গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য নাটক

জাহাঙ্গীর	১৲
বাজীরাও	১৲
অহল্যাবাই	১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[শিখ ইতিহাস সংবলিত]

গুরুগোবিন্দ সিং

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়-

প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দোপাধ্যায়

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস।

৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২৫ সাল।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

গুরুগোবিন্দ সিং।

শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত বংশোদ্ভব স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ পাতিয়ালার বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ

শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রসিং মাহিন্দার বাহাদুর জি. সি, আই. ই,

METCALFE PRESS.

(বাঙ্গালা উৎসর্গ পত্রের সম্মুখে)

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার কৃপায় বাল্যকালে ভারতে নবযুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক ভারতবাসি
মাত্রেরই প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি-সম্পন্ন আমার মাতুল ৺ভূদেব
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট থাকিয়া 'স্বধর্ম্মের সর্ব্ব-
ব্যাপকতা' এবং উদারতার আভাস পাই,

যাঁহার কৃপায় পশ্চিমে গিয়া খারিন্দোয়া-নিবাসী ভাই হরি সিংহের
নিকট "ছক্কা" পাঠে আনন্দ লাভ করি,

যাঁহার কৃপায় এই গ্রন্থ রচনায় একাধারে ভাই এবং বন্ধু
শ্রীমান্ মুকুন্দদেব ভাই জীবনের উৎসাহ পাই,

যাঁহার কৃপায় স্বর্গীয় পুরোহিত ভাই রাম সিংহের অনুগ্রহ লাভকরি,

যাঁহার কৃপায় ভাই গণপৎ সিংহের ন্যায় বন্ধুর সহায়তা পাই,

যাঁহার কৃপায় প্রথম সংস্করণে এই গ্রন্থের কিয়দংশ প্রকাশে
বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দীর উৎসাহ পাই,

যাঁহার কৃপায় তদীয় আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত বংশোদ্ভব স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বর্ত্তমান
মহারাজ পাতিয়ালার * নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য
পাইয়া একান্ত দরিদ্র আমি এই বর্ত্তমান সম্পূর্ণ
সংস্করণ ছাপাইতে সমর্থ হইলাম,

সেই কৃপাময় সনাতন ধর্ম্মরক্ষক অবতার পুরুষ

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দ সিংজীর

মঙ্গলময় নামে এইক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ভক্তিভরে উৎসর্গীকৃত হইল।

২৫ বৈশাখ, ১৩২৫। শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* His Highness Farzand-i-Khas Daulat-i-Englishia Mansuri-ul-Zaman-Amir-ul umra Maharajadhiraj Rajeshwar Sri Maharaja Rajgan Maharaja Bhupinder Singh MahinderBahadur G. C. I. E.

১ম গুরু নানক (১)
তদীয় সহচর বালা (২)
৩য় গুরু অমরদাস (৩)
৪র্থ " রামদাস (১১)
৭ম গুরু হররায় (৫)
৮ম " হরিকিষণ (৯)

দশ গুরু।

মঙ্গলাচরণ।

——:০:——

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

"গুরু নানক অঙ্গদ অমর গুরু।
গুরু রামদাস জগ্‌তারণ কো॥
গুরু অর্জ্জুন শব্দ জাহাজ গুরু।
সৎসঙ্গত পার উতারণ কো॥
গুরু হরগোবিন্দ হররায় গুরু।
হর কৃষ্‌ণ ভয়ো নিস্তারণ কো॥
গুরু তেগবাহাদুর শিসদিও।
কলযুগমে প্যায়েজ সমারণ কো (১)॥
প্রগটে গুরুগোবিন্দসিং গুরু।
অবতারণ দুষ্ট সংহারণ কো॥"

(১) প্যায়েজ সমারণকো = লজ্জা নিবারণের জন্য।

সূচীপত্র।

চিত্রের সূচী।

গুরুগোবিন্দ সিং।

প্রথম অধ্যায়।

শিখ-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি—

গুরু নানক।—(১) প্রথম অংশ

জন্মকথা।—গুরুপদ।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গুরুগোবিন্দ সিং শিখদিগের দশম গুরু। যদিও এক্ষণে ভারতের সর্ব্বত্রই প্রায় শিখদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাদিগের বাসস্থান প্রধানতঃ পঞ্জাব প্রদেশে। পঞ্জাবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক আছে বলিয়া ইহাদিগকে কেবল পঞ্জাবী না বলিয়া শিখ বলা যায়। পঞ্জাব প্রদেশ ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার উত্তরে হিমালয়

পর্ব্বত,পশ্চিমে সলিমান পর্ব্বত, দক্ষিণে সিন্ধুদেশ ও রাজপুতানা এবং পূর্ব্বে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। সমস্ত ভারতবর্ষে শিখদিগের সংখ্যা ১৯ লক্ষ ৭ হাজার মাত্র। তন্মধ্যে ১৮ লক্ষ ৭০ হাজার পঞ্জাববাসী। পঞ্জাবের মোট অধিবাসিসংখ্যা ২ কোটি ৫১ লক্ষ। শিখের সংখ্যা অত অল্প হইলেও, উহারা ভারত-ইতিহাসে আপনাদিগের নাম সমুজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে এবং আজও ইংরাজের নেতৃত্বে চীন, মিশর, পূর্ব্ব-আফ্রিকা, ইউরোপ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভারতীয় সদাচারসম্পন্ন অকুতোভয় সৈনিকের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। শিখ-সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক বাবা নানক। এই সম্প্রদায়ের দশম গুরুগোবিন্দ সিংহের বিষয় আলোচনাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের আমূল কিঞ্চিৎ উল্লেখ না করিলে, দশম গুরুর মাহাত্ম্য পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতে পারে না।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে লাহোরের উত্তরে রাভী (ইরাবতী) নদী-তীর-বর্ত্তী তেলবণ্ডী নামক স্থানে শিখধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক গুরু নানকের জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি লাহোরের দশ মাইল দক্ষিণে কটকপেয়া বা কানাকুচা গ্রামে মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। নানকের পিতার নাম কালুবেদী। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, সূর্য্যবংশীয় সীতা-পতি রামচন্দ্র হইতে এই বেদীবংশের উদ্ভব। বর্ত্তমান অমৃত-সহরের ছয় মাইল দূরে রামতীরথ নামক স্থান শ্রীরামচন্দ্রের স্থাপিত। শ্রীরাম-চন্দ্রের লব ও কুশ নামক পুত্রদ্বয়ের নাম পঞ্জাবে লোহ ও কুসু বলিয়া অভিহিত। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ লোহ লাহোরে এবং কনিষ্ঠ কুসু বর্ত্তমান ফিরোজপুরের নিকট কুসুর নগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে কুলপত কুসুরের রাজা হইয়া লাহোরের রাজা কুলরাওকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিতাড়িত করিয়া লাহোর অধিকার করেন। কুলরাও পলাইয়া দক্ষিণে অমৃতরাজের রাজ্যে গিয়া বাস

গুরুগোবিন্দ সিংহ।

[মর্দানা।] [গুরুনানক।] [বালা।]

Metcalfe Press.

করেন; উত্তরকালে তিনি তথাকার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং রাজার উত্তরাধিকারী হয়েন। উক্ত রাজকন্যার গর্ভে কুলরাওয়ের শোড়িরাও নামে এক পুত্র হয়।

কালক্রমে শোড়ি পরাক্রমশালী রাজা হইয়া উঠেন এবং পঞ্জাব তাঁহার নিজ রাজ্য বলিয়া জানিতে পারিয়া খুল্লতাত কুলপতকে আক্রমণ ও বিতাড়িত করেন। কুলপত মনের দুঃখে ৺কাশীধামে গমন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কুলপত বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক জ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, অত্যাচারী হওয়া বড় পাপ এবং অত্যাচারী ব্যক্তি কখন ভগবৎ-কৃপার প্রত্যাশা করিতে পারে না। এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি পুনরায় শোড়িরায়ের নিকট গমন পূর্ব্বক, তিনি যে তাঁহার পিতার উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে জন্য ক্ষমা চাহিলেন। শোড়িরাও পিতৃব্যকে ক্ষমার বিষয় আর কি বলিবেন, বিনয় পূর্ব্বক জানাইলেন,—"আপনি বেদ পাঠ করিয়া যাহা শুনাইলেন, তাহাতে আমার আর রাজ্যে অভিলাষ নাই। আমি সন্তুষ্টচিত্তে আপনাকে রাজ্য দান করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিলাম।" কুলপত রাজ্য গ্রহণ করিয়া শোড়িরাওকে বলিলেন,—"যদিও আমার বংশে সাধু এবং শাস্তা জন্মিবে, কিন্তু তোমার বংশে সর্দ্দার ও রাজা সমূহ জন্মিবে, এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি।" তখন শোড়িরাও চলিয়া গেলেন এবং কুলপত লাহোরে রাজ্য করিতে লাগিলেন। কুলপত বেদ পড়িয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার বংশধরদিগকে বেদী বলিত। বহুকাল পরে কালুবেদী সেই উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কালু যদিও জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু সামান্য ব্যবসায় করিয়া দিনযাপন করিতেন। আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও তাঁহার চরিত্রগুণে তিনি গ্রামের মধ্যে একজন মণ্ডল-স্থানীয়

ছিলেন। দার-পরিগ্রহ করার পর বহুদিন পর্য্যন্ত কালুর সন্তানাদি হয় নাই। একদিন কোন সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়া তাঁহাকে গৃহে আনিয়া ও অতিথি-সৎকার করিয়া অপত্যাভাবে নিজ মনোদুঃখের কথা জানাইলে, সন্ন্যাসী ঠাকুর নিজ প্রসাদের কিঞ্চিৎ অংশ লইয়া কালুর পত্নীকে ভক্ষণ করিতে বলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে একে একে কালুর এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। এই পুত্রই নানক। কন্যার নাম নানকী। বাদশাহ দৌলত খাঁ লোদীর অধীনস্থ জয়রাম নামক একজন হিন্দু কর্ম্মচারীর সহিত নানকীর বিবাহ হয়।

তেলবণ্ডী গ্রামটি কৃষি-বাণিজ্য-বিহীন একটি বিস্তীর্ণ জঙ্গলমধ্যগত স্থান বলিলেই চলে। ইহার একদিকে রাভী (ইরাবতী) ও অপরদিকে বিয়া (চন্দ্রভাগা) নদী প্রবাহিত। এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ (দোয়াব) বিলক্ষণ বিস্তীর্ণ। বর্ণিত সময়ে এ স্থানের শ্রমজীবী জাটেরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল এবং দেশান্তর হইতে আগত অলস ভট্টিরা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। এতদুভয় জাতির মধ্যে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বিরোধানল প্রজ্বলিত হইত। এরূপ বিরোধানল সে সময়ে ভারতের অনেক স্থলেই প্রজ্বলিত হইতেছিল, এবং হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিগণ ইহাতে একান্ত ক্ষুব্ধ হইতেছিলেন। স্বধর্ম্ম-পরিপালনের পরিবর্ত্তে অপর ধর্ম্মের প্রতি মনের ভিতরে বিদ্বেষ পোষিত হইলে প্রকৃত উদার ধর্ম্মভাব কমিয়া যায়; দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এই জন্য তখন ধর্ম্মাত্মাদিগের আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল যে, যাহাতে এই বিবাদ মিটিয়া যায়। ভগবান্‌ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলেই অংশাবতারদিগকে প্রেরণ করেন। তাহারই ফলে যেমন পঞ্চনদে গুরু নানক, তেমনি অন্যান্য স্থলে রামানন্দ, গোরক্ষনাথ, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ দেখা দিয়াছিলেন। যে সময়ে

নানক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে লোদীবংশীয় সম্রাট্‌গণ ভারতের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। পঞ্জাবের হিন্দু এবং মুসলমান একদেশবাসী এক রাজার অধীন ও এক-ভাষা-ভাষী হইয়াছিলেন এবং ক্রমে এক-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেই যেন ভাল হয়, এমনই ভাল লোকদিগের মনে হইতেছিল।

জনম-শাখী, সূর্য্যপ্রকাশ প্রভৃতি শিখদিগের গ্রন্থে নানকের জীবনী যেরূপ বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত আছে, সেরূপ বিস্তৃত বর্ণনা বর্ত্তমান পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। যাহা হউক, অতি অল্প বয়সেই নানক বিদ্যাশিক্ষার্থে পাঠশালায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার শিক্ষক তাঁহার বাক্যে মোহিত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানক নাকি কোন সময়ে শিক্ষককে বলিয়াছিলেন ঃ—

"শুন্‌ পাণ্ডে কেয়া লিখো জঞ্জালা।
লিখে রাম নাম গুরুমুখ গোপালা॥"

অর্থাৎ হে পণ্ডিত! কি জঞ্জাল লেখা-পড়া শিক্ষা দিতেছ, গুরুমুখ দ্বারা একমাত্র রামগোপাল নাম শিক্ষণীয়। কথিত আছে যে, নানক তাঁহার শিক্ষককে এইরূপ আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা কতদূর হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না; কিন্তু তাঁহার প্রণীত আদি গ্রন্থ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে অনুবাদিত তাঁহার স্বপ্রদেশীয় ভাষায় শ্লোক-রচনা প্রভৃতি দেখিলে, তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই বোধ হয়। শিখেরা তাঁহাকে সকল বিদ্যায় নিপুণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

নানক অল্প বয়সে গণিত ও পারস্য ভাষা আয়ত্ত করিলে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি সিন্ধু-দেশীয় জনৈক জাটের সঙ্গে নানককে চল্লিশটি টাকা দিয়া

ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইতে বলিয়াছিলেন ; কিন্তু নানকের প্রকৃতি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের দিকে গেল না। তাঁহার হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাব ছিল, তাহা স্বদেশীয় হিন্দু এবং মুসলমানের সর্ব্বপ্রকার মিলনানুকূল অবস্থায় অসঙ্গত-রূপ বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়া, যেন ক্রমে ক্রমে প্রধূমিত হইতে লাগিল। তিনি বাণিজ্য-ব্যবসায় করিয়া ধনবান্ হওয়া এবং ভোগ-বিলাসই জীবনের চরমোদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিলেন না। নানক পিতৃদত্ত উক্ত টাকা লইয়া বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একদল ফকীরকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হন। ফকীরগণও তাঁহার নিকট বৈরাগ্য-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তখন নানক তাঁহাদিগকে কিছু অর্থ দিতে চাহিলেন ; তাঁহারা তাহা গ্রহণ না করিয়া বলেন,—"তোমার একান্ত ইচ্ছা হয়, তবে কিছু আহার দিতে পার। অর্থ লইয়া আমরা কি করিব?" তখন নানক হস্তস্থিত অর্থ দ্বারা ফকীরদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। যে স্থলে এই ঘটনা হইয়াছিল, তাহার নাম এখন পর্য্যন্ত "খারা সওদা" অর্থাৎ অমিশ্র বাণিজ্য। ইহার পর নানক নিঃসম্বল হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার পিতা অনেক কটূক্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু ভোলার ভট্টি গ্রামবাসী জনৈক আঢ্য ব্যক্তি নানকের এই সাধু চরিত জ্ঞাত হইয়া এরূপ তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, নানকের পিতাকে নানক-কর্ত্তৃক ব্যয়িত অর্থ দিয়া নানকের প্রতি কটূক্তি নিবারণ করেন। নানক পিতৃকৃত তিরস্কারের সময় যে বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিলেন, তাহার নাম 'মাল সাহেব।'

ইহার কিছুদিন পরে কালু জলন্দর দোয়াবের মধ্যবর্ত্তী সুলতানপুরে নানকের জন্য একখানি দোকান করিয়া দেন। এবারও নানক নিজ স্বভাব-সিদ্ধ দয়ালুতা-গুণে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। যেখানে নানক এই দোকান করিয়াছিলেন, সে স্থানকে এখনও "হাট সাহেব" বলে।

এবার কালু বিরক্ত হইয়া পুত্রকে আর বাণিজ্য-ব্যবসায় করিতে দিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে নানক নিজ ভগিনীপতির নিকট লাহোরে উপস্থিত হইলেন। নানকের ভগিনীপতি জয়রাম তখন প্রতিপত্তির সহিত উক্ত প্রদেশের শাসন-কর্ত্তার অধীনে কর্ম্ম করিতেছিলেন। জয়রাম তাঁহাকে নবাব সরকারে কর্ম্ম করিয়া দিলেন। তিনি নিত্য রসদ বাঁটিবার অর্থাৎ আহার্য্য বিতরণের ভার পাইলেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্ববৎ ফকীরদিগের সেবায় খরচ আরম্ভ করিয়া দিলে, জয়রাম এরূপ অত্যধিক জড়িত হইয়া পড়িলেন যে, পরিশেষে অভদ্রাচারী বলিয়া অভিযুক্ত হইলেন। কেহ কেহ বলেন যে, অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, অলৌকিক-ভাবে সরকারী তহবিল বাড়িয়াছিল। সে যাহা হউক, নানকের নবাব সরকারে কার্য্য এই সময় হইতে ফুরাইল।

বৈরাগ্য-আশ্রম-অবলম্বীদিগের প্রতি বাবা নানকের যে অসাধারণ সহানুভূতি ছিল, তাহা এই সকল উদাহরণ হইতে এক প্রকার বুঝা গেল। তাঁহার অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি অন্তরে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিধির চক্রে তাঁহাকে এত দিন সাংসারিক ব্যাপারে আটকাইয়া রাখিয়াছিল। দার-পরিগ্রহ তিনি গুরুজনের আজ্ঞা-পালনের নিমিত্তই করিয়াছিলেন। অর্থো-পার্জ্জনের দশা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নানক দারপরিগ্রহ করিয়া-ছিলেন বটে, কিন্তু সহজে গৃহবাসী হইতে সম্মত হয়েন নাই। কিরূপে অসার গণ্ডগোল ত্যাগ করিয়া লোকে ঈশ্বর-তত্ত্বে মনো-নিবেশ করিবে, সেই জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল ছিল। তিনি দেখিলেন যে, দেশমধ্যে দুই প্রকার ধর্ম্মপ্রণালী লইয়া লোকে গণ্ডগোল করিতেছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভোগ-সুখেই লিপ্ত রহিয়াছে। এরূপ

লোকদিগকে উদ্ধার করিতে উভয় ধর্ম্মপ্রণালীর সামঞ্জস্য-বিধান এবং ভোগসুখ-নিবারণের জন্য বৈরাগ্য-আশ্রয় ভিন্ন আর কি উপায় আছে? যথায় লোক রাবণের ন্যায় দর্পী, তথায় ভিখারী রাঘর উদ্ধার-কর্ত্তা; যথায় লোক পরস্বাপহারী, তথায় আত্মদানকারী উদ্ধার-কর্ত্তা; যথায় লোক মরুবাসী, দরিদ্র ও ধর্ম্মাচরণ-হীন, তথায় ধর্ম্মোন্মত্ত দিগ্‌বিজয়ীই উদ্ধার-কর্ত্তা; যথায় লোক বলি রাজার ন্যায় দাতা, তথায় ত্রিবিক্রমরূপী সর্ব্বব্যাপী (বা সর্ব্বগ্রাহীই) উদ্ধার-কর্ত্তা; সুতরাং যথায় লোকে ভোগ-বিলাসী হইয়া পড়ে, তথায় বৈরাগ্য-অবলম্বী ভিন্ন আর কে উদ্ধার করিবে? তাই ভারতে নানক, গৌরাঙ্গ প্রভৃতির উদ্ধার-কর্ত্তৃত্ব দেখিয়া ভারতবাসীর ভোগ-বিলাসিতা সূচিত হইয়াছে। তবুও ভাল যে, এদেশের লোক এত নিকৃষ্ট হয় নাই যে, এখানকার গুরু বা অবতারগণকে এখনও আত্মদানে প্রস্তুত হইতে হয়। নানকের সময়ে পঞ্জাবীরা এত অধার্ম্মিক এবং দরিদ্র হয় নাই যে, দিগ্‌বিজয়ী বীরের আবির্ভাব তখনই আবশ্যক হইয়াছিল। ব্রুস, উইলিয়ম্ টেল, ক্রমওয়েল, শিবজী, ওয়াসিংটন, গ্যারিবালডি প্রভৃতি মহাত্মগণ স্ব স্ব সমাজের একান্ত বিদলিত অবস্থাতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শিখ-গুরুগোবিন্দের অভ্যুদয়ও সেইরূপ সময়ে ঘটিয়াছিল। নানকের সময়ে তাঁহার সমাজের অবস্থা তত শোচনীয় হয় নাই। কতক পরিমাণ ভোগ-বিলাস সাধারণ মনুষ্যমাত্রেই হয়,—এই জন্য গুরু-মাত্রেরই ত্যাগী হওয়া আবশ্যক হইয়া থাকে। যাহা হউক, হিন্দু-মুসলমানের একতা-সাধন-চেষ্টার আবশ্যকতা তখন সুস্পষ্টরূপ উপলব্ধ হইয়াছিল; সেই সম্মিলন-চেষ্টাতে নানক-পন্থের বিশিষ্টতা প্রতিষ্ঠিত।

নানক পারস্য ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন; সুতরাং তিনি রাজা রাম-মোহন রায়ের ন্যায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যে অংশটিতে মুসলমান-ধর্ম্মের

ধরণের কথা আছে,তাহাই সমুজ্জ্বল করিয়া উভয় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু হিন্দুয়ানীর দিকেই ঝোঁক অধিকতর রহিল। তিনি যখন নানকসাহী ধর্ম্ম বা শিখ-সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন, তখন তাহার কর্ত্তা হইয়া "মোল্লা" বা "মৌলবী" উপাধি না লইয়া "গুরু" উপাধি গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, নানক একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই গুরু উপাধিগ্রহণ করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নানক-প্রবর্ত্তিত এই পথের বিশিষ্ট লক্ষণ "গুরু-ভক্তি।" বলিতে গেলে, বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী মানবগণকে যদি এক বন্ধনে বাঁধিতে হয়, তবে শ্রীগুরুর সেবাই একমাত্র উপায়। গুরুভক্তি বিষয়ে সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের একই কথা; গুরুগীতায় মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন;—

"দুর্ল্লভং ত্রিষু লোকেষু তং শৃণুষ্ব বদাম্যহম্।
কিঞ্চিদ্ গুরুং বিনা নান্যৎ সত্যং সত্যং বরাননে॥ ৪৮॥
বেদশাস্ত্র-পুরাণানি ইতিহাসাদিকানি চ।
যন্ত্র-মন্ত্রাদি-বিদ্যানাং মৃত্যুরুচ্চাটনাদিকম্॥ ৪৯॥
শৈবশাক্তগণাদীনি অন্যদ্বহুমতানি চ।
অপভ্রংশাঃ সমস্তানি জীবানাং ভ্রান্তচেতসাম্॥ ৫০॥"

অর্থাৎ—ত্রিভুবনে গুরুতত্ত্ব দুর্ল্লভ। আমি সেই সর্ব্বলোক-দুর্ল্লভ গুরুতত্ত্ব বর্ণন করিতেছি; অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। হে বরাননে! এ জগতে গুরুই সত্য। গুরু ভিন্ন আর কিছুই সত্য নাই, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ভ্রান্ত-চিত্ত জীবের বেদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্র, যন্ত্র-মন্ত্রাদি বিদ্যা, মারণ উচ্চাটনাদি কর্ম্ম, শৈবশাক্ত-গাণপত্যাদি বহুবিধ মত সমস্তই ব্যর্থ, অর্থাৎ গুরু-তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এ সমস্তই ব্যর্থ। গুরুগীতার অপর স্থলে কথিত হইয়াছে;—

"জন্মহেতূ হি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ।
গুরুর্বিশেষতঃ পূজ্যো ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শকঃ॥ ২৪ ॥"

অর্থাৎ—জনক ও জননী বলিয়া পিতা ও মাতা পূজ্য, অর্থাৎ পিতামাতা হইতে আমরা জন্মলাভ করিয়া থাকি বলিয়া তাঁহারা পূজনীয়; কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রদর্শক বলিয়া গুরু পিতা-মাতা অপেক্ষা অধিক পূজ্য।

অন্যত্র গুরুগীতায়;—

"জপেচ্ছাক্তশ্চ শৈবশ্চ গাণপত্যশ্চ বৈষ্ণবঃ।
সৌরশ্চ সিদ্ধিদং দেবি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষদম্॥ ১০২ ॥"

অর্থাৎ গুরুগীতাস্তব সকলেরই পাঠ্য অর্থাৎ কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি গাণপত্য, কি সৌর, সকলের পক্ষেই উক্ত স্তোত্র ফলপ্রদ হয়। দেবি! এই গীত ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষদাতা।

মনু দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিতেছেন:—

"আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা স্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ॥ ২২৫ ॥"

অর্থাৎ—বেদদাতা আচার্য্য (গুরু) ব্রহ্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি; জন্মদাতা পিতা প্রজাপতি-মূর্ত্তি; গর্ভধারিণী মাতা পৃথিবীর সাক্ষাৎ মূর্ত্তি এবং সহোদর ভ্রাতা আপনার দ্বিতীয় মূর্ত্তি।

অন্যত্র মনু (২ অঃ)।

"ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্।
গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥ ২৩৩ ॥"

অর্থাৎ মাতৃভক্তি দ্বারা ভূলোক, পিতৃভক্তিবলে মধ্যম লোক এবং

গুরুভক্তি-বলে :ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়। এইরূপে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে "গুরু" পূজিত হইয়া থাকেন। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এই মৌলিক লক্ষণটি বুঝিয়াই বোধ হয়, নানক "গুরু" উপাধি মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর্য্য-বহুল পঞ্জাব প্রদেশে "গুরুর" প্রতি যথেষ্ট ভক্তি থাকায়, তাঁহার প্রতি অবতারাদি নামের বা উপাধির প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় নাই। তিনি শিষ্য বা শিখ-দিগের নিকটও "গুরু" মাত্র। আর্য্যদিগের মন্ত্রদ্রষ্টা বৈদিক সূক্ত-প্রণেতারা "ঋষি" মাত্র। সকল বড় লোককেই তাঁহারা পূর্ণাবতার না বলিয়া থাকিতে পারিতেন।

গুরু নানক।—(২) দ্বিতীয় অংশ।

গুরু-মাহাত্ম্য। বালা ও মর্দ্দানা।

'সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌॥"

গীতা ৫ অঃ ৪র্থ শ্লোক।

শিখদিগের মতে গুরু এক, তবে উহাঁদের কায়া ভিন্ন মাত্র। এমন কি, সেই কারণে অন্যান্য গুরুর রচিত পদও গুরু, যেমন নিজ নিজ চিহ্ন দ্বারা দেবগণ ভক্তগণের নিকটে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন, শিখ গুরুগণের রচিত পদগুলিও বিভিন্ন গুরুগণের রচিত চিহ্ন দ্বারা (প্রথম-দ্বিতীয়াদি চিহ্ন দ্বারা) শিখগণ কর্ত্তৃক পরিচিত হইয়া থাকে। গুরুগণের মধ্যে ঐরূপ একত্ব দেখিয়াই গুরুগোবিন্দ সিংহের কথা-প্রসঙ্গে সকল গুরুগণের উল্লেখ করা সবিশেষ আবশ্যক বলিয়া বোধ হইয়াছে।

গুরুগোবিন্দ সিংহের কথা উপলক্ষে অন্যান্য গুরুগণের এবং শিখ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গুরু নানকের বিষয় সবিশেষ করিয়া আলোচনা করার আর একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। গুরু নানকের কথা যে পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে উদাসীন সন্ন্যাসিগণের পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হয় এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি করাই যেন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু তাঁহার দশম কায়া-স্বরূপ গোবিন্দ সিংহ সেরূপ ছিলেন না বলিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন। গোবিন্দ সিংহকে পাঠক রণক্ষেত্রে দেখিতে পাইবেন। নানক শিষ্যগণকে ভক্ত সন্ন্যাসী সাজাইয়াছিলেন, আর গুরুগোবিন্দ তাঁহার শিষ্যগণকে শত্রুবিমর্দ্দনকারী সেনামণ্ডলী করিয়া

তুলিয়াছিলেন। এরূপ দেখিলে সহজেই মনে হয় যে, তবে বুঝি গুরুগণ এক নহেন। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে যখন অর্জ্জুন গুর্ব্বাদি-বধভয়ে বিষাদযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময় ভগবান্ তাঁহাকে ঔদাস্য-বৃদ্ধিকর যোগশিক্ষা দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। ঔদাস্য-বৃদ্ধিকর যোগ-শিক্ষা দ্বারা কিরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান যায়, ইহাও যেমন বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া আপাত-দৃষ্টিতে বোধ হয়, নানক-সাহী ধর্ম্মের গুরুগণের কার্য্যও যেন তদ্রূপ বিস্ময়-জনক। তা'ই বলি,—

"সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।"—অর্থাৎ পণ্ডিতেরা সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ বলেন না।

নানকের আমলে যুদ্ধ-বিগ্রহের কোন কথাই ছিল না বলিলেই চলে। তবে কোন সময় তিনি মুলতানের গড়ছত্র মেলায় বেড়াইতে গিয়া বেদ কোরাণ ছাড়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন বলিয়া, নবাবের অনুজ্ঞায় বন্দীকৃত হন। এই সময় ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাত মাসকাল বন্দিভাবে অবস্থানের পর নানক নিষ্কৃতিলাভ করেন। তাহার কিছুকাল পরে পাণিপথের যুদ্ধে সম্রাট্ বাবর কর্তৃক ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হয়েন।

নানকের ভগিনী নানকী নানককে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারই পতির যত্নে কিছুদিনের জন্য নবাব সরকারে নানকের কর্ম্ম হয়; এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নানকও নানকীকে বড় ভালবাসিতেন। নানক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে,নানকীর যত্নে দিনকতক গৃহবাসী হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার দুই পুত্র হয়,—শ্রীচাঁদ ও লছমীদাস (লক্ষ্মীদাস)। তৎপরে নানক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কিছুদিন নানাস্থলে পর্য্যটন পূর্ব্বক একবার জন্মভূমির নিকট গুজরণবালাস্থ এমনাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তথায় লালু নামক একজন সূত্রধরের সহিত কয়েকদিন

অবস্থিতি করিলে, তাঁহার সহচর মর্দ্দানা নিজ পরিবারবর্গকে দর্শন করিবার মানসে গৃহে গমন করিয়াছিল। মর্দ্দানা পূর্ব্বে মুসলমান ছিল; কিন্তু নানকের গুণে মুগ্ধ হইয়া শিখধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে নানা দেশ-বিদেশে ফিরিয়াছিল। মর্দ্দানার সঙ্গীত-শক্তি অতি চমৎকার ছিল; তাহার গানে নানকের ভগবদ্ভক্তি উত্তেজিত হইত। তেলবণ্ডীর সর্দ্দার রায় বুলার মর্দ্দানার নিকটে নানকের মহত্ত্বের কথা শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি নিকটে আসিয়াছেন জানিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহার কথায় তৃপ্ত হইয়া নানকও তেলবণ্ডীতে রায় বুলারের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার মাতা, পিতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সকলেই তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু নানক তাহাতে সম্মত না হইয়া বলেন,—"আমিও পরিবারবর্গ দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছি। এ আশ্রমে 'ক্ষমা' আমার মাতা, 'ধৈর্য্য' আমার পিতা, 'সত্য' আমার পিতৃব্য; ইঁহাদেরই দ্বারা আমার মন আবদ্ধ রহিয়াছে; ইঁহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আমি সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।" এইরূপ বাক্য-বিন্যাস দ্বারা নানক আত্মীয়-স্বজনকে পুনরায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

নানক বিবাহিত পুরুষ এবং পুত্রবান্,—কোন ফকীর এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার সন্ন্যাস-আশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে উপহাস করিয়াছিলেন। তদুত্তরে নানক বলেন;—

"আওরত ইহান।
লেড়্কা নিসান।
দৌলত গুজরান্॥"

অর্থাৎ ধর্ম্ম-পত্নীর নিকট যিনি অবস্থিতি করেন, তাঁহার ধর্ম্ম ঠিক। পুত্র চিহ্নস্বরূপ। কেবল দিনযাপনের নিমিত্ত ধন আবশ্যক।

এ স্থলে ঔদাস্য-ব্যঞ্জক নানকের কৃত গুরুমুখীতে লিখিত শ্লোকের উল্লেখ করিলে বোধ হয়, মন্দ হয় না।

"আয়ে জগৎমে কেয়া কিয়া তন পালাকর পেট।
নানক দিন ধন্ধে গিয়া রয়েন গিয়া সুখলেট॥"

অর্থাৎ জগতে আসিয়া কি করিলে? কেবল আপন শরীর ও পেট পোষণ করিলে বৈ ত নয়। দিন ধন্ধায় পোষণের চেষ্টায় গেল, এবং রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হইল।

"খান্দে খান্দে মুহ ঘট্টা পহেন্দিয়া সব অঙ্গ।
নানক ধিরগ তিনাদা জীবিয়া যিন্ সচ্ না লগ্‌গিয়া রঙ্গ॥"

অর্থাৎ খাইতে খাইতে মুখে এবং পরিতে পরিতে সর্ব্ব অঙ্গে ঘাটা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহাদের হৃদয় সেই (ঈশ্বর) রঙ্গে (প্রেমে) মাতিল না, নানক তাহাদিগকে ধিক্কার দিতেছেন। এ দিকে বাঙ্গালার বৈষ্ণব ফকীরও বলিতেছেন:—

"দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণের চরণারবিন্দে॥"

নানক তীর্থাদি নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এই পর্য্যটনের সময় উক্ত গায়ক মর্দ্দানা এবং ভৃত্য সদৃশ ভক্ত বালা প্রায়ই সঙ্গে থাকিত। নানকের রচিত সঙ্গীত মর্দ্দানা কর্তৃক গীত হইত। এ সকল গীত হইতে নানককে চিনিতে হইলে, তাঁহাকে একজন সরল বৈদান্তিক বলিয়া মনে হয়। তিনি বেদান্তাদির আলোচনা রাখিতেন; তাহা তাঁহার গুরুমুখীতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। গুরু নানক নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ বিবরণ পর্য্যায়ক্রমে বলা যায় না। তবে সংক্ষেপে কতক কতক এস্থলে দেওয়া গিয়াছে।

তিনি যখন মক্কায় গিয়া তথাকার প্রধান মস্‌জিদের দিকে পা রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তখন তথাকার মোল্লারা কুপিত হইলে, নানক বলিয়াছিলেন,—“যে দিকে ভগবানের দ্বার নাই, এমন দিক্ দেখাইয়া দাও, সেই দিকে পা রাখি।” ইহাতে মোল্লারা চমৎকৃত হইয়া নানককে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহার কথাবার্ত্তায় অতীব সন্তুষ্ট হয়েন। যাহা হউক, উক্ত কথাটিও তাঁহার সরল বৈদান্তিক মত-পোষক বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছে। মর্দ্দানা কর্ত্তৃক অধিকাংশ গীতই ঐ ভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। এ স্থলে একটি উদ্ধৃত করা গেল :—

গৌড়ীরাগ।

“পওয়ন পানী অগ্নিকা মেল। চঞ্চল চপল বুদ্ধকা খেল॥
নও দরওয়াজা দশম দোয়ার। বুঝ্‌রে জ্ঞানী ইয়ে বিচার॥
কর্ত্তা বক্তা শুন্তা সোই। আপ্ বিচারে সো জ্ঞানী হোই॥
দেহী মাটী বোলে পওয়ন। বুঝ্‌রে জ্ঞানী মুয়া হ্যায় কোন্॥
মুই সুরৎ বাদ অহঙ্কার। ও ন মুয়া যো দেখন হার॥
বয় কারণ তট্ তীরথ যাহী। রতন পদারথ ঘটহি মাহী॥
পড় পড় পণ্ডিত বাদ বাখানে। ভিতর হোদি ব্যথ না জানে॥
হওঁনা মুয়া মেরে মুই বলায়। ওনহে মুয়া যো রহাসমাএ॥
কহ নানক গুরু ব্রহ্ম দেখায়া। মরতা জাতা নজর না আয়া॥”

অর্থাৎ এই দেহ, বায়ু, জল এবং অগ্নির মিলন-সম্ভূত, অস্থির মায়ার বুদ্ধির খেলামাত্র। এই দেহের নবদ্বার; এবং মূর্দ্ধা ইহার দশম দ্বার। হে জ্ঞানী! ইহা বিচার করিয়া বুঝ। কর্ত্তা, বক্তা এবং শ্রোতা সেই; আপনি চিন্তা করিয়া জ্ঞানী হও। দেহ মাটীতে এবং বাক্য পবনে মিশাইবে। এক্ষণে বুঝ, তবে মরে কে? মরে দেহ, বাক্য এবং

অহঙ্কার, কিন্তু সেই দ্রষ্টা (আত্মা) মরে না। যে জন্য (ঈশ্বরলাভ) তীর্থ-এবং তট-ভ্রমণ করা হয়, সে রত্ন-পদার্থ (ঘটেই) নিজ দেহেই রহিয়াছে। পণ্ডিতগণ পাঠ করিয়া পাঠ করিয়া বাক্যব্যয় খুব করিতে পারেন; কিন্তু ভিতরে বিদ্যমান বস্তু জানেন না। যে মরিয়াছে, সে (দেহ) আমার বালাই গিয়াছে। যে ব্যাপক আছে, সে মরে নাই। নানক বলেন, যখন গুরু ব্রহ্ম দেখাইয়া দেন, তখন মরণ জনন আর নজরে আসে না।

এইরূপ জ্ঞান-পূর্ণ ও আত্মার অমরত্ব-সূচক অনেক সঙ্গীত নানকের স্বরচিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। উত্তরকালে সুপণ্ডিত উদাসী লেখক কেহ কেহ বেদ এবং উপনিষদ্ গ্রন্থের অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গুরু নানকের বাণী-সকল শ্রুতির অবিরোধী। ব্রহ্মবিৎ গুরুর হৃদয়ে—সংস্কৃতে শিক্ষিত না হইলেও অনুভবের দ্বারাই সনাতন ধর্ম্ম-তথ্য সকল জাগরিত হইয়াছিল। শ্রীমৎরামকৃষ্ণদেবে ঐ ভাবে সে দিন লক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার কৃত ভগবানের সুন্দর আরতি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি ভগবানের বিরাট মূর্ত্তির পূজক ছিলেন। ঐ আরতি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা জয়জয়ন্তী রাগিণীতে এবং ঝাঁপতাল বাদ্য সহযোগে গীত হইতে পারে।

"গগনময় থাল, রবি চন্দ দীপক বনে,
তারকা মণ্ডলা জনক মোতি।
ধূপ মলেয়ানিল পবন চৌঁর করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।
ক্যায়সে আরতি হোওয়ে,
ভব খণ্ডন তেরি আরতি অন্ হদ্ শব্দ বাজান্তভেরী।
সহংস * তব নয়ন, নন্ নয়ন হ্যায় তোহেক,

* সহস্র।

সহংস মূরত নন্ এক তোহি ; সহংস পদ বিমল নম্ এক পদ গন্ধ, বিন্ সহংস তব গন্ধ এব্ চলত মোহি।

সব্‌মে জ্যোত জ্যোতহি সোয়, তিস্‌কে চান্‌নে সর্ব্বমে চান্ হোয় ; গুরু সাক্ষী জ্যোতি প্রগট হোয়, যো তিস্ ভাবে সো আরতি হোয়।

হরিচরণ কমলমকরন্দ লোভিত মন অনুদিন মো আহি পিয়াসা, কৃপাজল দেও নানক সারঙ্গকো হো যাওয়ে তেরে নাম বাসা॥”

এই পদাটির প্রথম ভাগ বাঙ্গালা করিয়া উক্ত রাগ-রাগিণীতে আজকাল ব্রাহ্মসমাজে গীত হয় ; যথা :—

“গগনের থালে রবিচন্দ্রদীপক জ্বলে,
তারকা-মণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে, ভব খণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে॥”

নানকের ভণিতা দেওয়া এরূপ ভাবার্থ-সংযুক্ত অনেক সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। “আদিগ্রন্থে” নানাপ্রকার রাগ-রাগিণীসংযুক্ত গীত আছে। শিখেরা সাধারণতঃ বলেন,—ছত্রিশ রাগিণীই আছে। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থে একত্রিশ প্রকার দেখা যায়। কানিংহামও একত্রিশটি মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

(১) শ্রীরাগ (২) মাঝ) (৩) গৌরী (৪) আশা (৫) গুজরী (৬) দেওগান্ধারী (৭) বিহাগ্‌রা (৮) বড়হংস (৯) সুরট (১০) ধানেশ্বরী (১১) তেজশ্রী (১২) টৌরী (১৩) বেইরারী (১৪) তিলং (১৫) সোধি (১৬) বিলোয়াল (১৭) গৌড় (১৮) রামকেলী (১৯) নটনারায়ণ (২০) মালী গোড়া (২১) মারু (২২) তোখারী (২৩)

কেদারা (২৪) ভায়রো (২৫) বসন্ত (২৬) সারং (২৭) মল্লার (২৮) কানাড়া (২৯) কল্যাণ (৩০) পার্ব্বতী (৩১) জয়জয়ন্তী।

"গ্রন্থ" পুস্তকখানি এখনও হাতের লেখায় চলে, এবং উহার নানা পাঠ দেখা যায়।

নানকের ধর্ম্মমতের ভিতর হিন্দু-মুসলমানের অনেক মিল পাওয়া যায়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নানকসাহী মতে জাতিভেদ প্রায় নাই, অথচ গো-হত্যা গুরুতর পাপ। কেহ কেহ বলেন যে, শিখদিগের মতে দেবদেবী বা মূর্ত্তিপূজা নাই, এ কথা যে অমূলক, তাহা পরে দেখান যাইবে। তবে মানস-পূজার অধিকারী এবং ব্রহ্মবিৎ নানকাদি গুরুগণের পক্ষে মূর্ত্তি-পূজার আবশ্যক না হইতে পারে, সে স্বতন্ত্র কথা।

গুরু নানক—তৃতীয় অংশ

আদি গ্রন্থ।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

"আদিগ্রন্থ" নানকের রচিত; কিন্তু তিনি উহা লিপিবদ্ধ করিয়া যায়েন নাই। উহা শিষ্যগণের মুখে মুখেই প্রথম প্রথম থাকিত। পরে পরবর্ত্তী গুরুগণ উহা রীতিমত গ্রন্থাকারে সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত রাগ-রাগিণী-সংযুক্ত গীত ব্যতীত "আদিগ্রন্থে" (১) জপজী, (২) সোদর রহরাস, (৩) কীর্ত্তি সোহিলা প্রভৃতি বিষয় আছে। "আদি-গ্রন্থে" গুরু কয়জন ব্যতীত কয়েকজন ভক্তের রচনাও আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম প্রধানতঃ দেখা যায়।—

(১) কবির (মুক্তকবি বা সাধক বা সংস্কারক), (২) ত্রিলোচন (জনৈক ব্রাহ্মণ), (৩) বেণী, (৪) রাওদাস (ভক্তমাল গ্রন্থানুসারে ইনি পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী ছিলেন; কিন্তু পরে শাপগ্রস্ত হইয়া চামার হয়েন), (৫) নাম দেও (জনৈক রজক বা কাপড়ে ছাপাকর বা ছীপা, (৬) ধন্না (জনৈক জাঠ), (৭) সেখ ফরিদ (জনৈক মুসলমান), (৮) জয়দেও (জনৈক ব্রাহ্মণ), (৯) ভীকণ, (১০) সেন (জনৈক নাপিত), (১১) পীপা (রাজা—মীরা বাইয়ের স্বামী), (১২) স্বধন্না (জনৈক কসাই, কেহ কেহ বলেন বৈরাগী), (১৩) রামানন্দ (বিখ্যাত সংস্কারক), (১৪) পরমানন্দ, (১৫) সুরদাস (জনৈক অন্ধ), (১৬)

মীরাবাই (পূর্ব্বে রাণী ছিলেন, পরে বৈরাগ্য আশ্রয় করেন), (১৭) সত্যা, (১৮) বলবন্ত, (১৯) সুন্দর দাস (জনৈক রবাবী-বাদক)। এতদ্ব্যতীত "গ্রন্থের" ভোগ নামক অংশে আট নয় জন ভাট বা ভাঁড়ের রচনাও গৃহীত হইয়াছে। ভাট নয় জন যথা ঃ—(১) গুরু রামদাসের অনুচর ভীক্ষা, (২) গুরু রামদাসের শিষ্য কল্, (৩) কল সহার, (৪) গুরু অর্জ্জুনের শিষ্য জলপ্, (৫) শল্, (৬) নল্, (৭) মথরা, (৮) বল,(৯) কীরিত। কোন কোন মতে বলের রচনা নাই।

শিখদিগের সন্ধ্যাবন্দনাদির মধ্যে "জপজী" পাঠই প্রধান। ইহা কেবলমাত্র নানকের রচনা বলিয়া শুনা যায়। স্নানের সময় "জপজী" অন্ততঃ কতকটা পাঠ করেন না, এমন বয়ঃপ্রাপ্ত শিখ প্রায় নাই। শিখ-দিগের প্রধান ধর্ম্ম-পুস্তক "গ্রন্থের" ইহাই শিরোভাগ বলিলেই চলে। ইহা মন্ত্রসমেত চল্লিশটি পৌরী (বা শ্লোকে) সম্পূর্ণ। মহাভারতের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার যে স্থান, "গ্রন্থের" মধ্যে "জপজীর" সেই স্থান বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিত নেহাল সিং প্রভৃতি কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাসহ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোকটিই শিখদিগের প্রধান মন্ত্র। গায়ত্রী যেমন ব্রাহ্মণমাত্রেরই প্রধান মন্ত্র, এ মন্ত্রটিও শিখদিগের সেইরূপ। তবে গায়ত্রী যেমন ব্রাহ্মণেতর জাতির পঠনীয় নহে, ইহা সেরূপ নহে। ইহা শিখ ভিন্ন অপর জাতিতেও শুনিতে এবং শিখিতে পারে। মন্ত্রটি এই ঃ—

"এক ওঁ সত্যনাম কর্ত্তা পুরুষ নির্ভও নির্বৈর অকাল মূর্ত্তি অযোনি সয়ম্ভম গুরুপ্রসাদী জপ্।

আদ সচ্। যুগাদ সচ্। হ্যায় ভি সচ্।

নানক হোসি ভি সচ্॥ * ॥"

মোটামুটী অর্থ,—এক ওঁকার সত্যনাম কর্ত্তা পুরুষ, নির্ভয় নির্বৈর

(রাগদ্বেষশূন্য) অকাল (অ=বিষ্ণু, কা=ব্রহ্মা এবং ল=শিব) অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতিলয়—মূর্ত্তি (অনাদি অনন্ত) অযোনি, বুদ্ধিতে প্রকাশরূপ গুরু কৃপায় জপ কর। আদিতে তিনি সত্য, এখনও সত্য, এবং নানক বলিতেছেন—তিনি থাকিবেনও সত্য॥ * ॥

এই মন্ত্রের পর ছন্দ ও শ্লোক আছে। উহাদের ধরণ বুঝিবার জন্য একটিমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

"শোচে শোচি ন হোই যে শোচি লাখবার।
চুপে চুপ না হোই যে লায় রহ লেওতার॥
ভুক্ষে ভুক্ষণা উৎরী যে বন্নাপুরিয়া ভার।
সহস্র সেয়ানপা লাখ হোয়ত এক না চলেনাল॥
কেঁও সচিয়ারা হোইয়ে কেঁও কুড়ে টুট্টেপাল।
হুকুম রেজাই চল্‌না নানক লিখেয়া নাল॥" ১॥

মোটামুটী অর্থ,—লক্ষবার শুচি করিলেও (এই জড়দেহ) শুচিতে (অভ্যন্তর) শুচি হয় না। যেমন তৈলের ধারা, তৈল ঢালা বন্ধ করাব পরও থাকে, সেইরূপ (ইন্দ্রিয়গণ) চুপ হইলেও (মন) চুপ হয় না। ক্ষুধার্ত্তের (ইন্দ্রাদির) পুরী বাঁধিয়া লইলেও (অর্থাৎ স্বর্গভোগ মিলিলেও) ক্ষুধা (কামনা) নিবৃত্ত হয় না। তুমি সহস্র চতুরতা কর, একটিও তোমার সঙ্গে যাইবে না। (যদি এরূপ হইল, তবে) কিরূপেই বা শুচি (খাঁটী) হইতে হয়? কেমন করিয়াই বা মিথ্যা (দেহ) ভার বহন বন্ধ হইবে? নানক বলিতেছেন, ঈশ্বরের আজ্ঞা সানন্দে পালন কর। শরীরের ভোক্তব্য অবশ্য ভুগিতে হইবে। ১

এইরূপ ভাবে "জপজী" লিখিত হইয়াছে। ইহার সকল শ্লোকগুলিই প্রথম গুরু নানকের লিখিত। কথিত আছে, কোন সময় গুরু নানক্ ভগবানের গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, এবং তাঁহার নিজ-কৃত কার্য্য-

গুলি যথাযথ হইতেছে কি না, সে বিষয়েও চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় শুনিলেন, এক অশ্রুতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় স্বর বলিতেছে—"ওয়াগুরু" বা "বাহগুরু"—অর্থাৎ হে গুরু! ভালই হইয়াছে! ইহাতে নানকের উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। শিখেরা বলেন যে, জপজীর প্রথম মন্ত্রটি গুরু নানক এইরূপে ধ্যানস্থ অবস্থায় মহাবিষ্ণুর শ্রীমুখ হইতে পাইয়াছিলেন, এবং জীবের মঙ্গলার্থ মর্ত্ত্যলোকে আনিয়াছিলেন।

(২য়) "সোদর রহরাস" সায়ংকালে পঠিতব্য। উহার আকার জপ-জীর অর্দ্ধেক। গুরু নানক ব্যতীত গুরু রামদাস, গুরু অর্জ্জুন প্রভৃতিও এই অংশে যোগ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, "গ্রন্থ"-মধ্যে অল্প-বিস্তর সকল গুরুগণই প্রায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

(৩য়) "কার্ত্তিসোহিলা।" ইহা শয়নের পূর্ব্বে পঠিতব্য। ইহা "সোদর রহরাসের" এক তৃতীয়াংশ হইবে।

(৪র্থ) "গ্রন্থের" গীতভাগের মধ্যে "আশা কিবার" বিশেষ বিখ্যাত। উহা অমৃত বেলায়—(অর্থাৎ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে) সুরতানলয়-সংযুক্ত করিয়া গীত হয়। "আশা কিবার" নানকের ন্যায় অপরাপর গুরুগণও লিখিয়া গিয়াছেন। এ স্থলে নানকের রচিত দুই একটি "আশা কিবার" উদ্ধৃত করা গেল :—

"বল্ হারি গুরু আপ্‌নে দেওহারি শৎবার।
যিন মানষ্‌তে দেওতে কিয়ে করৎনলাগীবার॥" ১॥

অর্থাৎ হে গুরু (মহাবিষ্ণু)! আপনাকে বলিহারি, প্রতিদিন শতবার বলিহারি যাইতেছি। যিনি এই মানবকে দেবতা করিয়া দেন - সে কার্য্য করিতে তাঁহার অধিকক্ষণ লাগে না।১।

"নানক গুরু নাচেৎনে মন্ আপ্‌নে শুচেৎ।
ছুটেতিল্ বোয়াড়্জোঁ সুয়ে অন্দর ক্ষেৎ।

ক্ষেতে অন্দর ছুটেয়া কহ নানক সহ নাহ।

ফলে ফুলে বপ্ পড়ে ভিতন্ বিচে শুয়ায়॥" ২॥

অর্থাৎ শ্রীগুরু নানকজী বলিতেছেন, [যে আপন মনে আপনাকে বুদ্ধিমান্ মনে করিয়া গুরুকে ধারণ করে নাই—উহার দশা বোয়াড় (একপ্রকার আগাছা) গাছের ন্যায় হয়]। যেমন তিলের ক্ষেত্রে তিল-গাছের সঙ্গে সঙ্গে বোয়াড় গাছ হইলে উহাকে (লোকে) ত্যাগ করে; যেহেতু, উহাতে ফল-ফুল সকলই হয় বটে, কিন্তু উহার ভিতরে ছাই-ই হয়। উহাকে লোকে কেন ত্যাগ করে, তদুত্তরে নানক বলেন যে, উহার কোন মালিক নাই ।২।

আদি গ্রন্থের উপসংহারে "ভোগকী বাণী" বলিয়া একটি ভাগ আছে। ইহাতে ভগবানের স্তোত্র, মলহর-রাজের প্রতি উপদেশ, নানকের রত্ন-মালা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আছে।

গুরুভক্তির উদ্রেক করা নানকসাহী ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যেমন সকল সম্প্রদায়েই স্বীকার করেন, নানকের গ্রন্থেও সেইরূপ স্বীকারের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। নানক অপর স্থলে বলিয়াছেন :——

"পরমেশ্বর সে গুরু বড়া গাওত বেদ পুরাণ।

নানক হরকে মুকত হ্যায় গুরুকা ঘর ভগবান্॥"

—নানক প্রকাশ।

অর্থাৎ বেদ এবং পুরাণে এইরূপ বলিয়া থাকে, পরমেশ্বর হইতেও গুরু বড়। নানক বলিতেছেন, ইহার কারণ এই যে, হরির (অর্থাৎ পরমেশ্বরের) ঘরে মুক্তি আছে এবং সেই ভগবান্ গুরুর ঘরে থাকেন।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের দুর্গা, কালী, শিব, বিষ্ণু, হরি, হর, এই সকলই

যে এক পরমেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া বর্ণিত হয়, ইহাও বিরাটমূর্ত্তি-সেবী নানকের বেশ বোধ ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। দুর্গা বা দুর্গতি-নাশিনী যে ভগবতী, এ বিষয়ে তাঁহার কোন দ্বিধা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি "পরমেশ্বর" শব্দের স্থলে স্বচ্ছন্দে "হরি" শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এইটি না বুঝেন, তাঁহাদের জন্যই চৈতন্য-চরিতামৃত-কার বলিয়াছেন ঃ—

"স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হইল বাধ্য।"

এতদ্ব্যতীত গুরু নানক নীতি উপদেশ দানের সময় অনেক স্থলে পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে "হিন্দু দেব-দেবীর" উপাসক বলিতে স্বীকৃত নহেন। বাস্তবিক জীবের সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক অবস্থা-ভেদে যে উপাসনা-প্রণালীও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, এ কথা বোধ হয় তাঁহা-দের জানা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চ অঙ্গের সাধকগণ নিম্ন অঙ্গের সাধকগণের ভেদ-বুদ্ধি জন্মাইয়া দিবেন, হিন্দুধর্ম্মে এমন বিধি নাই। (ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্—গীতা ৩য় অঃ ২৬)—যথাযথ নিয়োগই হিন্দুধর্ম্মের বিধি এবং ইহাই প্রকৃত সাম্যবাদ বলিয়া হিন্দুগণ মনে করেন।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন, শিখেরা "প্রতিমা-পূজার বিদ্বেষী।" কিন্তু শিখগণ আমাদের সরস্বতী-পূজার ন্যায় এখনও "গ্রন্থ" পূজা করেন, এবং শিখ ইতিহাসবেত্তা ম্যাক্ গ্রেগর এই জন্য তাহাদিগকে প্রতিমাপূজার বিদ্বেষী বলেন নাই। তবে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যে অংশ মহম্মদীয় ধর্ম্মের সহিত মিলে, নানক সেই অংশ অবলম্বন করিয়া উভয় ধর্ম্মের সামঞ্জস্যের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হই-য়াছে। তিনি হিন্দুধর্ম্মের গো-জাতির প্রতি ভক্তি এবং মুসলমানদিগের

শূকরের প্রতি ঘৃণার সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, উহার কেহই পূজ্য বা ঘৃণিত নহে, তবে অহিংসা-পরায়ণ ব্যক্তিই পীর ও গুরুর নিকট সমাদৃত। ইতিহাসবেত্তা মালকলম উল্লেখ করিয়াছেন যে, নানক বিশেষ করিয়া হংস-মাংস-ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছিলেন। মদ্যপানও তাঁহার বিধিবিরুদ্ধ।

শুনা যায় যে, নানকের রচিত "প্রাণ সাংলি" গ্রন্থে অনেক বিষয়ে বিধিনিষেধের কথা আছে। এই গ্রন্থখানি তিনি সিংহলে অবস্থানকালে লিখিয়াছেন। এক্ষণে সেখানি দুষ্প্রাপ্য। নানক দুই বৎসর পাঁচ মাস সিংহলে ছিলেন। তথাকার রাজা শিবনাভ নানকের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে তথায় বিভব দিয়া আট্‌কাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, নানক স্তাম্বুলে গিয়া তুরস্কের সুলতানের সহিত দেখা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে নিজ গুণে মোহিত করিয়া ফকীরদিগের প্রতি বদান্যতা বিষয়ে মুক্তহস্ত হইয়া আসিয়াছিলেন।

নানক ভারতের বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, এবং এই অঞ্চলে আসায় সুপ্রসিদ্ধ যোগী গোরক্ষনাথের সহিত তাঁহার দেখা হয়। কথিত আছে, গোরক্ষনাথ পূর্ব্ব হইতেই নানকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহার ভক্ত ও প্রিয় শিষ্যগণের তাহা প্রীতিপ্রদ হইত না; তাহারা গোরক্ষনাথকেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিত। কিন্তু নানককে দেখিয়া এবং নিজ গুরুর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহাদের সে অপ্রীতি ঘুচিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল!

আফগানস্থানে ভ্রমণকালে নানকের প্রিয় গায়ক শিষ্য ও সর্ব্বাভিব্যাহারী মর্দ্দানার মৃত্যু হয়। তখন তিনি পুনরায় তেলবণ্ডীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন তাঁহার পিতা কালু এবং তেলবণ্ডীর প্রধান রায়

বুলায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তৎপরে তিনি মর্দ্দানার পুত্র সাজাদাকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া মূলতান অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় সাজাদা এক দুষ্ট ঠগ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হয়, কিন্তু নানকের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া ঠগ সাজাদাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তখন তিনি পুনরায় কাবুল যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক স্থলে পাহাড়ের অঙ্গে নিজ হস্ত-চিহ্ন রাখিয়া যান। এখনও স্থানটি "পাঞ্জা সাহিব" নামে আখ্যাত হইয়া শিখগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকে।

এবার কাবুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় এমনাবাদে কালু সূত্রধারের নিকট অবস্থান করেন। সেখানে উজীর মুল্লক ভাগু নামক এক ব্যক্তি তাঁহার আহারীয় দ্রব্য যোগাইতে ইচ্ছা করে; কিন্তু সেই ব্যক্তি দীনপীড়ক বলিয়া নানক তাহার দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি এই সময় দিল্লী লোদী-বংশীয় সম্রাট্‌গণের প্রতি বিরক্ত হইয়া ভারত লইবার জন্য বাবরকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন,—এবং তাঁহার সাত পুরুষ ভারতে সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত থাকিতে পারিবেন বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন; তবে বাবরের স্বহস্তলিখিত বিবরণের মধ্যে গুরু নানকের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

অবশেষে নানক নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া আসিয়া রাভি (ইরাবতী) নদীতীরে কর্ত্তারপুর নামক নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন।

নানকের পর্য্যটনকালে মর্দ্দানা এবং বালা তাঁহার অনুচর হইয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার দুই প্রিয় শিষ্য— বুদ্ধা ও লেহনা—সর্ব্বদা প্রায় তাঁহার নিকটে থাকিতেন। নানক কখনও আপনাকে অতিমানুষিক-শক্তিধারী বলিয়া ব্যক্ত করিতেন না। তিনি সর্ব্বদা ভগবানের দাস্য-ভাব দেখাইতেন। তিনি বলিতেন,—"তু হায় নিরঙ্কার কর্ত্তার, নানক বান্দা

তেরা।" অর্থাৎ তুমি একমাত্র নিরাকার কর্ত্তাপুরুষ, নানক তোমার দাস। এই পদটি তিনি মর্দ্দানার বীণা-যন্ত্রের সঙ্গে সুর-তান অনুসারে শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। যাহা যউক, নানকের এইরূপ দাস্যভাব সত্ত্বেও তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাতে আতিমানুষিকী শক্তির আরোপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। বুদ্ধা শিষ্য হইবার পূর্ব্বে একদিন নানক তৃষ্ণাতুর হইয়া তাহাকে নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে আজ্ঞা করেন। তাহাতে বুদ্ধা বলে, পুষ্করিণীটিতে জল নাই। তখন নানক রোষব্যঞ্জক উচ্চস্বরে বলেন,—"দেখ গিয়া উহাতে জল আছে, উহা শুষ্ক নহে।" আশ্চর্য্যের বিষয়—বুদ্ধা প্রত্যুষে উহাতে জল দেখে নাই,—এক্ষণে উহা জলপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যে স্থলে এই ঘটনা হয়, তথায় পরে গুরু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক অমৃতসহর সৃষ্ট হইয়াছে।

———

গুরু নানক—চতুর্থ অংশ।

——:——

গুরু নানকের দেহত্যাগ।

"ডণ্ডবং বন্দনা অনেকবার সরবকলা সমরথ।
ডোলন্ তে রাখো প্রভু জন নানক দে কর হথ॥
ফিরং ফিরং প্রভু আয়া পরেয়া তও সরনায়।
নানক কি প্রভু বেনতি আপনি ভক্তি লায়॥"

অর্থাৎ হে সর্ব্বকলাসমর্থ! (হে ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্)! অনেক-বার দণ্ডবৎ বন্দনা করিতেছি। গুরু নানকজী বলিতেছেন, (এই চৌরাশী লক্ষ যোনি) ভ্রমণ হইতে রক্ষা কর। হে প্রভু! ঘুরিতে ঘুরিতে এতক্ষণে তব শরণ লইতে আগমন করিয়াছি। গুরু নানক মিনতি করিয়া বলিতেছেন, হে প্রভু! আপনার ভক্তিতে আমার মন লাগাইয়া দাও। (তাহা হইলে আর জন্ম-মরণরূপ গতায়াত করিতে হইবে না)।

উক্ত পদদ্বারা নানক পরমাত্মাকে প্রণাম করিতেন। এক্ষণে উহাই শিখদিগের সকলেরই নমস্কারের মন্ত্র। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মতানুযায়ী জীবের চৌরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ নানক স্বীকার করিতেন, এবং কর্ম্মানুসারে অবনতি অথবা মুক্তিপদলাভেও বিশ্বাস করিতেন।

মহাপুরুষগণের মতবাদ লইয়া গোল করিতে অনেককে শুনা যায়, এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়। যিনি যে

মহাপুরুষের মতবাদের অনুসরণকারী, তিনি তাঁহারই সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া আত্মগৌরব করিয়া থাকেন। কিন্তু মতবাদের অনুসরণ করা বা মতবাদ লইয়া গোলযোগ করা যত সহজ, মহাপুরুষগণের সাধনায় যোগ দেওয়া বা তাঁহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করা তত সহজ নয়। এই জন্য অনেককে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের দোহাই দিয়া চলিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার প্রায় কিছুই করেন না। সাধনা-ভাগ হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ডভুক্ত। কর্ম্মকাণ্ড, মতবাদ বা জ্ঞানকাণ্ড অপেক্ষা নিম্নস্তরের অধিকারীর জন্য হইলেও

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪ ॥"

গীতা, ৩য় অঃ।

অর্থাৎ লোকে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারে না, [চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত] কেবল সন্ন্যাসেই সিদ্ধি পায় না।

এ হেন কর্ম্মকাণ্ডে বা সাধনায় লিপ্ত না হইয়া কেবল মহাপুরুষগণের মতবাদ লইয়া গণ্ডগোল করিলে, অনেক সময় অনেকের মুখে উহা "জেঠামী" বলিয়া বোধ হয়। রিপুগণকে দমন করা সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য। অনেক সময় আহারাদি জীবধর্ম্ম হইতে লোভাদি রিপুগণ উত্তেজিত হইয়া থাকে। সে জন্য সংযমাদি নিয়মের অভ্যাস আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত জীবধর্ম্মের বল হ্রাস করিবার জন্য প্রাণায়ামাদির বিশেষ প্রয়োজন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাই সাধনার মূলসূত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধক মহাপুরুষগণ এতৎসম্বন্ধে কি কি উপায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা সাধারণতঃ তাঁহাদের জীবনচরিতে প্রায় পাওয়া যায় না। জীবনচরিত-লেখকগণের এতৎসম্বন্ধে আলোচনার পক্ষে অসুবিধা আছে,

তাহা অবশ্য স্বীকার করি, এবং বিনা-সাধনায় যে কেবল দীর্ঘ-প্রস্থযুক্ত বাক্যে মহাপুরুষ হয় না, তাহাও বুঝিতে পারি। কিন্তু কি করা যায়, সাধনা-কার্য্য প্রকাশ্য-ভাবে কেহই করেন না,—করিতে পারেন না,—করিলে সাধনার ব্যাঘাত হয়। এই সকল কারণে নানকের সাধনা সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে পারা যায় না। তবে কথিত আছে যে, তিনি কোন সময়ে সুলতানপুরের নিকট বিয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়া তিন দিবস কাল জলের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি "কুম্ভক" যোগে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু শিখদিগের নিকট সে কথা বলিলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হয়েন। প্রাণায়ামাদি কার্য্য, শিক্ষা বা অভ্যাসের কর্ম্ম; কিন্তু নানকের প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত ভক্তি থাকায় তাঁহাকে একবারে সিদ্ধ বলিয়া জানেন,—তাঁহাকে কোন কালে কিছু শিখিতে হয় নাই, এইরূপ তাঁহাদের ধারণা। এই নিমিত্ত নানক যে প্রাণায়াম আদি কর্ম্ম করিতেন, এ কথা শিখেরা বলিতে চাহেন না। নানকের পূর্ব্বোক্ত "প্রাণ সাংলি" গ্রন্থে নাকি তিনি যোগের বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং উহাতে প্রাণায়ামাদি বিষয়ের উল্লেখ আছে।

নানক তিন দিনের পর বিয়া নদী হইতে উঠিয়া যে বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন, লোকে তাহাকে "বাবাকী বের" বলিয়া থাকে। যে স্থলে তিনি স্নান আহ্নিক করিতেন, তাহার নাম "শান্তঘাট" এবং তিনি যে ভীষণ বনে ধ্যানস্থ থাকিতেন, তাহাকে "রোরী সাহেব" বলে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গুরু নানক, হিন্দু মুসলমান উভয় দলের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সামঞ্জস্য-বিধানের জন্যই সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি উভয় দলের সহিত বেশ মিশিতেন। হিন্দুর সন্তান হিন্দুর সহিত মিশিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? মুসলমানের সঙ্গেও এরূপ মিশিতেন যে, তাহারা

বুঝিতে পারিত না যে, তিনি হিন্দু কি মুসলমান। কোন সময় নবাব দৌলত খাঁর সহিত কথা-প্রসঙ্গে তিনি মসিদে গিয়াছিলেন। সে সময় তথায় একজন মৌলবী উপাসনা করিতেছিলেন। নানক তথায় গিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, "তুমি উপাসনায় রত না হইয়া দণ্ডায়মান কেন?"

উত্তরে নানক বলিলেন,—"এই মৌলবী সাহেব—যিনি উপাসনা করিতেছেন, উঁহার হৃদয়ে সন্তানের চিন্তা, এবং নবাবের হৃদয়ে কান্দাহারে ঘোড়া ক্রয় করিবার কথা জাগিতেছে। এরূপ স্থলে চিত্ত বিচলিত হইয়া প্রকৃত উপাসনা হইতেছে না।"—ইহাতে নবাব ও মৌলবী সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি আমাদের অন্তরের কথা কিরূপে জানিলে, আমরা প্রকৃতই ঐরূপ ভাবিতেছিলাম।" নানক এইরূপে অনেক মুসলমানকে বিস্মিত করিয়া স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবও যখন শ্রীবাসের গৃহে প্রথম প্রথম কীর্ত্তন অভ্যাস করিতেন, তখন একদিবস কীর্ত্তন শুনিবার জন্য শ্রীবাসের শাশুড়ী ঠাকুরাণী তথায় লুক্কায়িত ছিলেন। স্ত্রীলোক প্রেমভক্তি উদ্রেকের ব্যাঘাতকারী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কীর্ত্তন-গৃহে স্ত্রীলোক কোন প্রকারে থাকিতে পাইবে না। যে দিবস শ্রীবাসের শাশুড়ী লুকাইয়াছিলেন, সে দিবস প্রেমভক্তি উদ্রেকের বিলম্ব দেখিয়া শ্রীচৈতন্যের মনে স্ত্রীলোক উপস্থিতির সন্দেহ হয়, এবং পরক্ষণেই লুক্কায়িতাকে বাহির করিয়া দেন। যাহা হউক, উক্তরূপ নানা ঘটনায় মুসলমানগণ নানকের প্রতি মুগ্ধ ছিলেন। এই জন্য লোকে বলে—

"গুরু নানক সাহেব ফকীর।
হিন্দুকা গুরু মুসলমানোকা পীর॥"

এরূপ অবস্থায় নানক লোকান্তর গমন করিলে পর যে তাঁহার মৃত

(জড়) দেহ লইয়া একটা গোলযোগ উঠিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? নানকের লোকান্তর-গমনের অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তিনি একখানি চাদর দিয়া আপাদ-মস্তক আচ্ছাদিত করেন। চাদরের উপর হইতে যেমন অনুমান হইল যে, তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে, অমনি হিন্দু-মুসলমানে এক বিষম গোল পড়িয়া গেল। হিন্দু বলে, নানকের দেহ ভস্মসাৎ করিতে হইবে; মুসলমান বলে, কবর দিতে হইবে। এমন গোল যে, উভয় দলের লোক অস্ত্র লইতে প্রস্তুত। কিছুক্ষণ পরে একজন বলিল, "দেখ দেখি, যে দেহ লইয়া এই গণ্ডগোল, তাহার অবস্থা এখন কি প্রকার?" তখন চাদর উন্মুক্ত করিয়া দেখা গেল যে, সে দেহ নাই। কতকগুলি পুষ্প পড়িয়া আছে মাত্র। তখন সে দেহ কোথায় গেল,—কে লইল, এই বলিয়া অল্পক্ষণ বিস্ময়াবিষ্ট থাকিয়া সকলে স্থির করিল যে, গুরু নানক স-শরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন; কাল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তৎপরে হিন্দু ও মুসলমান উভয়দল একমত হইয়া উক্ত চাদরখানি এবং ফুলগুলি অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া লইল; হিন্দু নিজ ভাগ জ্বালাইল, মুসলমান পুতিয়া ফেলিল। রাভী নদী-তীরস্থ গুরু নানকের স্বপ্রতিষ্ঠিত কর্ত্তারপুর নগরে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল। মৃত্যুকালে নানকের বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। নানক শেষ দশায় এই কর্ত্তারপুর নগরেই বাস করিতেন। যেখানে তাঁহার কবর দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে রাভী নদীর স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। কর্ত্তারপুর নগর শিখদিগের একটি তীর্থস্থান। যাত্রিগণ তথাকার শিখ-মন্দিরে গমন করিলে গুরু নানকের চাদর বলিয়া তাহাদিগকে একখানি চাদর দেখান হয়।

গুরু নানকের দেহ দাহ করা হইবে বা কবর দেওয়া হইবে বলিয়া তাঁহার হিন্দু মুসলমান ভক্তেরা গোল তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু নানক

শবদাহেরই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার প্রিয় মুসলমান শিষ্য মর্দ্দানার মৃতদেহ দাহ করিয়াছিলেন। শিখদিগের মধ্যে দাহ করিবার নিয়মই প্রচলিত আছে।

সংক্ষেপে নানকের বিবরণ যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে যদিও স্পষ্টভাবেই জানিতে পারা যায় যে, তিনি হিন্দু মুসলমানের মতভেদের সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি বেদের কোন প্রকার নিন্দাবাদ করিয়াছেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পুরাণ কোরাণকে তিনি এক শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়া, কি হিন্দু, কি মুসলমান উভয়ের মধ্যে তখন যে সাম্প্রদায়িক দোষাদি ঘটিয়াছিল, তাহাই সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন-চরিত্র-লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির বিদ্বেষী বলিয়া বর্ণন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোন সময় নদীতে স্নানকালে না কি তিনি একজন তর্পণকারী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া নদীতীরে জলসেচন করিতে করিতে উপহাস করিয়া বলেন যে, তিনি বহুদূরবর্ত্তী তাঁহার কর্ত্তারপুরের ক্ষেত্রে জল দিতেছেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ বলেন, "এই সামান্য সিঞ্চিত জল কি অতদূর যাইতে পারে?" তাহাতে নানক বলেন, "তাহা যদি না হয়, তবে তোমার প্রদত্ত এই জল পরলোক-গত পিতৃলোকে কিরূপে পৌঁছিবে?" ঠিক এরূপ কথা হইয়াছিল কি না, আমাদের সন্দেহ হয়। আমাদের বোধ হয় যে, তিনি সেই সময় ব্রাহ্মণের অন্য কোন প্রকার ত্রুটী দেখিয়া কিছু বলিয়া থাকিবেন; নতুবা অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ নানক আত্মার অমরত্ব ও সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং শ্রদ্ধা-উত্তেজনকারী শ্রাদ্ধ-তর্পণের মাহাত্ম্য যে বুঝিতেন না, তাহা কোনরূপেই প্রতীত হয় না। শিখেরাও শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন।

নানক পরলোক-গমনের অল্পদিন পূর্ব্বেই নিজ গুরুপদের উত্তরাধি-

কারী স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার লছমীচাঁদ (বা লছমীচন্দ) এবং শ্রীচাঁদ (বা শ্রীচন্দ) নামে দুই পুত্র ছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে লছমীচাঁদ সংসারী হয়েন, ও তাঁহার বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। উঁহাদিগকে "নানক-পুত্র"বা "সাহেবজাদা" নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীচাঁদ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া 'উদাসী' নামক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। উদাসিগণ ক্ষৌরকার্য্য করে না, শির জটায় বিভূষিত করে, অঙ্গে ভস্ম মাখে এবং লেঙ্গট পরিধান করে। শিখেরা মনে করেন যে, শ্রীচাঁদ বিখ্যাত সংস্কারক গোরক্ষনাথের অবতার। তাঁহারা বলেন, যখন গোরক্ষনাথের সহিত নানকের দেখা হয়, তখন তিনি নানকের গুণে মুগ্ধ হইয়া শিষ্যত্বগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন। তাহাতে নানক বলেন যে, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার সময় অতীত হইয়াছে। তবে আগামী জন্মে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারেন। যাহা হউক, নানক এরূপ উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের মধ্যে কাহাকেও গুরুপদ দেন নাই। গুরুগতপ্রাণ না হইলে গুরুপদের যোগ্য হয় না, এই কথাটি বুঝাইবার জন্য প্রিয়তম শিষ্য লেহনাকে এই পদ দেন। লেহনা নানকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন। তিনি আহার-নিদ্রা সমস্তই গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। গুরুর আজ্ঞা-পালনের জন্য তিনি রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেন না; গুরুর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। এক রাত্রিতে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেহনা! এখন সময় কত?" উত্তরে লেহনা বলিলেন, "রাত্রি দ্বিপ্রহর।" গুরু বলিলেন, "না, দিবা দ্বিপ্রহর। যাও, অদূরবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে কাপড় কাচিয়া আন।" লেহনা তাহাই করিতে চলিল, এবং বিশ্বাস অনুসারে প্রকৃতই দিবা দ্বিপ্রহর দেখিল। লেহনা এইরূপে কায়মনোবাক্যে গুরুসেবারূপ সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে একদিবস নানক কতকগুলি

শিষ্য লইয়া নদীতীরে দেখিলেন যে, একটা শব ভাসিয়া আসিতেছে। শবের অঙ্গ একখানি চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত। নানক আচ্ছাদিত শবটি দেখাইয়া শিষ্যবর্গকে বলিলেন, "আমার কে এমন শিষ্য আছে যে, ঐ মড়াটি ভক্ষণ করিতে পারে?" লেহনা তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়া শবের নিকটে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল,—"শবের কোন্ দিক্ হইতে ভক্ষণ আরম্ভ করিব?" নানক বলিলেন,—'পায়ের দিক্ হইতে ভক্ষণ আরম্ভ কর।' তখন লেহনা আচ্ছাদিত চাদরখানি উঠাইয়া দেখেন, উহা শব নয়—প্রসাদীকৃত ভক্ষ্য দ্রব্য। এই পরীক্ষার ফলে নানক পরম সন্তুষ্ট হইয়া লেহনাকে নিজ অঙ্গ সদৃশ বলিয়া "অঙ্গদ" নামে অভিহিত করেন এবং উঁহাকেই গুরুপদ প্রদান করেন।

নানক গুরু দেখাইয়া গেলেন যে, বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দুর গুরুই সম্মিলনের মহৎ উপায় এবং গুরুভক্তিই জীবের উন্নতির একমাত্র উপায়স্বরূপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।
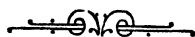
শিখ-সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি।

দ্বিতীয় গুরু—অঙ্গদ।

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥" গীতা ১৮অ ৪০।

আমাদের কোন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু আমাদিগকে এক দিবস বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণাদি জাতি যে কতকাল সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বলা যায় না;

(২য় গুরু—অঙ্গদ)

কিন্তু হিন্দুর যে তখন স্বাধীন রাজা ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ; যে ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে কৌলীন্য-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, তখনও আমাদের স্বাধীন রাজা ছিলেন; স্বাধীন রাজার সময়ে সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য কৌলীন্যাদি পুরুষানুক্রমে অধিকৃত হইলে বিশেষ দোষ হয় না; কারণ, তাহাতে যদি কোন প্রকারে দোষ আসিয়া পড়ে, তবে সমাজপতি রাজা সে সময়ে তাহার শাসন করিতে পারেন; কিন্তু শিখসম্প্রদায়ের যখন সৃষ্টি হইল, তখন রাজা শিখ-

ধর্ম্মাবলম্বী নহেন; এইজন্যই বোধ হয় যে, নানক "উদাসী" সম্প্রদায়ের স্রষ্টা শ্রীচন্দের ন্যায় পুত্র পাইয়াও স্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব বা গুরুপদ পুত্রকে না দিয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী শিষ্যকে দিয়া গেলেন।

বন্ধুবর কেবলমাত্র ব্যবসায়ভেদেই বর্ণ-ভেদ হইয়াছে মনে করেন, এবং রাজশাসনে উচ্চ বর্ণের লোক নীচ বর্ণস্থ হওয়া এবং নীচ জাতির লোক উচ্চবর্ণ-সম্ভুক্ত হওয়ায় বিশ্বাস করেন। আমি ব্রাহ্মণাদি মৌলিক বর্ণ সম্বন্ধে ঠিক ওরূপ হওয়া মনে করি না, এবং সেই নিমিত্তই বংশগত উচ্চতা সম্বন্ধে অনেকটাই বিশ্বাস করি। ব্যবহার-দোষে ব্রাহ্মণ পতিত হইত; হয় ত পতিতই থাকিত, হয় ত আবার উঠিত। কিন্তু রাজ-শাসনেও কোন প্রকার নিম্নস্থ বর্ণের বা শূদ্রের সহিত পতিতেরা মিলিয়া যাইত না। হিন্দুর সকল বর্ণের লোকেরাই সম্পূর্ণভাবে আত্মগৌরব-সম্পন্ন; উহারা কোন বর্ণের "পতিত"কে স্ব-সমাজে লইবে কেন? অন্ত্যজের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। রাজশাসন ব্রাহ্মণ-প্রদর্শিত শাস্ত্রাচারের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে দিত না মাত্র। গুরু নানক পুত্রকে গুরুপদ না দিয়া শিষ্যকে যে ঐ পদ দিয়া যান, তাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই রীতি-সম্মত। মহম্মদের জামাতা আলির পরিবর্ত্তে শিষ্যদিগের তৎপদাধিরোহণ, এবং এদেশীয় মোহন্ত প্রভৃতির ব্যবস্থাতে সন্ন্যাসীর ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান চেলার অধিকার, উহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ওরূপ মহাত্মাদিগের চক্ষে ঔরসজাত সন্তানে এবং অপর মনুষ্যে প্রভেদ নাই। কে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, তাহা পক্ষপাত-শূন্য দৃষ্টিতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন, এবং সম্প্রদায়ের উন্নতি উদ্দেশে তাঁহারা নির্ব্বিকৃতচিত্তে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকেই মনোনীত করিতে পারেন। বিশেষতঃ সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যে পারিবারিক মায়া, মমতা প্রভৃতি কার্য্য করে, ফকিরীর গদি সম্বন্ধে তাহা কার্য্য করিবার কথা

নহে। যাহা হউক, নানক ভবিষ্যতের জন্য পুত্রকে গুরুপদ দানের নিষেধ-বিধি কিছুই করিয়া গেলেন না।

লেহনা "অঙ্গদ" নাম ধারণ পূর্ব্বক গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, নানকের পুত্রদ্বয়ের কিছু মনোভঙ্গ হইল এবং গুরু অঙ্গদের সহিত তাঁহাদের বিবাদ বাধিবার উপক্রম হইল। কিন্তু অঙ্গদ শান্তিপ্রিয় এবং গুরুপুত্রের সহিত বিবাদে অনিচ্ছুক বলিয়া গুরুগদি কর্ত্তারপুরস্থ "ডেরা বাবা নানক" হইতে স্বগ্রাম খাণ্ডুরে লইয়া গিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, গুরু-পুত্রগণ অসন্তুষ্ট হইয়া গুরু অঙ্গদকে "কুষ্ঠ-ব্যাধি-গ্রস্ত হও" বলিয়া অভিসম্পাত করেন। শিখেরা বলেন যে, অঙ্গদের অন্তরে এরূপ তেজ ছিল যে, ঐ অভিসম্পাতের প্রতিবিধান করিতে পারিতেন; কিন্তু পাছে গুরু-পুত্রের অবমাননা হয়, এই ভয়ে স্বহস্তের একটি অঙ্গুলিতে কুষ্ঠব্যাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তবেই দেখা যাইতেছে যে, নানক যে পুত্র অপেক্ষা অঙ্গদকে অধিকতর সাত্ত্বিক-প্রকৃতিক এবং গুরুপদের অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহা উচিতই করিয়াছিলেন।

গুরু নানকের নিকট অঙ্গদের শিষ্যত্ব-গ্রহণের পূর্ব্বে সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। ইনি ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে বিয়ানদী-তীরস্থ গোবিন্দো-য়ালের সন্নিকট খাডুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ক্ষত্রিয়ের পুত্র। তবে গুরু নানক বেদী-বংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইনি তিরহন-বংশীয়। অঙ্গদ পূর্ব্বাপর ভক্তপ্রাণ বলিয়া পরিচিত। ইনি পূর্ব্বে প্রতিবর্ষ জ্বালামুখী তীর্থে জ্বালাদেবীকে দর্শন করিয়া আসিতেন; কিন্তু গুরুকরণ হইয়া অবধি "গুরুকা ঘর ভগবান্" বুঝিয়া তিনি গুরু নানকের চরণ-সেবা ছাড়িয়া আর কোথাও গমন করিতেন না। নানকের লোকান্তর হইলে তিনি নানকের পদাঙ্ক ধরিয়াই গমন করিয়াছিলেন।

অঙ্গদ গুরুপদ পাইয়াও নিজের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত কাহার উপর নির্ভর করেন নাই। তিনি মঞ্জু ঘাসের এক প্রকার দড়ি বুনিয়া যাহা পাইতেন, তাহা দ্বারাই তিনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপ ধীরভাবে পূর্ব্ব-গুরুর পদাঙ্ক ধরিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাতেই অনেকের মতি স্থির রাখিবার পক্ষে সবিশেষ সাহায্য হইল। শিখ মতবাদ নানকের মৃত্যুর পরও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইল।

ভক্ত গুরু অঙ্গদ গুরু নানকের অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। কালে সে সকল "গ্রন্থ"মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। গুরু অঙ্গদ যখন নানকের কথা লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন, তখন নানকের অনুচর বালা অনেক কথা বলিয়া দিয়া সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। আর একটি কার্য্যও গুরু অঙ্গদের চেষ্টায় সম্পাদিত হইয়াছিল ;- তিনি সুলতানপুরের প্যাণ্ডামুখ নামক এক ব্যক্তি দ্বারা গুরু নানকের জন্মপত্রী গুরুমুখী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

তাঁহার নিজকৃত গুরুমুখী পদেও গুরুরই জন্য ব্যাকুলতা দেখা যায়। আশাকীবার গ্রন্থ হইতে অঙ্গদের উক্ত পদের একটি নমুনা দেওয়া গেল :—

"যে সওচন্দা উগ্‌ওঁহে সূরজ চড়হেঁ হাজার।
এতে চানন্ হোঁদেয়াঁ গুরুবিন্ ঘোর আঁধার॥"

যেখানে শত চন্দ্র ও সহস্র সূর্য্য প্রকাশ হয়, সে স্থানও গুরু বিনা সমস্ত অন্ধকার।

বাস্তবিক অঙ্গদ গুরু ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতেন না ; ইহাই অঙ্গদের বিশিষ্টতা।

কথিত আছে যে, সম্রাট্ বাবর মৃত্যুকালে নিজপুত্র হুমায়ুনকে বলিয়াছিলেন, "শিখ গুরুগণ আমাদের বড় কল্যাণাকাঙ্ক্ষী। উঁহাদের প্রতি

চিরদিন ভক্তিমান্ থাকিবে।” হুমায়ুন কিন্তু এ কথাটি বড় গ্রাহ্য করেন নাই। ক্রমে যখন সেরশা কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া পলায়নপর হইলেন, তখন কথাটি মনে পড়িল, তাঁহার সেই ত্রুটীতে গুরুরই অভিসম্পাতে তাঁহার সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া খাড়ুরে গুরু অঙ্গদের নিকট গমন পূর্ব্বক অসি উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে কাটিতে উদ্যত হইলেন! অঙ্গদ উত্তোলিত অসির কোন প্রকার প্রতিবিধান না করিয়া ধীরভাবে বলিলেন,—“তুমি যে হস্ত আমায় দেখাইতেছ, রণক্ষেত্রে এ হস্ত কোথায় ছিল?” এই কথায় হুমায়ুন লজ্জিত হইয়া গুরুর শরণ লইলেন। তখন গুরু প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে সেই আশীর্ব্বাদের বলে হুমায়ুন সিকন্দর শাকে পরাস্ত করিয়া, পুনরায় রাজ্য-গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

গুরু অঙ্গদের দুই পুত্র ছিল। তাহাদের উভয়কেই সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত দেখিয়া গুরু অঙ্গদও প্রিয় শিষ্য অমরদাসকে গুরুগদি দিয়া গিয়াছিলেন। গুরু অঙ্গদ পনর বৎসর কাল গুরুপদে থাকিয়া ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে খাড়ুর গ্রামে দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, কোন সময়ে গুরু নানকের বর্ত্তমানে অঙ্গদের সর্ব্বাঙ্গে বিষম বেদনা হইয়াছিল। কিছুতে বেদনার উপশম হয় না দেখিয়া, তিনি নিজ গুরুর পদাশ্রয় মাত্র করিয়া থাকেন। গুরু নানকও প্রিয় শিষ্যের কষ্ট দেখিয়া তাঁহার পদদ্বয় ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে হস্ত বুলাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে অঙ্গদের সর্ব্বাঙ্গের বেদনা তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়, কেবল পদদ্বয়ের বেদনা রহিয়া যায়। সেই বেদনা-বৃদ্ধি উপলক্ষে অঙ্গদের মৃত্যু হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

শিখ-সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি।

তৃতীয় গুরু—অমরদাস।

তৃতীয় গুরু অমরদাসও পূর্ব্ব-গুরুদিগের ন্যায় জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু ইনি ভল্লা-বংশ-সম্ভূত। অমরদাস ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে অমৃতসহর জেলার বাসর্কি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে বেটো ঘোড়ার দ্বারা বলদের কর্ম্ম করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পরে লবণ ও তৈলের সামান্য ব্যবসা করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। গুরু অঙ্গদের দ্বারা দীক্ষিত হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু কখনও গুরুর অর্থে নিজের উদর পূরণ করেন নাই,—নিজ সঞ্চিতধনেই নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অমরদাসেরও অত্যন্ত গুরুভক্তি ছিল। তিনি কখনও গুরুর দিকে পশ্চাদ্ভাগ দেখান নাই। কথিত আছে যে, তিনি স্বয়ং প্রত্যহ চারি ক্রোশ দূর হইতে গুরুর নিমিত্ত জল আনয়ন করিতেন। কিন্তু পাছে যাত্রাকালে গুরুর দিকে পশ্চাৎ ফিরিতে হয়, এই ভয়ে পেছু হাঁটিয়া গমন করিতেন, এবং সেইরূপ গমন করিতেন বলিয়া কখন কখন কূপাদিতে পড়িয়া কষ্টও পাইয়াছেন; কিন্তু গুরুভক্তি-বলে তিনি সে কষ্টকে কষ্টমধ্যে গণ্য করেন নাই।

(৩য় গুরু—অমরদাস)

এইরূপ অসাধারণ ভক্তিপূর্ণ ও কর্ত্তব্য-কার্য্যে একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিরা গুরুপদে আসীন হইয়াছিলেন বলিয়াই, শিখ-সম্প্রদায়ের শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

তৃতীয় গুরু অমরদাস বক্তৃতায় বড় পটু ছিলেন। এমন কি, সম্রাট্ আক্‌বর পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে ভালবাসিতেন। এই গুণে তিনি অনেক শিষ্য সংগ্রহ করেন। অধিকন্তু চতুর্দ্দিকে দ্বাবিংশজন শিখ-ধর্ম্মের প্রচারক পাঠাইয়া তিনি শিষ্য-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় গুরুর দরবারে অর্থাগমেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। গুরু অমরদাস বহু অর্থব্যয় করিয়া গোবিন্দোয়ালে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় ও একটি পান্থনিবাস স্থাপন করেন। সেই জলাশয়টি এত গভীর যে, তাহার ঘাটে ৮৪টি সোপান প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। শিখদিগের মতে এই ৮৪টি সোপানশালী জলাশয়ে স্নান করিলে আর ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয় না। যাহা হউক, সকল ধর্ম্মাবলম্বীই স্বীকার করেন যে, গ্রীষ্মকালে এই পান্থনিবাসে আসিয়া এবং এই জলাশয়ে স্নান করিয়া লোকে প্রকৃতই কতকটা শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

গুরু নানকের পুত্র শ্রীচাঁদ যে 'উদাসী' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন, সেই সম্প্রদায়ভুক্তগণ সংসার-বিরাগী ও পরিব্রাজক মাত্র বলিলেই চলে। শিখগণ যে কেবল তাহাই নহে, তদতিরিক্ত আরও কিছু, এইটি স্পষ্ট করিয়া জানাইবার নিমিত্ত গুরু অমরদাস "শিখ" হইতে "উদাসী" সম্প্রদায় বিভিন্ন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এই কার্য্য গুরু অমরদাস করেন নাই,—উঁহার পরবর্ত্তী কোন গুরু কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন, গুরু অমরদাস সতীদাহের বিরোধী এবং বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। এই "মত" শিখ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা নানক

হইতেই পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহারাই অনুমান করেন। কিন্তু তাঁহারা এ কথাও বলেন যে, নানক আত্মত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া, এতৎ-সম্বন্ধে কোন বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করেন নাই! গুরু অমরদাসের উক্ত মত সম্বন্ধেও বিশিষ্ট কোন প্রমাণ তাঁহারা দেখাইতে পারেন না। তবে অমরদাস নাকি মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "শোক এবং অগ্নি যে রমণীকে দগ্ধ করিতে অক্ষম, তিনিই প্রকৃত সতী। যাহারা শোক-তাপ-জর্জ্জরিত, ভগবানের নিকট তাহারা শান্তি কামনা করুক"—এই বাক্য তাঁহাদের উক্ত মতের প্রমাণস্বরূপ মনে করেন!

এতৎসম্বন্ধে আমাদের মনে হয় যে, যদিও গুরু নানক হিন্দু ও মুসল-মান ধর্ম্মের সামঞ্জস্য-বিধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি হিন্দুত্বের যে ভাগটি মুসলমান-ধর্ম্মের সহিত মিলে, তাহাই মিলাইতে বসিয়াছিলেন, হিন্দুত্ব একবারে মূলে উল্টাইতে বসেন নাই। সেই কারণেই তিনি গোবধ-নিবারণ ইত্যাদি বিধির বিধান যে করিয়াছিলেন, সে সকল কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে গুরু অমরদাসের যে কথাটি প্রামাণ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে দেখা যাউক।

গুরু অমরদাস বলিয়াছেন:—

"শোক এবং অগ্নি যে রমণীকে দগ্ধ করিতে অক্ষম, তিনিই প্রকৃত সতী।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:—

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮॥"

গীতা, ৩য় অঃ।

অর্থাৎ যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত, পরিতোষ-প্রাপ্ত এবং (অন্য ভোগাপেক্ষা না করিয়া) আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার কিছু কর্ত্তব্য নাই ॥ ১৭ ॥ ইহলোকে কৃত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার পুণ্যও হয় না, কর্ম্মের অকরণ হেতু কোন পাপও হয় না এবং সর্ব্বভূতে কেহ ইঁহার মোক্ষলাভ বিষয়ে আশ্রয়ণীয় নাই ॥ ১৮ ॥

তাই বলি,—যাঁহারা শোকাগ্নি দ্বারা পীড়িত হয়েন না, তাঁহাদের মোক্ষ বিষয়ে কেহ আশ্রয়ণীয় নাই,—তাঁহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে লীন, তাঁহারাই সতী। আর যাঁহাদের সে অবস্থা হয় নাই, তাঁহাদের জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥"

গীতা, ১২শ অঃ।

অর্থাৎ আমাতেই (ভগবানেই) মনঃ স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর, এই প্রকার করিলে দেহান্তে আমাতেই থাকিবে সংশয় নাই। তা'ই গুরু অমরদাস বলিয়া থাকিবেন যে ;—

"যাঁহারা শোক-তাপ-জর্জ্জরিত, ভগবানের নিকট তাঁহারা শান্তি কামনা করুন।"

ইহাতে বিধবা-বিবাহ-প্রচলন এবং সতীদাহ-নিবারণের প্রমাণ কিসে হইল, বুঝা যায় না। বরং "নানক আত্মত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন" এ কথায় তিনি যে বিধবা-বিবাহ অবাধে প্রচলনের বা সতীদাহ-নিবারণের জন্য একান্ত ব্যাকুল ছিলেন না, ইহাই বেশ বুঝা যায়। সতীদাহ আইনানুসারে নিবারিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে আইনকর্ত্তাদিগের দয়াই প্রকাশ হইয়াছে, এবং সতীদাহের কোথাও কোথাও

যেরূপ অপব্যবহার হইতেছিল, তাহাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়া মঙ্গল করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে এক্ষণে আর কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। তবে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, উহা উচ্চাধিকারীদিগের আদর্শ নহে। হিন্দুদিগের নিম্নস্তরে উহা বিরাজমান। এই বিধবা-বিবাহ দেখিলে ইউরোপীয় প্রভৃতি যাঁহাদের মধ্যে উহা প্রচলিত আছে, তাঁহারাও একটু বক্র হাসি হাসেন; ডিকেন্সের পিক উইক পেপারে "বিধবা হইতে সাবধানে আত্মরক্ষা করিবে" বলিয়া সুন্দর বিদ্রূপ আছে। ফলতঃ বিধবা-বিবাহ কোন মতেই উচ্চ আদর্শ নহে। শিখদিগের ভিতরেও উহা উচ্চবংশীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। লৌকিক ব্যবহারে বড় ঘরে যাহাই হউক, মুসলমান-ধর্ম্মে বিধিতে বিধবা-বিবাহে কোন বাধা নাই, এই জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য-বিধায়ক শিখধর্ম্মের কোন গুরু যদি বিধবাবিবাহের পক্ষে কোন কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। তবে শিখদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ বাঞ্ছনীয় বলিয়া কোন বিধিও নাই।

বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হিন্দুদিগের মধ্যে এক ভাবাপন্ন করিবার নিমিত্ত গুরু যেমন অত্যাবশ্যক বলিয়া গুরু নানকের জীবনীতে দেখান হইয়াছে, সেইরূপ প্রকৃত শিষ্যেরও যে আবশ্যক, তাহাও বুঝিতে হইবে। রাত্রি-দিন জ্ঞান নাই—গুরু-সেবাই প্রবল, খাদ্যাখাদ্য-জ্ঞান নাই—গুরু-আজ্ঞাই প্রবল, মরি বাঁচি জ্ঞান নাই, গুরুর অবমাননা ঘুণাক্ষরেও না ঘটিয়া যায়, গুরুভক্তিই প্রবল—এই ভাব দেখিয়া এতদিন প্রধান শিষ্যগণ, গুরু-পুত্রের বর্ত্তমানেও গুরুপদে অভিষিক্ত হইতেছিলেন, এবং এইরূপ উচ্চ অঙ্গের শিষ্যেরই গুরু হইবার যে সবিশেষ উপযোগিতা আছে, তাহা গুরু নানক ও গুরু অঙ্গদ বেশ বুঝিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

গুরু অমরদাস যখন পরবর্ত্তী গুরু নির্ব্বাচন করেন, তখন ঠিক এ নিয়মে চলিলেন না। তাঁহার মোহন নামে এক পুত্র এবং মোহিনী বা ভাণী (ভবানী) নামে এক কন্যা ছিল। ভাণীর অনূঢ়া অবস্থায় গোবিন্দোয়ালের বৃহৎ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় একটি মেলা হয়। তথায় রামদাস নামে একজন সুন্দর যুবকের সঙ্গে ভাণীর সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে উভয়ের মন আকর্ষণ করে। গুরু অমরদাসের আজ্ঞাক্রমে রামদাসের সহিত ভাণীর বিবাহ হইল। ইহাতে সোডী ও বেদীবংশীয় ক্ষত্রিয়মধ্যে নানকের জন্মের পূর্ব্ব হইতে যে একটা বিরূপতা ছিল, তাহা মিটিয়া যায়। রামদাস বিবাহ উপলক্ষে অমরদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। অমরদাস কন্যাকে পুত্রাধিক স্নেহ ও যত্ন করিতেন। ভাণীর পিতৃভক্তিও আদর্শ-স্থানীয়। কোন সময় গুরু অমরদাস ছোট চৌকিতে বসিয়া সমাধিস্থ হয়েন; এমন সময় চৌকির এক পায়া হঠাৎ খুলিয়া যায়। ভাণী উহা দেখিয়া সেই খোলা পায়ায় হাত দিয়া থাকিয়া পিতার সমাধি ভঙ্গ হইতে দেন নাই, কিন্তু তাহাতে তাঁহার হাতটি ফুলিয়া গিয়াছিল। কন্যার সেই বেদনাযুক্ত স্ফীত হাত দেখিয়া পিতা পরে জানিতে পারেন যে, কন্যা কেমন কঠোর চেষ্টায় তাঁহার সমাধি অবস্থা রক্ষা করিয়াছিল। এইরূপ নানাকারণে গুরু অমরদাস কন্যার প্রতি সবিশেষ স্নেহ-পরবশ হইয়াছিলেন। এমন কি, কোন সময় কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে, তিনি "গুরুমাতা" হইবেন। এক্ষণে রামদাস শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এমনি প্রিয় শিষ্য হইয়া উঠিলেন যে, অমরদাসের পর গুরুপদ তিনিই পাইবেন বলিয়া নির্ব্বাচিত হইলেন। কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ হয় যে, রামদাস যে অমরদাসের পুত্রাধিক স্নেহ লাভ করিলেন,—তাহা ভক্তিবলে কি ভাণীর মায়ায়? সে সন্দেহ বৃথা। রামদাস পরীক্ষায় গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। অমরদাস গুরুভক্তির

পরীক্ষা করিবার জন্য পুত্র ও জামাতাকে বেদী নির্ম্মাণ করিতে বলেন। বেদী নির্ম্মিত হইলে উহা মনোনীত হইল না বলিয়া, পুনরায় উহার নির্ম্মাণ করিতে বলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে পুত্রের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি পুনঃ পুনঃ এক কাজ করিতে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তখন রামদাস বলিলেন ঃ—

"সেবক কো সেবা বন্ যাই।
হুকুম বুঝ পরম গতি পাই॥"

অর্থাৎ সেবকের সেবা করাই কার্য্য, এবং প্রভুর হুকুম মান্য করিলেই পরম গতি লাভ হয়। এইরূপ কথায় ও কার্য্যে গুরু তুষ্ট হইয়া জামাতাকে স্বপদে নির্ব্বাচন করেন।

অন্যান্য গুরুর ন্যায় "গ্রন্থ" মধ্যে অমরদাসেরও অনেক "বাণী" সন্নিবেশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে "আনন্দজী" অংশই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হয়। গুরু নানককৃত "জপজী" এবং দশম গুরুকৃত জাপজীর পরই আনন্দজীর" উল্লেখ হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সকল গুরুই এক এবং সে জন্য অন্যান্য গুরুকৃত পদ ও প্রথম গুরু নানকের ভণিতা সংযুক্ত হইয়া থাকে। তবে কোন্‌টি কোন্ গুরুর, বুঝিবার নিমিত্ত "২য় মহল্যা," "৩য় মহল্যা" ইত্যাদি শব্দ প্রথমে ব্যবহৃত হয়। "আনন্দজী" গীত হইয়া থাকে। নমুনাস্বরূপ প্রথম পদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

আনন্দজী।—মহল্যা তিস্‌রা।—রাগ রামকেলী।
"আনন্দ ভ্যায়া মেরী মায়। সৎ গুরু মএ পায়া॥
সৎগুরু ত পায়া সহজ্ সেতি মন্ বজিয়া বধাইয়া।
রাগ রতন্ পর্‌বার পরেয়া শব্দ গাওন আইয়া॥
শব্দোত গাওঁ হরিকেরা মন্ জিনি বসায়া।
কহে নানক আনন্দ হুয়া। সৎগুরু মএ পায়া॥"

অর্থাৎ হে মাতা আমার আনন্দ হইয়াছে। আমি সদ্‌গুরু পাইয়াছি। সদ্‌গুরু পাওয়ায় আমার মনে সহজে আনন্দ-উৎসবের বাদ্য বাজিয়া উঠিতেছে। রাগ (হরির গান) ও রতন (হরিগুণ-গানরূপ রত্ন) আমার পরিবার (ইন্দ্রিয়গণ) প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলে বাধাইয়ের (আনন্দ-উৎসবের বাদ্যের) ন্যায় গাহিয়া বাজাইয়া আসিতেছে। শব্দ যদি গাইতে হয়, তবে হরির নাম-রূপ শব্দ গাও। যিনি হরির নামকে আপন মনে বসাইয়াছেন, নানক কহিতেছেন, উঁহারই প্রকৃত আনন্দ হইয়াছে। আমি সদ্‌গুরু পাইয়াছি।

অমরদাস দ্বাবিংশ বৎসর গুরুগিরি করিয়া ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দোয়ালে মানবলীলা সংবরণ করেন। ইঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বোধ হয় যে, ইনি পূর্ব্ব গুরুদ্বয়ের মতের সম্পূর্ণ-ভাবে পরিপাক করিয়াছিলেন মাত্র।

চতুর্থ অধ্যায়।

শিখ-সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি।

চতুর্থ গুরু—রামদাস।

চতুর্থ গুরু—রামদাস অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্ব-নাম ছিল, জেঠাজী। দরিদ্রতা নিবন্ধন ইঁহার মাতা লাহোর পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দোয়ালে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা সামান্য ছোলাভাজা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া দিন-যাপন করিতেন।

রামদাস শিখ-গুরু হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে নিরপেক্ষ এবং গুণগ্রাহী সম্রাট্ আকবরের পরিচিত হইয়াছিলেন। ক্রমে সম্রাট্ তাঁহার বক্তৃতাদি গুণে মুগ্ধ হইয়া একখণ্ড ভূমি দান করেন। এই ভূমিখণ্ডের আকার প্রায় চক্রের ন্যায় বলিয়া ইহার নাম হয় 'চক্কর রামদাস'। গুরু রামদাস ইহার প্রায় মধ্যস্থলে একটি সরোবর খনন করাইয়া তাহার নাম 'অমৃতসর' রাখেন। অমৃতসরের মধ্যে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার নাম দেন "হর-মন্দর' অর্থাৎ হরির মন্দির। এই অমৃতসরের চতুর্দ্দিকে যে বসতি হয়, তাহার প্রথম নাম রামদাসপুর; ক্রমে উহাই অমৃতসর হইতে
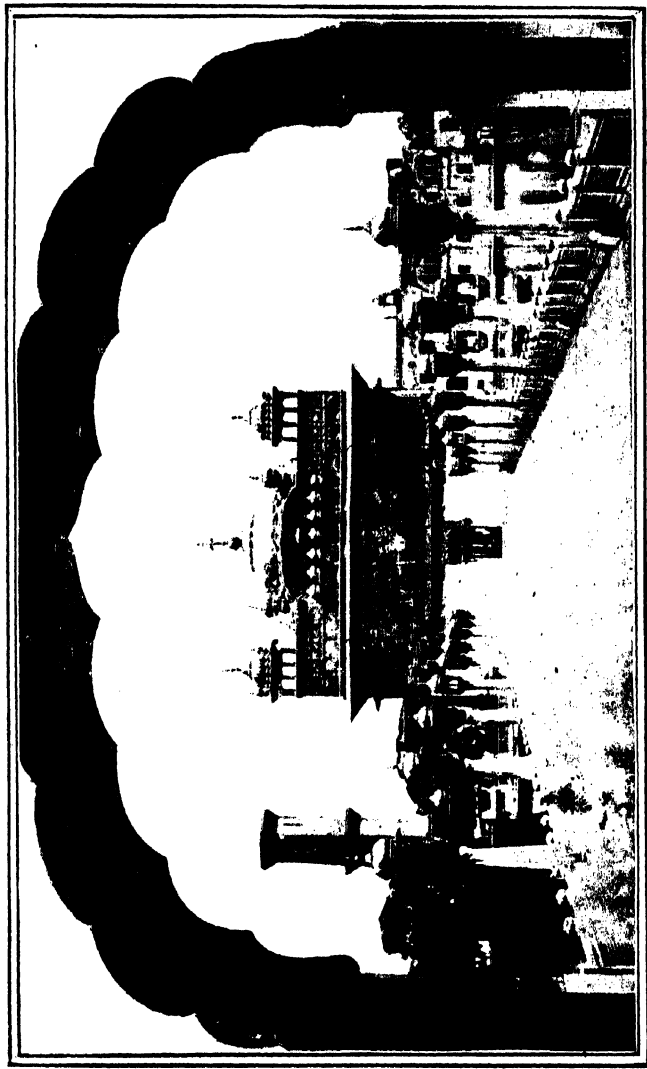
গুরু রামদাস।

অমৃত সহরের হর-মন্দির।

METCALFE PRESS.

(৫১ পৃঃ)

"অমৃতসহর" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে অমৃতসহরই শিখদিগের প্রধান তীর্থস্থান।

কথিত আছে যে, গুরু রামদাস সম্রাট্ আক্‌বরের নিকট হইতে উক্ত ভূমিখণ্ড পাইলে, একজন শ্রীরামচন্দ্রের সেবক উক্ত ভূমিখণ্ড শ্রীরামচন্দ্রের নামে দাবী করেন। ইহাতে গুরু রামদাস বলেন যে, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অবতার, এবং সেই কথা প্রমাণের নিমিত্ত বলেন যে, সেই স্থানে তাঁহার পূর্ব্ব-নিবাস ছিল, এবং একটি কূপ খনন করিয়া পূর্ব্ব-নিবাসের নিদর্শনস্বরূপ একটি পুরাতন সিঁড়ি দেখাইয়া দেন। ইহাতে উক্ত ব্যক্তি গুরুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তৃপ্ত-হৃদয়ে প্রস্থান করে।

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি॥ ২০॥" গীতা, ৩য় অঃ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্ম দ্বারাই (শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া) সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোক সকলের স্বধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া (তোমার) কর্ম্ম করা উচিত॥ ২০॥ তবেই যে কোন প্রকারে নিজের উদ্ধার-চেষ্টা করিলেই হইবে না; লোক সকলের স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনের দিকেও দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। গুরু রামদাস যেরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে এই মহাবাক্যটি কেমন প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহাই এ স্থলে বক্তব্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামদাস গুরু অমরদাসের পুত্রাধিক প্রিয়তরা কন্যা ভাণীকে বিবাহ করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গুরুভক্তির এবং ধৈর্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গুরুপদের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মহত্ত্বে শিখধর্ম্ম প্রসারিত হইয়া পড়িল। কোন সময়ে লাহোরে অবস্থানকালে সম্রাট্ আক্‌বর গুরুর গুণে মুগ্ধ হইয়া কিছু উপহার প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহাতে গুরু নিজের নিমিত্ত

কিছুই প্রার্থনা করিলেন না; বলিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে, সম্রাটের লাহোরে অবস্থানকালে, বাহিরে অনেক লোকজন আসায় দ্রব্যাদি যেরূপ বিক্রয় হইতেছে, অতঃপর সম্রাট্ চলিয়া গেলে আর সেরূপ বিক্রয় হইবে না। তাহাতে অনেক লোকের আয় কম হইবে। এই নিমিত্ত সেই অঞ্চলের লোকদিগকে এক বৎসরের রাজস্ব প্রদানে অব্যাহতি দিবার জন্য আদেশ প্রার্থনা করেন। উদার সম্রাট্ গুরুর বাক্যে সম্মতি প্রদান করেন। এই ঘটনায় জন-সাধারণের মধ্যে গুরুর নিঃস্বার্থপরতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ শ্রদ্ধা জন্মিল। অনেক জমীদার, ব্যবসাদার প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

আর্য্য ঋষিগণ সমস্ত প্রকৃতিকে তিন গুণের আধার বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন, এবং তদনুসারে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণ-সেবিত হিন্দু জাতিকে একই সনাতন ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ শুদ্ধাচারী, জ্ঞানী ব্রাহ্মণ হইতে কদাচারী, জ্ঞানহীন চণ্ডাল পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় শান্তিলাভ করিতে পারে। উক্ত জমীদার, ব্যবসাদারগণ সাধারণতঃ রজোগুণাত্মক; তাঁহারা গুরু নানকের সাত্ত্বিক চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। নানকের বিরাট্ মূর্ত্তির সেবা বা অধ্যাত্মচিন্তা তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই; কিন্তু কাঞ্চন-সেবী জমীদার, ব্যবসাদার এই নিঃস্বার্থ-ভাবে অপরের সাংসারিক সুবিধা করিয়া দেওয়ার মর্ম্ম সহজেই উপলব্ধি করিয়া গুরুর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এই ঘটনায় শিখ-সংখ্যাবৃদ্ধির কথা সকল ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে বলিয়াছেন। তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কানসিংহ নামে একজন লিখিয়া গিয়াছেন যে, গুরু রামদাসের ভক্ত ও শিষ্য ৮৪টি মাত্র ছিল। বোধ হয়, সে গুলি বিশিষ্ট শিষ্যের সংখ্যা।

চতুর্থ গুরু রামদাস-প্রণীত পদের মধ্যে নিম্নলিখিত পদটি শিখগণ

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে পাঠ করেন। ইহাও অন্যান্য পদের ন্যায় গুরু নানকের ভণিতা-সংযুক্ত। এই পদটি সাধারণতঃ বিঘ্ন-বিনাশক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

রাগ গৌড়া। মহল্যা চৌথা।

"কাম ক্রোধ নগর বহু ভরেয়া, মিল্ সাধু খণ্ডল খণ্ডাহে।
পূরব লিখৎ লিখে গুরু পায়া, মন্ হরলেও মণ্ডল মণ্ডাহে॥
কর সাধু অঞ্জল পুনবড়াহে, কর ডণ্ডবৎ পুন বড্ডাহে॥
সাকৎ হর রস সাদ না জানেয়া তিন্ অন্তর হোমে কণ্ডাহে।
জেঁও জেঁও চলে চুভে দুঃখ পাওয়ে যমকাল সহে শিরদণ্ডাহে।
হর জন হর হর নাম সন্ধানে দুঃখ জনম মরণ ভও খণ্ডাহে॥
অবিনাশী পুরুষ পায়া পরমেশ্বর বহুশোভ খণ্ড ব্রহ্মাণ্ডোহে।
হম গরিব মস্কিন প্রভু তেরে হর রাখ রাখ বড্ বড্ডাহে।
জন নানক নাম আধার টেক্ হায় হর নামে হি সুখ সুখ মণ্ডাহে॥"

অর্থাৎ নগররূপী শরীর বা মন কাম-ক্রোধাদিতে একবার ভরিয়া গিয়াছে, ইহার খণ্ডনকারী সাধুগণের সহিত মিলিত হইয়া ইহার খণ্ডন কর। পূর্ব্ব লেখার (কর্ম্মের) লিখন অনুসারে গুরু পাইলে, তবে হরিতে মন ব'সে। সাধুজনকে করযোড়ে প্রণাম কর, আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কর। দুষ্টলোকে হরি-রসের স্বাদ জানে না, তাহাদের মন অহঙ্কার-রূপ কণ্টকাকীর্ণ। তাহাতে যখন সে চলে, কাঁটা ফুটিতে সে দুঃখ পায়, এবং কাল যম শিরে দণ্ড দেয়। হরির জন (হরির ভক্ত বা দাস) হরি হরি নাম স্মরণ করিয়া জনম-মরণ-দুঃখ নাশ করে। অবিনাশী পুরুষ ভগবান্ পাইয়াছি, (বুঝিয়াছি) যিনি খণ্ডে (অর্থাৎ অণুতে) এবং ব্রহ্মাণ্ডে (অর্থাৎ বিশ্বে) নানাপ্রকারে শোভা করিতেছেন। আমি কাঙ্গাল, হে প্রভু! আমি তোমার কাঙ্গালের কাঙ্গাল, হে হরি! তুমি বড় রও,

বড় তুমি রক্ষা কর, রক্ষা কর। জন (ভক্ত বা দাস) নানক বলিতেছেন, আধার-স্বরূপ তুমিই ধারণ-যোগ্য। একমাত্র হরির নামেই সুখ।

গুরু রামদাস সাত বৎসর গুরুগিরি করিয়া ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন। ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে অমৃতসহর স্থাপন করেন। বিয়া নদীতীরে ইঁহার সমাধি-মন্দির স্থাপিত হয়।

ভাণীর গর্ভে গুরু রামদাসের তিন পুত্র হয়। প্রথম পৃথ্বীদাস, নিতান্ত সাংসারিক হইয়া বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া পড়েন। দ্বিতীয় মহাদেও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় অর্জ্জুন, ভক্তিবলে পিতার শিষ্যত্ব পাইয়া, মাতামহের আশীর্ব্বাদানুসারে গুরু-পদের অধি-কারী হইয়াছিলেন। গুরু রামদাস অর্জ্জুনের ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য একটি কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে লাহোরে পাঠাইয়া দেন, এবং বলেন, "যতদিন ফিরিয়া আসিবার জন্য পত্র লেখা না হয়, ততদিন তথায় থাকিবে।" এইরূপ অনুজ্ঞা অনুসারে অর্জ্জুন লাহোরে গিয়া কিছুদিন রহিলেন। ক্রমে গুরু বা পিতৃ-দর্শনের বাঞ্ছা প্রবল হইলে পিতাকে পত্র লিখিলেন ;—

"মেরা মন লোচে গুরু দর্শন ভ্যাই।
বিলপ্ করে চাতৃক কি ন্যাই॥
তৃষা না উৎরে, সাৎ না আওয়ে
বিন্ দর্শন সন্ত প্যারে জিউ ;
হাঁওঘোলি জিউঘোল ঘুমাই,
গুরু দর্শন সন্ত প্যারে জিউ॥ ১

অর্থাৎ গুরু-দর্শনের জন্য আমার মন বাঞ্ছা করিতেছে, চাতকের ন্যায় বিলাপ করিতেছে ; সাধু প্রিয়দর্শন বিনা তৃষ্ণা নিবারণ হয় না—শান্তি আসে না ; আমি এমন সাধু দর্শনেতে বলিহারি যাই॥ ১

যে শিখ এই পত্র লইয়া গুরুর নিকট গমন করে, সে গুরুর দর্শন না পাইয়া পত্রখানি গুরুপুত্র পৃথ্বীদাসের হস্তে অর্পণ করে। পৃথ্বীদাস অর্জ্জুনের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিতেন। তিনি দেখিলেন যে, এরূপ প্রেমভক্তি-পূর্ণ পত্র যদি পিতার হস্তে পড়ে, তাহা হইলে অর্জ্জুনই পিতার অধিকতর প্রিয়পাত্র হইবে। এইজন্য পত্রবাহককে বিদায় দিয়া পত্রখানি পকেটস্থ করিলেন।

কিছুদিন অতীত হইয়া গেল, অর্জ্জুন উত্তর না পাইয়া আবার পত্র লিখিলেন ;—

"তেরা মুখ শোহায়েজি সহজ ধুন বাণী।
চির হোয়েয়া দেখে সারঙ্গপাণি॥
ধন্য সুদেশ যাহা তু বসেয়া, মেরে সজ্জন
মিত মুরারেজি।
হাঁওঘোলি জিউঘোল ঘুমাই,
গুরু সজ্জন মিত মুরারে জিউ॥ ২॥"

অর্থাৎ তোমার মুখে সুন্দর শোভা, তোমার সুমিষ্ট বাক্যের ধ্বনি। হে সারঙ্গপাণি! * বহুদিন হইল, তোমাকে দেখিয়াছি। ধন্য সে দেশ, যেখানে তুমি বাস কর। হে মম সজ্জন মিত্র মুরারি! এমন সজ্জন মিত্র মুরারির বলিহারি যাই॥ ২॥

এই দ্বিতীয় পত্রও প্রথম পত্রের দশা প্রাপ্ত হইল! তখন অর্জ্জুন পত্র-

* পাঞ্জাব অঞ্চলে বিশেষতঃ শিখদিগের মধ্যে উচ্চ অঙ্গের যোদ্ধ্ পুরুষগণ তরবারাদি অস্ত্রের ন্যায় সর্ব্বদা বাজপক্ষী হস্তে রাখিতেন। গুরু রামদাসের হস্তেও বাজপক্ষী থাকিত। সারঙ্গ অর্থে বাজপক্ষী। বেদী বংশের সহিত শোডি বংশের মিলনের পর হইতে গুরুগণ প্রায় সকলেই বাজপক্ষিধারী হইয়াছিলেন।

বাহক হইতে সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া পুনরায় জানিয়া আবার পত্র লিখিলেন ;—

"এক ঘড়ি না মিল্‌তে তা কল্ যুগহোতা ।
হুন্‌কদ্ মিলিয়ে প্রিয় তুধ ভগবন্তা ॥
মোহে র্যায়ন না বিহাবে, নিদ না আবে,
বিন্ দেখে গুরু দরবারে জিউ ।
হাঁওঘোলি জিউঘোল ঘুমায়ে
তিস্ সচ্চে গুরু দরবারে জিউ ॥ ৩ ॥"

অর্থাৎ হে প্রিয় ভগবান্ ! তুমি কবে মিলিবে ? এক ঘড়িমাত্র তোমার আর দর্শন না পাইলে বড় কষ্টের সময় হয় । গুরু দরবার দর্শন না করিয়া আমার রাত্রি অতিবাহিত হয় না, নিদ্রা আসে না । এমন গুরু দরবাব দর্শন, আহা ! ব'লহারি যাই ।

এবারের পত্রখানি পত্রবাহককে দিবার সময় অর্জ্জুন ব'লিয়া দিলেন,— "গুরু যখন প্রকাশ্য দেওয়ানে বসিবেন, সেই সময় তাঁহার হস্তে দিবে ।" পত্রবাহক শিখ তাহাই করিল । গুরু রামদাস পুত্রের পত্র পাঠ করিয়া প্রেমানন্দে গলিয়া গেলেন । পত্রে তিন চিহ্ন দেখিয়া বুঝিলেন যে, ইহার পূর্ব্বে আরও দুইখানি পত্র ছিল । পত্রবাহক শিখকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বে সে দুইখানি পত্র আনিয়া পৃথ্বীদাসকে দিয়াছে । পৃথ্বীদাসকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি পত্রপ্রাপ্তি অস্বীকার করিলেন ; কিন্তু তাঁহারই পকেট হইতে পত্র বাহির হইল ! ইহাতে গুরু পৃথ্বীদাসের উপর প্রকাশ্যভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন । তৎপরে এই পত্রের উত্তর দ্বারা পদ-পূরণ করিতে বলিলেন ; অর্থাৎ তিনখানি পত্রে যে চতুর্থ পদ বাকী :আছে, তাহাই পূরণ করিয়া উত্তর লিখিতে

বলিলেন। পৃথ্বীদাস ইহাতে অক্ষম হইলে অর্জ্জুনকে আনবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। অর্জ্জুন আগমন করিলে গুরু উক্ত পদ পূরণ করিতে বলিলেন। তদনুসারে গুরু-দরবারে অর্জ্জুন বলিলেন ;—

"ভাগহোয়া গুরু সন্ত মিলায়া।
প্রভু অবিনাশী ঘরমে পায়া॥
সেব করি পল্ চসা না বিছড়া
জন নানক দাস তোঁহারে জিউ।
হাঁওবোলি জিউঘোল ঘুমাই
জন নানক দাস তোমারে জিউ॥ ৪॥

অর্থাৎ ভাগ্য হইল। সাধু গুরু দর্শন মিলিল, ঘরেই অবিনাশী প্রভু পাইলাম। এক মুহূর্ত্তও বিস্মৃত না হইয়া সেবা করিব। জন নানকের দাস হইয়া তোমারই॥ ৪

এখন সকলেই বুঝিলেন যে, অর্জ্জুন ভক্তিমান্ এবং পৃথ্বীদাস অপেক্ষা নিশ্চয়ই উপযুক্ত। গুরুও অর্জ্জুনকে গুরুপদ প্রদান করিলেন।

গুরু রামদাস স্বর্গীয় হইলেন। এতদিন লোকে জানিত, গুরুগণ পরকালেরই রক্ষাকর্ত্তা; কিন্তু গুরু রামদাসের সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারে সকলেই বুঝিল যে, গুরু ইহকাল পরকাল উভয়ই রক্ষা করিয়া থাকেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

শিখ-সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি।

পঞ্চম গুরু—অর্জ্জুন।

পণ্ডিতেরা ভগবানের প্রধানতঃ দুই ভাব বলিয়া থাকেন ;—"ঐশ্বর্য্য" ও 'মাধুর্য্য'। ইহজগতের প্রায় পনের আনা তিন পাই লোক ঐশ্বর্য্য-ভাবে ভুলিয়া থাকেন। এমন কি, যাঁহারা মাধুর্য্য-ভাবের সেবক বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদিগকেও ঐশ্বর্য্য-ভাব দেখিয়া (দুইটা রজত-কাঞ্চন, দুইটা কল-কারখানা প্রভৃতি রাজসিক ভাব দেখিয়া) মুগ্ধ হইতে দেখা যায়। চতুর্থ গুরু—রামদাসের সময়ে কেবল সাত্বিক-ভাব-প্রধান ব্যক্তি ব্যতীত রাজসিক ও তামসিক ভাবাপন্ন লোকদিগকেও শিখ-

গুরু অর্জ্জুন

সম্প্রদায়ে লব্ধপ্রবেশ হইতে দেখা গিয়াছে! এক্ষণে অর্জ্জুন গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়া পূর্ব্ব-গুরুগণের ন্যায় ফকিরীবেশে রহিলেন না। তিনি সাধারণজন-মুগ্ধকর রাজবেশ ধারণ করিলেন। দ্বারে হস্তী, অশ্বাদি বন্ধন করিলেন। তিনি রাজগণের ন্যায় কর আদায়েও প্রবৃত্ত হইলেন। এতদিন গুরুগণ যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্য গ্রহণ করিতেন; গুরু নানক তাহাতেও সম্মত ছিলেন না। কিন্তু অর্জ্জুন কর আদায়ের নিরিখ বাঁধিয়া দিয়া

নিয়মমত কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অমৃতসহর মহাতীর্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন; উহাই যেন রাজধানীস্বরূপ হইল। কিন্তু কাহার কাহারও মতে তিনি স্বয়ং অমৃতসহরে বড় একটা থাকিতেন না, প্রায়ই তরণতারণ নামক স্থানে গিয়া বাস করিতেন। তিনি তথায় ও সন্তোষসর নামক স্থানেও দুইটি প্রকাণ্ড জলাশয় নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এ স্থলে একটি কথা মনে হইতেছে। ক্ষত্রিয়মধ্যে বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদী বংশের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং শোড়ি বংশ অস্ত্র-ধারণে পটু। অর্জ্জুন এই উভয় লক্ষণাক্রান্ত বংশ-সম্ভূত।

অমৃতসহরকে মহাতীর্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেওয়াতে বৎসরের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহা শিখদিগের একটি সম্মিলনের স্থান হইয়া উঠিল। এতদ্ব্যতীত তীর্থস্থান বলিয়া তথায় অন্যান্য সময়েও লোক-সমাগত হইত। এতদিন আদিগ্রন্থের নানা অংশ নানাস্থানে ছিল। গুরু অর্জ্জুন উহা সংগ্রহ করিয়া হরমন্দিরে স্থাপন করিলেন। অমৃত-সহরে স্নান করিয়া আদিগ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে বিশিষ্ট পুণ্যসঞ্চয় হয় বলিয়া প্রকাশ করায় এই মহাতীর্থে আগত শিখদিগের উহাই প্রধান কর্ম্ম হইয়া উঠিল।

গুরু অর্জ্জুন গুরু-প্রণামী বা দক্ষিণার হার নির্ণয় ও উহা সংগ্রহের সুবন্দোবস্ত করায় বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ হইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত তিনি তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশ হইতে ঘোড়া আনাইয়া ভারতে উহার ব্যবসা করিয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অর্জ্জুন ধনবান্ হইতেছেন দেখিয়া, উঁহার ভ্রাতা পৃথ্বীদাসের হিংসার উদ্রেক হইল। তিনি গুরুপদ গ্রহণের জন্য একান্ত চেষ্টা করিয়া অর্জ্জুনকে বিষপান পর্য্যন্ত করাইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শতদ্রু নদীর তীরবর্ত্তী কিরতপুর,

ফিরোজসহর প্রভৃতি স্থানে পৃথ্বীচাঁদের বংশধরগণকে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

গুরু অর্জ্জুন আদিগ্রন্থ সংগ্রহের সময় কবীর প্রভৃতি ভক্ত কবিগণের অনেক পদ উহাতে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, এখনও পর্য্যন্ত গ্রন্থপূজা ও আরতির সময় ঐ সকল পদ শাস্ত্রীয় পদ বলিয়া উচ্চারিত বা গীত হইয়া থাকে। গুরু অর্জ্জুনের সময় গুরুদাস নামক একজন ভক্ত কবি নানকসাহী ধর্ম্মপ্রচারের বড় সহায়তা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার প্রণীত ৪০টি পরিচ্ছেদ-বিশিষ্ট "জ্ঞানরত্নাবলী" গ্রন্থমধ্যে স'ন্নবেশিত হইয়াছিল। কিন্তু যে গ্রন্থ ধরিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে, তাহাতে উহার উল্লেখ নাই। শিখেরা বলেন,—"ভাই গুরুদাস কি বার" ভক্তি সহকারে পঠিত হয় সত্য; কিন্তু উহা গ্রন্থ সাহেবের অংশ বলিয়া গণ্য নহে। গুরু অর্জ্জুন উহাকে গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করিলে গুরুদাস বলিয়াছিলেন,—"ভক্ত ও ভগবানের একস্থান হইতে পারে না।"

গুরু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক "হরি কা সহস্র নাম" রচিত হইয়াছিল। উহা কিরূপ ধরণে রচিত, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"অচ্যুত পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, অন্তর্যামী।
মধুসূদন, দামোদর স্বামী॥
হৃষীকেশ, গোবর্দ্ধনধারী।
মুরলী মনোহর হর রঙ্গা॥ ১॥
মোহন মাধব কৃষ্ণ মুরারে।
জগদীশ্বর হর জীউ অসুর সংহারে॥
জগজীবন অবিনাশী ঠাকুর।
ঘট ঘট বাসী হ্যায় সঙ্গা॥ ২॥"

এতদ্ব্যতীত গুরু অর্জ্জুনের রচিত নানারাগ-সংযুক্ত ভজনাদি আছে। উহার একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। ইহাও অন্যান্য গুরুর রচিত পদের ন্যায় নানকের ভণিতা-সংযুক্ত।

রাগ রামকেলী। মহল্যা পঞ্চমা।

"কোই বোলে রাম কোই খোদায়।
কোই সেবে গোঁসাইয়াঁ কোই আল্লায়॥
কোই নাওয়ে তীরথ কোই হজ্ যায়।
কোই করে পূজা কোই শির নোয়ায়॥
কোই পড়ে বেদ কোই কতেব।
কোই ওড়ে নীল কোই সফেদ॥
কোই কহে তুরগ কোই হিন্দু।
কোই বাচে ভেস্ত কোই স্বর্গ ইন্দু॥
কহু নানক জিন হুকুম পছাতা।
প্রভু সাহেবকা তিনি ভেদ যাতা॥"

অর্থাৎ কেহ বলে রাম, কেহ বলে খোদা। কেহ গোঁসাইয়ের সেবা করে, কেহ বা করে—আল্লার। কেহ তীর্থস্নান করে, কেহ বা মক্কায় হজ্ করিতে যায়। কেহ কেহ পূজা করে, কেহ বা শির নত করিয়া নোয়াজ করে। কেহ বেদ পড়ে, কেহ বা কোরাণ পড়ে। কেহ নীল বস্ত্র, কেহ বা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে। কেহ আপনাকে তুর্ক (মুসলমান) বলে, কেহ বা হিন্দু বলে। কেহ ভেস্ত (মুসলমানদিগের স্বর্গের নাম ভেস্ত), কেহ বা স্বর্গ প্রার্থনা করে। নানক কহিতেছেন, (এ সকলই এক) যিনি ইহাকে ভেদ জ্ঞান করেন, তাঁহারই ভেদবুদ্ধি হয়।

সামঞ্জস্য-বিধায়ক সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃত্বভার-প্রাপ্ত গুরুর ইহাই উপযুক্ত বাক্য। আজকাল বাঙ্গালায়ও এরূপ গীত শুনিতে পাওয়া যায়।

অর্জ্জুনের সন্তান জন্মিতে নিয়মিত কাল উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, গুরু নানকের সাক্ষাৎ শিষ্য বুদ্ধা তখনও জীবিত ছিলেন; কিন্তু প্রায় ভীমরতি দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহারই আশীর্ব্বাদের পর এক সন্তান হয়। ইনিই ভবিষ্য গুরু—হরগোবিন্দ।

প্রায় এই সময়ে লাহোরের রাজস্ব-সচিব চণ্ডুসা নিজ কন্যার পাত্রের জন্য নানাস্থানে ঘটক পাঠাইয়া দেন। চণ্ডুসা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। ঘটক গুরু অর্জ্জুনের পুত্র হরগোবিন্দকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া আসিয়া চণ্ডুসাকে সংবাদ দেন। চণ্ডুসা যখন শ্রবণ করিলেন যে, ঘটকগণ ফকীর গুরু অর্জ্জুনের পুত্রের সহিত রাজস্ব-সচিবের সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন, তখন বলিয়া উঠিলেন,—"কেয়া! ছাদ কি ইটা মোহরি মে লাগায় দিয়া?"—কি, ছাদের ইট নর্দ্দামায় লাগাইয়াছ? এই কথায় চণ্ডুসার সভাসদ সকলেই প্রতিবাদ করিয়া অর্জ্জুনের গুণ-ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অতি অল্প সময়মধ্যে চণ্ডুসার ঘৃণা ব্যঞ্জক বাক্য অর্জ্জুনের কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে, কোন প্রকারেই এ বিবাহে সম্মত হইবেন না। এ দিকে চণ্ডুসা ক্রমশঃ সকলেরই মুখে অর্জ্জুনের গুণ শুনিয়া কন্যাদানে প্রস্তুত হইলেন। এমন কি, স্বয়ং লক্ষ টাকা সঙ্গে লইয়া অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। অর্জ্জুন লক্ষ টাকা তুচ্ছ মনে করিয়া বলিলেন যে, তিনি ফকীর, এবং গুরুর বাক্য পাষাণের রেখা; সুতরাং এ বিবাহ কোন প্রকারেই হইতে পারে না। বিবাহ হইল না, এবং চণ্ডুসার গুরুর প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু পঞ্জাব-শাসনকালে বিদ্রোহিতা অপরাধে অপরাধী হয়েন। সম্রাট্ তাঁহাকে

শাসন করিতে উদ্যত হইলে, তিনি গুরু অর্জ্জুনের আশ্রয় ভিক্ষা করেন, এবং গুরুও খসরুকে আশ্রয় দান করেন। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিলে গুরু লাহোরে আহূত হয়েন। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, এতৎসম্বন্ধে চণ্ডুসার ষড়্‌যন্ত্র ছিল। গুরু অর্জ্জুন সম্রাটের আজ্ঞানুসারে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত ও কারারুদ্ধ হয়েন। এইরূপে কারারুদ্ধ হওয়ার পরই ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ বৎসর গুরুগিরি করিয়া তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন লোকান্তরগমন করেন। শিখেরা বলেন যে, গুরুকে কারাগারে লইয়া যাইতে পারে নাই; দণ্ডাজ্ঞা হওয়ার পর তিনি সম্রাটের অনুমতিক্রমে চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিতে গিয়া অন্তর্ধান হয়েন। যাহা হউক, তিনি যে কারাদণ্ডের নিদারুণ যন্ত্রণায় শারীরিক বা মানসিক পীড়ায় ব্যথিত হইয়া ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা সকলেরই প্রতীত হইয়াছিল। তাঁহার স্বর্ণ-মণ্ডিত সমাধি-মন্দির এখন পর্য্যন্তও লাহোরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইহতেই বোধ হয়, তাঁহার মৃতদেহের অন্তর্ধান হয় নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শিখ-সম্প্রদায়ে পূর্ণ রাজস ভাব।

ষষ্ঠ গুরু—হরগোবিন্দ।

দেখা গিয়াছে যে, শিখ-সম্প্রদায়ের প্রায় সকল গুরুই জাতিতে ক্ষত্রিয়। শিখ-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বেদী-বংশীয় গুরু নানক ক্ষত্রিয় হইয়াও সাত্ত্বিক চিন্তা, সাত্ত্বিক ক্রিয়ার লক্ষণ সমূহ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী গুরুগণ ক্রমে ক্রমে রাজস ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। গুরুগণের মধ্যে গুরু নানকের যেমন সাত্ত্বিক ভাবের মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল, হরগোবিন্দে সেইরূপ রাজসভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আদিগ্রন্থে যুদ্ধাদি রাজসিক কার্য্যে লিপ্ত ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম গুরুর কোন বাণী লিপিবদ্ধ হয় নাই;

গুরু হরগোবিন্দ।

শান্তিপ্রিয় নবম গুরুর বাণী গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে হরগোবিন্দের সর্ব্বত্র বিজয়লাভ হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের জন্মের পর পাণ্ডুরাজ কুন্তী দেবীকে যে প্রকার বলিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় গুরুকুলে নানকাদি জন্মগ্রহণ করিলে পর পঞ্চনদ নানকসাহী সম্প্রদায়কে ঠিক সেইরূপ বলিয়াছিলেন,—'পণ্ডিতেরা ক্ষত্রিয়কে' বল-শ্রেষ্ঠ বলিয়া

থাকেন, অতএব তুমি একটি বলপ্রধান পুত্র প্রার্থনা কর।” তদনুসারেই যেন ভীমসম অমিততেজা হরগোবিন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গুরু অর্জ্জুনের লোকান্তরপ্রাপ্তির সময় হরগোবিন্দের বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ মাত্র। হরগোবিন্দকে বালক দেখিয়া অর্জ্জুনের ভ্রাতা পৃথ্বীচাঁদ গুরুপদ অধিকারের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিখ-সম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। কেহ কেহ বলিল, পৃথ্বীচাঁদ চণ্ডুসার লোক। এই নিমিত্ত সাধারণতঃ শিখেরা পৃথ্বীচাঁদকে না লইয়া হরগোবিন্দকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। যে কতকগুলি লোক পৃথ্বীচাঁদের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই “মীনা” শিখ বলিয়া অভিহিত।

হরগোবিন্দ গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়-লক্ষণ সমস্ত দেখাইতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-জগতে যিনি গুরু, সামাজিক ক্ষেত্রে তিনিই সেনাপতির স্থান অধিকার করিলেন। কিরূপে স্বদল হৃষ্ট-পুষ্ট হইবে, কিরূপে পিতৃ-বৈরি নিপাত করিবেন, ইহাই যেন তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইয়া উঠিল। কথিত আছে যে, তিনি সর্ব্বদা দুইখানি তরবারি ধারণ করিতেন। তাঁহার এইরূপ দুইখানি তরবারি বহন সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, অধ্যাত্ম-জগৎ ও বহির্জ্জগৎ উভয়ই শাসন করিবেন বলিয়া, তিনি উভয় তরবারি ধারণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি একখানিতে পিতৃবৈরি নিপাত, এবং অপরখানিতে স্বদল রক্ষা করিবেন বলিয়া দুইখানি তরবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হরগোবিন্দের কোন বাণী “গ্রন্থে” সন্নিবেশিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অনেক নূতন ব্যবস্থা শিখগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। এতদিন শিখগণের মধ্যে মাংস-ভক্ষণের বিধি-ব্যবস্থা ছিল না। হরগোবিন্দ স্বয়ং মাংসভোজী হইয়া অনুচরবর্গকে তৎপথে অনুসরণ করাইয়াছিলেন।

গুরু হরগোবিন্দের সাজ-সজ্জা গুরু অর্জ্জুন অপেক্ষাও অধিক জমকাল হইয়া উঠিয়াছিল। অর্জ্জুন-প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা অনুসারে সমস্ত দেশ হইতে অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। আটশত ঘোড়া তাঁহার অশ্বশালায় নিয়ত রক্ষিত হইত। ইনিই বিয়া (বিপাসা) নদীতীরে হরগোবিন্দপুর স্থাপন করিয়া তথায় শত্রু হইতে রক্ষার নিমিত্ত গুপ্তস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের লাহোরে অবস্থানকালে, হরগোবিন্দ তাঁহার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইয়া নিজগুণে সম্রাট্‌কে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি পিতৃবৈরি চণ্ডুসাকে বিলক্ষণ কষ্ট দিয়া নিধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং সম্রাটের অধীনে সামরিক কার্য্য পাইয়া সম্রাটের সহিত কাশ্মীরে গিয়াছিলেন। কাশ্মীরে যাইয়া তেজস্বী হরগোবিন্দ জাহাঙ্গীরের বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে মৃগয়াদি করিয়া বেড়াইতেন; ইহাতে সম্রাট্ বিরক্ত হইয়া, তাঁহার পিতা অর্জ্জুনের উপর যে অর্থদণ্ড হইয়াছিল, তাহার দাবী করেন। গুরু তাহা না দেওয়ায় তাঁহাকে গোয়ালিয়ারের দুর্গে অর্দ্ধাশনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। দ্বাদশবর্ষ কাল গুরু হরগোবিন্দকে কারারুদ্ধ অবস্থায় থাকিতে হয়। কিরূপে গুরু কারামুক্ত হইলেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। কেহ বলেন, শিখদিগের ব্যাকুলতা দেখিয়া, কেহ বা বলেন, গুরুর অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। আবার কেহ বা বলেন, একজন মুসলমান সেনাপতির চেষ্টায় গুরু কারাগৃহ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। কিন্তু কারামুক্ত হওয়ার পরও, এমন কি, ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সময়ও গুরু মোগলসম্রাটের অধীনে সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সম্রাট্ সাজেহানের সময়েও গুরু হরগোবিন্দ সম্রাটের অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সম্রাটের জ্যেষ্ঠ

পুত্র দারা সেকো পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হইয়া লাহোরে আসিলেন। দারা বড় ফকীর-প্রিয় ছিলেন। গুরু হরগোবিন্দের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তাহাতে দিনকতক বেশ স্বচ্ছন্দে গেল; কিন্তু হরগোবিন্দের দিন স্বচ্ছন্দে যাইবার নহে—আবার নিম্নলিখিত নূতন উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল।

গুরু হরগোবিন্দের জন্য তুর্কীস্থান হইতে শিষ্য কর্ত্তৃক ক্রীত ঘোড়া কয়েকটি সম্রাটের লোক অপহরণ করে। সেই অপহৃত অশ্বের মধ্যে একটি অশ্ব লাহোরের কাজী উপহার প্রাপ্ত হয়েন। কাজীর নিকট হইতে সেই অশ্ব ক্রয় করিবার ছলনা করিয়া হরগোবিন্দের লোক তাহা গ্রহণ করে এবং মূল্য দেয় নাই। এই কার্য্যের অনুমোদন দ্বারা গুরু কাজীর মনে ক্ষোভ উৎপাদন করিয়াছিলেন। শিখেরা বলেন, ইতিমধ্যে একদিন কাজী গুরুর নিকট খাজানা তহশীল করিতে আইসেন। এই সময় সাধু বুদ্ধা (কেহ কেহ বলেন, বাবা বুড্ঢা) হরগোবিন্দের বহির্বাটীতে ছিলেন। অসন্তুষ্ট কাজী গুরু হরগোবিন্দকে গালি দেন। ইহাতে সাধু বুদ্ধা উল্টাইয়া কাজীকে শাপ দেন,—"গুরু তোমার কন্যাকেও গ্রহণ করিবেন, এবং খাজানার টাকাও দিবেন না।" এ দিকে কাজীর কন্যা কওলা বিবি গুরু হরগোবিন্দের জন্য ব্যাকুলা। তিনি পূর্ব্বজন্মে অপ্সরা ছিলেন, শাপভ্রষ্টা হইয়া যবনী হয়েন, এবং হরগোবিন্দ কর্ত্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ কথা ছিল। তিনি উদ্ধার করিবার জন্য গুরুকে এক পত্র লেখেন। গুরু বুড্ঢা-প্রদত্ত শাপের কথা রক্ষার নিমিত্ত *

* শিখদিগের মতে প্রকৃত শিখ বা শিষ্য দেড়জন হইয়াছিলেন। এক—গুরু অঙ্গদ, তিনি গুরুর অঙ্গের সঙ্গেই এক হইয়া গিয়াছিলেন। অপর অর্দ্ধেক শিষ্য এই বুদ্ধা বা বুড্ঢা। ইঁহাকে শিখ-সমাজ যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তি করেন।

কওলাকে গ্রহণ করেন। কন্যা যে অন্তঃপুর হইতে পলাইয়া গিয়া গুরুর নিকট আশ্রয় লইয়াছেন, কাজী তাহা জানিতে পারেন নাই। তিনি কিছুদিন পরে পুনরায় খাজানা আদায় করিতে আসিলে, হরগোবিন্দ সবিশেষ যত্ন সহকারে কাজীকে আহারাদি করান। অবশেষে কিছু মিষ্টান্ন হস্তে কওলাকে কাজীর নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহাতে কাজী লজ্জাবনত হইয়া পলায়ন করেন। যাহা হউক, এই সকল কারণে স্থানীয় মুসলমান প্রধান লোকেরা গুরুর এবং গুরু-অনুচরবর্গের উপর বিরূপ হইয়া উঠেন।

কওলা বিবিকে গুরু পত্নীরূপে গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু গুরুপত্নীগণ পুত্রবতী হওয়ায় কওলা বিবি পুত্রকামনা প্রকাশ করেন। গুরু নানক বলিয়াছিলেন,—"লেড়্কা নিশান"—সন্তান চিহ্নস্বরূপ। সেই চিহ্নস্বরূপ পদার্থ বা কওলা বিবির পুত্রকামনা নিবারণের জন্য গুরু তাঁহার নামে কওলেসর নামক সরোবর নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, এবং "কওলা বিবিকে গ্রহণ করা অন্যায় হইয়াছে" শিষ্যগণের মধ্যে এইরূপ কথা জন্মিয়াছে, বাবা বুড্ঢার মুখে জানিতে পারিয়া গুরু কওলা বিবির জন্য স্বতন্ত্র বাস-ভবন দেন, এবং বিবেকসর নামে একটি সরোবর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন।

এ দিকে মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হওয়াতে মুক্‌লিস খাঁ নামক একজন মুসলমান সেনাপতি সসৈন্যে অমৃতসহরের নিকট গুরুকে আক্রমণ করেন। হরগোবিন্দের শিষ্যগণ বা শিষ্য-সম্প্রদায় তখন আর নিতান্ত নিরীহ উপাসক সম্প্রদায় নহেন; রীতিমত সৈনিক দল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; রিপুদমন শিক্ষাদাতা গুরু হরগোবিন্দও সেনাপতির স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। যখন মুক্‌লিস খাঁ গুরু হরগোবিন্দকে আক্রমণ করেন, তখন গুরুর সৈন্য পাঁচ হাজার, আর মুক্‌লিসের সৈন্য সাত হাজার।

গুরু হরগোবিন্দের সাহস এবং সৈন্যগণের সুশিক্ষা ও একপ্রাণতাগুণে মুসলমানদিগকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে হইল।

অপর দিকে একজন শিখ সম্রাটের দুইটি অশ্ব চুরি করায়, লাহোরের প্রাদেশিক সেনাপতি হরগোবিন্দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন; কিন্তু তিনিও গুরুর নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন। যদিও গুরু এইরূপে মুসলমানদিগকে কয়েকবার পরাস্ত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি যে দিল্লীশ্বরের সমকক্ষ নহেন, ইহা তাঁহার বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। তিনি নিত্য নিত্য এরূপ অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত, এবং গুপ্তভাবে স্বদলের বলসঞ্চয়ের জন্য শতদ্রু নদীতীরস্থ ভাতিণ্ডার জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি যে স্থানে ছিলেন, উহাকে "গুরুকা কোট" বলে। উহা খাড়ুর হইতে সাত আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

গুরু হরগোবিন্দের অরণ্য-বাসকালে তথায় অনেক শিষ্য জুটিয়াছিল, এবং তথায় শিষ্যগণকে অস্ত্র-শিক্ষাদানেরও বিরতি ছিল না। কিছুদিন পরে গুরু পুনরায় যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হইয়া লোকালয়ে আসিয়া থাকিলেন। এই সময় হরগোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটি বাজ পক্ষী পয়েন্দা খাঁ নামক জনৈক মুসলমানের গৃহে উড়িয়া যায়। পয়েন্দা খাঁর মাতাই হরগোবিন্দের ধাত্রী ছিলেন; একারণ পয়েন্দা খাঁর সহিত গুরুর বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য ছিল। কিন্তু উক্ত বাজপক্ষী হরগোবিন্দ আনিতে পাঠাইলে পয়েন্দা খাঁ দেন নাই বলিয়া, গুরু বাল্যবন্ধুর বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করিলেন। রীতিমত যুদ্ধ হইল। রণক্ষেত্রে পয়েন্দা খাঁ হরগোবিন্দকে আঘাত করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিবামাত্র যুদ্ধকুশল হরগোবিন্দ বাল্যবন্ধুকে নিহত করেন।

১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গুরু হরগোবিন্দের মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব-গুরুগণের ন্যায় হরগোবিন্দের পাণ্ডিত্যের বা জ্ঞান-চর্চ্চার পরিচয়

পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু শিখগণ যে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে, ওয়াটারলুর যুদ্ধের সময় একজন ফরাসী সৈনিকের একটা হাত গোলার আঘাতে ভাঙ্গিয়া ঝুলিতে থাকে; সে লোকটা অপর হস্ত দিয়া নিজের ভাঙ্গা হাতটা কাটিয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ করে, এবং "সম্রাটের জয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে; নেপোলিয়ান বোনাপার্টির যুদ্ধকৌশলে অধীনস্থ সৈনিকেরা তাঁহার প্রতি এতটাই অনুরাগ-পরবশ হইয়াছিল। নেপোলিয়ানের সেণ্টহেলেনা বাসের হুকুম হইলে একজন উচ্চ পোলীয় আফিসর সামান্য পরিচারকের অবস্থাতেও সঙ্গে যাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিখের গুরুভক্তি আরও অনেক অধিক। সতী যেমন উন্মত্তা অথচ ধীরা হইয়া পতির অনুমৃতা হইতেন, গুরু হরগোবিন্দের মৃত্যুর পর সেইরূপ প্রথমে একজন রাজপুত শিখ, পরে একজন জাঠ শিখ হরগোবিন্দের চিতায় আরোহণ করিয়া গুরুর সহিত পরলোকগমন করেন। এই সময়ে আরও তুইজন শিখ চিতায় পড়িতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ভাবী গুরু হররায়ের নিষেধ-বাক্যে তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন। কি চমৎকার একপ্রাণতা! যোদ্ধাদিগের অন্তর সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিবার উপযুক্ত যোদ্ধৃ-সুলভ গুণ যে গুরু হরগোবিন্দের সম্পূর্ণরূপ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

গুরু হরগোবিন্দের তিন পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে পাঁচ পুত্র হয়। দামোদ্রির গর্ভে গুরুদিৎ, নানকীর গর্ভে অটলরায় এবং তেগ বাহাদুর এবং মর্দ্দানীর গর্ভে সূর্য্যমল ও অনিরায়। গুরু হরগোবিন্দের বর্ত্তমানেই জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুদিৎ হররায় নামে এক সন্তান রাখিয়া পরলোকগমন করেন। পিতৃহীন পৌত্র হররায়কে হরগোবিন্দ সবিশেষ স্নেহ ও যত্ন করিতেন, এবং তাঁহাকেই পরবর্ত্তী গুরু নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন।

বাবা অটল রায়ের সমাধি।

METCALFE PRESS.

(৭১ পৃঃ)
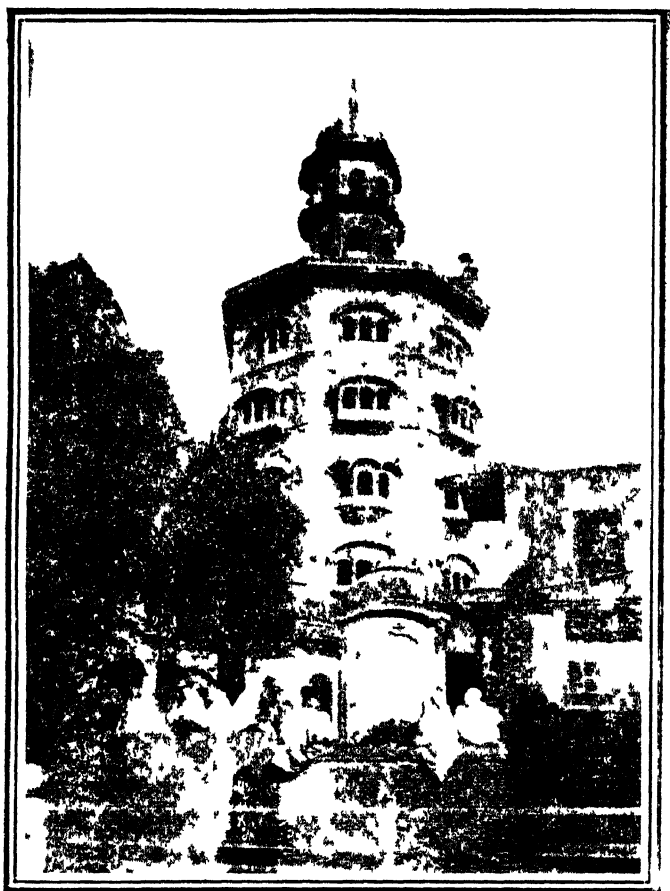
অটলরায় বাল্যকালে একদিন সমবয়স্ক শিশুদিগের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া পড়ে। সে সময় তাহাদের মধ্যে কথা হয়, পরদিন প্রাতে আবার খেলা হইবে এবং তাহাতে মোহন নামে এক স্বর্ণকারের পুত্রকে তিনি (অটলরায়) হারাইয়া দিবেন। দৈবাৎ সেই রাত্রিতে সর্পাঘাতে মোহনের মৃত্যু হয়। পরদিন অটলরায় ক্রীড়াভূমিতে গিয়া দেখিলেন, মোহন আইসে নাই। তখন তিনি অপর খেলুড়ীদের দ্বারা তাহাকে ডাকিতে পাঠাইয়া জানিতে পারিলেন যে, মোহন মারা গিয়াছে; তবে মৃতাবস্থায় তখনও বাড়ীতে রহিয়াছে এবং বাড়ীর সকলে রোদন করিতেছে। তখন অটল বলিলেন,—'সে মরে নাই, খেলায় হারিবার ভয়ে সে সেরূপ ছলনা করিয়া পড়িয়া আছে; চল, আমরা গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনি।' এই অবস্থায় গুরু হরগোবিন্দের পুত্র সদলে মোহনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, শোকার্ত্ত পরিবার কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, এবং অটল গিয়া মোহনের হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"কি রে ভাই! হারিবার ভয়ে এরূপ পড়িয়া আছিস্, আয়," বলিয়া তাহাকে লইয়া বালকেরা খেলিতে চলিয়া গেলেন। এই অশ্রুতপূর্ব্ব অচিন্তনীয় ঘটনায় সে দিন মোহনের বাড়ীতে কি হইল এবং সহরে কিরূপ ভাবে সে কথার আন্দোলন হইল, তাহা বর্ণনীয় নহে। কিন্তু এ কথা হরগোবিন্দের কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন,—"অটল যোগৈশ্বর্য্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা অনেক স্থলে দেখিয়াছি; কিন্তু এ কার্য্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধভাব হইল এবং এই মুসলমান রাজত্বে ইহাতে বড় বিষময় ফল ফলিবে," এইরূপ বলিয়া তিনি চিন্তায় গম্ভীর হইয়া রহিলেন। অটল প্রত্যহ প্রাতে পিতাকে প্রণাম করিয়া তবে অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। উক্ত ঘটনার পরদিন প্রাতে যখন অটল পিতাকে প্রণাম করিলেন, তখনও গুরু গম্ভীর হইয়া রহিলেন, এবং অটল

উহার কারণ জানিতে চেষ্টা করায়, হরগোবিন্দ বলিলেন,—'এক রাজ্যে দুই রাজা বা এক বনে দুই সিংহ থাকে না।' এই কথায় অটলরায় পিতার মনোভাব বুঝিয়া একান্ত মর্ম্মাহত হইলেন, এবং পিতার নিকট হইতে "কওলসর" অভিমুখে চলিয়া গেলেন। পরক্ষণেই জানা গেল, অটলরায় "কওলসরের" পরপারে গিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে সকলেই শোকার্ত্ত হইলেন। পরে, হরগোবিন্দ অটলের খুব উচ্চ সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং শিখদিগকে অমৃতসহরে ইহা অপেক্ষা উচ্চ সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিতে নিবারণ করিয়া গিয়াছেন। হরগোবিন্দ সেই সময়ে বলিয়াছিলেন যে, ঐ মন্দিরও অন্যান্য গুরুর সমাধি-মন্দিরের ন্যায় ভক্তের মানসিক পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে এবং অটলরায়কে গুরুগদির "কোতয়াল" বলিয়া জানিতে হইবে।

এই ঘটনায় মাতা নানকী অত্যন্ত দুঃখিতা ও শোকার্ত্তা হইয়াছিলেন। হরগোবিন্দ তাঁহার শোকমোচনের জন্য বলেন,—'তোমার এইরূপ আবার একটি সন্তান হইবে।' তাহার পর তেগ বাহাদুরের জন্ম হয়। যখন তেগ বাহাদুর অল্পবয়সেই সংসারে ঔদাস্যভাব দেখাইতে থাকেন, তখন উঁহার মাতা নানকীর দুঃখ-মোচনের জন্য বলিয়াছিলেন,—'তেগ বাহাদুর মহৎ কর্ম্ম করিবেন এবং ইঁহার ঔরসে যে সন্তান জন্মিবে—তাহা হইতে আমাদের এই গুরুগদি আরও উজ্জ্বল হইবে।' আমাদের গুরুগোবিন্দই তেগ বাহাদুরের সেই ঔরসজাত পুত্র। ইহার পর হররায়কে গুরুপদ দেওয়ায় নানকী বিশেষ দুঃখিতা হইলে হরগোবিন্দ পুনরায় বলেন,—'তোমার পুত্র তেগ বাহাদুরই ভবিষ্যতে গুরুপদ প্রাপ্ত হইবেন।' এই কথা বলিয়া তেগ বাহাদুর প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাঁহাকে দিবার জন্য নিজ তরবারি প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

শিখ-সম্প্রদায়ের রাজস ভাব।

সপ্তম গুরু—হররায়।

"অর্জ্জুন উবাচ। অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥"

"শ্রীভগবানুবাচ। কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।"

গীতা, ৩য় অঃ।

গুরু হরগোবিন্দের পৌত্র হররায় গুরুপদে আসীন হইয়া কর্ত্তারপুরে গদি স্থাপন করিলেন। তিনি শান্তস্বভাব ও কুশলপ্রিয় ছিলেন; কিন্তু কালের গতিতে তখন তাঁহাকে শান্ত থাকিতে দিল না। তখন শিখসম্প্রদায় যুদ্ধ-বিগ্রহে মিশিব না বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। সেই রাজস ভাবের সময়ে যেন কি বলে আকৃষ্ট হইয়া উঁহাকে সমরাঙ্গনে অবতরণ করিতে হইল। কুলহর-রাজের দমনার্থ দিল্লী হইতে সম্রাটের সৈন্য প্রেরিত হয়। গুরু হর-রায় সেই সৈন্যদলের সহিত যোগ দিয়া

গুরু হররায়।

অম্বালার উত্তরাংশে অধিনায়কত্ব করেন। এই সময়ে সম্রাট্ সাজাহানের পুত্রগণের মধ্যে সাম্রাজ্যলাভার্থ ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। সম্রাটের

জ্যেষ্ঠপুত্র দারা সেকোর সহিত গুরু হররায়ের বন্ধুত্ব ছিল। তৃতীয় পুত্র আরঙ্গজেব যখন দারাকে আক্রমণ করেন, তখন গুরু হররায় দারাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। আরঙ্গজেব দারাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া, গুরু হররায় কেন দারাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার কারণ প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। গুরু স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া মিনতি পূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিলেন, এবং সেই পত্র নিজ পুত্র রামরায় দ্বারা সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্ গুরুর পত্র পাঠ করিয়া তুষ্ট হইলেন, এবং তিনি যে বৈরাগ্যবান্ ফকীর, ইহাতে সম্রাটের বিশ্বাস হইল। রামরায়ের দিল্লীতে অবস্থানকালে গুরু হররায় ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে কর্ত্তারপুরে দেহ ত্যাগ করেন।

অষ্টম অধ্যায়।
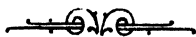
মহাপুরুষ-জন্মের সংখ্যা-পূরণ।

অষ্টম গুরু—হরকিষণ।

কংসবধের নিমিত্ত কথা হয় যে, দেবকী দেবীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান হইলে কংস-বধ হইবে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বর্ণিত সময়ে অন্যায় অত্যাচার এমন প্রবলভাবে চলিতেছিল যে, যেন তদ্রূপ কোন নৈসর্গিক বল না আসিলে আর চলে না। দেবকী-গর্ভজাত সন্তানগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে কেবল সংখ্যা পূরণ করিবার নিমিত্তই যেন দেবকীর এক একটি শৃঙ্খল কাটিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। মহাপুরুষ গুরুগোবিন্দের জন্মের কিছু পূর্ব্বে হরকিষণের আবির্ভাবও সেইরূপ সংখ্যা-পূরণ-মাত্রের জন্য বলিয়া মনে হয়।

সপ্তম গুরু হররায়ের দুই পুত্র;—জ্যেষ্ঠ রামরায় ও কনিষ্ঠ হরকিষণ। হররায়ের লোকান্তরের সময় হরকিষণের বয়স ছয় বৎসর মাত্র। রামরায় গুরু না হইয়া হরকিষণই গুরু হইবে, হররায় কখন কখন এ কথা বলিতেন বটে; কিন্তু সেটা কথার কথা মাত্রই ছিল; পাঁচটি পয়সা ও নারিকেল সমক্ষে রাখিয়া যেরূপ পরবর্ত্তী গুরু নির্ব্বাচন করিয়া রাখা হইত, সেরূপ করা হয় নাই। আবার গুরু রামরায়

গুরু হরকিষণ।

পিতার জন্য দরবার করিতে দিল্লীতে প্রেরিত—বয়সে গুরু-গদির

উপযুক্ত; হরকিষণ ছয় বৎসরের শিশু। এ স্থলে রামরায় গুরুপদ প্রাপ্ত না হইয়া হরকিষণ পায় কিরূপে?

ঐতিহাসিকেরা বলেন, রামরায় গুরু হরগোবিন্দের দাসীর গর্ভজাত পুত্র; সেই হেতু তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য গুরু প্রতিকূল সম্রাটের দরবারে পাঠাইয়াছিলেন। শিখেরা বলেন, রামরায় দাসী-পুত্র নহেন। হররায়ের আট মহিষী ছিল, রামরায় তাহাদেরই একজনের গর্ভজাত; কিন্তু রামরায় পিতার সম্পূর্ণরূপে বাধ্য ছিলেন না; এতদ্ব্যতীত তিনি দিল্লীতে গিয়া একটি অন্যায় কার্য্য করেন। সেখানে যখন শাস্ত্রীয় অনেক আলোচনা হয়, তখন নানকের নিম্নলিখিত পদটি ভয় প্রযুক্ত উল্টাইয়া দেন :—

"মিট্টি মুসলমান কি পেঁড়ে পৈই কুমিয়ার।
গঢ় ভাঁড়ে, ইঁটা কিয়া জলতি করে পুকার॥"

অর্থাৎ মুসলমানের দেহও মাটী হয়, তৎপরে কুমারের হস্তে পড়িয়া ভাঁড়, ইট ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়। ইহার অর্থ এই যে, মৃতদেহ কাহারও রক্ষার চেষ্টা করা বিফল; মুসলমানেরা মৃতদেহ দাহ করেন না, রক্ষা করেন; কিন্তু তাহা সযত্নে রক্ষিত হইলেও পরিশেষে মাটীতেই পরিণত হয়।

দিল্লীতে এই পদটির অর্থ করিতে বলিলে, গুরুপুত্র রামরায় ভয়ে "মিট্টি মুসলমান কি" স্থলে "মিট্টি বেইমান কি" পাঠ বলিয়াছিলেন। 'ভয়ে" প্রথম গুরুর পাঠ উল্টাইয়াছেন শুনিয়া গুরু হররায় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্রমধ্যে গণ্য করেন। শিখ-গুরু হইতে গেলে গুরুর কিরূপ আজ্ঞাবহ হইতে হয়, তাহা গুরু অঙ্গদ প্রভৃতির প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। এক্ষণে রামরায় তেমন আজ্ঞাবহ ছিলেন না বলিয়া, গুরু হররায় তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবং সেই নিমিত্তই তাঁহাকে গুরুপদ দেন

নাই। শিখগণ হরকিষণকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন সত্য; কিন্তু রামরায় দিল্লীতে থাকিয়া এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিলেন। নির্ব্বাচনের ভার মোগল সম্রাটের উপর ন্যস্ত হইল। কেহ কেহ বলেন যে, গুরু হরকিষণ ম্লেচ্ছ সম্রাট্ দর্শন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় জয়পুর-রাজের উপর নির্ব্বাচন-ভার ন্যস্ত হয়। যাঁহারা জয়পুর-রাজের কথা বলেন, তাঁহারাও বাকী ঘটনাটি একই প্রকার বলেন, কেবল সম্রাট্ স্থলে রাজা বলেন মাত্র। যাহা হউক, সম্রাট্ হরকিষণকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলে, সেই শিশুকে দেখিয়া আরঙ্গজেবের মায়া জন্মে, এবং শিশুর বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া, পাট-রাণীর সহিত সম-বেশে সজ্জিতা-প্রায় দুইশত মহিলার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া পাটরাণীকে বাহির করিয়া দিতে বলেন। শিশু হরকিষণ সহজে পাটরাণীকে বাহির করিয়া দিলে সম্রাট্ শিশুকে আদর করেন, এবং তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। হরকিষণ গুরুপদ প্রাপ্ত হইবার পরই দিল্লীতে বসন্ত রোগে মারা যান। তিনি মোটে তিন বৎসর গুরুগদি অধিকার করিয়াছিলেন। শিখেরা বলেন যে, হরকিষণ কোন রোগে মরেন নাই; বিপক্ষ পক্ষ, সম্রাটের লোকে, তাঁহাকে নিহত করিয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা গুরু নানকের সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত গল্পটি বলেন। সম্রাট্ বাবরের সহিত গুরু নানকের সাক্ষাৎ হইলে গুরু নানক তাঁহাকে সম্রাট্ হইবার বর প্রদান করেন। ইহাতে নানকের কোন শিষ্য বলেন যে, ম্লেচ্ছকে বাদসাই দেওয়ায় হিন্দুর বড় কষ্ট হইবে। তাহাতে গুরু বলেন যে, সাত পুরুষ সাম্রাজ্য করিয়া, অবশেষে উঁহাদের মধ্যে যখন অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে, এবং সাতজন পরম সাধুর হত্যা হইবে, তখন তাহাদের পতন হইবে। তদনুসারে বাবরের বংশধরগণ প্রবল-প্রতাপে সাত পুরুষ ধরিয়া সাম্রাজ্য শাসন করার পর মোগল সাম্রাজ্যের

পতন হইয়াছে, এবং (১) পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন, (২) অষ্টম গুরু হরকিষণ, (৩) নবম গুরু তেগ বাহাদুর, (৪-৭) গুরুগোবিন্দের চারিটি পুত্র এই সাতজন নিহত হইয়াছিলেন। তাহার পর মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বংসের মুখে পড়ে।

হরকিষণ মৃত্যুশয্যায় পাঁচটি পয়সা ও একটি নারিকেল আনাইয়া শিখদিগকে বলেন যে, ভবিষ্য গুরু বিয়ানদী তীরবর্ত্তী গোবিন্দওয়ালের সন্নিকট বাকালা গ্রামে বাস করিতেছেন।—দেখা গেল, সে সময় অন্যান্য গুরুবংশীয় ব্যক্তিগণের সহিত ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের পুত্র তেগ বাহাদুর তথায় বাস করিতেছেন। যাহা হউক, অনেক চেষ্টায় তেগ বাহাদুরই নবম গুরু হইতে স্বীকৃত হইলেন। ইনি যে নিশ্চয়ই গুরু হইবেন, সে বিষয়ে পিতার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সে কথার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা গিয়াছে।

নবম অধ্যায়।

মহাপুরুষ আগমনের পূর্ব্বাভাস।

নবম গুরু—তেগ বাহাদুর।

অষ্টম গুরু হরকিষণ যখন দিল্লীতে কলেবর পরিত্যাগ করেন, হরগোবিন্দের পুত্র তেগ বাহাদুর তখন বাকালায় বাস করিতেছিলেন। তেগ বাহাদুর বাকালায় আসিয়া স্থির হইয়া বসিবার পূর্ব্বে তীর্থাদি দর্শন উপলক্ষে পূর্ব্বাঞ্চলে কামাখ্যা, পাটনা প্রভৃতি স্থান দেখিয়া গিয়াছিলেন। গুরু হরকিষণের ইঙ্গিতে অনেকেই তেগ বাহাদুরকে নবম গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলেও দিল্লীস্থ গুরু রামরায় যে হরকিষণের পর আবার একবার গুরুপদ লাভের নিমিত্ত সচেষ্ট হইবেন,

গুরু তেগ বাহাদুর

ইহা আর বিচিত্র কি? এতদ্ব্যতীত তখন বাকালায় গুরুবংশীয় যে দ্বাবিংশ জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও গুরুপদের দাবী করিলেন। শিখদিগের মধ্যে কেহ কেহ রামরায়ের পক্ষও সমর্থন করিল। কেহ কেহ বা দ্বাবিংশ জনের মধ্যে যে কোন একজনকে নির্ব্বাচন করিতে চাহিলেন। কিন্তু গুরু হরগোবিন্দের শিষ্য দিল্লীস্থ মাখন সাহা তেগ বাহাদুরকেই প্রকৃত শিখগুরু মনে করিয়া তাঁহার পক্ষ

প্রবল করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি নবম গুরুকে একতোড়া মুদ্রা প্রণামী দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, কে প্রকৃত গুরু, ইহা স্থির করিবার জন্য উক্ত তোড়া হইতে একটি মুদ্রা সর্ব্বপ্রথমে প্রণামী দিয়া বলেন যে, ইহাতে কত মুদ্রা আছে, ইহা যিনি স্থির করিতে পারিবেন, তিনি প্রকৃত শিখগুরু হইবেন। এইরূপে ভাগ্য-পরীক্ষার খেলায় তেগ বাহাদুর ঠিক সংখ্যা (৫২৪৲ টাকা) বলিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, হরকিষণের মৃত্যুর সময় মাখন সাহার জলযান জলমগ্ন হইবার উপক্রমের সময় তিনি গুরুকে ৫০০৲ শত টাকা মানসিক করেন। এক্ষণে যিনি প্রকৃত গুরু হইবেন, তিনি প্রণামী এক টাকা প্রাপ্ত হওয়ার পর এই টাকা চাহিয়া লইবেন, মনে ইহা স্থির করিয়া প্রত্যেক গুরুকে ১৲ এক টাকা করিয়া দিয়া প্রণাম করিতে থাকেন। তখন তেগ বাহাদুর মগ্নপ্রায় তরির কথা উল্লেখ করিয়া মানসিকের কথা জিজ্ঞাসা করেন। যাহা হউক, মাখন সাহা তখন তাঁহাকেই প্রকৃত গুরু স্থির করিয়া সমুদয় অর্থগুলি প্রদান করিলেন। তেগ বাহাদুর প্রথমে এই টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন নাই। বলিয়াছিলেন, "উহা রাজার যোগ্য, রাজাকে উহা দাও।" এই বাক্যে আবার শিখ-গুরুর যেন অর্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বতন উদাসীনের ভাব ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, মাখন সাহার অনুরোধে এবং মাতার অনুমতিক্রমে তিনি সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তেগ বাহাদুর গুরু-গদিতে বসিলে তাঁহার পিতৃদত্ত অস্ত্র তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি আপনাকে উক্ত অস্ত্র-ধারণে অযোগ্য বলিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "আমি তেগ বাহাদুর, (ভাতের হাঁড়ির নায়ক) অর্থাৎ দরিদ্র ভিক্ষুকের অন্নদাতা,—তেগবাহাদুর (অস্ত্রধারী) নহি।"

উক্ত প্রকার বিনয়-নম্র ও ঔদাস্যব্যঞ্জক বাক্যে তেগ বাহাদুর সত্বরেই

শিষ্যবর্গের ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন। লোকে তাঁহাকে গুরু হরগোবিন্দ অপেক্ষাও বড় গুরু বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল। কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে কতকটা ঔদাস্যভাব দেখাইলেও পূর্ব্ব গুরু কয়েকজন যেমন ধূমধামে চলিতেন, তেগ বাহাদুর, সেইরূপেই চলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ দেখা গিয়াছে, তাহাতে ঔদাস্য ও তেজস্বিতা এই উভয়ের সামঞ্জস্যভাব অথবা যুধিষ্ঠির-ভাব ও ভীমভাব এতদুভয়ের সামঞ্জস্য-বিধায়ক অর্জ্জুন-ভাবের এইবার প্রবর্ত্তন হইতে চলিল। ইহার পূর্ণ বিকাশ গুরু গোবিন্দে দেখা যাইবে,—তথায় শাস্ত্র ও শস্ত্র উভয়েরই সমান প্রভাব। তেগ বাহাদুরের অধীনে সহস্র অশ্বারোহী নিয়মিত রক্ষিত হইত।

ক্রমে গুরু তেগ বাহাদুর কর্ত্তারপুরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া রামরায় প্রতিহিংসাবৃত্তি-সাধনার্থ সম্রাট্‌কে জানাইলেন যে, গুরু তেগ বাহাদুর সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তখন সম্রাটের আজ্ঞায় সপরিবার গুরু তেগ বাহাদুর দিল্লীতে বন্দিভাবে আনীত এবং তত্রস্থ জয়পুর-রাজের প্রাসাদে রক্ষিত হইলেন। জয়পুর-রাজ জয়সিংহ গুরুর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তিনি কিছুদিন পরে সম্রাট্‌কে জানাইলেন যে, গুরু তেগ বাহাদুর প্রকৃতই ফকীর (সন্ন্যাসী); রাজ্যাধিকার প্রভৃতির লালসা তাঁহার নাই; তিনি নির্জ্জন স্থানে থাকিতে বা তীর্থভ্রমণে যাইতে ইচ্ছুক। সম্রাট্‌কে এই সকল কথা জ্ঞাপন করিয়া রাজা জয়সিংহ বাঙ্গালা অঞ্চলে যাত্রা করিলেন। প্রায় সেই সময়েই সপরিবার গুরু তেগ বাহাদুরও পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করেন। পাটনা সহরটি গুরু তেগ বাহাদুরের একটি প্রিয় স্থান। তিনি বাঙ্গালা অঞ্চলে আগমন করিয়া পাটনায় অবস্থান করিতে লাগিলেন; তথায় পাঁচ ছয় বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি শিখভূমি পঞ্জাব ত্যাগ করিয়াও শিখের মঙ্গল-কার্য্যেই রত ছিলেন; পাটনায়

আসিয়া শিখদিগের নিমিত্ত একটি উচ্চ বিদ্যালয় (কলেজ) স্থাপন করেন।

পাটনায় অবস্থানকালে গুরু তেগ বাহাদুর পাঠে ও ধ্যানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। শাস্ত্র-পাঠের জন্য পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এই সময়ে আসাম জয় করিবার জন্য দিল্লীশ্বরের একদল সেনা আসামে প্রেরিত হয়। শিখদিগের পুস্তকে লিখিত আছে, জয়পুর-রাজপুত্র জয়সিংহ এই সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, গুরু তেগ বাহাদুর পাটনা হইতে সেই সৈন্যদলের সঙ্গে আসাম গমন করিয়াছিলেন, এবং আসাম-রাজ সম্রাটের প্রাধান্য স্বীকার করিলে, তাঁহাকে শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আইসেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গুরু তেগ বাহাদুর পাটনায় অবস্থানকালে মিথিলাস্থ ব্রাহ্মণদিগের নিকট তন্ত্র-শাস্ত্রের মাহাত্ম্য বুঝিয়া, আসামে কামাখ্যা-দর্শন উদ্দেশ্যে উক্ত সৈন্যগণের সহিত আসামে গিয়াছিলেন। এতৎ-সম্বন্ধে সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া কঠিন,—প্রকৃত তান্ত্রিক সাধকদিগের মর্ম্ম কে বলিতে পারে? তবে, তাঁহার ভবিষ্য জীবনে নির্ভীকতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি দেখিয়া কামাখ্যাসিদ্ধ হইয়া আসার প্রবাদ সত্য বলিয়া মনে হয়।

গুরু তেগ বাহাদুর আসাম হইতে পাটনায় প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিবস পরে পুনরায় পঞ্জাবস্থ আনন্দপুরে গমন করেন, এবং কুলহর-রাজের নিকট হইতে ৫০০৲ শত টাকা দিয়া দেবীমাধো নামক স্থানটি ক্রয় করিয়া তথায় শতদ্রু (সটলেজ) নদীতীরে মাখোয়াল নামক নগর সংস্থাপন করেন। ইহারই নাম পরে আনন্দপুর রাখা হয়।

মুসলমান ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে, বাঙ্গালার কোন একজন 'উদাসী' বা সন্ন্যাসীর নিকট শিক্ষা পাইয়া তেগ বাহাদুর নিতান্ত দুর্বৃত্ত বা ডাকাত হইয়া উঠেন এবং আদম হাফিজ নামক জনৈক পাগল মুসলমানের

সহিত যোগ দিয়া গুপ্ত সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময়ে হিন্দুদ্বেষী সর্ব্ববাদি-সম্মত-অত্যাচারী সম্রাট্ আরঙ্গজেবের পাশব শক্তিতে ভারত-শাসন আরম্ভ হইয়াছে। মহাত্মা আকবরের উদারতা এবং মহানুভবতা ক্রমে লোকে ভুলিয়া আসিতেছে। হিন্দু দেবমন্দিরে দমাদম আঘাতে হিন্দুর হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, ওরূপ সময়ে শিখ-গুরুর উপর লোকে যে নানাপ্রকার কথা বলিতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলেন, উক্ত প্রকার ডাকাতী এবং গুপ্ত সভাদি করায় আদম হাফিজ সম্রাটের আজ্ঞানুসারে সাম্রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হয়েন, এবং গুরু তেগ বাহাদুর দিল্লীতে আহূত হয়েন। কিন্তু গুরু তেগ বাহাদুরের বাণীসমূহ পাঠ করিলে, তাঁহাকে একজন ভগবদ্ভক্ত মাত্র বলিয়া বোধ হয়,—তিনি দুর্বৃত্ত ছিলেন বলিয়া কোন অংশেই বোধ হয় না। তাঁহার অনেক বাণী গুরুগ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত আছে। অন্যান্য গুরুর ন্যায় তাঁহার বাণীও নানকের ভণিতা-যুক্ত। তিনি মধ্যে মধ্যে বলিতেন ঃ—

"ভৈ নাশন দুরমতি হরণ কলমে হরিকা নাম।
নিশ দিন জো নানক ভজে সফল হোহি তিহ কাম॥"

অর্থাৎ হরির নাম কলিকালে ভয়নাশকারী ও দুর্ম্মতি হরণকারী। নানক বলিতেছেন, দিবারাত্র যে উহা ভজনা করে, তাহার কামনা সফল হয়।

নারদীয় পুরাণ হইতে শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন ঃ—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

গুরু তেগ বাহাদুর দিল্লীতে গমন করিলে, তাঁহাকে বিলক্ষণ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। তথায় তাঁহাকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার

জন্ম আরঙ্গজেব সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না। অবশেষে তিনি যে হিন্দুদিগের গুরু, সেই হিন্দুত্বের কিছু কেরামত (লীলা) দেখাইতে বলিলেন—গুহ্য বিষয় বা গোপ্য বা গুরু-প্রদত্ত মন্ত্র প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পীড়ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে গুরু বলিলেন, "সকল বিবরণ আমার গলদেশে আছে।" তখন সম্রাটের কঠোর আজ্ঞানুসারে দিল্লীর প্রকাশ্য বাজারে গুরু তেগ বাহাদুরের শিরশ্ছেদ করা হইল। তখন দেখা গেল, গুরুর গলদেশে একখানি কাগজ বাঁধা রহিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে,—"শির দিয়া সারা না দিয়া" মস্তক দিলাম; কিন্তু গোপ্য বা গুরু-মন্ত্র দিলাম না। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে এই ভীষণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। গুরু তেগ বাহাদুর ত্রয়োদশ বৎসরকাল গুরুগিরি করিয়াছিলেন।

গুরু তেগ বাহাদুরের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সেই দেহ আনন্দপুরে লইয়া গিয়া সৎকার করা হয়। গুরু তেগ বাহাদুর হইতে গুরুগণ ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণ দিতেও প্রস্তুত দেখিয়া "সাচা বাদ্‌সা" (অর্থাৎ খাঁটী সম্রাট্‌) নামে অভিহিত হইয়াছেন।

গুরু তেগ বাহাদুরের কথা বলিতে বলিতে অনেক কথা বলিতে বাসনা হয়। স্বধর্ম্ম-রক্ষার নিমিত্ত এমন নির্ভীক, এমন ভগবানে—নির্ভর ভাব দেখাইয়া কয়জন শির দিয়াছেন? যাহা হউক, অন্যান্য গুরুর ন্যায় আপাততঃ সংক্ষেপে গুরু তেগ বাহাদুরের কথা কিছু বলা গেল; গুরুগোবিন্দের বিষয় বর্ণনার সময় প্রসঙ্গক্রমে তেগ বাহাদুরের কথা আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল।

———

দশম অধ্যায়।

দশম গুরু—গোবিন্দ সিং।

পাটনাপর্ব্ব।

প্রথম পর্ব্বাধ্যায়।

জন্মকথা।

গুরুগোবিন্দের কথা বলিতে বসিয়া মুখবন্ধ ভাবেই অনেক কথা বলা হইয়া গেল, তথাপি সে সকল সংক্ষেপেই উক্ত হইয়াছে বলিলেও চলে। তবে আমাদের যে উদ্দেশ্য,—গুরুগোবিন্দ গুরুগণের মধ্যে প্রকৃত কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছেন—তাহা বুঝিবার পক্ষে বোধ হয়, এখন সুবিধা হইবে। পূর্ব্বেই আভাস দেওয়া গিয়াছে, পাণ্ডবের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের যে স্থান, শিখ-গুরুগণের মধ্যে গুরু নানকের সেই স্থান; আর ভীমের স্থান গুরু হরগোবিন্দ লইয়াছেন। অতঃপর দেখা যাইবে যে, গুরুগোবিন্দ সিং অর্জ্জুনের স্থান লইয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের সাত্ত্বিক বা ধর্ম্মভাবে শাস্ত্র-প্রিয়তা, এবং ভীমের রাজস-ভাবে শস্ত্রপ্রিয়তা—অর্জ্জুনে এই উভয়ই আছে। তদ্রূপ গোবিন্দ সিংহে উক্ত উভয়বিধ ভাবই পরিস্ফুট ভাবে দেখা যাইবে। আবার পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুনের স্থান সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, "বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।" আমি

বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবগণের, মধ্যে ধনঞ্জয়। তা'ই আমরা বলি, শিখ গুরুগণের মধ্যে গুরুগোবিন্দই গোবিন্দ। যে সময় দুর্য্যোধনাদির ন্যায় অসুর-বৃত্তি-সম্পন্ন লোকের জন্ম হইয়াছিল, পৃথিবী উৎপীড়িতা হইয়াছিলেন,—সেই সময়ে পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়েরও জন্ম হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, সেই সেই সময়ে আমি আবির্ভূত হই।

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক বাবু রজনীকান্ত গুপ্তের ভাষায় বলিঃ—

"খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর অধিকাংশ অতীত হইয়াছে। ভারতে মোগল-রাজ্যের পূর্ণ বিকাশ দেখা যাইতেছে। আক্‌বরের উদারতা, আক্‌বরের সমবেদনার চিহ্ন বিলুপ্ত হইলেও উহা লোকের স্মৃতিতে মুহুর্মুহুঃ জাগিয়া উঠিতেছে। শাজাহানের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া লোকে অশ্রুপাত করিতেছে। দুরন্ত আওরঙ্গজেব পাশব-শক্তিতে ভারতভূমির শাসনে উদ্যত হইয়াছে। পশ্চিমদক্ষিণদিকে পরাক্রান্ত রাজসিংহ সেই শক্তির গতিরোধে উদ্যত হইয়াছেন, দক্ষিণে প্রাতঃস্মরণীয় শিবাজী হিন্দু আর্য্যের গৌরব রক্ষার জন্য অলৌকিক বীরত্ব-মহিমার পরিচয় দিতেছেন, আর উত্তরে একটি তরুণবয়স্ক যুবক ঐ শক্তির মূলে আঘাত করিবার জন্য দুর্গম গিরি-কন্দরে যোগাসনে সমাসীন হইয়া ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে গভীর তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।"

এই তাপস যুবক আমাদের গুরুগোবিন্দ সিং। মহানুভব আক্‌বরের সময়ে ইনি জন্মেন নাই; নিদারুণ নিষ্ঠুর আরঙ্গজেবের পাশব-

গুরুগোবিন্দ সিংহ :- পাটনাপর্ব্ব।
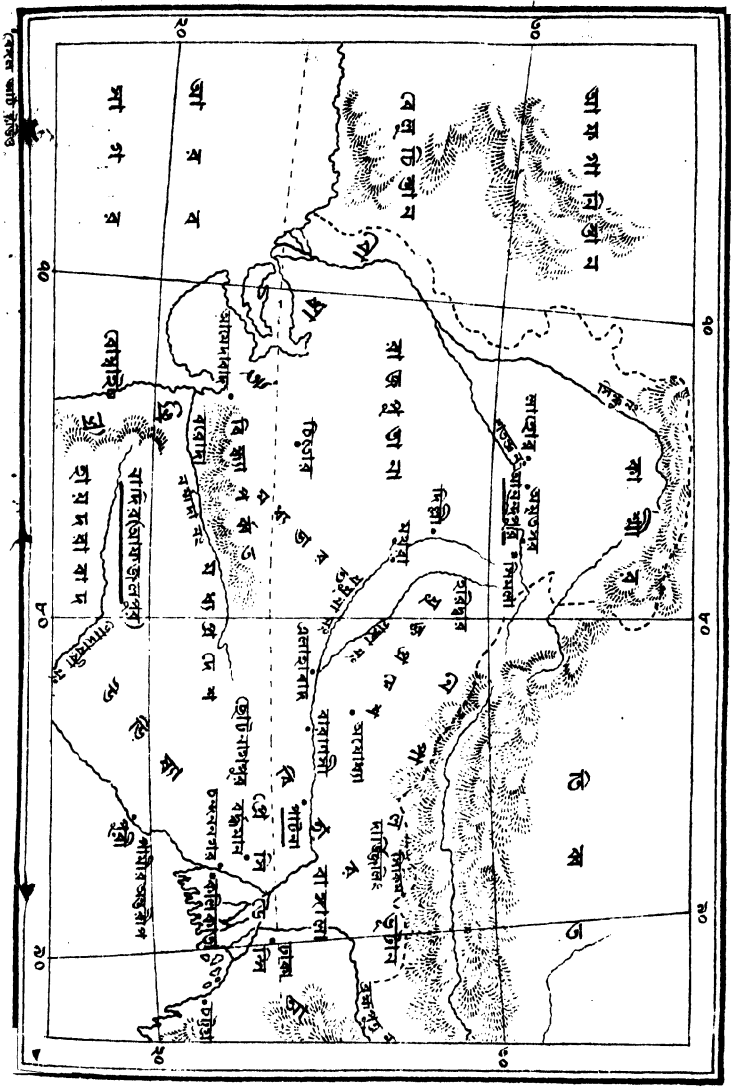
শক্তিবলে রাজ্য-সঞ্চালনই ইঁহার জন্মের অন্যতর কারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি না জন্মিলে কি হইত?—

"মলেচ্ছু পরক্ক যাতে, হিন্দুয়া ধসক যাতে,
ধরম করম গরথ যাতে, বেদন পুরাণ কি।
কলমা রটতে যাতে, গায়ত্রী ত্যজৎ যাতে,
দেহোরা ডহট্ যাতে, মতন্ কোরাণ কি॥
কবুরা বনৎ যাতে, তীরথা সরক্ যাতে,
সুন্নৎ করৎ যাতে, নিন্দৎ পুরাণ কি।
শ্রীগোবিন্দ সিং, সুরমা পূর্ণ ব্রহ্মমূর্ত্তি,
নাহোতা যোপে, বিষ্ণু ভগবান্ কি॥"

অর্থাৎ ম্লেচ্ছত্ব পরিপক্ক হইত, হিন্দুত্ব বিধ্বস্ত হইয়া যাইত, বেদ-পুরাণ-সম্মত ধর্ম্মকর্ম্ম গভীর গর্ত্তে যাইত; কলমা রটিয়া যাইত, গায়ত্রী ত্যক্ত হইত, কোরাণের মতানুসারে দেবমন্দির চূর্ণ হইত; কবর বনিয়া যাইত, তীর্থ সরিয়া যাইত, পুরাণ-নিন্দিত—(অর্থাৎ হিন্দুর অসম্মত) সুন্নৎ করা হইত;—যদি ভগবান্ পূর্ণ ব্রহ্মমূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দ সিং না জন্মাইতেন। তাহা হইলে ঐ সকলই হইত।

উক্ত পদটিতে আরঙ্গজেবের সময়ের যে সকল অত্যাচার বর্ণিত আছে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য সে সময় একজন মহা-পুরুষের আবশ্যক হইয়াছিল—এবং শ্রীগুরুগোবিন্দ সিং সেই মহাপুরুষ, ইহাই সূচিত হইতেছে।

গুরুগোবিন্দ সিংহের জীবনীর আরম্ভে অনেক কথা মনে হইতেছে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখা গিয়াছে যে, গুরু তেগ বাহাদুর সত্যপালনের জন্য (অর্থাৎ যে ধর্ম্মে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, তাহার পালন জন্য) প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন; তাঁহারই পুত্র গুরুগোবিন্দ সিং। আর মহারাজ দশরথ জানিতেন যে, সত্য-পালনে রামের বিচ্ছেদ হইবে—রামের বিচ্ছেদ-

যন্ত্রণা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও দশরথ সত্য হইতে বিচলিত হয়েন নাই; সেই দশরথের পুত্র ভগবান্ রামচন্দ্র।

আর এক কথা, যে সময় কংস-কারাগারে বসুদেব-দেবকী আবদ্ধ, সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর যে সময় আরঙ্গজেবের অত্যাচারে তীর্থ-যাত্রা উপলক্ষে জয়পুর-মহারাজের সঙ্গে পূর্ব্বাঞ্চলে আসিয়া গুরু তেগ বাহাদুর পাটনায় বাস করিতেছেন, সেই সময় ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে পৌষ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ধনিষ্ঠা-নক্ষত্রে রাত্রির শেষ প্রহরে মহাপুরুষ শ্রীগুরুগোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়।

গোবিন্দের যখন জন্ম হয়, তখন অস্মদ্দেশের একটি আনন্দের সময়। ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ হইয়া আইসে। লোকে কথায় বলে "কাহার সর্ব্বনাশ, কাহার পৌষ মাস।"—"এস পৌষ যেও না; জন্ম জন্ম ছেড় না।" ইত্যাদি। সেই আনন্দ-দায়ক, আশাপ্রদ পৌষ মাসে গুরু গোবিন্দের জন্ম হয়। ভাগীরথী-তীরস্থ পাটনা নগরীর যে স্থানে গুরু গোবিন্দের জন্ম হইয়াছিল, সেখানে এখন "হর-মন্দির" বর্ত্তমান আছে। তথায় একখণ্ড "গ্রন্থসাহেবে" গুরুগোবিন্দ সিংহের স্বহস্তে তীরের ফলা দ্বারা লিখিত একটু অংশ আছে; তাঁহার বাল্যকালের ব্যবহৃত দোলা এবং ক্ষুদ্র খড়ম আছে; এবং এক দিকে অষ্টভুজা মূর্ত্তি এবং অপরদিকে মহাবীর হনূমানের মূর্ত্তি অঙ্কিত বিশাল তরবারি এবং পটে মূর্ত্তি তাঁহার চিহ্নস্বরূপ তাঁহারই সূতিকা-গৃহকে মন্দিরে পরিবর্ত্তিত করিয়া সুরচিত আছে। এই মন্দির পাটনার মহাপীঠ শ্রীশ্রীছোট পটন দেবীর মন্দিরের অনতিদূরবর্ত্তী। গোবিন্দের মাতার নাম—গুজরী।

"গ্রন্থের" যে অংশ পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা "আদিগ্রন্থ" বলিয়া পরিচিত। আর শেষ ভাগ অর্থাৎ যে অংশ

গুরুগোবিন্দ লিখিয়াছিলেন, তাহাকে "দশম বাদসা কা গ্রন্থ" বলা হয়। কেবল "গ্রন্থ" বা "গ্রন্থ সাহেব" বলিলে সমগ্র গুরু গ্রন্থ বুঝায়। "দশম বাদসা কা গ্রন্থের" এক অংশের নাম "বিচিত্র নাটক।"—উহাতে গুরুগোবিন্দ নিজ সম্বন্ধে (সংক্ষেপে) স্বয়ং লিখিয়াছেন ঃ—

"মোরপিত পূরব কিয়া পয়ানা।
ভাঁত ভাঁতকে তীরথ নানা॥
যব হিঁযাত ত্রিবেণী ভয়ে।
পুণ্যদান দীন করত বিতায়ে॥
তহি প্রকাশ হামারা ভয়ো।
পাটনা সহর বিথে ভয়োলয়ো॥
মদ্রদেশ হামকো লেয়ায়ে।
ভাঁতি ভাঁতি দাইয়েন তুলরায়ে॥
কীনি অনেক ভাঁত তন্ রক্ষা।
দীনি ভাঁত ভাঁতকে শিক্ষা॥
যব হাম ধরম করম মে আয়ে।
দেওলোক তব পিতা সে ধায়ে॥"

অর্থাৎ—আমার পিতা পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে যাইতেছিলেন। যখন ত্রিবেণী (৺ প্রয়াগধামে) পৌঁছিলেন, তখন দীন-দরিদ্রকে দান আদি করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিলে তথায় আমার উৎপত্তি হইল। পরে পাটনা সহরে আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম। কিছুদিন পরে আমাকে মদ্রদেশে (পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে) আনা হইল। ধাত্রীগণ আমায় কতই আদর করিয়া ডুলাইল। আমার দেহরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা হইল। পরে আমি যখন ধর্ম্ম-কর্ম্ম শিখিয়া আসিলাম, তখন আমার পিতা দেবলোকে গমন করিলেন।

পাটনাপর্ব্ব।

দ্বিতীয় পর্ব্বাধ্যায়।

বাল্যলীলা।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—গীতা।

গোবিন্দের বাল্যলীলার কথা কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। সকলেই কেবল বলিয়াছেন যে, পাটনায় গোবিন্দের জন্ম হয়; কয়েক বৎসর পরে তিনি পঞ্জাবে গমন করেন; পঞ্চদশ * বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়; তৎপরে অন্যূন বিশ বৎসর যমুনাতীরের এবং হিমালয় পর্ব্বতের অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন। অরণ্য হইতে ফিরিয়া আসার পর তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার অল্প-বিস্তর সকলেই বর্ণনা করিয়াছেন। তবেই প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল তিনি কিরূপে কাটাইলেন, তাহা সাধারণতঃ জানা যায় না। গোবিন্দ সিং আটচল্লিশ বৎসর মাত্র মর্ত্ত্যলোকে জীবলীলা করিয়াছিলেন।

ক্যানিংহাম, মালকলম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণ যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাহাতে মাদৃশ লোকের অগ্রসর হওয়া ধৃষ্টতা হইলেও শিখ পূজারী ও শিখ বন্ধুগণের সাহায্যে ও অনুগ্রহে "গুরুপ্রসাদ সূর্য্য-প্রকাশ" গ্রন্থ পাইয়া এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দ স্মরণ

---

* শিখ গ্রন্থ অনুসারে দশম বৎসর বয়ঃক্রমকালে।

পূর্ব্বক গুরুগোবিন্দের বাল্যলীলা-বর্ণনে অগ্রসর হইতেছি। শুনিয়াছি যে, "সূর্য্যপ্রকাশ" অপেক্ষা অন্য কোন গ্রন্থে শিখ গুরুগণের অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ জানিবার উপায় নাই। এতদ্বিষয়ে যে কয়খানি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে "সূর্য্যপ্রকাশ" পুথিখানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহা আকারে প্রায় কালী সিংহের মহাভারতের তুল্য। উহা গোবিন্দের পরলোক-গমনের পরই কিন্তু উঁহারই স্বপ্নাদেশে সন্তোখ (সন্তোষ) সিং নামক জনৈক ভক্ত শিখ কর্ত্তৃক লিখিত। উহাতে বিস্তৃত বর্ণনাজন্য যে সকল জনশ্রুতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এ স্থলে পরিত্যক্ত হইবে। কেবল আমাদের গোবিন্দ সিংকে সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার জন্য সংক্ষেপে তাহাদের কিছু কিছু বলা যাইতেছে।

গুরুগোবিন্দের জন্মের পর শিশু দর্শনের জন্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। যে সকল লোক নবকুমারকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া অনেক ভক্ত শিখ মনে করেন যে, দেবগণ প্রচ্ছন্ন-ভাবে আসিয়াছিলেন। আগন্তুকগণের মধ্যে সৈয়দ ভিকৃশা নামক জনৈক মুসলমান ফকীর আসিয়া বালক দর্শনের প্রার্থনা করেন। সে সময় নবম গুরু তেগ বাহাদুর বাড়ীতে ছিলেন না। গোবিন্দের মাতুল কৃপাল তখন গুরুর বাড়ীর তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। সম্রাট্ আরঙ্গজেব গুরু তেগ বাহাদুরের প্রতি যেরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং তেগ বাহাদুর যেরূপে জয়পুরের মহারাজের সাহায্যে পূর্ব্বাঞ্চলে তীর্থ-দর্শন উপলক্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন, সে সকল বৃত্তান্ত গুরুর বাড়ীর প্রায় সকলেই জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহারা সৈয়দ ভিকৃশাকে দেখিয়া আরঙ্গজেবের চর বলিয়া সন্দেহ করিলেন। কিন্তু শিশু গোবিন্দকে দেখিতে ভিকৃশার এতই আগ্রহ হইয়াছিল যে, তিনি তিন দিন দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণে তাঁহাকে ভক্ত জানিয়া গুরু তেগ

বাহাদুরের মাতা নানকীর অনুমতিক্রমে কৃপাল শিশু গোবিন্দকে দেখাইলেন। অতি যত্নে ও সাবধানে শিশু পালিত হইয়া ক্রমে বাল্য-ক্রীড়ার বয়স প্রাপ্ত হইলেন।

একদিন কতকগুলি বালক লইয়া গোবিন্দ রাস্তায় ধূলি লইয়া খেলা করিতেছেন, এমন সময় দিল্লীশ্বরের অধীনস্থ জনৈক নবাব ধূমধামের সহিত হস্তী আরোহণে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। নবাবের লোকেরা বালকগণকে সেলাম করিয়া সরিয়া যাইতে বলিল। নবাব বলিয়া সকলকেই সেলাম করিতে হইবে, এ কথা বালকের ভাল লাগিল না। গোবিন্দ বালকগণকে হাসিতে বলিলে তাহারা হাসিল। তাহাতে নবাব বলিলেন,—"বাঁদরের মত মুখ করিয়া বালকগণ কি বলিতেছে?" তখন তেজস্বী গোবিন্দ যে উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা "সূর্য্যপ্রকাশ" গ্রন্থের ভাষায় বলা যাউক :—

"বদন বিলোচন।
সমান জিন বাদরকে ॥
ল্যায় হেঁ রাজ সোই ভয়ো।
হৃদয় তব থামেও ॥
যয়হে তেজ ঠারো।
কোই হোয় নারাখবারো ॥
তব হয়রো হোঁয়ে ভারো।
বনে সম বিধ বামে য়ো ॥"

অর্থাৎ—মুখ দেখ, বাঁদরের মত নহে। এই তোমার রাজ্য লইবে; তোমার হৃদয় কাঁচা হইবে। তোমার এ তেজ চলিয়া যাইবে। রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। এখন যে হালকা আছে, তখন সে ভারি হইবে। সে সময়ে বিধি বাম হইবে।

নবাব, বালকের কথা শুনিতে শুনিতে কঠোর-গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"বালক কি বলিতেছে ?" তখন নবাবের অনুচরেরা "বালকের কথা" বলিয়া গুরুগোবিন্দের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন! তখন বালকের কথা বলিয়া অগ্রাহ্য করা সঙ্গত হইলেও ইহাতে বালকের তেজস্বিতা বেশ বুঝা যায়।

লোক কথায় বলে,—"উঠন্তি মূলো পত্তনেই জানা যায়"। যিনি ভবিষ্যতে "দিল্লীশ্বরকে" রণপাণ্ডিত্যে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন, তিনি বাল্যকালে গুল্‌তি খেলিতেন। ধনুকে বর্ত্তুল যোজনা করিয়া লক্ষ্য স্থির করিতেন; সেই খেলা আবার সঙ্গিগণকে শিক্ষা দিতেন।

গোবিন্দের এরূপ খেলার বয়সেই গুরু তেগ বাহাদুর কামরূপ, কামাখ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রত্যাগত হয়েন। কামরূপের রাজা ও জয়পুরের রাজা বিষ্ণুসিংহ গুরু তেগ বাহাদুরের সঙ্গে পাটনা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কামরূপের রাজা দেশে প্রত্যাগমন করিলে পর গুরু পঞ্জাবে ফিরিয়া যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। বালক গোবিন্দ পিতার সহিত যাইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু সে সময়ে পথের কষ্ট প্রভৃতি জানাইয়া পিতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, গোবিন্দ সিং পিতার আজ্ঞানুসারে আরও কিছুদিন পাটনায় থাকিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বলিলেন,—"তুমি কামরূপে গেলে আমার বড় মন কেমন করিত। এবার যদি সঙ্গে লইয়া না যাও, তবে সেখানে গিয়া পত্র লিখিও। যদি না লেখ, তবে আমিও পশ্চাতে যাইব।" এ কথাগুলি সামান্য হইলেও পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা এবং তাঁহার প্রতি গভীর অনুরাগ-বোধক।

পাটনাপর্ব্ব।

তৃতীয় পর্ব্বাধ্যায়।

কৈশোর লীলা।

পাটনা হইতে পঞ্জাব-গমন।

গোবিন্দ যখন ধনুক ও বর্ত্তুল লইয়া খেলিতেন, তখন তাঁহার মাতা, পিতামহী প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-রমণীগণের বড়ই আনন্দ হইত। গোবিন্দের পিতামহী নানকী বলিতেন,—"গোবিন্দ! তোমার পিতা ও পিতামহ এই খেলা বড় ভালবাসিতেন।" এইরূপ কথার প্রসঙ্গে কিরূপে অমৃত-সরের পত্তন হইল, কিরূপে বাদসাহের সৈন্যগণকে হরগোবিন্দ পরাস্ত করিয়াছিলেন, ইত্যাদি পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তি-সমূহ ক্রমে ক্রমে তেজস্বী বালকের হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া দিতেন। এইরূপে স্বধর্ম্ম-পালন এবং স্বধর্ম্মিরক্ষার জন্য উদ্যমের কর্ত্তব্যবোধ ক্রমশঃ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল।

হিন্দুর চিরন্তন মতই এই যে, শৈশবে অতি যত্ন করিয়াই পিতৃ-পুরুষ-দিগের প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতে হয়। এই শিক্ষাটি হইয়া গেলেই চরিত্র দৃঢ় হইল। তখন সঙ্গদোষ, উত্তরকালের শিক্ষার দোষ, কিছুতেই আর মনুষ্যকে কেন্দ্রভ্রষ্ট করিতে পারে না। "বাপ-পিতামহের নাম ডুবাইব?"—এই বাক্য মনে উদিত করিয়া, কত যুবক সুখলালসায়

উত্তেজিত হইয়াও এবং পাপের প্ররোচনায় কতকটা আকৃষ্ট হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে—এবং পারিবে। এইরূপে বংশমর্য্যাদার কথা মনে হয় বলিয়াই অনেকেরই হঠাৎকারে না বুঝিয়া স্বধর্ম্মত্যাগটা নিবারিত হয়। ফলতঃ পূর্ব্ব-পুরুষদিগের প্রতি প্রকৃত ভক্তি না থাকিলে, সহযোগীদিগের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়দের উৎকর্ষ জন্য একাগ্রচিত্তের যত্ন ঘটিতে পারে না। যে পিতা-মাতাকে প্রকৃতরূপে ভক্তি করিয়াছে, পিতৃ-পুরুষগণ যাহার হৃদয়ক্ষেত্রে সর্ব্বদা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন, সে কখনই ভ্রাতা ভগিনীর সহিত বিবাদ করিতে পারে না। যে সকল সময়েই ছেলে-মেয়েরা পিতার বংশধরেরা কিসে প্রকৃত পক্ষে ভাল হইবে, এই চিন্তায় মগ্ন, তাহার ক্ষণিক আত্মসুখের দিকে দৃষ্টি থাকে না। আপনার পূর্ব্ব-পুরুষের ও আর্য্য ঋষিগণের প্রতি প্রকৃত ভক্তিমান্ কয়েকজন হিন্দুই আজও "প্রকৃত প্রস্তাবে স্বজাতি-বৎসল"। সুদূর ভবিষ্যতে উত্তরবংশীয়গণ স্বজাতীয় গুরুপ্রদর্শিত পথ যাহাতে পূর্ব্ব-মাহাত্ম্য অনুসরণে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, পৃথিবীতে তাঁহারা সেই অভিলাষমাত্রই পোষণ করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় বিলাসিতা তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না।

গুরুগোবিন্দের বাল্য-জীবনেও দেখা গেল যে, শৈশবে তাঁহারও এই মহতী শিক্ষা ঘটিয়া তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা সাধন করিয়াছিল। প্রতিভাশালী মহাত্মারা প্রতিভাগুণেই বড় হইয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু শুধু সেই মোটা কথা শুনিয়া রাখিলে, সাধারণের শিক্ষণীয় কিছু পাওয়া যায় না। প্রতিভা ভগবত্তেজাংশ—অতি পূজ্য পদার্থ। কিন্তু কিরূপ লালনপালনে সেই প্রতিভা রক্ষিত, বর্দ্ধিত এবং প্রকৃতপথে দৃঢ়-প্রযুক্ত হইতে পারে—পিতা, মাতা কিরূপ হইলে সেই বংশে মহাপুরুষ-দিগের জন্মগ্রহণ সম্ভব হয়, তাহাও লক্ষ্য করিতে হয়। আমাদের

দেশীয় মহাপুরুষদিগের জীবনী সম্বন্ধে যাহা যাহা জানা যায়, তাহার প্রতি সূক্ষ্মরূপে দৃষ্টি রাখিলে, এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব জানা যায়।

আর্য্য মহাকবি শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকে "চারিত্রপাঞ্জিকা" বলাতে এমন স্থির হইতেছে না যে, সকলেই ঐ আদর্শে বনে যাইবে, বা রাবণ বধ করিবে, বা সীতা হইবে, বা সকলেই দশরথ ও কৌশল্যা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় পুত্র পাইবে। উহাতে বুঝা যায় যে, কিরূপ ব্যবহার আদর্শ-স্থলীয় এবং একাগ্রচিত্তে কিরূপ ব্যবহারের যথাসাধ্য অনুকরণ-চেষ্টা করিলে, নিজের চরিত্রের ও পরবর্ত্তী পুরুষদিগের উৎকর্ষ ঘটিতে পারে,—ইহকাল পরকাল রক্ষা হয়। শ্রীরামচন্দ্রের বাল্যশিক্ষাও প্রকৃত হিন্দুর বাল্যশিক্ষা। কালাপাহাড়ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষ এবং গোবিন্দ সিংও ক্ষমতাপন্ন প্রতিভাশালী পুরুষ। কি শিক্ষা বা সংসর্গবশে কালাপাহাড়—কালাপাহাড় হইল, তাহা জানি না; কিন্তু কেমন অবস্থায়, কেমন বংশে, কিরূপ শিক্ষায় গোবিন্দ সিং গুরুগোবিন্দ হইতে পারিলেন, তাহার মূল কথা জানা গিয়াছে। গোবিন্দ সিং পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি ভক্তিমান্, একান্ত পিতৃগতজীবন বালক। প্রকৃত হিন্দুবংশে যেমন লালনপালন আবশ্যক, তিনি সেইরূপই শিক্ষা পাইয়াছিলেন। ফলতঃ "পূর্ব্বপুরুষেরা 'ওল্‌ডফুল' ছিল, সাহেবদের আচার-ব্যবহার অনেক ভাল," এই সকল কথা শ্রবণ এবং প্রাতঃকাল হইতে বিলাতী বিস্কুট ও মুর্গী আহার প্রভৃতি ম্লেচ্ছাচারের সহিত লালনপালন কার্য্য সম্পন্ন হইলে, মহাপুরুষের আবির্ভাবের কথা দূরে থাকুক, উত্তর-বংশীয়দিগের সদাচার, ধর্ম্মভীরু এবং দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়।

যাহা হউক, পিতামহীর নিকট পূর্ব্বোক্তরূপ শিক্ষা পাইয়া, পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে গোবিন্দ সিং ক্রমশঃ হৃদয়ে বল পাইতে লাগিলেন।

গুরু তেগ বাহাদুর আনন্দপুরে গমন করিলে, গোবিন্দকে তেগ বাহাদুরের আসনে বসাইয়া পাটনায় ভক্তগণ যখন তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, তখন তিনি গম্ভীরভাবে নানা কথা বলিতেন। পিতার সাক্ষাতে যেরূপ ধনুক ও বর্ত্তুল লইয়া খেলা করিতেন, তখনও তাহা ছাড়েন নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত ধনুক ভিন্ন অন্যান্য অস্ত্রশিক্ষারও ইচ্ছা হইতে লাগিল, এবং ভাল অস্ত্র পাইলেই সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অস্ত্রগুলি একটি উচ্চ স্থানে রাখিয়া নানাপ্রকার পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া তাহার উপর রাখিতেন; কখন বা মালা গাঁথিয়া অস্ত্রকে পরাইতেন; অস্ত্রে চন্দন দিতেন; অস্ত্রের নিকট যোড়হাত করিয়া অস্ত্রের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন—সংক্ষেপে অস্ত্রের পূজা করিতেন। বিধর্ম্মীদিগের নির্য্যাতনে পিতাকে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল। তাঁহার নিজের জীবন, পরিবারবর্গের এবং শিষ্যদিগের দ্বারা অতি সযত্নে পরিরক্ষিত হইতেছে দেখিতে পাইতেন। সধর্ম্মিগণ প্রবল শত্রুর নিকট মাথা তুলিতে পারে না, সর্ব্বদা অন্তরে গুমরাইতেছে, সর্ব্বদাই এ ভাব উপলব্ধ করিতেন। সুতরাং বালকের মনও স্ব-সমাজের মনের অনুরূপ হইয়া গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। শত্রু-বেষ্টিত আছি—আত্মরক্ষার প্রয়োজন, তখন শিখ-সমাজে সকলেরই এই ভাব। বালকও যে সেই ভাবাপন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছিলেন, তাহা বালকের ক্রীড়াতেই প্রমাণিত হয়। তিনি অস্ত্রের সমক্ষে বলিতেন,—"তোমারই সহায়ে আমি শত্রু নিধন করিব।" যদি ছোট তরবারি পাইতেন, তবে তাহা লইয়া পাঁচজনকে দেখাইয়া বলিতেন,—"ইহাই আমার উপযুক্ত; ইহাতে আমি এইরূপে শত্রু হনন করিব" এইরূপ বলিতে বলিতে বালক গোবিন্দ যুদ্ধের অভিনয় করিতেন। বালকের এই শেষোক্ত বিষয়ে আন্তরিক একাগ্রতার অঙ্কুর দর্শন করিয়া গোবিন্দের পিতামহী নানকী পুত্রবধূ গুজরীকে বলিতেন,—"এই

ছেলেটি যে বংশের ধারা রক্ষা করিবে, এই সকল বীরোচিত কার্য্যে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে!”

পাটনায় তেগ বাহাদুরের বাটীতে একটি কূপ ছিল। প্রথমে সেই কূপোদক বেশ সুস্বাদু ছিল। তখন অনেক লোক তথায় জল লইতে আসিত। গোবিন্দ তখন গুল্‌তি খেলিতেন, এবং ক্রীড়াচ্ছলে কখন কখন গুল্‌তি দিয়া কলসী ভাঙ্গিয়া দিতেন। ইহাতে যাহার কলসী ভাঙ্গিয়া যাইত, সে আসিয়া গোবিন্দের মাতা বা পিতামহীকে তাহা জানাইত। তাঁহারা গোবিন্দকে তিরস্কার করিতেন, এবং অভিযোক্তাকে মিষ্টবাক্যে, কখন বা অর্থ দিয়া, সন্তোষ করিয়া বিদায় করিতেন। এই-রূপে একদিন এক মুসলমানী জল লইয়া যাইতেছে, গোবিন্দের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহার গুল্‌তি মুসলমানীর কলসীতে না লাগিয়া তাহার কপালে লাগিল; রুধিরধারা পড়িতে লাগিল! গোবিন্দের মাতা গুজরী এই ঘটনা জানিতে পারিয়া সন্তানকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। গোবিন্দ পলাইয়া চিলের ছাদের গৃহে গিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন; গুজরী সন্তানকে গালি দিতে লাগিলেন। গোবিন্দ অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। গৃহের ভিতর হইতে বলিলেন,—“লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ায় লাগিয়াছে; আমি উহাকে মারিব, এরূপ ইচ্ছা করি নাই। যাহা হউক, কাজ ভাল হয় নাই। কিন্তু এখানে জল লইতে এত লোক না আসিলে ত আমার এরূপ ব্যবহার ঘটিয়া যাইত না। অতঃপর ঐ কূপের জল ক্ষারা (বা লবণ স্বাদ) হইয়া যাইবে—তাহা হইলে আর লোক আসিবে না।” পাটনায় ঐ কূপটি এখনও আছে, এবং উহার জল এখন ক্ষারা।

গুজরী বলিলেন, -“তুই কি জানিস্ না যে, মুসলমান রাজ্যে বাস করিতেছিস্; এখনই দিল্লীশ্বরের লোক আসিয়া সর্ব্বনাশ বাধাইবে।”

এ কথায় গোবিন্দের মনে লজ্জার ভাব ঘুচিয়া হঠাৎ ক্রোধোদয় হইল। অপকর্ম্মের জন্য তাঁহার নিজেরই লজ্জা হইয়াছিল ; স্ত্রীলোককে আঘাত লাগা কোন মতেই ভাল হয় নাই বুঝিয়াছিলেন ; সেই জন্য মাতার নিকট মুখ দেখাইতে না পারিয়াই গৃহে কপাট দিয়া তিরস্কার গ্রহণ করিতেছিলেন ; কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটি "মুসলমানী" বলিয়া তাঁহার মনে কোন ইতর-বিশেষ ঘটে নাই। আমার হস্তে শুধু শুধু একটি স্ত্রীলোক আঘাত পাইয়াছে, এইমাত্র মনে হওয়াতেই লজ্জা হইয়াছিল। মাতার কথার ভাবে বুঝিলেন যে, ঐ স্ত্রীলোকটি হিন্দু হইলে যত দোষ হইত, সে মুসলমানী বলিয়া, তখনকার কালের মুসলমান রাজার একান্ত স্বজাতি-পক্ষপাতী বিচারের দোষে তদপেক্ষা দোষের হইয়া দাঁড়াইতেছে! এই পক্ষপাতী বিচার ও মুসলমানের "ভয়ের" কথার আভাসমাত্র শুনিয়া গোবিন্দের অবিচারে বিদ্বেষ ও হৃদয়স্থিত আত্মাভিমান উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি "ভয়" কথাটার,—বিশেষতঃ স্বধর্ম্মের শত্রু মুসলমান হইতে তাঁহার কণামাত্র "ভয়" হইতে পারে, এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কেঁয়ো হাম তুরকন্‌তে ডর পাহি।" (কি! আমি মুসলমানের ভয় করি?)। পাছে সন্তানের ওরূপ উদ্ধত কথা কেহ শুনিতে পাইলে কোন অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে গুজরী উহাকে আর না ঘাঁটাইয়া ব্যাকুলচিত্তে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। পরে আহত রমণীর নিকটে গিয়া তাহার আহত স্থানে জলাদি দিলেন, এবং তাহাকে সুমিষ্ট-বাক্যে কিছু অর্থ দিয়া ও বীতক্রোধ করিয়া বিদায় করিলেন। গোবিন্দের পিতামহী পুত্রবধূ দ্বারা গোবিন্দের তিরস্কার শুনিয়াই সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিলেন। পৌত্রের নিকটে গিয়া মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে সদুপদেশ দিতে ও বুঝাইতে লাগিলেন। তখন গোবিন্দ বলিলেন,—"আমি এ দেশে আর থাকিব না।" সূর্য্য-প্রকাশের ভাষাই উদ্ধৃত করিতেছি।

শুনক কহত না হাম ইতরহেঁ।
আপনা দেশ পেয়ানো চাহেঁ॥
পিতা সমীপ বিগ্রহেঙ্গে যায়।৮
লেখ পঞ্জাব আনন্দপুর ঠায়॥

অর্থাৎ (উক্ত কথা) শুনিয়া বলিলেন, আমি এখানে থাকিব না, আপন দেশে যাইব; পিতার নিকটে যাইব; পঞ্জাবস্থ আনন্দপুর দেখিব।

তখন পিতামহী নানকী বুঝাইতে লাগিলেন, "তোমার পিতা সেখানে পৌঁছিয়া এখনও পত্র দেন নাই। কি জানি, পথিমধ্যে হয় ত কোন ভক্ত আটকাইয়া রাখিয়াছে, অথবা এখন যাওয়ার সুবিধা নাই। আর সে প্রদেশে নানা হাঙ্গামা—হিন্দু মুসলমানে প্রায়ই দাঙ্গা-ফসাদ হয়, এখানে তত হয় না। এখানকার ভক্তগণ তোমায় কত ভালবাসে।" ইত্যাদি নানা কথায় বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু পঞ্জাব-যাত্রাই গোবিন্দের মনে স্থির হইয়াছে। তিনি নিত্য নিত্য সেই কথা বলিতে লাগিলেন। তখন বিহার প্রদেশ (পাটনা অঞ্চল) অপেক্ষা পঞ্জাব অঞ্চলে অশান্তি অধিক ছিল, এই জন্য রমণীগণ মান-ভয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রদ গঙ্গা-ত্যাগ করিয়া, পঞ্জাব যাইতে বড় ইচ্ছুক ছিলেন না, এবং আর্য্যপত্নী গুজরী দেবী স্বামীর আজ্ঞাও অপেক্ষা করিতেছিলেন। গোবিন্দকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিবার সময় একদিন নিজ হৃদয়স্থ সুদৃঢ় স্বামি-ভক্তি দেখাইয়া সন্তানকে বলিলেন,—"তুয়া পিত মর্জ্জি বিন কিম যামে।"—তোমার পিতার ইচ্ছা ব্যতীত কিরূপে যাইব? সতীর এই বাক্য শুনিয়া, গোবিন্দ, পূর্ব্বে পিতা পুত্রে যে কথা হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, পত্র না আসিলেও যাইবার অনুমতি বা সঙ্কেত আছে। তিনি এইরূপে মাতাকে নিরস্ত করিয়া যাত্রার উদ্যোগ

করিতে লাগিলেন। ইহাতে ভক্তগণ ব্যাকুলতা দেখাইতে লাগিল। ভক্তের ব্যাকুলতা উপলক্ষ করিয়া নানকী দেবী গোবিন্দকে বলিলেন,—"এই সকল ভক্ত ত্যাগ করিয়া কিরূপে যাইবে?" তাহাতে গোবিন্দ বলিলেন,—"ইহারা প্রকৃত ভক্ত নহে। ইহারা যেরূপ দেখাইতেছে, সেরূপ নয়; ইহারা ভণ্ড।" নানকী বলিলেন,—"দেখ, উহারা তোমাকে কত যত্ন করে, ধন-দৌলত দিয়া, খাদ্যাদি দিয়া তৃপ্তি বোধ করে। তবে ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য অত ব্যাকুল হইতেছ কেন?" গোবিন্দ পুনর্ব্বার বলিলেন,—"উহারা ভক্ত নয়—ভণ্ড।" তখন নানকী কথাপ্রসঙ্গে মুসন্দ বুলাকী দাস নামক জনৈক ভক্তের নামোল্লেখ করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং উহার পরীক্ষা লইবার প্রস্তাব করিলেন। তদনুসারে গোবিন্দ সাত শত খাঁটি স্বর্ণ-মুদ্রা দ্বারা অলঙ্কৃত একখানি পাল্কী নির্ম্মাণ করাইবার জন্য অনুমতি করিলেন। বুলকী দাস ঢাকা হইতে স্বর্ণের কাজ করা উত্তম পাল্কী নির্ম্মাণ করাইয়া আনিলেন। পাল্কী দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোবিন্দ মাতা ও পিতামহীকে ডাকাইয়া তাঁহাদের সমক্ষে পাল্কীতে অগ্নি অর্পণ করিলেন। ইহাতে সকলেই দুঃখিত হইলেন যে, এমন সুন্দর জিনিস নষ্ট হইতেছে; কিন্তু গোবিন্দ তখন গুরু-স্থানীয়; তাঁহার কথার বিরুদ্ধে সামান্য সোণার জিনিস রক্ষা করিবার প্রস্তাব করিতে সকলেই লজ্জা বোধ করিলেন। গুরুর একটা সামান্য ইচ্ছা-প্রকাশ যে সোণার অপেক্ষা অনেক বড়, এ মত তখন ভারতবর্ষের শিখসমাজে দৃঢ়বদ্ধ।

যাহা হউক, পাল্কীতে অগ্নি-সংযোগে দেখা গেল যে, উহাতে স্বর্ণের কাজগুলি খাঁটি স্বর্ণের নহে—ঝুটা সোণার! এই ঘটনায় সকলেই বিস্মিত হইলেন। গুজরী ও নানকী কি বলিয়া গোবিন্দকে বুঝাইবেন, স্থির করিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে বলিলেন,—

"একমাত্র বুলাকী দাসের দোষে সকলকে দোষী করা যায় না।" গোবিন্দ বলিলেন,—"বুলাকী দাস যখন একজন মুসন্দ (অর্থাৎ সাধারণ শিখগণের নিকট হইতে গুরুর জন্য নির্দ্ধারিত কর আদায়-কর্ত্তা), তখন সাধারণ শিখের কথা কি বলিব?" তখন গুজরী ও নানকী দেবীদ্বয় পুনরায় গুরু তেগ বাহাদুরের নিকট হইতে পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন; কিন্তু গোবিন্দ তাহাতে সম্মত না হইয়া আনন্দপুর-যাত্রার জন্য ব্যাকুলতা দেখাইতে লাগিলেন। বলিলেন,—"পঞ্জাবে আমার অনেক কার্য্য আছে। এখানকার শিখগণ দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না। পঞ্জাবী শিখগণ বিনাবেতনে গুরুর পক্ষ সমর্থন করিয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে। সেখানে অর্থের এত আদর নাই।"

পাটনা পর্ব্ব।

চতুর্থ পর্ব্বাধ্যায়।

পাটনা পরিত্যাগ। দেশের অবস্থা।

পূর্ব্বোক্তরূপ কথা চলিতেছে, এমন সময় জগৎ শেঠ নামক জনৈক শিখ বলিলেন,—"গুরুর কৃপায় আমার কিছুরই অভাব নাই। ভারতবর্ষের নানাস্থানে আমার যে সকল কুঠি আছে, সে সমস্তই গুরুর। অতএব যদি একান্তই পঞ্জাব যাত্রা করা হয়, তবে আমি কুঠির উপরে হুকুম দিব। পথিমধ্যে আমার কুঠির লোকেরা গুরু মহারাজের জন্য প্রস্তুত থাকিবে।" তাঁহার এইরূপ কথায় গোবিন্দ পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়া জগৎ শেঠকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং বলিলেন,—"তোমার ভক্তি মুক্তি উভয় লাভ হইবে এবং লক্ষ্মী তোমাতে অচলা থাকিবেন।" এমন সময় গুরু তেগ বাহাদুরের নিকট হইতে পত্র আসিল। তখন গোবিন্দের আর অনেন্দের সীমা রহিল না। তিনি পত্রবাহকের নিকট পিতার সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আনন্দপুর স্থানটি কেমন—তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। আনন্দপুর অতি মনোরম স্থান; উহা শতদ্রু নদীর তীরে; উহার পশ্চাতে পাহাড়-শ্রেণী; পাহাড়ের উপর চণ্ডিকা দেবীর মন্দির—এই সকল কথা এবং পিতার

কুশল সংবাদ শুনিতে শুনিতে গোবিন্দ পত্র পাঠ করিলেন। পত্রের শেষ ভাগে আনন্দপুর যাইবার আজ্ঞা ছিল। "আন আনন্দপুর নগর নেহারিয়ে।" (আসিয়া আনন্দপুর নগর দেখ।) কথাটি গোবিন্দের বড় মিষ্ট লাগিল। তিনি বলিলেন :—

"হৃদয় হামারে কি সব জান।
লিখি পত্রকা গুরু ভগবান্॥"

অর্থাৎ "আমার হৃদয় জানিয়াই গুরু ভগবান্ (পিতৃদেব) এই পত্র লিখিয়াছেন।" তখন মাতা ও পিতামহীকে পত্র দেখাইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। স্ত্রীলোকেরা পাল্কীতে উঠিলেন। যাত্রাকালে, পাটনাস্থ শিখগণ অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া স্মৃতিচিহ্ন চাহিলেন। গোবিন্দ নিজের বাল্যকালের "খাটোলা" (ছোট খাটিয়া) খানি দিয়া বলিলেন,—"ইহাই তোমাদের গুরুর স্বরূপ জানিও। ইহার নিকট মানসিক করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে।" এখনও পর্য্যন্ত সেই খাটিয়াখানি পাটনায় আছে, এবং উহা গুরুমূর্ত্তির ন্যায় পূজিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রাকালে ব্রজবালকগণ যেরূপ দুঃখ করিয়াছিল, গোবিন্দের সমবয়স্ক বালকগণও তদ্রূপ করিতে লাগিল।

এ দিকে পঞ্জাব অঞ্চলে কি হইতেছিল এবং নবম গুরু তখন কি অবস্থায় ছিলেন, তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। তখন উত্তর-ভারতে আরঙ্গজেবের দোর্দণ্ড প্রতাপ চলিয়াছে। হিন্দুগণকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য তিনি নিদারুণ চেষ্টা করিতেছেন। এই ধর্ম্ম-প্রচার উপলক্ষে সাধারণতঃ মুসলমানদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলা এ স্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যখন, 'মুসলমান-শ্রীবৃদ্ধির উপলক্ষ কি?'—এই প্রশ্নটি মনে উদিত হয়, তখনই প্রায় আপনা হইতে উত্তর আইসে, "পরকালে ঐকান্তিক

গুরুগোবিন্দ সিং।
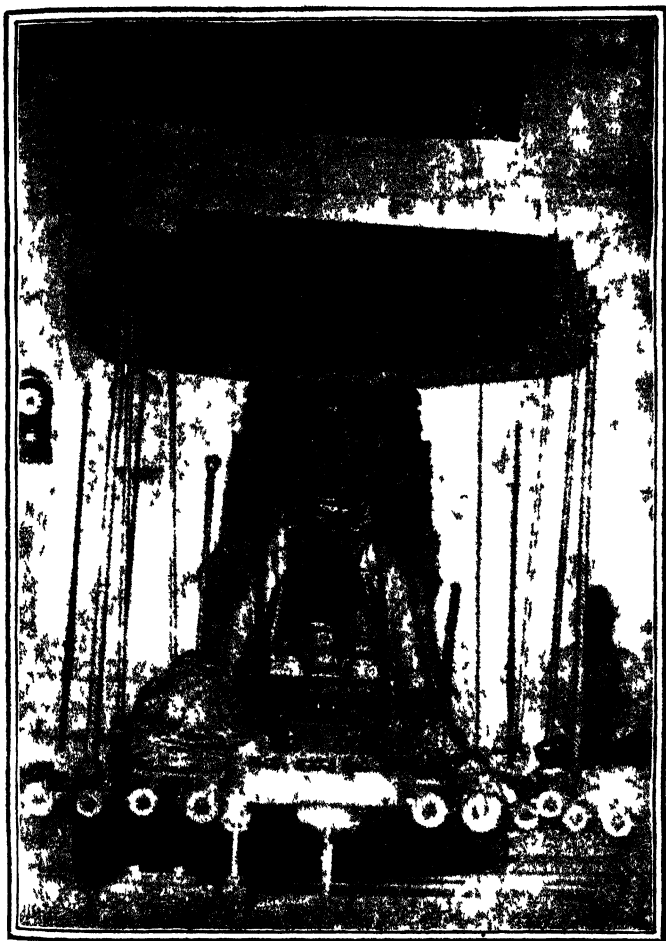
গুরুগোবিন্দসিংহের বাল্যকালের "খাটোলা"। (পাটনায় হর মন্দিরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে)।

METCALFE PRESS

(১০৪ পৃঃ)

দৃষ্টি, স্বধর্ম্মে একাগ্র ভক্তি, ও ইস্‌লাম ধর্ম্মপ্রচারে আত্মোৎসর্গ।” যদি তাহাই হয়, তবে যে উদ্দেশ্যের উপলক্ষে —

পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ
পশ্চিমে হিস্পানী শেষ

এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ শাসিত হইয়াছিল, সে বড় সামান্য উদ্দেশ্য নয়। যে ধর্ম্মে নিজের একান্ত বিশ্বাস—যে ধর্ম্ম-গ্রহণ ব্যতীত মুক্তি নাই বলিয়া নিজে শিক্ষিত—অপরের মুক্তি উদ্দেশে সেই ধর্ম্ম-প্রচারকে সুমহৎ উদ্দেশ্য কে না বলিবে? সেই সুমহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত পয়গম্বরের আরবশিষ্য-গণের আক্রমণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জনপদ ক্ষণমাত্রে বশীভূত হইয়াছিল। তাঁহাদের সেই ধর্ম্মোন্মাদে সংক্রামিত হইয়া কোটি কোটি লোক ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনকার মুসলমান অতি অপূর্ব্ব দ্রব্য। ঐহিকতা, বিলাসিতা, তাঁহাদের দিকে যাইতে পারিত না। “যদি কোরাণে থাকে, তবে আর সে কথা অপর পুস্তকে পড়িয়া প্রয়োজন কি? আর যদি কোরাণে না থাকে, তবে সে সব মিথ্যা কথা পৃথিবীতে রাখা উচিত নয়।” এই মনে করিয়া যিনি আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার পোড়াইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, তাঁহাকে অসভ্য বলিতে হয় বল, কিন্তু তাঁহার একাগ্রতা, ঐহিকতাশূন্যতা, এবং স্বধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। সে সকল ধর্ম্মবীরের সমক্ষে কোন বাধা বিপত্তিই দাঁড়াইতে পারে না। আমরা হিন্দু; আমরা উদারতর ধর্ম্ম-প্রণালীর অনুগ্রহে জানি যে, ভগবানের মনে হিংসা, দ্বেষ থাকিতে পারে না। জানি যে, “এ ব্যক্তি ধর্ম্মের এই বাঁধা বুলি বলে নাই, অতএব ও অবশ্যই চিরদিন নরকে বাস করিবে,”—ভগবানের মনে এমন হইতে পারে না। আমরা জানি যে, তিনি ভাবগ্রাহী, তিনি অন্তঃকরণ দেখেন, ভাল লোকমাত্রেই তাঁহার প্রিয়। এজন্য আমরা কাহাকেও পৈতৃক ধর্ম্ম

হইতে বিচ্যুত হইতে উপদেশ দিই না। ওরূপ করিলে স্বজনের সহিত সহানুভূতি-হীনতা প্রভৃতি অনেকগুলি দোষ-সংঘটন এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমরা পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ অবৈধ জানি বলিয়া যে, যাহারা সে কথা বুঝে নাই, তাহারা বড়ই মন্দ, এ কথা বলিব না। আরবীয়গণ যথাজ্ঞান স্বধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। আর আমাদের প্রকৃত বিশ্বাস এই যে, মুসলমান ধর্ম্ম তাঁহাদের ধর্ম্মোন্মত্ততার সংক্রামণেই অধিকতর প্রচারিত হইয়াছিল; তাঁহাদের সময়েও অত্যাচার কিছু হইয়া থাকিবে; কিন্তু ঐভাবে প্রচার অধিক হয় নাই।

সে যাহা হউক, ভারতবর্ষে হিন্দুর সংস্রবে মুসলমানের মনে উদারতর ধর্ম্ম-প্রণালীর ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। সুফিমত বেদান্তপ্রসূত। অন্যধর্ম্মাবলম্বী লোক কদাচ ভাল হইতে পারে না, তাহাকে ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ করাইতেই হয়, এরূপ ভাব উদারতর মতবাদের সংস্রবে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের মধ্যে ঈষন্মাত্রায় কমিয়াছিল। মহাত্মা আক্‌বর শাহ ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভাল ও ক্ষমতাপন্ন লোকের সমাদর করিতেন। "ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎপীড়ন রাজাকে করিতে নাই; রাজা সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই পালক; সকল ধর্ম্মাবলম্বীই ভাল লোক হইলে করুণাময়ের কৃপায় মুক্তি পাইতে পারে।"—এইরূপ উদারভাব দিল্লীর সম্রাট্-বংশীয়দিগের মধ্যে তিনিই বিশেষরূপে প্রবেশ করাইয়া দেন। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালমধ্যে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ পারসীতে অনুবাদিত হইয়া এবং অনেক মহামহাপণ্ডিতগণ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া জনসাধারণের মধ্যেও ধর্ম্মবিদ্বেষ হ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। হিন্দুর পরধর্ম্মের প্রতি যে আক্রমণ নাই, মুসলমান সেই মহান্ উদার ভাব পাইতেছিলেন। আজ হইতে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন খৃষ্টীয় কর্ম্মচারী সামরিক বিভাগে সুলতানের অধীনে কর্ম্ম পাইতেন না। রুষ তুরুস্ক-

যুদ্ধের সময়েই অতিশয় বিপদ দেখিয়া সুলতান মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত না করিয়াও জেনারেল বেকারকে সামরিক বিভাগে কর্ম্ম দিয়াছিলেন। কিন্তু বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে আক্‌বর, জাহাঙ্গীর, এবং সাজাহান, হিন্দু সেনাপতিদিগের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিতেন। ফলতঃ যিনি যাহাই বলুন, ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুর সংস্রবে পরধর্ম্ম-বিদ্বেষরূপ অনুদার ভাব অনেকটাই ছাড়িয়াছিলেন। এখন উঁহারা সহস্র চেষ্টা করিয়াও আর পূর্ব্বমত ধর্ম্মান্ধতা মনের মধ্যে আনয়ন করিতে পারেন না। মুখে যতই বলুন, কাজে হঠাৎ একবার যাহা করিয়া ফেলুন, মনে ততটা আর কিছুতেই স্থায়ী হইবার উপায় নাই। তবে এখনও উত্তেজিত হইলে কতকটা ঘটে সন্দেহ কি ?

যাহা হউক, উদারমনা সাজাহানের পুত্র আরাঙ্গীবের সময়ে হিন্দুধর্ম্মের পীড়ন এই জন্য খলিফাদিগের সময়ের ন্যায় খাঁটি ধর্ম্মান্ধতা-মূলক নহে। তাঁহার কার্য্য জ্ঞানকৃত পাপ। দারা জ্যেষ্ঠ সহোদর। দারা সাজাহানের প্রিয়পাত্র; দারারই রাজা হইবার কথা; নিজে দারার ন্যায় হিন্দু মাতার গর্ভজাত নহেন; নিজের মনেই স্বাভাবিকই একটু মুসলমান ধর্ম্মের খুঁটিনাটির দিকে টান অধিক আছে। আবার দারাকে পর্য্যুদস্ত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়—'দারার হাতে ইসলাম ধর্ম্ম লোপ হইবে' এইরূপ ভয় উৎপাদন করিয়া গোঁড়া মুসলমান সৈনিক ও অজ্ঞ সাধারণ প্রজাদিগের সাহায্যে সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করা। আরাঙ্গীব তাহাই করিয়াছিলেন। মক্কা যাইবেন বলিতেন, কিন্তু যান নাই। গোঁড়া মুসলমানের দলের বলে তিনি নিজের ঐহিক কার্য্যসাধনের সুবিধা করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু সেনাপতিদেরও প্রতি যে সদ্ব্যবহার করিতেন না, তাহা নহে; প্রয়োজন পড়িলেই গোঁড়ামি ছাড়িতেন। জয়সিংহ তাঁহার দক্ষিণহস্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রকাশিত ধর্ম্মোন্মাদ

খাঁটি ধর্ম্মোন্মাদ নহে। লোভ পরবশ হইয়া, তিনি পিতার অপমাননা, রাজ্যগ্রহণ জন্য ভ্রাতাদিগের বধ, পিতৃবংশ ধ্বংস, বিষ-প্রয়োগে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের হত্যা, এমন কি, তৈমুরলঙ্গ-বংশীয় কুল-ললনাদিগের মান-সম্ভ্রমের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, ভ্রাতা সুজাকে সপরিবারে অসভ্য আরাকানে বিতাড়িত করা প্রভৃতি অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-প্রচার দ্বারা তাঁহার সেই সকলের প্রায়শ্চিত্ত চেষ্টা—বিশুদ্ধ, প্রকাশ্য, প্রথম কালের মুসলমান বীরদিগের ন্যায় ঐহিকদৃষ্টি-রহিত, এবং একাগ্র-ধর্ম্মোন্মাদ নহে। বিদেশীয় শত্রুকে জয় করিয়া, আপনাদের ধর্ম্মোন্মাদ তাহাদের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া, তাহাদিগকে ঐহিকতা পরিত্যাগ করাইয়া, কঠোর ব্রতাবলম্বী ইস্‌লামের যোদ্ধায় পরিবর্ত্তন কার্য্যে তিনি ব্রতী ছিলেন না। তিনি সিরিয়াবিজয়ী নহেন; তিনি চীন বিজয় করিতে পারেন নাই। যাহারা তাঁহার প্রজা, যাহাদের রক্ষা করা তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম,—যাহাদিগের মনে ব্যথা দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি অসৎকর্ম্ম—তিনি সেই "নিজের প্রজাদের" নির্য্যাতন করিয়া ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আরাঙ্গীবের হাতে দক্ষিণাপথের "মুসলমান" রাজ্যগুলির ধ্বংস হয়। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি তিনিই গ্রাস করেন; রাজ্য-বিস্তার নিমিত্ত তিনি স্বধর্ম্মীর সহিত যুদ্ধে কুণ্ঠিত ছিলেন না। ফলতঃ ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রচার মাত্র তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। গোলকুণ্ডার হীরক-খনি, দিল্লীর রাজমুকুট প্রভৃতি ঐহিক বিষয়েও তাঁহার বেশ দৃষ্টি ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমানদিগকে একত্র করিয়া দক্ষিণাপথে হিন্দু-দিগকে—মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করেন নাই। সকল জাতীয় ঐতিহাসিকেরা মুক্তকণ্ঠে বলেন যে, তিনি যখন রাজ্যলোভে বিজয়পুরের মুসলমান ভূপতিদিগকে নষ্ট করিবার যত্ন করিতেছিলেন, তখন সেই

সুযোগেই তাঁহার বংশীয়দিগের সর্ব্বপ্রধান শত্রু শিবজীর উদ্ভব ও উন্নতি হইল। নির্জ্জিত দক্ষিণাপথের মুসলমানেরই আশীর্ব্বাদে এবং চূড়ান্তভাবে পীড়িত হিন্দুর আন্তরিক প্রার্থনায় শিবজীর অভ্যুদয়। আমাদের এত কথা বলিবার কারণ এই যে, আরাঙ্গীব মিতাচারী, অতিশয় বুদ্ধিমান্, একান্ত স্বধর্ম্মাচার-নিরত, দৃঢ়পণ সম্রাট্ ছিলেন; সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার করতলস্থ ছিল। তাঁহার সময়ে কেন সাম্রাজ্য-ধ্বংসের সূত্রপাত হইল? স্বধর্ম্মাচার-নিরত ব্যক্তির হস্তে এরূপ কি প্রকারে হইল? উত্তর এই—"তাঁহার পিতৃদ্রোহ, ভ্রাতৃহত্যা, অসাধারণ কুটিলতা, নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি যাবজ্জীবন নির্য্যাতন, প্রজা-পীড়ন," তাঁহার স্বধর্ম্মের অঙ্গীভূত নহে। ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী অধিকাংশ লোকেই এ সকল কার্য্যের জন্য তাঁহাকে একান্তই দোষ দেন। উক্ত কার্য্যগুলি মনে পড়িলে "কেহই" ভাল বলেন না, এবং আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, আমার এই ঐতিহাসিক সমালোচনার চেষ্টায় কোন মুসলমান ভ্রাতা অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমি গুণ দোষ দুই-ই দেখিবার চেষ্টা করিতেছি। তিনি স্বধর্ম্মের "বাহ্যিক" শ্রীবৃদ্ধি চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সুধু সন্ধ্যা-আহ্নিক বা নামাজ করিলেই স্বধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় না। হিন্দু যদি দিনে অন্ততঃ তিনবার সন্ধ্যার সময় "যৎকিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি" মনের সহিত বলিয়া আত্মদোষগুলির তীব্র আলোচনা না করেন, মনকে ভুল বুঝাইয়া বা আত্মদোষ দেখিবার চেষ্টা না করিয়া নীতি-হীন হয়েন, চরিত্র শুদ্ধ রাখিবার ও কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবার জন্য নিজের দোষ-গুলিকে দাহ করিতে দৃঢ়ব্রত না হন, তাহা হইলে তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিক করিলে বা মালা ফিরাইলেও স্বধর্ম্ম-প্রতিপালক নহেন। সেইরূপ মুসলমান-ধর্ম্মও বলেন যে, সুধু নামাজ করিলে বা দুজন বিধর্ম্মীকে মুসলমান করিলেই সকল দোষের মার্জ্জনা হয় না। অন্তর্য্যামী ঈশ্বর

মনের দোষ জানিতে পারেন। মন শুদ্ধ না থাকিলে কিছুতেই কিছু হয় না। তবে আচারপূত থাকিলে মন পরিষ্কার রাখিবার অনেকটা সুবিধা হয়, এই মাত্র। আচার ত্যাগ করিলে মন পরিষ্কার রাখা-রূপ কঠিন কর্ম্ম আরও কঠিন হয়—এই মাত্র।

যাহা হউক, এইরূপে দেখা গেল যে, আরাঞ্জীবের ধর্ম্মোন্মাদ পূর্ব্বকালের আরবীয়দিগের ধর্ম্মোন্মাদের ন্যায় বিশুদ্ধ দ্রব্য ছিল না। তিনি নানাপ্রকার গুণশালী হইলেও প্রকৃতপক্ষে নীতিহীন, রাজধর্ম্ম-পালনে বিমুখ ও অদূরদৃষ্টি রাজা ছিলেন। তিনি বুঝেন নাই যে, হিন্দুর ধর্ম্ম-বিশ্বাস মুসলমানের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ন্যায়ই দৃঢ় পদার্থ, উভয়ের "মর্ম্মান্তিক" সংঘর্ষ উৎপাদন করা তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের অনুমোদিত নহে। "পূর্ব্ব-পুরুষদিগের পদানুসরণ করাতেই আমার কুলধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম এবং প্রকৃতরূপে স্বধর্ম্ম রক্ষা হইবে, অন্যথা ধর্ম্মনাশ হইবে"—এ কথা না ভাবিয়া পিতৃদ্রোহী নীতিহীন রাজা যে ধর্ম্মোন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিলেন, তাহার ফল অশুভ ব্যতীত শুভ কিরূপে হইবে? স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপও মিতাচারী ও কঠোর পরিশ্রমী রাজা ছিলেন। ইউরোপ খণ্ডে তাঁহারও অতুল বিভব ও অতুল প্রতাপ ছিল। তিনিও কুটিল রাজনীতির অনুসরণে রাজকীয় কারাগারে অনেক ভীষণ কাণ্ডের অভিনয় কবাইয়াছিলেন। তিনি বলপূর্ব্বক ওলন্দাজদিগকে রোমান কাথলিক করিবার জন্য একান্ত উৎপীড়ন করিলে, অর্দ্ধেক ইউরোপ এবং প্রায় সমস্ত আমেরিকার অধীশ্বর সামান্য বাণিজ্য এবং মৎস্য-ব্যবসায়ী মুষ্টিমেয় ওলন্দাজের হাতে পরাজিত হইলেন। সম্রাট্ আরাঞ্জীব যাহাকে "পার্ব্বত্য ইন্দুর" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহারই হস্তে লাঞ্ছিত হন। ফিলিপ যাহাদিগকে "ধীবর" বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তাহারাই তাঁহার অজেয় বাহিনীগুলিকে অকৃতকার্য্য

করিয়াছিল। ভগবানের চক্ষে অধিকতর পরিমাণ ধর্ম্ম যে দিকে থাকে, সেই দিকেই চিরকাল জয় হয়; অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মের জয় হয়। অবিশুদ্ধ ভাবদুষ্ট বাহ্যিক ধর্ম্মের জয় হয় না।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, আরাঞ্জীব এক হস্তে তরবারি এবং অপর হস্তে কোরাণ লইয়া ভীষণ পাশব অত্যাচারে হিন্দুকে মুসলমান-ধর্ম্মে বলপূর্ব্বক লওয়াইতে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ফিলিপের সহিত কোন কোন বিষয়ে তাঁহার তুলনা করায় আমি যেন ঐ কথা বলিলাম, এমন মনে হইতে পারে। কিন্তু ঠিক সেরূপ হয় নাই। ফিলিপ সহস্র সহস্র লোককে ধর্ম্মের জন্য প্রকাশ্যরূপে অগ্নিদগ্ধ করিয়াছিলেন; উত্তেজিত নাগরিকদিগকে দমন করিবার জন্য বড় বড় নগর লুণ্ঠিত ও অধিবাসী-দিগকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত হত্যা করিয়াছিলেন। আরাঞ্জীব হাজার হউক ভারতবাসী; অতটা নৃশংসতার উৎপত্তি এ পুণ্য ভূমিতে কিছুতেই সম্ভবে না। তিনি ঐ সকল ভয়ানক আচরণ করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলে জীবের গতি নাই। সেই দৃঢ়বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া ভয় এবং মিত্রতা দেখাইয়া তিনি কতকগুলি হিন্দুকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দির ভাঙ্গিয়াছিলেন, এবং তীর্থস্থানের মেলা নিবারণ করিয়াছিলেন। যে ধর্ম্মে অন্য ধর্ম্মকে বিদ্বেষ করিতে নিবারণ করে না, যে ধর্ম্ম রাজশক্তি দ্বারা (কেবল রক্ষিত নহে) প্রচারিত হইতে পারে, যে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য রাজা ভয়-মিত্রতা দেখাইবার অনুজ্ঞা প্রচার করেন—তথায় গোঁড়ামী প্রশ্রয় পায় এবং তথায় রাজশক্তি তরবারি হস্তে বলপূর্ব্বক লওয়াইতেছে বলিয়া বর্ণিত হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? কিন্তু যদি মুসলমানগণ সত্য সত্যই তরবারি হস্তে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তবে আজ সুলতানকে আর্ম্মিনিয়া বা সিরিয়া লইয়া এত বিব্রত থাকিতে হইবে কেন? তাহা

হইলে প্রথম হাঙ্গামাতেই ও সকল দেশ খৃষ্টান-শূন্য হইয়া যাইত। এ দেশেও বলপূর্ব্বক যুদ্ধের অঙ্গস্বরূপ স্থানে স্থানে অল্প অল্প পরিমাণে ধর্ম্মান্তর-প্রচার-চেষ্টা হইয়াছিল; রাজকার্য্যের অঙ্গস্বরূপ স্থায়িভাবে হয় নাই; নচেৎ এই মহাদেশ মুসলমান দ্বারা কখনই বিজিত হইতে পারিত না; তাহা হইলে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্যবর্ণের লোকেও অস্ত্র ধারণ করিত। এ দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে দেশব্যাপী হস্তক্ষেপ হইলে যে কি কঠিন আন্দোলনই উপস্থিত হয়, তাহা আরাঞ্জীবই নিজ কার্য্যের দোষে দেখিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান বাদশাহগণের কাহাকেও দেখিতে হয় নাই। হিন্দুর মনে পরধর্ম্মে বিদ্বেষ নাই। হিন্দু জানেন যে, কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিতে নাই। বাস্তবিকও কোন "ধর্ম্মমত" মন্দ নহে। সকল ধর্ম্মই মানুষকে ভাল হইতে বলে। ধর্ম্মের নামে অন্যায় করিলেই সে ধর্ম্মের নিন্দা হয়। যাহা হউক, মুসলমান রাজত্বের সময় কি হিন্দু, কি মুসলমান উভয়েই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন। ধর্ম্মই শান্তির বা সুখের নিদান বলিয়া মনে করিতেন। তখনও অর্থকরী বিদ্যা-বৃক্ষের ফল খাইয়া সাধারণের মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঔদাস্য জন্মে নাই। তখন স্বধর্ম্ম-বিরুদ্ধ সকল চেষ্টাই উভয়ের পক্ষেই ভীষণ বলিয়া বোধ হইত।

আক্‌বর শাহের উদার মতবাদ তাঁহার দ্বারা সুন্দররূপে প্রকট হইয়াছিল বটে; কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইবার পর হইতেই হিন্দু মুসলমান পরস্পরের গুণে আকৃষ্ট হইতেছিলেন। অনেকের মনেই বিরুদ্ধ ভাব কমিয়া আসিতেছিল। নানকের সামঞ্জস্য-বিধায়িনী নীতি উক্ত ভাব আরও প্রকট করিতেছিল। যতদিন মোগল সাম্রাজ্যে উদার নীতি চলিতেছিল, ততদিন নানকের মন্ত্রেই কার্য্য হইতেছিল। যখন সেই নীতির পরিবর্ত্তন হইল, তখন মন্ত্রের ব্যাখ্যার একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইল। মন্ত্রের কালোপযোগী ব্যাখ্যা

দিবার উপযুক্ত ব্যক্তিও তখন ভগবৎ-প্রসাদে উপস্থিত! মোগল সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয়ের প্রবলতর আঘাতে ভাঙ্গিয়া না পড়িলে, এই নূতন মন্ত্রেই সমস্ত ভারত প্লাবিত করিত। কিন্তু শীঘ্রই অত্যাচার ফুরাইয়া যাওয়ায় সমগ্র মহাদেশে উক্ত নূতন বীর-মন্ত্রের প্রসার আবশ্যক হয় নাই। আবশ্যক হইলে—অত্যাচার স্থায়িভাবে চলিলে—সমস্ত ভারতবাসীই ঐরূপ মন্ত্রে যে দীক্ষিত হইতেন, সে বিষয়ে আস্তিকের সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়ের বিক্রম, শিখের অভ্যুত্থান, মহারাষ্ট্রীয়ের শক্তি-প্রসারণ প্রভৃতি,—সমস্ত জাতি, সমস্ত ভারতবাসীকে লইয়া ধরিলে আংশিক উত্তেজনা মাত্র। হিন্দুর সম্পূর্ণ বিরাট্ ভয়াবহ মূর্ত্তি কখনই প্রকট হইবার আবশ্যক হয় নাই।

যাহা হউক, সম্রাট্ আরাঙ্গীব স্বধর্ম্ম-প্রচার উদ্দেশে কাশ্মীরের সুবা আফগান সেরকে প্রথমে এইরূপ উপদেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"হিন্দুগণ মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইলে তাহাদের উদ্ধার নাই—প্রকৃত সুখে স্বর্গবাস, মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই পাওয়া যায়। অতএব তুমি প্রথমে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণকে ডাকাইয়া মিষ্টভাষায় বুঝাইবে। আর নানাপ্রকার কর স্থাপন করিয়া প্রজাকে দরিদ্র করিয়া আনিবে, এবং দরিদ্র প্রজাকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইবে। যদি তাহাতেও না হয়, তবে ভয় দেখাইবে।"

সূর্য্যপ্রকাশে এতৎসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

"রঙ্কদেশ ধন হাকম্ লেত। দারিদ্র সারি প্রজানিকেত॥
পঠেও সাহেবকো যব পরওয়ানা। করেও তুর্ক এদেশ মহানা॥
ধন ধরণী লালচ দেখাও। বনহ তুর্ক সবহুঁ সুখ পাও॥"

অর্থাৎ (পূর্ব্ববর্ণিত হুকুম অনুসারে) "ধন সমস্ত হাকিমে লইল।

দেশে দরিদ্রতা প্রবেশ করিল। সকল প্রজা দরিদ্র হইয়া পড়িলে যখন আবার বাদসাহের পরওয়ানা যাইবে, তখন এই সকলকে ধন ও ধরণীর লালসা দেখাইয়া তুর্ক (মুসলমান) করিও; তখন সকলে সুখ পাইবে।”

নদীয়া প্রভৃতি জেলায় ঘোর দুর্ভিক্ষের সময়ে, অন্নকষ্টের সময়ে মিসনরীদের প্রলোভনে পড়িয়া যে অনেক মুসলমান প্রজা খৃষ্টান হইয়াছে, কত দরিদ্র হিন্দু দাক্ষিণাত্যে খৃষ্টান ও নানাস্থানে যে মুসলমান হইয়াছে, তাহা অনেকটাই এইরূপই কারণে—অসহ্য পেটের জ্বালার সময়ে সাময়িক সাহায্যের লোভে। কাশ্মীরে কোন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত ছিল না বলিয়া, বাদসাহ আপনার প্রজাদিগকে সেই দুর্ভিক্ষের অবস্থাপন্ন করিতে আদেশ করিলেন! এ সকল সরল আরবীয়দিগের ধর্ম্ম-প্রচারের ন্যায় সরল উপায়াবলম্বন নহে। রাজধর্ম্ম-পালনে এরূপ অবজ্ঞা, এরূপ কুটিলনীতি, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, কাহারও মতে শ্রীভগবানের প্রিয় হইতে পারে না। আর সেই নিমিত্তই সম্রাট্ আরাঞ্জীবের অনেক গুণ সত্ত্বেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের পুণ্যফলে গঠিত অসামান্য সাম্রাজ্য ভোজবাজীর ন্যায় ক্ষণেকের মধ্যে বিনষ্ট হইয়া গেল। প্রজার দারিদ্র্য দূর করিতে যে রাজা চেষ্টা না করিবেন—প্রজার অন্নকষ্ট সম্বন্ধে যাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি নাই—অপর সহস্র গুণ থাকিলেও তাঁহার সাম্রাজ্যের চিরকালই এই দশা হয়।

তৎপরে বাদসাহের আবার হুকুম গেল,—“যদি নিজ কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণকে মুসলমান করিতে না পার, তবে পাহাড়ের উপরে এখানে ওখানে যে সকল প্রজা থাকে, সেই সকল দরিদ্রদিগকে অগ্রে লও।” এইরূপে যে সকল মুসলমান হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা “ভস্তে মুসলমান” এবং ক্ষত্রিয় হইতে “খক্কে মুসলমান” হইয়াছে। ইহাদিগকে এখন কাশ্মীরের নিকটস্থ প্রদেশগুলিতে

দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীর মধ্যে এখন আর কিছু করিতে না পারিয়া জর্ম্মণ মিসনরীরা যেন এইরূপ নীতির অনুসরণেই পার্ব্বত্য প্রদেশে দরিদ্র কোল, ভীল, সাঁওতালদিগের মধ্যে তাঁহাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে ব্যাপৃত!

যাহা হউক, কাশ্মীরের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণকে মুসলমান করিবার জন্য আবার আদেশ গেল। তখন ব্রাহ্মণেরা এ বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য সময় লইয়া ৺অমরনাথ মহাদেবের নিকট ধর্ণা দিলেন। ৺অমরনাথের স্বপ্নাদেশ হইল যে, তোমরা সকলে গুরু তেগ বাহাদুরের নিকট গমন কর, তিনি ইহার উপায় করিবেন। স্বপ্নে একখানি পত্রও পাওয়া গিয়াছিল। ৺অমরনাথ মহাদেবের চিহ্নস্বরূপ সেই পত্র লইয়া ব্রাহ্মণগণ তেগ বাহাদুরের নিকট গমন করিলেন।

গুরু তেগ বাহাদুর এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। গুরু নানক যে মোগল সম্রাট্ বাবরকে অটল সিংহাসনের আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সাতটি উচ্চ দরের হিন্দুর মস্তক না গেলে মোগল রাজ্যের অধঃপতন হইবে না, সেই কথাটি মনে মনে আলোচনা করিয়া গুরু তেগ বাহাদুর স্থির করিলেন, "আপনা শির দে কুড়ো করে।" (অর্থাৎ সেই সাতটির মধ্যে) আপনার মস্তক দিয়া সেই বাক্য পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিবেন। বাক্য পূর্ণ হইলেই আশীর্ব্বাদের তেজ বিনষ্ট হইবে, এবং হিন্দুর রক্ষা হইবে। স্বদেশ-বৎসল স্পার্টীয়দিগের ইতিহাসে এবং রোমীয়দিগের ইতিহাসে অনেক উদাহরণ আছে যে, বিপদ্‌কালে রাজা বা প্রধান সেনাপতি আত্মোৎসর্গ করিতেন। তাঁহাদের সেই অসাধারণ দৃষ্টান্তে স্বদলের লোকে বীরমদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া জয়লাভ করিত। দেশের উচ্চপদস্থদিগের আত্মোৎসর্গ ব্যতীত

জাতীয় উন্নতি কোথাও কখন ঘটে নাই। মহাত্মা তেগ বাহাদুর সংকল্প স্থির করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিনয়বাক্যে বলিলেন,—"আপনারা দল বাঁধিয়া বাদ্‌সাহের নিকট গমন করিয়া বলুন ঃ—

'হামরে চ্ছত্রি হয় যজমান।
তিন্ করেহেঁ থান আর পান॥'

অর্থাৎ আমাদিগের যজমান ক্ষত্রিয়গণ; উহারা আহার পানীয় যেমন চালাইবে, সেইরূপে চলিব। অতএব ক্ষত্রিয়গণকে আগে ঠিক করিতে বলিবেন এবং 'চ্ছত্রিও বিচমে লেও নাম হামারো।' ক্ষত্রিয়-গণের মধ্যে আমার নাম লইবেন।"

ব্রাহ্মণগণ তদনুসারে চতুর্দ্দিকে সংবাদ দিয়া দলে দলে দিল্লীতে গিয়া সম্রাটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, আপনাদের দুঃখ অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মে আঘাত করায় যে প্রজার সবিশেষ কষ্ট হইতেছে, তাহা জানাইলেন। "সারাবাত লখে নিকট হাকারে।" ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অভিযোগ বুঝিয়া সম্রাট্ ব্রাহ্মণগণকে নিকটে আনাইলেন, এবং মৌলবীগণকে সভাস্থলে উপস্থিত হইতে অনুমতি করিলেন। তদনুসারে সকলে সমবেত হইলে ব্রাহ্মণগণ গুরু তেগ বাহাদুরের কথা অনুসারে ক্ষত্রিয়গণকে অগ্রে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার কথা বলিলেন, এবং প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণের নাম করিবার সময় বিশেষরূপে গুরু তেগ বাহাদুরের নাম করিলেন।

সম্রাট্ আরাঙ্গীব গুরু তেগ বাহাদুরের প্রভাব শুনিয়া এবং হিন্দুগণের মধ্যে তাঁহার এতটা প্রতিপত্তি দেখিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। গুরু উত্তর দিলেন যে, তিনি সত্বরে দিল্লী যাইবেন; কিন্তু বর্ষাকাল বলিয়া পথের কষ্টে পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে। কিন্তু দিল্লীতে গিয়া কিছুদিন থাকিবেন—এই কথা

জানাইলে সম্রাটের দূত চলিয়া গেল। গুরু তেগ বাহাদুর স্বীকৃতিমত আষাঢ় মাসেই আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন—সন্তানকে পাটনা হইতে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আগমনের জন্যও অপেক্ষা করিলেন না।

দশম অধ্যায়।
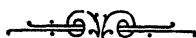
আনন্দপুর পর্ব্ব।

প্রথম পর্ব্বাধ্যায়।

—:*:—

লখ্‌নৌর গ্রামে আগমন।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ধার্ম্মিকের একটি লক্ষণ "নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু"। সুতরাং গোঁড়ামী বা পরধর্ম্মে বিদ্বেষ হিন্দুত্বের বা ধার্ম্মিকের চিহ্ন হইতে পারে না; গুরু তেগ বাহাদুরের পরধর্ম্মে বিদ্বেষ ছিল না। তিনি সম্রাট্ কর্ত্তৃক আহূত হইলে তাঁহার দূতকে বলিলেন,—"তুমি অগ্রসর হও, আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।" দূত চলিয়া গেলে, গুরু স্বীকৃতিমত দিল্লীযাত্রা করিলেন। আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া অনুরক্ত মুসলমান শিষ্য সয়ফাবাদ নগরের প্রতিষ্ঠাতা সায়ফুদ্দীনকে দেখিবার মানস করিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্রও বনবাসযাত্রাকালে প্রথমেই তাঁহার ভক্ত গুহক চণ্ডালের প্রতি কৃপা করিয়া তাহার আলয়ে গিয়াছিলেন। সায়-ফুদ্দীন গুরুকে পাইয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। গুরু তথায় চাতুর্ম্মাস্য শেষ করিয়া পাতিয়ালার রাস্তায় পুনরায় দিল্লী-অভিমুখে গমন করিলেন। এ দিকে সম্রাট্ গুরুর আসিতে বিলম্ব দেখিয়া আনন্দপুরে পুনরায় দূত

গুরুগোবিন্দ সিং:— আনন্দপুরপর্ব্ব।
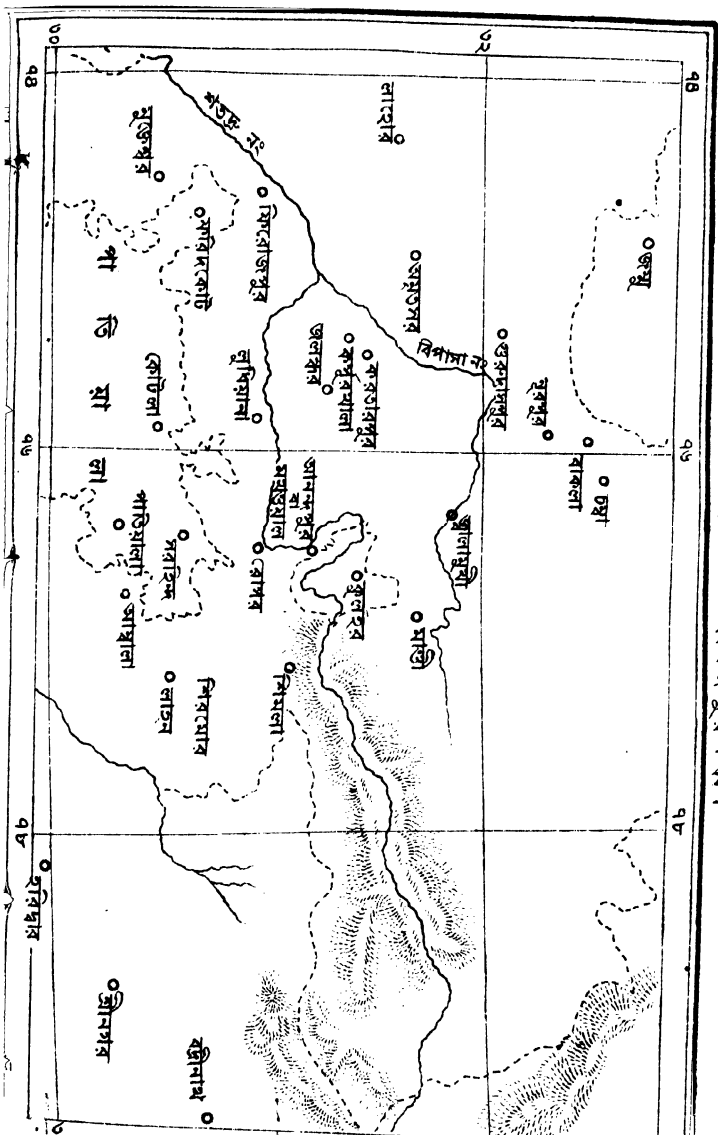
পাঠাইলেন। দূত গুরুকে তথায় না দেখিয়া অমৃতসহরে গেল, এবং সেখানেও গুরুর সন্ধান পাইল না। তখন বাদসার হুকুম্‌ হইল— "যেখানে পাও গুরুকে ধৃত কর।"

এ দিকে তেগ বাহাদুর সয়ফাবাদ ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ সমানা নামক স্থানে পৌঁছিলেন। যে সকল শিষ্যাদি সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে কেবল-মাত্র পাঁচজনকে সঙ্গে রাখিয়া অপর সকলকেই তথায় বিদায় দিলেন। ছয়জনেই অশ্বারোহণে চলিয়াছেন। সমানা গ্রামে আসিলে একজন পাঠান অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া গুরুকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন। এই পাঠান তেগ বাহাদুরকে সয়ফাবাদে দেখিয়া তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। সে সন্ধান পাইয়াছিল যে, গুরু তেগ বাহাদুরকে ধরিবার জন্য সম্রাটের লোক বাহির হইয়াছে। পাছে সম্রাট্‌ কোন প্রকার অত্যাচার করেন, এই ভয়ে সেই পাঠান গুরুকে নিজগৃহে লুকাইয়া রাখিল। সম্রাটের লোক তথায় সন্ধান করিতে আসিলে "হিন্দুর গুরু পাঠানের ঘরে থাকিতে পারে না," ইত্যাদি বলিয়া সে তাহাদিগকে অন্য পথে ঘুরাইয়া দিল। কিছুদিন পরে গুরু তাহার ভবন ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে যদৃচ্ছাক্রমে কহ্লালি, চেকা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া খটকরগাঁওয়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় ভাল পানীয় জল পাওয়া যাইত না; সকল কূপেই ক্ষারা (লবণাক্ত) জল। তথাকার লোকেরা তেগ বাহাদুরের প্রীতি সংবর্দ্ধন করিয়া যাহাতে নিকটস্থ জল সুস্বাদু হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করিলেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যের প্রার্থনা শুনিয়া গুরু সন্তোষচিত্তে সুস্বাদু জলের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে গুরু জীন নগর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আগ্রা সহরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পঞ্জাবস্থ আনন্দপুর হইতে দিল্লী যাইতে যে আগ্রায় কেন আসিলেন, বলা যায় না। তবে পরবর্ত্তী

ঘটনায় বোধ হয়, তিনি হয় ত প্রিয় পুত্র গোবিন্দের সহিত সম্মিলন প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আগ্রায় আসিয়া গুরু আপনাকে এক রাখাল বালক দ্বারা প্রকাশিত করেন, এবং তথা হইতে সম্রাটের ৭০১২ জন সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লীতে নীত হয়েন।

এ দিকে তাঁহার পুত্র গোবিন্দ সিং পাটনা হইতে বাহির হইয়া ক্রমে বারাণসী আসিয়া পৌছিয়া যথাবিহিত স্নান-দানাদি করিলেন। বারাণসীতে বহু শিখ ভক্তের সমাগম হইল। কেহ কেহ গুরুপুত্র গোবিন্দের পাদোদক দ্বারা শিখ মন্ত্রে নূতন দীক্ষিত হইল। কিছুদিন তথায় অতিবাহিত করিয়া গোবিন্দ ক্রমে অযোধ্যা, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থে স্নানাদি করিয়া যমুনাতীরে পৌছিলেন। এমন সময় গুরু তেগ বাহাদুরের প্রেরিত একজন শিখ উপস্থিত হইয়া জানাইল যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দিগের কাতরতায় এবং স্বধর্ম্ম-রক্ষার্থে গুরু সম্রাটের আদেশক্রমে দিল্লীতে গিয়াছেন; এবার তাঁহার আর দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিবার আশা নাই; পুনঃ আদেশ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পুত্রকে লখ্‌নৌর গ্রামে জেঠা নামক মসন্দের গৃহে থাকিতে অনুমতি করিয়াছেন। এই সংবাদে গোবিন্দের পিতামহী নানকী ও মাতা গুজরী শোকার্ত্ত হইলেন। তবে সকলেই গুরুর আজ্ঞানুযায়ী কার্য্যই করিলেন।

সূর্য্য-প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে, এবং শিখদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, গুরু তেগ বাহাদুর দিল্লীতে নীত হইলে সম্রাটের আদেশক্রমে প্রেতের উপদ্রব-সঙ্কুল এক ভবনে তাঁহাকে বাসা দেওয়া হইল। তথায় প্রেতের এতই উপদ্রব হয় বলিয়া প্রকাশ ছিল যে, রাত্রির কথা দূরে থাকুক, প্রাণের ভয়ে লোকে দিনের বেলায়ও সে বাটীতে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না। গুরুকে একাকী সেই ভবনে রাখা হইল। গুরুদিৎ, মতিদাস প্রভৃতি তাঁহার অনুচর পাঁচজনকে সেই

ভবনের বাহিরে স্থান দেওয়া হইল। সূর্য্য-প্রকাশে লিখিত আছে যে, রাত্রিকালে প্রেত যোড়হস্তে গুরুর নিকট আসিল এবং বলিল,—"ভাগ্যোদয় হওয়াতে গুরুর দর্শন পাইলাম। এইবার বোধ হয়, আমি এই পিশাচদেহ ত্যাগ করিতে পাইব। এক্ষণে কি করিব—অনুমতি করুন। যদি অনুমতি হয় ত এখনি আপনার শত্রুগণকে, এমন কি, বাদসাকে পর্য্যন্ত নিধন করি।" এই কথা শুনিয়া গুরু যে কথা বলিলেন, তাহাতে গুরুর মন কিরূপ জ্ঞান-পূর্ণ, দ্বেষ-হিংসাশূন্য, পরম পবিত্র, সত্ত্বগুণ-প্রধান ছিল, তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই যে এই অদ্ভুত রসের অবতারণা, তাহা আমাদের পুরাণ পাঠে অভ্যস্ত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

"শুনি গুরু তেগ বাহাদুর কহো। হামনে দ্বেষী কোই না লহেয়ো॥"

অর্থাৎ (উক্ত কথা) শ্রবণ করিয়া গুরু তেগ বাহাদুর বলিলেন,—"আমার ত দ্বেষী কেহই নাই।" এই কয়েকটি কথাতেই গুরুর মনের ভাব কি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইতেছে!—"আমার বিদ্বেষী কেহ নাই।"—কি পবিত্রতা ও সরলতাপূর্ণ পদার্থই জন্মভূমির উপকারার্থে বলির জন্য স্বেচ্ছায় প্রস্তুত! তান্ত্রিক সাধক ইষ্টদেবতার সমক্ষে নিজকে বলি দিতে উদ্যত! মনে উপাসনার ভাব—বিদ্বেষের সংস্রব নাই। গুরু আরও বলিলেন :—

"নহি কিসে হুঁ সংহারণ বনে। সর্ব্বজীব নিজ ভাগঠ সনে॥
দেব দেত দুঃখ সুখ সব কাহুঁ। এনেহে দোষ অপর কিস মাহু॥
পণ্ডিত মূঢ় রাও আর রঙ্কা। সবকে শিস কালকো ডঙ্কা॥
কর্ম্ম শুভাশুভ যে কর জন্ত। গমহে সঙ্গ হোত যব অন্ত॥
কারণ করণ এককর তারা। তিস্ আগে কেয়া জীব বিচারা॥
মারে রাখে সভকো সোয়। ইয়াতে রহিয়ে তুসন্ হোয়॥"

অর্থাৎ কাহাকেও মারার আবশ্যকতা নাই। সকল জীব নিজ

ভাগ্যানুসারে ভোগ করে। অদৃষ্ট অনুসারে দুঃখ-সুখ পায়—ইহাতে অন্য কাহারও দোষ নাই। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী ও নির্ধন সকলকার মাথায় কাল ঘুরিতেছে। জীব যে শুভাশুভ কর্ম্ম করে, অন্তে তাহাই সঙ্গে যায়। ঈশ্বর একমাত্র কারণ-করণের কর্ত্তা। তাঁহার অগ্রে জীবের কি অধিকার? মারে রাখে সেই একমাত্র ভগবান্। ইহাতে নিস্তব্ধ থাকাই ঠিক।

সূর্য্য-প্রকাশ বলেন যে, প্রেত এই সকল জ্ঞানপূর্ণ বাক্য শুনিয়া দিব্য গতি প্রার্থনা করিল, এবং পরে তাহার স্পৃষ্ট মিঠাই প্রভৃতি দ্রব্য লইবেন কি না, সন্দেহ করিয়া গুরুর প্রীত্যর্থে কিছু মেওয়া ফল আনিয়া দিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে গুরুকে অক্ষত দেখিয়া বিস্মিত হইল। শিখদিগের দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, এই সময়ে তাঁহার শিষ্য পাঁচজনের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া নিজকে এত বলশালী মনে করিয়াছিল যে, দম্ভ করিয়া দিল্লী সহর উল্টাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু গুরু তাহাদের অঙ্গে হস্ত দিয়া বলহরণ পূর্ব্বক দর্প চূর্ণ করেন।

আনন্দপুর পর্ব্ব।

দ্বিতীয় পর্ব্বাধ্যায়।

লখ্নৌর গ্রাম পরিত্যাগ।

গোবিন্দ লখ্নৌর গ্রামে জেঠা নামক মসন্দের গৃহে মাতা ও পিতামহীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। পাটনা হইতে যে সকল লোকজন ও অশ্বযানাদি আসিয়াছিল, সে সমস্ত মাতুল কৃপালের সঙ্গে আনন্দপুর পাঠাইয়া দিলেন। পিতৃভক্ত গোবিন্দ নিজে পিতার জন্য ব্যাকুল থাকিলেও মাতা ও পিতামহীকে নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য কহিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়স নিতান্ত অল্প—তের চৌদ্দ বৎসর মাত্র। বংশগুণে শিষ্যাদির নিকটে নরলোকাতীত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাল্যক্রীড়ার বয়স তখনও যায় নাই। তিনি লখ্নৌর গ্রামে অবস্থানকালে তথাকার বালকগণের সঙ্গে খেলা করিতেন। খেলার মধ্যে—গুলি-ডাণ্ডা, হাঁডুডুডু, গাছে ঝোলা; গুল্‌তি, তীর, তরবারি লইয়া মধ্যে মধ্যে শিকার খেলারও উল্লেখ আছে।

একদিন লখ্নৌর গ্রামের মাঠে গোবিন্দ বালকগণের সঙ্গে গুলি-ডাণ্ডা খেলিতেছেন, এমন সময় মীরদীন নামক একজন মুসলমানকে সঙ্গে করিয়া ফকীর ভীক্ষা তথায় উপস্থিত হইলেন। এই ভীক্ষা গুরুগোবিন্দের জন্মের পরই পাটনায় গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস সেই অঞ্চলে সিয়ানা গ্রামে। কখন কখন কোড়া গ্রামে থাকিতেন। ভীক্ষার মনে ধারণা হইয়াছিল যে, মোগলরাজ্য প্রায় শেষ

হইয়া আসিয়াছে; অতঃপর শিখগুরুগণ সম্রাট্ হইবেন। তন্মধ্যে গুরুগোবিন্দ সিংই প্রথম সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেন। ভীক্ষা গোবিন্দের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে সেই সুন্দর বালককে আদর করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার প্রতি কৃপা রাখিতে বলিলেন। এই সকল দেখিয়া ভীক্ষার সঙ্গী মীরদীন ভীক্ষাকে বলিল,—"তুমি ক্ষেপিয়াছ না কি? হিন্দু বালককে ওরূপ করিতেছ কেন?" তদুত্তরে ভীক্ষা বলিলেন,—"ইঁহাকে সামান্য মানুষ মনে করিও না। ইনি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর।"—এইরূপ বলিতে বলিতে গোবিন্দের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যে ঠশ্‌কা নামক গ্রামখানি সম্রাটের নিকট নিষ্কররূপে পাইয়াছেন—গোবিন্দ সম্রাট্ হইলে যেন তাঁহার সেই গ্রামখানি হস্তান্তরিত না হয়। গোবিন্দ ঈষৎ হাসিয়া তথাস্তু বলিলেন; মীরদীনের সহিত ভীক্ষা চলিয়া গেলেন।

যখন গুরু তেগ বাহাদুর প্রথমে তীর্থ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন তিনি সপরিবারে এই অঞ্চল দিয়া গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় গুজরী দেবীর দাসীকে ঘোগা নামক একজন মসন্দ হরণ করে। তদবধি সেই মসন্দ গুরুর নিকট অপরাধী থাকে। এক্ষণে গুরুপুত্র গোবিন্দকে নিকটে পাইয়া সে অপরাধ ক্ষালনের আশায় তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিল, এবং তাহার ঘর-বাড়ী ও তাহার গ্রামের জল-বায়ু, লখ্‌নৌর গ্রামের জল-বায়ু অপেক্ষা যে ভাল, তাহা জানাইল। লখ্‌নৌর গ্রামের কূপের জল ভাল ছিল না; সে জন্য গোবিন্দের সে গ্রামটিতে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। তিনি ঘোগা মসন্দের প্রস্তাব মাতাকে জানাইলেন। মাতা গুজরী ঘোগাকে নামে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি বর্ত্তমান অবস্থায়—(স্বামী দিল্লীতে নির্য্যাতনের অবস্থায় রহিয়াছেন, এবং জেঠা মসন্দের নিকট তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে

স্বচ্ছন্দে আছেন বলিয়া) অন্যত্র যাইতে মত করিলেন না। গোবিন্দ লখনৌর গ্রামের জল ক্ষারা বলিয়া যোগা মসন্দের গ্রামে যাইতে মত করিয়াছিলেন। কিন্তু গুজরী দেবীর আজ্ঞানুসারে জেঠা মসন্দ একটি নূতন কূপ খনন করাইল, এবং তাহার জলও বেশ স্বাদু হইল। তাহার নাম "গুরুকা কূয়া"।

গুরুগোবিন্দ এইরূপে লখনৌর গ্রামে দিনযাপন করিতেছেন। মৃগয়াদি উপলক্ষে স্থানটির চারিদিক্ দেখিয়া লইতেছেন। এদিকে দিল্লীতে সম্রাট্ আরাঙ্গীব গুরু তেগ বাহাদুরকে দরবারে ডাকাইলেন এবং বলিলেন,—"জানিলাম, তুমি হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে সকলে হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। তুমি হিন্দুদিগের গুরু বা পীর। অতএব তুমি হয় তোমার ধর্ম্মের কোন কেরামত (লীলা) দেখাও, অথবা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ কর।" গুরু বলিলেন,—"কেরামত (লীলা) কি দেখাইব? সমস্ত প্রকৃতিতে ভগবানের লীলা অপেক্ষা আর বিচিত্র লীলা কি হইতে পারে? (অর্থাৎ প্রত্যহ যথাসময়ে সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ-পিণ্ডের উদয় ইত্যাদি অপেক্ষা বিচিত্র লীলা আর কি হইতে পারে?)। কেরামত (লীলা) দেখাইবার কিছুই নাই। বেদিয়ার ন্যায় মিথ্যা ভেল্কী দেখান বা বিধাতার নিয়ম-বহির্ভূত কোন কার্য্য করিয়া দেখান আমি উচিত মনে করি না। আর স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ কাহারই উচিত নহে। এই জন্য আমি সম্রাটের অনুজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলাম না।" তখন সম্রাটের আজ্ঞানুসারে গুরু তেগ বাহাদুর কারাগারে নীত হইলেন।

গুরু তেগ বাহাদুরের কারাগারে অবস্থানকালে শিখগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি কোন কোন শিখের বাড়ী গমন করিয়া আহার গ্রহণ করিয়া আসিতেন।

তিনি কি প্রকার উপায়ে কারাগার হইতে বাহির হইয়া যাইতেন, তাহা বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, রক্ষিগণ তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিত। শিখেরা বলেন, তিনি ভগবচ্ছক্তি দ্বারা যত্র তত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হইতেন। তিনি কামাখ্যায় গিয়াছিলেন ও তান্ত্রিক সাধনা করিতেন। অনেকের মত এই যে, তিনি তান্ত্রিক সাধনার বলেই যত্র তত্র ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারিতেন।

শিখেরা বলেন,—কোন সময় গুরু তেগ বাহাদুর শিষ্যালয়ে ভোজনার্থ গমন করিতেছেন, এমন সময় সম্রাটের চর সেই সংবাদ সম্রাট্‌কে প্রদান করিলে দেখা গেল, সে সময় তেগ বাহাদুর কারাগারে রহিয়াছেন। এক ব্যক্তির উভয় স্থানে থাকা সম্ভব নয় বলিয়া সম্রাট্ আর কোন প্রকার হুকুম দিলেন না বটে, কিন্তু সন্দেহ প্রযুক্ত কারারক্ষকদিগের প্রতি কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিলেন। বিদ্বেষ-বুদ্ধি-পরবশ গোঁড়ারা, এবং সম্রাটের খলস্বভাব তোষামোদকারিগণ দেখিলেন যে, গুরুর ত কিছুই হইল না—কারাগারে থাকা নাম মাত্র; তিনি যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে-ছেন। তখন সম্রাট্‌কে পরামর্শ দেওয়া হইল, গুরুকে হিন্দুর ধর্ম্ম মতে অখাদ্য দ্রব্য ভোজন করান হউক। তদনুসারে উক্ত গোঁড়ারা কারাগারে মুসলমানী খানা লইয়া গিয়া গুরুকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। গুরু স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য সহকারে খানা খাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

সূর্য্য-প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই সময়ে বলপূর্ব্বক গোমাংস খাওয়াইতে ইচ্ছা করিয়া উৎপীড়কগণ খানার পাত্রের ঢাকন খুলিলে পাত্রের উপর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শূকর-শাবক মাত্র রহিয়াছে, এইরূপ দেখিলেন। তখন মোল্লাগণ পলাইয়া সম্রাট্‌কে এই বিভ্রাটের সংবাদ দেন। সম্রাট্ বলিয়া পাঠান যে, হিন্দুর গুরু প্রথমে কেরামত (লীলা) দেখাইবেন না বলিয়াছিলেন, এক্ষন তাহা দেখাইতেছেন; ইহাতে বুঝা

গেল যে, হিন্দুর গুরু মিথ্যাবাদী। এক্ষণে তিনি ঐ সকল মিথ্যা ত্যাগ করিয়া, গুরুবংশীয় রামরায় যেমন নানাপ্রকার লীলা দেখাইয়া সম্রাটের সহিত মিল রাখিয়া চলিয়াছেন, হয় সেইরূপে চলুন, নতুবা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করুন। তাহা হইলে তাঁহাকে যথেষ্ট ধন-দৌলত, এমন কি, পরম রূপবতী সম্রাট্-কুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত দিয়া চিরকালের জন্য সুখী করা যাইবে। গুরু নৈসর্গিক ধীরতা সহকারে বলিলেন যে, তিনি কোন লীলাই দেখান নাই। মোল্লাগণ তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে আসিয়াছিলেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্মে ব্যাঘাত করিলে সকলেরই মনে কত কষ্ট হয়! পরের মন্দ করিতে গেলে আপন মন্দ আগে হয়—এই নৈসর্গিক নিয়মই ইহাতে প্রতিপালিত হইয়াছে মাত্র; তিনি নিজে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই।

এই সময় গুরুর যে পাঁচজন শিষ্য সমভিব্যাহারে ছিলেন, তাঁহারাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। উঁহাদের মধ্যে মতিদাস নামক শিষ্য গুরুর প্রতি প্রযুক্ত দু' চারটি অপমানসূচক কথা মোল্লাদিগের মুখে শুনিয়া গুরুকে বলেন,—"আপনি এত অপমান কেন সহ্য করিতেছেন? ইচ্ছা করিলে ত এখনি সকল মুসলমানের মাথা ফাটাইয়া দিতে পারেন; অন্ততঃ যে পাপিষ্ঠ আপনাকে এ অবস্থায় রাখিয়াছে, তাহাকে উচ্ছন্ন দিতে পারেন।" মোল্লাগণ মতিদাসের কথা শুনিয়া চলিয়া গেলেন, এবং সম্রাট্‌কে গিয়া সংবাদ দিলেন। গুরু তেগ্ বাহাদুর মতিদাসকে বুঝাইতে লাগিলেন, "বৎস! তোমার এখনও ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই।—মান, অপমান, সুখ, দুঃখ এ সকলে সমান জ্ঞান কর। ইহারা আমার মস্তক গ্রহণ করিবে; গুরু নানকের আজ্ঞানুসারে মস্তক দান না করিলে তাঁহার আশীর্ব্বাদের তেজ নষ্ট হইবে না। সেই সঙ্কল্প সাধন করিতে বসিয়া তাহা হইতে বিচলিত হইতে পারি না।" এইরূপে গুরু শিষ্যকে বুঝা-

ইতেছেন, এদিকে সম্রাট্ মোল্লাগণের মুখে শুনিলেন যে, মতিদা- তাঁহাকে পাপিষ্ঠ বলিয়াছে। শুনিয়াই ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার মস্তক চিরিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। সম্রাটের আজ্ঞানুসারে গুরু ও অপর চারিজন শিষ্যের সমক্ষেই মতিদাসের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল।

এই ভীষণ দৃশ্যে বাকী শিষ্য চারিজন ভয় পাইল। তাহারা রাত্রিতে ভীতিব্যঞ্জক স্বরে গুরুকে বলিল,—"দেখিতেছি, এইরূপে আমাদের প্রাণটা যাইবে!" গুরু বলিলেন, "যদি ভয় হইয়া থাক, তবে এখনি পলাও; কারাগারে কেহ তোমাদের আবদ্ধ রাখিবে না।" গুরুর কথায় তাহাদের মন দোদুল্যমান হইল। যাইব কি না, তাহা ভাবিতে লাগিল। তখন গুরু দেখিলেন যে, ভীত হইলেও শিষ্যেরা চক্ষুলজ্জায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছে না। তিনি সকলের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, কপটতা জানিতেন না। সরল ভাবেই চিন্তা করিয়া দেখিলেন, আমার কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য উহাদের যাইতে বলিলেই উহারা আমাকে এ অবস্থায় রাখিয়া যাইতে পারিবে, নচেৎ পারে না। সকলকেই বলিলেন,—"লখ্‌নৌর গ্রামে গিয়া জেঠা মসন্দরের বাটীতে গোবিন্দের নিকট এখানকার বৃত্তান্ত বলিবে, এবং লোকহিতার্থে মোগল সম্রাটের তেজ নষ্ট করিবার জন্য মস্তক-দানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, ইহা গোবিন্দকে জানাইবে। অতঃপর উহাদের সকলকে আনন্দপুর যাইতে বলিবে।"

এইরূপে বাকী চারিজন শিষ্যের মধ্যে তিনজন লখ্‌নৌর নগর যাত্রা করিল। চতুর্থ ব্যক্তি কিছুতেই গুরুর সঙ্গ ছাড়িল না। তিনজন শিষ্য লখ্‌নৌর পৌঁছিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক সকলকে আনন্দপুর গমন করিতে বলিলেন। নানকী ও গুজরী শোক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তেজঃপুঞ্জ ক্ষত্রিয়-তনয় গুরুগোবিন্দ মাতা ও পিতামহীকে বলিলেন,

"গুরু মহারাজ ভবিষ্যৎ বাণী উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় ঘটিবে। তাঁহার কথার অন্যথা হইবে না। কিন্তু আমি ইহার প্রতিশোধ লইব। আমি তুর্কের মূলদেশ একবারে উত্তোলন করিব ("কঁরো তুরকৃকে জড় উখ্‌রনা।") বালকের এবংবিধ প্রতিজ্ঞা বারংবার শুনিতে শুনিতে নানকী ও গুজরীর হৃদয়ে তুর্করাজের ভয় উদয় হইতে লাগিল। তাঁহারা আপনাদের শোক গোপন করিয়া বালককে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

গুরুগোবিন্দ দিল্লী হইতে প্রেরিত লোক দ্বারা গুরু তেগ বাহাদুরকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিয়া দিলেন যে, অতঃপর যেন সেই লোক আনন্দপুর গিয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিতে থাকে। দিল্লীর লোক বিদায় হইলে গুরুগোবিন্দ আনন্দপুর হইতে মাতুল কৃপালকে এবং পাল্কী, ঘোড়া প্রভৃতি যান আনাইয়া আনন্দপুর যাত্রা করিলেন। জেঠা মসন্দ প্রভৃতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গুজরী নানকী পাল্কীতে এবং গোবিন্দ ও কৃপাল অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিলেন। গোবিন্দ তরবারি, বাজপক্ষী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়াছিলেন। পথিমধ্যে মৃগয়া উপলক্ষে সমস্ত দেশটি দেখিতে দেখিতে কীরতপুরে গিয়া পৌছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিখ-সমাগম হইতে লাগিল। কীরতপুরে তখন গুরু হরগোবিন্দের পুত্র সূর্য্যমলের পৌত্রগণ বাস করিতেছিলেন। গুরু তেগ বাহাদুরের পুত্র গোবিন্দ আসিয়াছেন শুনিয়া, সূর্য্যমলের পৌত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন—পরিচয় হইল। নানকীকে দেখিয়া সকলেই প্রণাম করিলেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয় বশতঃ গোবিন্দকে তথায় একদিন অবস্থান করিতে হইল। পরদিন প্রাতঃকালে আনন্দপুর যাত্রা করিলেন। কীরতপুর হইতে আনন্দপুর পাঁচ ক্রোশ মাত্র দূরে; সুতরাং সেই দিনেই পৌছিলেন।

———

আনন্দপুরপর্ব্ব।

তৃতীয় পর্ব্বাধ্যায়।

আনন্দপুরে অবস্থান।—তেগ বাহাদুরের দেহত্যাগ।

তেগ বাহাদুর যখন দিল্লীতে আবদ্ধ, সেই সময়ে গোবিন্দের প্রেরিত শিখ তথায় পৌঁছিল। সম্রাটের আদেশ ক্রমশঃ কঠোর হইয়া উঠিতেছিল। গুরু তেগ বাহাদুর যে বাটীতে বদ্ধ ছিলেন, তিনি তাহার ছাদে পাদচারণা করিতেন। সেই স্থান হইতে বেগম মহলের দিকে তিনি উঁকি মারেন, এই অপবাদ দিয়া তাঁহার উক্ত বেড়ানটুকুও বন্ধ করা হইল। কথিত আছে যে, পবিত্রচরিত্র গুরু উক্ত মিথ্যা অপবাদের উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"আমি বেগমদিগকে দেখিতেছি না; ওদিকে কখনও চাহিয়া দেখি নাই; কিন্তু যাহারা বাদশাহী বেগমদিগকে দেখিবে, তাহারা কতদূর আসিল—তাহাই অন্যদিকে দেখিতেছি।" শিখেরা বলেন যে, উক্ত কথাদ্বারা ইংরাজদিগের বোম্বাই অঞ্চলে বদ্ধমূল হইবার বিষয়, এবং পরে উহাদের মিউটিনির সময় বাদশাহের প্রাসাদ অধিকারের কথা সূচিত হইয়াছিল। যাহা হউক, কঠোরতর আদেশ ক্রমশই আসিতে লাগিল। তেগ বাহাদুরের সহিত শিখমাত্রেরই দর্শন নিষেধ হইল। কিন্তু "বত্রিশ বন্ধনে ফস্কা গিরা"—অকারণে অতিরিক্ত অন্যায় অত্যাচার হইলে, দৌরাত্ম্যকারীর নিজের কর্ম্মচারীরাও উহাতে অল্প অল্প দোষ দেখিতে থাকে, এবং পূর্ণ মাত্রায় সাহায্য করে না। মীর

কাসিমের ও নানা সাহেবের বন্দি-হত্যার আদেশ তাহাদের সৈনিক কর্ম্মচারীরা প্রতিপালন করে নাই; সে কর্ম্মের জন্য অন্য লোক খুঁজিতে হয়, এবং সেরূপ লোক সংগ্রহ অনেক কষ্টেই হইয়াছিল। এখানেও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাট্ আরাঙ্গীবের আদেশ পবিত্রচরিত্র গুরু তেগ বাহাদুরের বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রায় প্রতিপালিত হইল না। গুরুর গুণে কারারক্ষকগণ মুগ্ধ হইয়া কতকটা শিখদিগেরই ন্যায় তাঁহাকে ভক্তি করিতেছিল। হিন্দু মুসলমান উভয়েই মূলতঃ পরার্থদৃষ্টি ও ঐহিকতাশূন্য বলিয়া সন্ন্যাসী ও ফকীরমাত্রেই উভয়েরই নিকট প্রায় সমভাবে শ্রদ্ধার আস্পদ। রক্ষীরা স্থির বুঝিয়াছিল যে, গুরু তেগ বাহাদুর পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলে কেহ তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না; কিন্তু পাছে তাহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট হয়, এই নিমিত্ত তিনি যে পলাইবেন না, সে কথা তিনি তাহাদিগের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাহারা তাহাতে সম্পূর্ণরূপেই বিশ্বাস করিয়াছিল। তাহারা কেবল চাকরী রক্ষা করিবার জন্য যেটুকু বাহ্যিক কড়াকড়ি আবশ্যক, তাহাই করিত; নচেৎ গুরুর আজ্ঞা-প্রতিপালনই যেন তাহাদের প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই জন্য গুরুগোবিন্দের প্রেরিত শিখের সহিত তেগ বাহাদুরের সহজেই দেখা হইল। তিনি সেই শিখের নিকট হইতে বৃদ্ধা মাতার ও অন্যান্য সকলের বিবরণ জানিয়া সকলকে যথাযোগ্য সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক পরে সাতান্নটি শ্লোকে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রের শেষ ভাগে গোবিন্দকে লিখিয়াছিলেন :—

"বল ছুটক্যো বন্ধন পরে কছুন হোত উপায়।
কহু নানক অব ওট হরি গজিজ্যো হোহি সহায়॥"

অর্থাৎ বল ছুটিয়াছে, বন্ধন পড়িয়াছে, কোন উপায় হইতেছে না।

নানক বলিতেছেন, এখন হরি যেরূপ নিজে গজকে *বল দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই প্রকার যদি করেন—তবে হয়।

উক্ত পত্রের উত্তরে গুরুগোবিন্দ লিখিয়াছিলেন :—

"বল হোয়া বন্ধন ছুটে সভ কিছ্ হোত উপায়।
নানক সভা কিছ্ তুমরে হাথ মৈ তুমহী হোত সহায়॥"

অর্থাৎ বল হয়, বন্ধন ছিন্ন হয়, সকলের কিছু উপায় হয়। হে নানক! সকল কেবল তোমারই হাত, যদি 'তুমি' সহায় হও।

গুরু তেগ বাহাদুর বালকের এই উত্তরে বালকের ধর্ম্মে ও গুরুতে ঐকান্তিক বিশ্বাস ও উদ্যম-প্রবণতা উপলব্ধি করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই দুই শ্লোকে নিজের বা সে সময়ের অবস্থার সামান্য উল্লেখ দেখা যায়, নতুবা তেগ বাহাদুরের রচনার সকলগুলিই পরমার্থ-বিষয়ক। তিনি অকারণে ডাকাইত বা রাজদ্রোহী বলিয়া কাহার কাহার দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন। তবে নিরীহ হইলেও শক্তিশালী লোককে রাজদ্রোহী বলা এ জগতে নূতন নয়। যাহা হউক, গোবিন্দের উত্তর প্রাপ্ত হইলে গুরু তেগ বাহাদুর একটি নারিকেল আনাইয়া এবং তৎসঙ্গে পাঁচটি পয়সা দিয়া যথাবিহিত গুরুশক্তি সমেত গুরুপদ গোবিন্দকে অর্পণ করিয়া স্বীয় দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন ; ঐ পাঁচটি পয়সা ও নারিকেলটি লইয়া শিখ আনন্দপুর যাত্রা করিল।

এদিকে পিতৃভক্ত গোবিন্দ পিতার দেহত্যাগের সময় সন্নিকট-বর্ত্তী বুঝিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। রত্রিতে নিদ্রা নাই—

* কুম্ভীরে ধরিলে নিরুপায় হস্তী শ্রীহরির চরণে হৃৎকমল উৎসর্গ করায় উদ্ধার পাইয়াছিল। গঙ্গাগণ্ডকের সঙ্গমে হরিহরছত্রের মেলাস্থলে ঐ ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

চক্ষে আর জল ধরিতেছে না; কিন্তু তখনও বৃদ্ধা পিতামহী, মাতা এবং শিষ্যগণের সমক্ষে স্থির গম্ভীর। তিনি প্রত্যহ নিয়মিত প্রাতঃস্নান করিতেন, কিন্তু যে দিন অপরাহ্নে দিল্লী হইতে শিখ নারিকেলটি ও পয়সা পাঁচটি আনিল, সে দিন প্রাতঃস্নান করেন নাই। পূর্ব্বদিন রাত্রিতে গুজরী রাণী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন,—যেন গুরু তেগ বাহাদুর নিয়মিত একটি নারিকেল ও পাঁচটি পয়সা দিয়া গোবিন্দকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহার দেহে মস্তক নাই। নিশি-শেষে এই ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া পুত্রের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, গোবিন্দও কেমন আলু থালু অবস্থায় রহিয়াছেন। তখন তিনি পুত্রকে স্বপ্নের কথা জানাইলেন; দিল্লীর আর কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় একজন শিখকে তথায় প্রেরণ করিতে বলিলেন। মাতা গুজরীর আজ্ঞায় একজন শিখ অবিলম্বে দিল্লীতে প্রেরিত হইল। তাহার সহিত উক্ত নারিকেল ও পয়সা-বহনকারী শিখের পথে সাক্ষাৎ হইল বটে; কিন্তু যেরূপ আজ্ঞা ছিল, তদনুসারে সেই শিখ দিল্লীতে গমন করিল। তেগ বাহাদুরের সঙ্গে এই শিখের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি তাহাকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে, সত্বরেই তাঁহার মস্তক উহার ঝুলিতে পড়িবে, আর মস্তক ঝুলিতে পড়িলেই উহা লইয়া যেন সে সত্বরে আনন্দপুর চলিয়া যায়।

এদিকে "একে মনসা তাহাতে ধূনার গন্ধ"; একে আরাঞ্জীব সম্রাট্, তাহাতে তোষামোদকারী গোঁড়া মোল্লা ও ওমরাওগণের উত্তেজনা-বাক্য! সুতরাং নিত্য নূতন অত্যাচারের ব্যবস্থা হইতেছে। বলা বাহুল্য, খোদ আরাঞ্জীবকে আর প্রায় কার্য্য-ক্ষেত্রে দেখা যাইত না। এখন কেবল তিনি হুকুম দিতেছেন, এবং তোষামোদকারী গোঁড়াদিগের

মুখে সংবাদ লইতেছেন। নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া অবশেষে সম্রাটের অনুজ্ঞা অনুসারে মোল্লা ও ওমরাওগণ কারাগৃহে তেগ্‌ বাহাদুরের পিঞ্জরের নিকটে আসিয়া বলিল :—

(১ম) "সারা ছোড়ো"—হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ কর, মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ কর, সকল প্রকার ভোগ-সুখ পাইবে। অথবা—

(২য়) "কারামাত দেও"—লীলা দেখাও, তাহা হইলে গুরুবংশীয় রামরায় যেমন সম্রাটের একজন পারিষদের ন্যায় হইয়া আছেন, সেইরূপ থাকিতে পাইবে। নতুবা—

(৩য়) "আপনা প্রাণ হানো"—আপনার প্রাণহানি কর অর্থাৎ প্রাণদণ্ড গ্রহণ কর।

গুরু তেগ বাহাদুর ধীরভাবে উত্তর করিলেন :—

"উত্তর ভণেও ধরম হাম হিন্দু।"
অৎপ্রিয় কো কিম্ করহেঁ নিকন্দু॥"

অর্থাৎ আমার হিন্দু-ধর্ম্ম অতি প্রিয়। কিরূপে উহাকে পরিত্যাগ করিব?—গুরু আরও বলিলেন :—

"কারামাত কা নাম করহ হ্যায়।
করে না শন্ত সমান সেহর হ্যায়॥
কর আজ্‌মত দেখরায় উদারা।
গুনেহ্‌গার দরগায় মাঝারা॥
নিজ নিজ ধরম সভন কো প্যারে।
যো জিস্ ধরত সো তিস্ তারে॥
হামতো দোনা বাত না মানেঃ।
করহ সাহ যএসে মন্ জানেঃ॥"

অর্থাৎ কারামত বা অদ্ভুত লীলার নাম যাদুগিরি। সাধুগণ এরূপ

কার্য্য করেন না। যে এরূপ অদ্ভুত খেলা দেখায়, সে ঈশ্বরের দ্বারে দোষী হয়। নিজের নিজের ধর্ম্ম সকলেরই প্রিয়। যে আপনার ধর্ম্ম ধরে, তাহার ধর্ম্মই তাহাকে ত্রাণ করে। সুতরাং আমি ঐ দুই কথা শুনিতে পারি না। এক্ষণে বাদশাহের যাহা মনে হয়—করুন।

তথা গুরু গ্রন্থে :—

"নাটক চেটক কিয়ে কু কাজা।
প্রভুলোগনকো আবৎলাজা।"

অর্থাৎ নটের মত চটক দেখান কু-কর্ম্ম। ইহাতে প্রভুর দাস বা ভক্ত লজ্জা পায়।

গুরু তেগ বাহাদুর এইরূপ উত্তর দিয়া মোল্লা ও ওমরাওগণকে বিদায় করিলেন।

তৎপরে সম্রাট্‌সভায় পরামর্শ হইল যে, সর্ব্বজন-সমক্ষে গুরুর প্রাণনাশ করাই যুক্তি-সঙ্গত। তাহা হইলে জনসাধারণে ভয় পাইবে, এবং অনেকে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। এইরূপ যুক্তির পর পূর্ব্ববারের ন্যায় মোল্লা ও ওমরাও দ্বারা গুরুকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তাঁহার নাম 'তেগ বাহাদুর' কেন? তিনি এমন কি বাহাদুরী করিয়াছেন যে, ওরূপ নাম ধারণ করিলেন?" তদুত্তরে গুরু বলিলেন,—"তেগ শব্দের অর্থ তরবারি। যদি উত্তম শাণিত খোরাসানী তরবারিতে কাগজ বাঁধিয়া তাঁহার অঙ্গে আঘাত করা হয়, তাহা হইলে কাগজ ও উহার বন্ধন দড়ী কাটিবে না।" এই কথায় মোল্লা ও ওমরাওদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে বুঝিয়া তাঁহারা সম্রাট্‌কে পরামর্শ দিলেন, এ বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হউক। সম্রাট্‌ও অনুকূলে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন পিঞ্জরাবদ্ধ গুরু তেগ বাহাদুরকে চাঁদনী-চৌকের বাজারে আনিয়া সর্ব্বজন-সমক্ষে বলিদান দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে মাঘ

মাসের শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত-পঞ্চমীর দিন বেলা একটার সময় বাজারের বৃক্ষতলে গুরু জপজী পাঠ করিয়া প্রণাম করিতেছেন, এমন সময়ে জল্লাদ অসি-সহ হস্ত উত্তোলন করিবামাত্র গুরুর মুণ্ড যে কোথায় গেল, কেহ দেখিতে পাইল না। ঠিক সেই সময়ে আঁধি বা ধূলিপূর্ণ ঘূর্ণবায়ু আসিয়া সকলের দৃষ্টিরোধ করিল। যে শিখ মুণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে মুণ্ড পাইয়া আনন্দপুর-অভিমুখে যাত্রা করিল। হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হইবে দেখিয়া দেবগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য-প্রকাশ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"হায় হায় হায় সভ জগত ভয়েও জয় জয় জয় সুরলোক।"

তৎপরে গুরু তেগ বাহাদুর স্বর্গীয় বিমানে চড়িয়া সর্ব্বোপরি যে "সচ্‌খণ্ড," সেই সত্য-লোকে চলিয়া গেলেন। সম্রাট্ গুরুর মস্তকের জন্য নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি গুরু তেগ বাহাদুরের মুণ্ড আনিয়া দিতে পারিবে, সে বিশেষরূপ পুরস্কার পাইবে। মুণ্ডের সন্ধান হইল না; ধড় পড়িয়া রহিল। সাধারণ শিখগণ সম্রাটের ভয়ে ভীত হইল। মুণ্ড উড়িয়া যাওয়ায় সাধারণের মনেও কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। ধড় স্থানান্তরিত করিবার জন্য শিখগণের হৃদয়ে ব্যাকুলতা জন্মিল, কিন্তু সম্রাটের ভয়ে কেহ প্রকাশ্য-ভাবে সে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিল না। অবশেষে একজন লবানা অর্থাৎ বল্‌দে শিখ বহুসংখ্যক পণ্যদ্রব্যবাহী বলদ সহ যে স্থানে গুরুর মৃতদেহ ছিল, সেই স্থান দিয়া যাইবার সময় ধড়টি লইয়া সহরের বাহিরে পলায়ন করে। তথায় তাহার একখানি সামান্য চালা বা খাপ রেলের গৃহ ছিল, সে সেই গৃহের দ্রব্যাদি সরাইয়া গুরুর মৃতদেহ সমেত গৃহখানি দাহ করিয়া দিল। ধড়টি আনিবার সময় ঘূর্ণবায়ু

হইয়াছিল, এবং অনেক বলদ চলিতেছিল বলিয়া ধূলিও উড়িতেছিল। এই সকল গোলযোগে কিরূপে যে ধড় চলিয়া গেল, তাহার সন্ধান রাজপুরুষেরা করিতে পারিলেন না।

ইউরোপীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের বর্ণনা, এবং তাঁহাদের বর্ণনা অনুসারে যে সকল এতদ্দেশীয় ব্যক্তি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন গুরু তেগ বাহাদুর যখন আনন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া আইসেন, তখন গুরুগোবিন্দ তথায় ছিলেন। তিনি স্বয়ং আপন পুত্রকে পিতৃদত্ত তরবারি দিয়া বলিয়া আসিয়াছিলেন, "এবার দিল্লী হইতে আর প্রত্যাগমন করিবার আশা নাই। দেখিও, যেন তরবারির মর্য্যাদা রক্ষা হয়। আমার রক্ত যেন বৃথা না যায়, এবং আমার দেহ যেন নিতান্ত শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য না হয়।" এইরূপ বাক্য বলিয়া সন্তানকে গুরুপদ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তৎপরে দিল্লীতে আসিয়া কিছুদিন তাঁহাকে নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, আরাঙ্গীব তাঁহাকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য,— কেহ বলেন, আদম হাফিজের সহিত যোগ দিয়াছিলেন বলিয়া,— তাঁহাকে কষ্ট প্রদান করেন। পরে সম্রাট্ আরাঙ্গীবের অনুজ্ঞা অনুসারে প্রকাশ্য রাজসভায় তাঁহার শিরশ্ছেদ ক।া হয় এবং অবশেষে মস্তকহীন দেহটি রাজপথে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু এই প্রকার কথাগুলির অপেক্ষা সূর্য্য-প্রকাশে লিখিত ঘটনা অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, সম্রাটের অনুজ্ঞায়—সম্রাটের তোষামোদকারীদিগের সমক্ষে (সম্রাটের অনুপস্থিতিতে) প্রকাশ্য বাজারে গুরু তেগ বাহাদুরের শিরশ্ছেদ করা হয়, ইহাই সম্ভব বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয়, এবং সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ও শিখদিগের ব্যবহারেও তাহাই ঠিক বলিয়া বোধ হইয়াছে।

যাহা হউক, দিল্লীতে কোতোয়ালীর সম্মুখে এইরূপে গুরু হত হওয়ায় মোগল সম্রাট্‌দিগের উপর এবং দিল্লী সহরের উপর শিখদিগের অতীব তীব্র বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়, এবং পুরুষানুক্রমে এই বিদ্বেষ পোষিত হইতে থাকে। মিউটিনির সময় যখন বিদ্রোহী "পুরবিয়া" সিপাহীরা দিল্লীর বাদসাহকে পুনর্ব্বার সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত করিল, তখন শিখেরা যদিও আটবর্ষ মাত্র পূর্ব্বে ইংরাজের সহিত রাম-নগর, চিলিয়ানওয়ালা, ও গুজরাটের ভীষণ যুদ্ধে আপনাদের প্রাধান্য-রক্ষার নিমিত্ত অসামান্য যত্ন করিয়াছিল, তথাপি বিদ্রোহীদিগকে স্বদেশী ভাবিয়া উহাদেরই দেখাদেখি পঞ্জাবের স্বাধীনতাজন্য কোন প্রকার হাঙ্গামা বাধাইবে, এ ভাব তাহাদের মনে ক্ষণমাত্রও স্থান পাইল না,—ইংরাজের প্রতি উহাদের রাজভক্তি অটুট রহিল। ইংরাজের সুবন্দোবস্ত ও তৎকালীন ইংরাজের পঞ্জাবস্থ কর্ম্মচারী-দের গুণ ব্যতীত শিখদিগের মোগল-বিদ্বেষও উহাদের এই রাজভক্তি রক্ষার কারণ হইল। উহারা দেখিল যে, যাহারা একদিকে রাজবিদ্রোহী, তাহারাই আবার শিখধর্ম্মের পরম শত্রু মোগল বাদসাহের পৃষ্ঠপূরক! সুতরাং যখন রব উঠিয়া গেল যে, দিল্লীর বাদসাহের উপর শিখদিগের চিরন্তন বৈরনির্য্যাতনের বড়ই সুযোগ উপস্থিত, শীঘ্রই ইংরাজের অধিনায়কতায় পল্‌টনে ভর্ত্তি হইয়া দিল্লীযাত্রা করিলেই হয়, তখন দলে দলে শিখ আসিয়া সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইল, এবং ধর্ম্মযুদ্ধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া দিল্লীযাত্রা করিল। ঝিন্দ, পাতিয়ালা প্রভৃতি স্থানের শিখ রাজারাও সেই পথে গমন করিলেন। শিখের সাহায্যে এই দিল্লী অধিকার ব্যাপারে ইংরাজের ইতিহাস পাঠের সার্থকতা ও বিভিন্ন জাতীয়দিগের অধিনায়ক হইবার উপযুক্ত নৈসর্গিক ক্ষমতা যেমন সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, কার্য্য-কারণ-সূত্রের দূর-ব্যাপকতা দেখিয়া ততোধিক বিস্মিত হইতে হয়।

সম্রাট্ আরাঙ্গীবের কৃত কার্য্যের ফল, তাঁহার অতি দূরবর্ত্তী বংশধরদিগের উপরে কি অচিন্তনীয় ভাবেই গিয়া পড়িল! শিখদিগের মধ্যে একটি প্রবাদ ছিল যে, যে স্থানে গুরু তেগ বাহাদুরের দেহ-ত্যাগ হয়—যেখানে পবিত্রাত্মা ঈশ্বর-পরায়ণ সাধু রাজধর্ম্মের একান্ত ব্যভিচারী নীতি অনুসারে হত হয়েন—সেই ভীষণ স্থলেই মোগল বাদসাহের বংশলোপ হইবে। ফলেও দেখা যায় যে, মিউটিনির সময় ইংরাজ কর্তৃক দিল্লী অধিকারের পর বাদসাহের পুত্রদিগকে দিল্লীর বাহিরে স্থিত সম্রাট্ হুমায়ুনের মকবরা হইতে ধৃত করিয়া দিল্লী আনয়নকালে সহরের লোকে যদিই ছিনাইয়া লয়, এই বলিয়া কাপ্তেন হডসান তাহাদিগকে একে একে গুলি করিয়া মারিলেন। তাহার পর সেই বাদসাহ-পুত্রদিগের মৃতদেহগুলি দিল্লীর বাজারে কোতোয়ালীর সম্মুখে তেগ বাহাদুরের বলিদানের স্থলেই ফেলিয়া রাখিলেন। এই করুণদৃশ্যে—যে অপরাধেই হউক, তৈমুরলঙ্গের সেই জগদ্বিখ্যাত বংশের এই শোচনীয় পরিসমাপ্তিতে—সকলেরই হৃদয় কারুণ্যরসে স্বতঃই সিক্ত হইবার কথা!

ম্যালিসন প্রভৃতি অনেক ইংরাজ ইতিহাস-রচয়িতা এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু কেভব্রাউন বলেন যে, উক্ত জমির উপর প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত গুরু-হত্যার স্মৃতি শিখ সৈনিকদিগের হৃদয়কে পাষাণবৎ করিয়াছিল। উহারা “এতদিনে ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হইল” বলিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশই করিয়াছিল! বাস্তবিক ভক্তি-ভাজনদিগের ও প্রিয়জনের সম্বন্ধে মর্ম্মান্তিক অত্যাচারের স্মৃতি এমনি ভয়াবহ পদার্থ! এই মানসিক ভাব হইতেই সিয়া সুন্নির আজও বিবাদ! কর্ণবধের দিন কর্ণের রথ-চক্র ভূমিতে বসিয়া গেলে, কর্ণের কাতরতায় অর্জ্জুন তাঁহাকে রথ উদ্ধার করিবার

জন্য সময় দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও অভিমন্যুর নিধনস্মৃতি আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে কঠোর করিয়া ফেলিল! ধর্ম্মের গতি বড়ই সূক্ষ্ম—অসৎপথের পরিণাম বড়ই ভয়াবহ! বলদৃপ্তেরা এ কথা যদি ভাবিয়া দেখিত, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে অধর্ম্মাচরণ অত্যাচার কতই কমিয়া যাইত! যাহা হউক, ইংরাজ-রাজের শাসনে আজ যে মুসলমানের সহিত শিখের বা হিন্দুর এই সমস্ত নিদারুণ বিবাদের কারণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, আমাদের অন্য সুখের বা দুঃখের কথা ছাড়িয়া সুধু ঐটুকু ভাবিলেই ইংরাজ-রাজের প্রতি কতই কৃতজ্ঞতার কারণ উপলব্ধি হয়!—সকলেই আপন আপন ধর্ম্ম অবাধে অনুসরণ করিতে পাইতেছে।

গুরু তেগ বাহাদুরের জীবনলীলা শেষ হইলে মোল্লা এবং ওমরাওগণ সম্রাট্‌কে বুঝাইল যে, একটা মহৎ কীর্ত্তি হইল; অতঃপর লোক সহজেই মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। কিন্তু আরাঞ্জীব পিতাকে কারাগারে পূরিয়া, ভ্রাতাকে যন্ত্রণা দিয়া নিহত করিয়া, সন্তানকে কারাগারে মারিয়া, মনে যে কষ্ট পান নাই, আজ একটি সাধু হত্যা করিয়া ততোধিক কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন,—সেই দিন রাত্রিতে গুরুর প্রধান শিষ্য মতিদাস, যাহাকে তিনি করাতে করিয়া চিরিয়াছেন, সেই আসিয়া তাঁহাকে খট্টাসমেত উল্‌টাইতেছে! তখন প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া সম্রাট্‌ যোড়হস্ত করিলেন। মতিদাস বলিল,—"অতঃপর তুমি যদি দিল্লীতে থাকিবে, তাহা হইলে তোমায় মারিয়া ফেলিব।" কথিত আছে, এই সময় হইতে সম্রাট্‌ আরাঞ্জীব রাত্রিতে দিল্লী সহরের মধ্যে থাকিতেন না। দিবাভাগে রাজ-কার্য্যের জন্য সহরে আসিলেও রাত্রিতে সহরের বাহিরে এক অট্টালিকায় গিয়া থাকিতেন, এবং কিছুদিন পরে দক্ষিণাঞ্চলের হিন্দুদিগের উত্থান দমন করিতে

গিয়া চিরদিনের জন্য তথায় রহিয়া গেলেন, দিল্লীতে তাঁহাকে আর ফিরিতে হইল না।

এ দিকে গুরু তেগ বাহাদুরের প্রেরিত শিখ নারিকেল ও পয়সা লইয়া আনন্দপুরে গোবিন্দের নিকট পৌঁছিবামাত্র তিনি অগ্রসর হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক সে সকল গ্রহণ করিলেন। গুরু-প্রেরিত সেই শিখ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, গুরু তেগ বাহাদুর যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সে সকল কথা বলিতে লাগিল।—তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, গুরুপদ ও গুরুশক্তি গ্রহণ করুন। আর —

"বিনা দের্ তুর্কণ প্রহারে সেবকন্ রচ্ছো বলঠান।"

অর্থাৎ বিনা দেরিতে (অবিলম্বে) তুর্ককে (মুসলমানকে) মারিবে, এবং সেবকগণের বল রক্ষা করিবে।

এইরূপ সংবাদ পাইতেই একজন অশ্বারোহী শিখকে দিল্লীর সংবাদ আনিতে প্রেরণ করা হইল। পথিমধ্যে তাহার সহিত গুরু তেগ বাহাদুরের মুণ্ডবাহী শিখের দেখা হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন গুরুর সমাধি কীরতপুরে হইয়াছিল, সেই জন্য যদি গুরু তেগ বাহাদুরেরও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তথায় হয়, এইরূপ মনে করিয়া মুণ্ডবাহী শিখ কীরতপুর পর্য্যন্ত গমন করিয়া অশ্বারোহী শিখকে ফিরাইয়া দিল, এবং নিজে মুণ্ড লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। মুণ্ড-রক্ষা সম্বন্ধে সম্রাটের লোক হইতে যে এখনও কিরূপ ভয় আছে, এবং পথিমধ্যে সম্রাটের লোক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সে কিরূপে গুরুকৃপাবলে মুণ্ড ও আত্মরক্ষা করিয়াছে, সে সকল বৃত্তান্তও জানাইয়া দিল।

অশ্বারোহী শিখ সত্বর আনন্দপুরে পৌঁছিয়া সংবাদ দিলে প্রথমেই সকলের শোকশব্দ ও অন্তঃপুর হইতে রোদনধ্বনি উঠিল। প্রধান প্রধান শিখ ও মসন্দেরা তেগ বাহাদুরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কীরতপুরে

হওয়ার পরামর্শ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, গুরু হরগোবিন্দের সমাধির নিকট সৎকারকার্য্য হউক। বৃদ্ধা নানকী একবারে শোকে জর্জ্জরীভূতা হইলেন। গুজরী সতী বলিলেন,—"সৎকার আনন্দপুরেই হওয়া আবশ্যক। কারণ, গুরু তেগ বাহাদুর এই স্থানটিকে মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন। জ্ঞাতিবিরোধ নিবারণের জন্য তিনি এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানটি তিনি বহু মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছেন, ইহার নাম তিনিই আনন্দপুর রাখিয়াছেন। আর কীরতপুরে সৎকার হইলে শেষ দর্শনের আশা থাকে না; যে হেতু, শাশুড়ী ঠাকুরাণী বৃদ্ধা হইয়াছেন, তিনি কীরতপুরে যাইতে পারিবেন না। একবার শেষ মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য মুণ্ড আনন্দপুরে আনয়ন করাও আবশ্যক।" মাতার এইরূপ নিদেশানুসারে গোবিন্দ (এক্ষণে গুরু গোবিন্দ) কীরতপুরে গমন পূর্ব্বক রথে করিয়া মুণ্ড আনিলেন। রথের সঙ্গে প্রধান প্রধান শিখ মসন্দগণ আসিলেন। সকলেরই সজল-নয়ন, সকলেই গুরুর বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সময়োচিত মারু রাগ ও বড়হংস রাগে সন্ত (শিখ-সাধুগণ) পৌড়ী (গুরুমুখী শ্লোক) গান করিতে করিতে রথের সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে রথে পুষ্প ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি দেওয়া হইতে লাগিল। সকল লোকেই হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষার্থে গুরুর দেহত্যাগের কথা শুনিয়া যেন মাতিয়া উঠিলেন, তুর্কেশ্বর আরাঞ্জীবকে গালি দিতে লাগিলেন।

রথ আনন্দপুরে পৌঁছিলে গুজরী ব্যাকুলা হইয়া সেই রূপ দেখিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। যে স্থানে চন্দনের ভার লইয়া চিতা সজ্জিত হইতেছিল, তথায় রথ নীত হইলে বৃদ্ধা নানকী গুরু তেগ বাহাদুরের নাম গ্রহণ করিয়া উচ্চ রোদন করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। সকলেই একবার শ্রীমুখের শেষ দেখা

দেখিয়া লইলেন। তখনও সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত মহাত্মার মুখ প্রসন্ন-ভাবে ছিল; কেবল পদ্মচক্ষু দুইটি মুদিত হইয়াছিল মাত্র! অনন্তর গুরুগোবিন্দ চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পিতার অগ্নিকার্য্য সম্পাদন করিলেন। তৎপরে সকলে শতদ্রু নদীতে স্নান করিয়া গুরুর ধৈর্য্যাদির প্রশংসা-কীর্ত্তনে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

আনন্দপুর পর্ব্ব।

চতুর্থ পর্ব্বাধ্যায়।

অভিষেক ও প্রথম বিবাহ।

গুরু তেগ বাহাদুরের 'তিলাঞ্জলি' (শ্রাদ্ধাদি কার্য্য) সমাধা হইয়া যাওয়ার কিছুদিন পরে গুরুগোবিন্দ সিংহের রীতিমত অভিষেকের জন্য শিখ মসন্দেরা প্রস্তাব করিলেন। মাতা গুজরীর ও পিতামহী নানকীর সম্মতি পাইয়া গুরুগোবিন্দ তাহাতে অনুকূল মত প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে চতুর্দ্দিকৃস্থ শিখগণকে সংবাদ দেওয়া হইল। যথা-সময়ে সকলে নানাপ্রকার উপঢৌকন লইয়া অভিষেকস্থলে উপস্থিত হইলেন। অভিষেক-কার্য্য অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। শিখ-গুরুর অভিষেককার্য্যে প্রথমে অভিষেচ্য ব্যক্তিকে নানকের প্রধান শিষ্য বুদ্ধার (অথবা বাবা বুঢ়াজীর) ঘরের পাগ বা শিরোপা দিয়া মান্য দেখান এবং তৎপরে তাঁহার হস্তে বাজপক্ষী দেওয়া হইত। গুরুগোবিন্দের সম্বন্ধেও সেই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করা হইল। তিরহণ, ভল্লা, বেদী ও শোডী বংশীয় অর্থাৎ যে কয়টি বংশীয় ক্ষত্রিয় হইতে শিখ-গুরুগণ উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সকল বংশীয় শিখগণ আসিয়া এই আনন্দকার্য্যে বিশেষরূপে যোগ দান করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও ভাটগণকে যথেষ্ট দান করা হইয়াছিল। ভাটগণ স্তবপাঠ এবং ব্রাহ্মণগণ নূতন মহারাজকে নানাপ্রকার নীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাহিরের এই সকল কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, গুরুগোবিন্দ সসজ্জ অবস্থায়

অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক মাতা ও পিতামহীকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা গোবিন্দের রূপ ও সজ্জা দেখিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পিতামহী নানকী গুরু তেগ বাহাদুরের অভিষেক কার্য্য কিরূপ হইয়াছিল, এরূপ সসজ্জ অবস্থায় গুরু হরগোবিন্দকে কিরূপ দেখাইত, সে সকল কথা বলিতে লাগিলেন। তৎপরে দরিদ্রদিগের মধ্যে বহু দ্রব্যাদি বিতরণের পর অভিষেক কার্য্য সমাপ্ত হইল।

অভিষেক কার্য্যের সময় হইতেই গুরু তেগ বাহাদুরের পুত্র গোবিন্দ গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন জানিয়া, শিখগণ নানাস্থান হইতে নিত্য নিত্য নানাপ্রকার দ্রব্য লইয়া আসিতে লাগিল। এই সময়, যে সকল শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের মৃত দেহের দাহাদি কার্য্য করিয়াছিল, তাহারা আসিয়া দিল্লীর সংবাদ জানাইল। কিরূপে দাহ-কার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়াছিল—ইত্যাদি সকল কথাই বর্ণন করিল। প্রসঙ্গক্রমে আরাঙ্গীব বাদসাহ যে অতি মন্দমতি, তাহাও বলিল; কিন্তু তাহারা আকবর ও সাজাহানের প্রশংসা করিতে ত্রুটি করে নাই। তাহারা বলিল,—"সাজাহান মৃত্যুকালেও যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা যদি আরাঙ্গীব পালন করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে লোকের এইরূপ কষ্ট হইত না। কিন্তু তিনি পিতার সেই সকল উপদেশের ঠিক বিপরীত কার্য্য করিতেছেন।" সাজাহান মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন,—

"হিন্দু ধরমকো নহি বিগারো।
একে দুনহো কো প্রতিপালো॥"

অর্থাৎ "হিন্দু-ধর্ম্মকে বিগ্‌ড়াইও না। (হিন্দু মুসলমান) উভয়কে একভাবে প্রতিপালন করিও।"

কিন্তু আরাঙ্গীব এই সকল উপদেশ অবহেলা করিয়া ঠিক তাহার বিপরীত পথে চলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্যের

(হায়দ্রাবাদের) সুপ্রতিষ্ঠিত নবাব তানে সাহের সহিত কোন প্রকার গোল-যোগ করিও না। কিন্তু আরাঙ্গীব পিতৃ-উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এক্ষণে তাঁহারই সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছেন। তানে সাহের বহুমূল্য একটি অঙ্গুরীয়ের লোভেই আরাঙ্গীব হায়দ্রাবাদাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।" যাহা হউক, গুরুগোবিন্দ এই সকল শিখকে সবিশেষ আদর ও আশীর্ব্বাদ দ্বারা প্রীত করিয়া বিদায় দিলেন। এইরূপে নানা শিখ-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে গুরুগোবিন্দ চতুর্দ্দিকের সংবাদও পাইতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দিকের সংবাদ সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র ও অশ্ব সংগ্রহও হইতে লাগিল। শিখগণ যে সকল উপঢৌকন আনিত, তন্মধ্যে ঘোড়া ও অস্ত্র পাইলে, তিনি অধিকতর সন্তোষ প্রকাশ করিতেন; এমন কি, স্পষ্টই বলিয়া দিতেন :—

"আয়ধ ঘোড়া যে লেয়াহেঁ।
সে শিখ খুসী গুরু কি লেইহেঁ।
মন বাঁছত সকল ফল পাইহেঁ॥"

অর্থাৎ যে শিখ আয়ুধ ও ঘোড়া লইয়া আসিবে, সে গুরুর আশীর্ব্বাদ লইবে এবং মনোবাঞ্ছিত ফল পাইবে।

উক্ত শিখ-সমাগমের সঙ্গে লৌপুর বা লাহোর-নিবাসী হরযশ নামে জনৈক সভিখী বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় শিখ গুরুদর্শনে আসিয়া গোবিন্দের মাতা ও পিতামহীর নিকট বলিল,—"আমি অতি সামান্য ব্যক্তি; কিন্তু হীনজনের মান, সহায়, সম্পদ সকলই গুরুর নিকট। এইজন্য আমার প্রার্থনা যে, আমার কন্যাকে গুরুগোবিন্দের সহিত বিবাহ দিয়া দাসী-স্বরূপে গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।" তাঁহারা হরযশের বিনয়ে প্রীত হইয়া তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃতা হইলেন এবং গুরুর সভাস্থলে এ

বিয়ের উত্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন। মাতুল কৃপাল এক্ষণে গুরু-গোবিন্দের অভিভাবক-স্বরূপ। নানকী ও গুজরী উভয়েই তাঁহাকে এই পরামর্শ দিলেন যে, সভাস্থলে বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে যেন উহাতে মত দেওয়া হয়। অস্মদ্দেশে ভদ্রলোকের ঘরে বিবাহে ব্যয়-বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ—সমাজকে অবজ্ঞা এবং আত্মম্ভরিতার বৃদ্ধি। শিখদিগের বিবাহ-স্থিরীকরণ গুরুদ্বারে সভাস্থলে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক লক্ষণা-লক্ষণ প্রভৃতি দেখাইয়া হইয়া থাকে। সুতরাং সেরূপে প্রকাশ্যভাবে সমাজের সমক্ষে কন্যা বা শুক্র-বিক্রেতাদিগের বাড়াবাড়ি হইতে পায় না।

যাহা হউক, যথাসময়ে হরযশ সভাস্থলে বিনয়-সহকারে বিবাহের কথা উত্থাপিত করিলেন। গুরুগোবিন্দের মাতুল কর্ত্তৃপক্ষের স্বরূপ হইয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কন্যার লক্ষণালক্ষণ বিবেচিত হইয়া উক্ত কন্যাটিই উপযুক্ত পাত্রী বলিয়া স্থির হইল। বলা বাহুল্য, যিনি সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করাই জীবনের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন, তিনি কখন নিজের পার্থিব সুখের কথা তুলিয়া এ বিষয়ে অন্যমত করিতে পারেন না। সুতরাং গুরু-গোবিন্দও বিবাহে মত খ্যাপন করিলেন এবং বলিলেন,—"বিবাহ আনন্দ-পুরেই হইবে। লৌপুর বা লাহোরের সদৃশ একটি সহর আনন্দপুরের পার্শ্বেই বসাইতে হইবে। এই নব লৌপুরে কন্যাপক্ষীয় লোকেরা স্বগণ সহিত আসিবেন।"

গুরুগোবিন্দকে কন্যা প্রদান করিতে পাইবেন বুঝিয়া হরযশের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বিবাহ ব্যাপারে প্রস্তুত হইবার জন্য এবং সকলকে নব লৌপুরে আনিবার জন্য বিদায় লইলেন। গুরুর মাতুল কৃপাল সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। গুরু হরগোবিন্দের দৌহিত্র (বিবিবিরোর জ্যেষ্ঠপুত্র) সঙ্গ আমন্দপুর গ্রামের উত্তর পার্শ্বে

নব লৌপুর প্রতিষ্ঠা করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। নব লৌপুর প্রতিষ্ঠার জন্য—তথায় দোকান, বাজার বসাইবার জন্য—গুরু ভাণ্ডার মুক্ত করিতে অনুমতি দিলেন। আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন যে, যাহার ক্ষমতা আছে, সে আসিয়া গুরুদর্শন, গুরুর বিবাহ-দর্শন প্রভৃতি শুভকার্য্যের সঙ্গে ব্যবসায় করিয়া দশ টাকা লাভ করুক; আর যাহার ক্ষমতা নাই, সেও আসুক—তাহার ব্যবসায়ের জন্য অর্থ গুরুর ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হইবে। বলা বাহুল্য, এরূপ "রথ দেখা—কলা বেচা" বন্দোবস্তে বহু লোকের সমাগম হইল। নব লৌপুর সহর প্রতিষ্ঠিত হইতে অধিক কাল বিলম্ব হইল না।

ক্রমে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। হরযশ স্বগণ সহিত নব লৌপুরে আসিয়া শুভ বসন্ত-পঞ্চমীর দিনে ব্রাহ্মণ ও নাপিত দ্বারা যথারীতি সগণ বা লগণ টীকা পাঠাইয়া দিলেন। ইহা কন্যা-কর্ত্তার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ-সূচক চন্দন-প্রেরণরূপ ব্যবহার মাত্র। আমাদের মধ্যে ঠিক এরূপ ক্রিয়া নাই বটে,—কিন্তু এতদঞ্চলে বিবাহের পূর্ব্বে লগ্নপত্র বা আশীর্ব্বাদ কার্য্যটি যে ভাবে সম্পাদিত হয়, লগণ কার্য্যটি কতকটা সেইরূপ। তৎপরে ফাল্গুন মাসে শুভ বিবাহের দিন স্থির হইল। তৎপূর্ব্বে বটনা বা এতদঞ্চলের গাত্রহরিদ্রা উৎসব হইয়া গেলে, বিবাহের দিন বর যথারীতি কন্যার ভবনে গমন করিলেন। সূর্য্য-প্রকাশ বলেন যে, সে দিন সন্ধ্যাকালে আতসবাজী হইয়াছিল—আতসবাজীতে ঘোড়া, উষ্ট্র প্রভৃতি জন্তুর মূর্ত্তি দেখান হইয়াছিল। এই বিবাহে নহবৎ বাদ্য, দরিদ্রকে দান, নানাপ্রকার মিষ্টদ্রব্য লোককে দেওয়া ইত্যাদি সমারোহেরও উল্লেখ আছে। শিখদিগের রীতি অনুসারে বর কন্যার ভবনে পৌঁছিবামাত্র কন্যার (নিজ বা অভাবে স্বসম্পর্কীয়) ভগ্নীপতি কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া দ্বারে আনিবেন। এই স্থলে শুভদৃষ্টি হয়, এবং স্ত্রীলোকেরা বরকে একবার বরণ করেন। তৎপরে কন্যাকর্ত্তার তত্ত্বাবধারণে সজ্জিত

নিকটস্থ কোন বাড়ীতে গিয়া বর এবং বরপক্ষীয়গণ বসেন। কন্যার বাটীর নিকটস্থ যে বাড়ীতে বর ও বরপক্ষীয়েরা বসেন,তাহাকে "জন্মাসা" বলে। গোবিন্দের বিবাহ গোধূলি লগ্নে স্থির হইয়াছিল বলিয়া বরকে অধিকক্ষণ "জন্মাসায়" বসিতে হয় নাই।

এই বিবাহে বিপ্র দয়ারাম * পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়াছিলেন। কন্যা-সম্প্রদানের পর গাঁটছাড়া বাঁধা, হোমাদি বৈদিক ও কুলরীত্যনুযায়ী কার্য্য সকল হইয়াছিল। তৎপরে বাসর। বাসর-ঘরে শ্যালিকা প্রভৃতি তামাসার যোগ্য স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত ছিলেন। গোবিন্দ তামাসায় বড় রত হইলেন না। যাহা হউক, যথারীতি শুভকার্য্যের সম্পাদন হইয়া গেলে, পরদিন বর-কন্যা নব লোপুর হইতে আসিবার সময় গোবিন্দের মাতা গুজরী আনন্দপুর গ্রাম-প্রান্তে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। আনন্দপুর ও নব লোপুর অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। বর-কন্যা গুজরীর নিকট পৌছিলে, তিনি তাহাদিগকে প্রথমে "গুরু স্থানে" অর্থাৎ গুরু তেগ বাহাদুরের সমাধি-মন্দিরের নিকট লইয়া গেলেন। তথায় প্রণামাদি করাইয়া সকলের সহিত মাতা নানকীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন পল্লীস্থ সকলে মহা আনন্দ সহকারে বর-কন্যা দেখিতে আসিল। কন্যার নাম "জিতো"। শিখেরা বলেন, "মাতা জিতোজী।" বর-কন্যার যুগলরূপ দর্শনে সকলেই আনন্দ লাভ করিল। এইরূপে শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

* ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের কন্যা বিবি বিরোর বিবাহের সময় মুসলমানগণ গুরু-ভবন আক্রমণ করিয়া বিবাহের ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করে। সেই সময় দয়ারামের পিতা বিবি বিরোকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই ব্রাহ্মণ-বংশ শিখ গুরুগণের সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিল।

আনন্দপুর পর্ব্ব।

পঞ্চম পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিতীয় বিবাহ।

বিবাহ উপলক্ষে সাধারণের প্রীত্যর্থে যতটুকু আমোদ-প্রমোদ একান্ত আবশ্যক, গুরুগোবিন্দ ততটুকু মাত্র হইতে দিলেন। পিতৃবিয়োগ-জনিত কষ্টে হৃদয় পুড়িতেছিল; তিনি বৈরনির্য্যাতন ভিন্ন হৃদয়ে কিছুতেই সুখ পাইতেছিলেন না। এক-দিক-ভারি বস্তুর যেমন ভারি দিক্‌ই নিম্নে পড়ে, তদ্রূপ গোবিন্দের জীবন-যাত্রাও একাগ্রভাবে এক লক্ষ্যে চলিল। তিনি আবার অস্ত্রাদি লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে লাগিলেন।

বিবাহের পর গুরু নিজ দরবারে বসিয়াছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, নব লৌপুর বাজারে একজন সামান্য ব্যবসাদারের ৭০০৲ শত টাকা চুরি হইয়াছে। গুরুর বিবাহের সময় চুরি—এমন আনন্দ-কার্য্যে অন্ততঃ একজনও নিরানন্দ হইবে! ইহাতে সকলেই ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু সমস্ত বিবরণ শুনিয়া গুরু অল্পক্ষণ পরেই এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে বলিয়া দিলেন যে, তাহাতে আসল চোর সহজেই ধৃত হইল। গুরু এই ব্যাপারটিতে এরূপ একটু অমানুষী বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় দিলেন যে, তাহাতে শিখদিগের গুরুভক্তি বৃদ্ধি পাইল, এবং অনেক দোদুল্যমান হৃদয়ে শিখগুরুর প্রতি আস্থা জন্মিয়া শিখ-সম্প্রদায় প্রসারিত হইতে লাগিল। এই সময়ের আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা সূর্য্যপ্রকাশে বর্ণিত হইয়াছে। শিখ-দরবারের কর্ম্মচারিগণ কতকটা পবিত্র-চরিত্র এবং

কতটা বিনয়ী ও শিষ্ট থাকা আবশ্যক বলিয়া গোবিন্দ সকলকে বুঝাইতে যত্ন করিতেন, তাহা এই ঘটনা দ্বারা সুস্পষ্ট সূচিত হয়।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা এই জীবনীতে অদ্ভূত ঘটনাগুলির পরিত্যাগ করিতেছি না। ইহা কুরুচি বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে জানিলেও, সে ভয়ে কর্ত্তব্য পবিত্যাগ করিতে পারি না। এ দেশে অদ্ভূত রস-সংসৃষ্ট উপদেশ দেওয়ার প্রথা পৌরাণিক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অদ্ভূত রস ছাড়িলে উপদেশগুলি শুনা হয় না। আরও প্রধান কথা এই যে, যে সম্প্রাদায়ের যে কথায় বিশ্বাস আছে, তাহা না জানিলে তাহাকে চেনা যায় না। শিখের যাহাতে বিশ্বাস—তাহা না জানা থাকিলে গুরুগোবিন্দের শিখকে চিনিবে কিরূপে? "বাহ গুরু কি ফতে" কি ভাবে ভাবিয়া কয়েক সহস্র অরণ্যবাসী শিখ মোগল-সাম্রাজ্যের সমগ্র বেগ সহ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার অনুভাবনা করিবে কিরূপে? আর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা এই যে, অদ্ভূতে বা মহাত্মাদের ক্ষমতায়, একবারে অবিশ্বাস বড়ই দম্ভের কথা! তুমি কি পৃথিবীর সবই জানিয়াছ ও বুঝিয়াছ? তোমার গুরু বৈজ্ঞানিক ইউরোপীয়ও ত বলেন না যে, জ্ঞানের চরম সীমায় তিনি পৌঁছিয়াছেন—নূতন তথ্য তাঁহার আবিষ্কৃত হইতে আর বাকি নাই।

একদিন গুরু দরবারে বসিয়া আছেন, শিষ্যবর্গ নানাপ্রকার দ্রব্যাদি লইয়া গুরু-দর্শনে আসিতেছে, এমন সময় একজন ভল্লুক-ব্যবসায়ী ভল্লুকের নৃত্য দেখাইবার জন্য বানর, ছাগল ও ভল্লুক লইয়া দরবারে উপস্থিত হইল। ভল্লুকটিকে দেখিয়া গোবিন্দের পার্শ্বস্থ জনৈক অনুচরের বড়ই আনন্দ বোধ হইল। তাহার ভাব লক্ষ্য করিয়া গুরু অনুচরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'এই ভল্লুকটি পূর্ব্ব-জন্মে তোমার পিতা ছিল।" অনুচর বলিল,—"প্রভু! পূর্ব্বজন্মে আমার পিতা গুরুদাস এই

গুরুবংশেরই সেবক ছিলেন, তবে তাঁহার এ দশা হইল কেন?" গুরু বলিলেন,—"তোমার পিতা গুরুদাস গুরু-দরবারে প্রসাদ বাঁটিতেন। একদিন জনৈক শিখ প্রসাদ লইতে আসিয়া কার্য্যগতিকে কিছু সত্বরে প্রসাদ দিতে অনুরোধ করে। গুরুদাস সেই লোকটাকে উল্লুক-ভল্লু-কাদি বলিয়া গালি দেন। তাহাতে প্রসাদ-প্রার্থী শিখ মর্ম্মে ব্যথা পায়; কিন্তু তথাপি সে প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় নাই। ধীরভাবে অপেক্ষা করিয়া ভক্তিভাবেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিল। এই কর্ম্মফলে, গুরুদাসকে ভল্লুক-জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে।" ইহাতে অনুচর পুনরায় বলিল,—"যদি গুরু-সেবা করিয়াও আমার পিতাকে ভল্লুক-জীবন ধারণ করিতে হইল, তবে গুরু-সেবায় ফল কি?" গুরু বলিলেন,—"কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী। কর্ত্তব্যে ত্রুটি ও বাক্যের কু-ব্যবহারের জন্য ভল্লুক হইয়াছে; কিন্তু দীর্ঘকাল গুরু-সেবার গুণে উহাকে অধিক দিন ভল্লুক-জীবন-ভার বহন করিতে হইবে না। সে ভল্লুক জন্মেও গুরু দর্শনে আসিল।" তখন অনুচরের অনুরোধে গুরুর ভাণ্ডার হইতেই অর্থ দিয়া ভল্লুকটি ক্রয় করিয়া তাহাকে মুক্তি দান করা হইল। গুরুদাস তখন ভল্লুক-জীবন পরিত্যাগ করিলেন। কি বিদেশীয়, কি বাঙ্গালী, বিশেষতঃ সাহেবী মেজাজের বাঙ্গালীরা পদ-গর্ব্বে অর্থী প্রত্যর্থীদিগের প্রতি বাক্য-বাণ ব্যবহার ও অশিষ্ট আচরণকালে এই অদ্ভুত কথাটি স্মরণ করিলে উপকার হয়। মহাত্মাদিগের কথা চিরকালই উপকারী।

গুরুগোবিন্দ জলক্রীড়া বড় ভালবাসিতেন। এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে জলক্রীড়া আনন্দেরই কার্য্য। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হইতে মুসলমান বাদসা-দিগের আমল পর্য্যন্ত বড়লোকের জলক্রীড়াতে আমোদ ছিল। নবদ্বীপের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুও ভক্তগণের সহিত জল ছিটাই ক্রীড়া করিতে ভালবাসিতেন। আজও এতদ্দেশীয় সকল লোকের উহাতে আনন্দ

হয়। গুরুগোবিন্দ বিবাহের পর সকল আত্মীয়বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়া জল ছিটাছিটি খেলা :আরম্ভ করিলেন। সকলেই নিজ নিজ পাগ ও অপর বস্ত্রাদি তীরে রাখিয়া জলে নামিয়াছেন, এমন সময় গুরুগোষ্ঠীর (গুরু হরগোবিন্দের প্রপৌত্র) গোলাপ রায় জল হইতে উঠিয়া গুরুগোবিন্দের পাগটি মস্তকে ধারণ করেন। ইহাতে শিখ ভক্তগণ একবারে হাঁ হাঁ করিয়া উঠেন, কিন্তু মিষ্টভাষী উদার-হৃদয় গোবিন্দ বলিলেন,—"গোলাপ! তোমার যখন গুরুপদে বসিবার এতই বাসনা হইয়াছে দেখিতেছি, তখন আমি বলিতেছি, তোমার সেই অভিলাষ এক সময়ে পূর্ণ হইবে।" সূর্য্য-প্রকাশ বলেন যে, এই আশীর্ব্বাদের বলে উত্তরকালে গুরুগোবিন্দ দক্ষিণাপথে গেলে গোলাপ রায় দিন কতক গুরু-গদিতে বসিয়াছিলেন বটে; কিন্তু অহঙ্কার বশতঃ সত্বরেই গুরুবক্স নামক জনৈক সাধুভক্তের অভিশাপে তাঁহাকে সে পদ হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল।

গুরু-দরবারে ক্রমে নানাপ্রকার দ্রব্য আসিতে লাগিল, কাবুল হইতে চমৎকার গালিচা, সতরঞ্চ প্রভৃতি আসিল। পূর্ব্বদেশে গিয়া গুরু তেগ বাহাদুর কামরূপের রাজবর্গকে শিখ-সম্প্রদায়-ভুক্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে তেগ বাহাদুর-নন্দন গোবিন্দ গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন জানিয়া, অদ্ভূত শিক্ষিত চমৎকার একটি হস্তী, অক্ষক্রীড়া-পটু অদ্ভুত পুত্তলিকা প্রভৃতি বিচিত্র উপঢৌকন লইয়া, কামরূপের রাজা আনন্দপুরে উপস্থিত হইলেন। গুরু রাজার যথোচিত আতিথ্য-সৎকার ও সম্মাননা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

উক্ত হস্তী উপলক্ষ করিয়া গিরিপতি ভীমচাঁদের সহিত গুরুর বিবাদের সূত্রপাত হয়। ভীমচাঁদ কুলহরের রাজা। আনন্দপুরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল ভীমচাঁদের রাজ্যভুক্ত। গুরুগোবিন্দ মৃগয়া

উপলক্ষে উক্ত সকল গ্রামের নিকটস্থ বনে গিয়া উৎপাত করিয়া আসিতেন। ইহাতে যদি কোনরূপে ভীমচাঁদের সহিত বিবাদ বাধে শিখ মসন্দেরা সর্ব্বদা এই ভয়ে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিলে তাহাদিগকে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, ইহাই তাহাদের ভয়ের প্রধান কারণ। তাহারা ব্যাকুল হইয়া মাতা গুজরীর নিকট জানাইলে, মাতা গুরুগোবিন্দকে ভীমচাঁদের রাজ্যে গিয়া উৎপাত করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু গোবিন্দের ভীমচাঁদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার একটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, লোভী ও কপটী ভীমচাঁদ মোগলদিগের সহিত শিখের বিবাদে প্রবল পক্ষের বিরোধী কোনমতেই হইবে না। সে গুরুরই পার্শ্বে কণ্টকস্বরূপ থাকিবে। বাদসাহী পুরস্কারের লোভে শিখদিগকেই আক্রমণ করিবে। যে ব্যক্তি শত্রু হইবেই বলিয়া নিশ্চিত, যাহাকে বন্ধুভাবে পাইবার সম্ভাবনা নাই, সেরূপ প্রতিবেশীকে প্রথমে নির্জ্জিত না করিয়া মোগলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। সুতরাং ভীমচাঁদকে পরাজয় করা তাঁহার স্বসমাজের উন্নতি-সোপানের একটি সোপান। উহা শীঘ্রই হউক, আর দশদিন পরেই হউক, নিষ্কণ্টক হইবার ও স্থানীয় প্রতিপত্তি লাভ করিবার জন্য প্রয়োজন হইবে। এই জন্যই গোবিন্দ ভীমচাঁদের সহিত বিবাদে প্রস্তুত হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। তবে মাতার অনুরোধে তিনি এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন যে, তিনি উপর-পড়া হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না।

যাহা হউক, এ দিকে ভীমচাঁদ ক্রমে নানাসূত্রে গুরুগোবিন্দের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলেন এবং গোবিন্দের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আনন্দপুরে গুরুদর্শনে আগমন করিলেন। গুরু রাজাকে সবিশেষ যত্ন করিলেন। পরে রীতিমত তাঁহার অতিথি-সৎকার করিয়া কামরূপের রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত খেলনা প্রভৃতি দেখাইয়া ক্রমে হাতীটি

দেখাইলেন। শিক্ষিত হাতী শুঁড়দ্বারা চামর লইয়া গুরুকে ব্যজন করে, জলপাত্র লইয়া গুরুর পদ ধৌত করিয়া দেয় ইত্যাদি রূপ সেবা করে দেখিয়া, গিরিপতি ভীমচাঁদ একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। হাতীটি গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার লোভ জন্মিল; তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, "যদি সহজে না পাই, তবে কাড়িয়া লইব। কিন্তু গুরুর নিকটে যেরূপ শিখ শিষ্য বা সৈন্য সর্ব্বদা থাকে দেখিতেছি, ইহাতে কাড়িয়া লওয়া নিতান্ত সহজ নয়।"

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তার পর রাজা গুরুর নিকট হইতে উক্ত হাতী ভিক্ষা করিলেন। গুরু বলিলেন যে, সেবক অনেক যত্নে হাতীটিকে শিক্ষা দিয়া সেবার্থে যেন নিজেরই স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছে; ইহাকে গুরু-সেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে দিলে সে ভক্ত মনে বড় ব্যথা পাইবে; এই জন্য তিনি উহা দিতে পারেন না। কিছুদিন পরে ভীমচাঁদ নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া একজন দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, তাঁহার পুত্রের বিবাহ অল্পদিনের মধ্যেই হইবে। সেই সময় কুটুম্বদিগকে হাতীটি দেখাইলে তাঁহার মান্য বৃদ্ধি হইবে। এইরূপ কারণ দেখাইয়া অল্পদিনের জন্য হাতীটি তাঁহার নিকট পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। গুরু বুঝিলেন যে, এইভাবে হাতীটি হস্তগত করিয়া লওয়াই ভীমচাঁদের উদ্দেশ্য। তিনি হাতীটি না দিয়াই দূতকে বিদায় দিলেন। ভীমচাঁদ হাতী না পাইয়া দুঃখিত হইলেন, এবং কিছুদিন নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার সহর কোতয়ালকে পাঠাইলেন। কোতয়ালও পূর্ব্ব-দূতের ন্যায় অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু কোতয়াল গুরুর ব্যবহারাদি দেখিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে গুরুগোবিন্দ গিরিপতি ভীমচাঁদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চলিলেন। ভবিষ্যতে যাঁহাকে দিল্লীশ্বরের ন্যায় প্রবল

রিপুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাঁহার পক্ষে এই বিবাদ যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ামাত্র, ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

এস্থলে একটি সাংসারিক ঘটনা বলিয়া লওয়া যাউক। গুরুগোবিন্দ পাঁওটা যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একজন অতি সামান্য অবস্থাপন্ন শিখ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া গুরুগোবিন্দের নিকট আসিয়া পড়েন। গোবিন্দ এই কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করেন। তাঁহার এই বিবাহ ১৭৪৩ সংবতে (১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে) হয়। এই কন্যার নাম সুন্দরীজী। এ বিবাহে কোন ধূমধাম হয় নাই।

আনন্দপুর পর্ব্ব।

ষষ্ঠ পর্ব্বাধ্যায়।

—○:✱:○—

গিরিপতি ভীমচাঁদের সহিত বিবাদ।

পাঁওটা গ্রামে অবস্থান।

গুরুগোবিন্দ নিজের বল-বৃদ্ধির জন্য ক্রমেই প্রস্তুত হইতেছেন। ভক্তিমান্ শিখ ব্যতীত অন্যলোককে উপযুক্ত বোধ হইলে বেতন-ভোগী করিয়া সৈন্য-শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইতে লাগিল। এক্ষণে গুরুগোবিন্দ দেখিলেন, নিজের হস্তে সকল ভার রাখিলে কখন কখন কার্য্যের ক্ষতি হয়, এই কারণে সরঞ্জাম এবং খাদ্যাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য নন্দচন্দকে দেওয়ান পদে বরণ করিয়া ঐ দুই কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। নন্দচন্দ এতদিন সামান্য মসন্দ ছিলেন। ইঁহার পিতা উমরসা গুরু তেগ বাহাদুরের একজন সেবক ছিলেন।

গুরুগোবিন্দ নন্দচন্দকে দেওয়ান পদ প্রদান করিয়া অনেকটা অবসর পাইলেন এবং অধিকাংশ সময় মৃগয়ায় নিযুক্ত থাকিতে লাগি-লেন। মৃগয়ার বর্ণনা পাঠ করিলে, বোধ হয়, নিকটস্থ অরণ্যময় স্থানের ভৌগোলিক অবস্থা জ্ঞাত হওয়াই যেন মৃগয়ার অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল।

ভীমচাঁদের লোভের নিবৃত্তি নাই। তিনি কিরূপে গুরুগোবিন্দের শ্রীস্বরূপ শিষ্য-দত্ত হস্তী, তাঁবু প্রভৃতি গ্রহণ করিবেন, সেই চিন্তাতেই নিমগ্ন! নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবোধ মিত্ররাজগণ কেহই ভীমচাঁদকে গুরুগোবিন্দের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন না। তথাপি

ভীমচাঁদ গুরুর নিকট অপর দূত পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। এবার কিশোরীচাঁদ এবং পুরোহিতকে পাঠাইলেন, এবং গুরুগোবিন্দের লোভ উদ্রেক করিবার জন্য বলিয়া দিলেন যে, তিনি হস্তী, তাঁবু প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য গুরুর নিকট চাহিতেছেন, সেইগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় উহার সহিত ৪০০০৲ হাজার টাকা দিবেন। গুরুগোবিন্দ কিশোরীচাঁদ ও পুরোহিতকে প্রথমে সবিশেষ যত্ন সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গুরু-দরবারে তাঁহারা দ্রব্যাদি প্রতিপ্রদানের সময় ৪০০০৲ হাজার টাকা দিবার প্রস্তাব করিলে, গুরু বুঝিলেন যে, ভীমচাঁদ এবার লোভ উত্তেজনার চেষ্টা করিয়া যেন 'ভাড়া'দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই কারণে গুরু বিষম অসন্তোষ প্রকাশ করিলে, তাঁহার উপস্থিত শিষ্যবর্গ, কিশোরীচাঁদ ও পুরোহিতকে গুরু-দরবার-সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কিশোরীচাঁদ ও পুরোহিত অপমানিত হইয়া ভীমচাঁদের নিকট ফিরিয়া গেলেন। ভীমচাঁদ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করিলেন, এবং নিকটস্থ কটোচিয়ার রাজা কৃপালের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। তিনি আপাততঃ যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন। বলিলেন যে, গুরুগোবিন্দ অতীব পরাক্রান্ত, বিশেষতঃ শুভ বিবাহরূপ আনন্দ-কার্য্যের পূর্ব্বে যুদ্ধের হাঙ্গামা অপেক্ষা বিবাহের পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই ভাল; আর শ্রীনগরের রাজা ফতেসা এই বিবাহের পর তাঁহার বৈবাহিক হইতেছেন, তাঁহার সহিতও পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে কার্য্য করাই উচিত। ভীমচাঁদ রাজা কৃপালের কথায় আপাততঃ নিবৃত্ত রহিলেন।

এই সময় নাহন-নামক স্থানের রাজা প্রকাশ মেদিনী লোক-পরম্পরায় জানিতে পারেন যে, গুরুগোবিন্দের সহিত ফতেসার ভবিষ্য

বৈবাহিকের মনান্তর ঘটিয়াছে। প্রকাশ মেদিনীর সহিত বহুদিন হইতে ফতেসার শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে গুরুগোবিন্দের প্রতাপ বুঝিয়া প্রকাশ মেদিনী তাঁহাকে স্বপক্ষে রাখিবার মানসে বিশেষ নম্রতা প্রকাশ করিয়া নাহনে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। গুরুগোবিন্দের পার্ষদ মসন্দেরা ভীমচাঁদের সহিত বিবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। নাহনের রাজদূত গুরুগোবিন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে; গুরু নিমন্ত্রণে গেলে আর বড় একটা গোলযোগের ভয় থাকিবে না; এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া মসন্দেরা সকলে নাহনের রাজ-দূতের পক্ষ-সমর্থন করিতে কৃতসংকল্প হইল, এবং মাতা গুজরী ও পিতামহী নানকীকে পর্য্যন্ত এ বিষয়ে উৎসাহিত করিল। তখন নাহনের রাজদূতের প্রার্থনা অনুসারে গুরুগোবিন্দ সদলে নাহনে গমন করিলেন।

নাহন আনন্দপুরের পূর্ব্বদিকে এবং যমুনাতীরে অবস্থিত। গুরু নাহনে গমন করিলে সবিশেষ আগ্রহের সহিত গৃহীত হইলেন। রাজা প্রকাশ মেদিনী সকলের যথাযোগ্য আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে গুরুকে সঙ্গে করিয়া মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। মৃগয়া করিতে করিতে নিজ মনের অনেক কথা গুরুকে জানাইলেন, এবং নাহন রাজ্য-মধ্যে যে স্থানে থাকিতে বাসনা হয়, তথায় বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। যমুনা-তীরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ পাঁওটা নামক গ্রাম অতি রমণীয় দেখিয়া গুরু তথায় বাস করিবার মনোভাব প্রকাশ করিলে, রাজার আজ্ঞায় অতি অল্প দিনের মধ্যে তথায় সামান্য দুর্গ বিনির্ম্মিত হইল। গুরুগোবিন্দ সদলে এই দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা কয়েক মাইল দূরে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই গ্রামের নাম পূর্ব্বে পাঁওটা ছিল না। গুরুগোবিন্দ

আনন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া এই গ্রামে প্রথম 'পা' রাখিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম পাঁওটা রাখা হয়।

পাওটা গ্রামের পরেই ফতেসার রাজ্য আরম্ভ। গোবিন্দ পাঁওটা গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, ফতেসা অতি ভক্তি সহকারে আসিয়া গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গুরু, ফতেসার বিনয় ও নম্রতায় তুষ্ট হইয়া রাজা প্রকাশ মেদিনীর সহিত যাহাতে উঁহার বৈরিভাব ঘুচিয়া যায়, সেই ইচ্ছায় দেওয়ান নন্দচন্দকে নাহনের রাজধানীতে পাঠাইয়া প্রকাশ মেদিনীকে আনাইলেন। গুরুগোবিন্দের যত্নে ও অনুজ্ঞায় শ্রীনগরের রাজা ফতেসার সহিত প্রকাশ মেদিনীর বহুদিনের বিবাদ মিটিয়া গেল।

আনন্দপুরপর্ব্ব।

সপ্তম পর্ব্বাধ্যায়।

—∞*∞—

গুরুগোবিন্দ সিং।—নানাপ্রকার সংযোগ।

পাঁওটার নিকটবর্ত্তী সস্তোরা গ্রামে বুদ্ধুসা নামক জনৈক মুসলমান ফকীর বাস করিতেন। তাঁহার মনে কিছুমাত্র সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল না। তিনি জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সজ্জনের সহিত সুকথার চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার বাসস্থানের অতি নিকটে শিখ-গুরুগোবিন্দ সিংহ আসিয়া বাস করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তিনি পাঁওটায় গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গোবিন্দের সহিত সুকথার আলোচনা করিয়া বুদ্ধুসা এমনি প্রীতিলাভ করিলেন যে, তিনি কিছুদিন পাঁওটাতেই অবস্থান করিলেন। বুদ্ধুসাকে যে সকল লোক শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, তাহারাও আসিয়া তথায় মিলিত হইল।

এই সময়ে দিল্লীর বাদসাহের কয়েকজন সৈন্য এরূপ অপরাধে অপরাধী হয় যে, তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট অপর ৫০০ সৈন্য এবং তাহাদের সর্দ্দার ভিখন খাঁ, নিজামত খাঁ, হায়ত খাঁ এবং কালে খাঁও কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল। ঐ সর্দ্দারগণ যাহাতে ভারতবর্ষীয় কোন রাজার অধীনে কর্ম্ম না পান, সে জন্য সম্রাটের দপ্তর হইতে ঘোষণা হয়। সর্দ্দারগণ নানাস্থানে কর্ম্মের প্রার্থী হয়েন; কিন্তু দিল্লীর বাদশাহের হুকুমের বিরুদ্ধে কার্য্য করে, এমন রাজা কেহই ছিলেন না। ঘটনাচক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এই সর্দ্দারগণ সস্তোরা গ্রামে উপস্থিত হইলে বুদ্ধুসা সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া গুরুগোবিন্দের

নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। তখন গুরুগোবিন্দের অধীনে সর্দ্দারগণ দৈনিক (রোজিয়ানা) ৪৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইতেছিলেন। বাদশাহের বিতাড়িত ৫০০ শত সৈন্য ও সর্দ্দারগণ পাঁওটায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহারা গুরুগোবিন্দ কর্তৃক দৈনিক ১৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইল।

পাঁওটার নিকটে গুরুবংশীয় রামরায় বাস করিতেন। তিনি দিল্লীর দরবারে থাকিয়া বাদসাহের প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বংশ-মর্য্যাদার এমনই মাহাত্ম্য যে, গুরুগোবিন্দের যশঃ-সৌরভে তাঁহার সহিত মিলিবার বাঞ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইল। পরন্তু পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া ভয়ে গুরুর নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে পলায়ন করিতে চাহেন। তাঁহার মসন্দেরা গুরুগোবিন্দের সদয় হৃদয়ের কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা রামরায়কে স্থানান্তরে যাইতে নিবারণ করিয়া গোবিন্দের আরও অনেক গুণের কথা বলিলেন। তাঁহার গুরুদর্শন লালসা আরও বৃদ্ধি হইলে, তিনি মান, অপমান বিবেচনা করিয়া গুপ্ত ভাবে মনের কথা জানাইয়া গুরুগোবিন্দকে পত্র লিখিলেন। তদনুসারে যমুনায় নৌকাবিহার উপলক্ষে উভয়ের দর্শন হইলে রামরায় পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এইরূপে উভয়ের মিলনের পর রামরায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। সূর্য্যপ্রকাশে কথিত আছে যে, রামরায়ের ভ্রাতা অষ্টম গুরু হরকিষণ যে বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা রামরায়েরই শাপে। আর হরকিষণও সেই সময় রামরায়কে শাপ দিয়াছিলেন যে, জীবিত অবস্থাতেই মসন্দেরা তাঁহার দেহ পোড়াইয়া ফেলিবে। কোন লোকের উপকারার্থে রামরায় নিজ স্থূল দেহ হইতে লিঙ্গ দেহ কয়েকদিনের জন্য বাহির করিয়া লওয়া আবশ্যক বোধ করেন, এবং তাঁহার পত্নী পঞ্জাব কুমারীকে বলেন যে, তিনি কয়েক দিনের জন্য দ্বারে অর্গল দিয়া স্বীয় কক্ষমধ্যে অবস্থান

করিবেন, যেন দ্বার খোলা না হয়। কিন্তু দুই এক দিন এইরূপে অবস্থানের পর তাঁহার মসন্দেরা বল পূর্ব্বক দ্বার খুলিয়া রামরায়ের দেহ বাহির করিয়া অগ্নিতে সংকার করে! রামরায়ের চারি পত্নী, তন্মধ্যে প্রথমা-সন্ন্যাসিনী, দ্বিতীয়া পঞ্জাব কুমারী। ইঁহাদের কাহারও সন্তান-সন্ততির কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক, স্ববংশ-দ্রোহী রামরায়ের পরিণাম এইরূপ হইল। কথিত আছে যে, রামরায়ের দেহের অগ্নি সংকার সময়ে শূন্যপথে তাঁহার লিঙ্গ দেহ আসিয়া মসন্দগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন, এবং পঞ্জাব কুমারীকে পিতৃব্য গুরুগোবিন্দের পরামর্শ অনুসারে চলিতে উপদেশ দেন।

মসন্দেরা প্রকৃত পক্ষেই তাহাদের গুরুদ্রোহী হইয়াছিল; তাহারা গুরুর নামে যে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহা তাঁহাকে দিত না। এক্ষণে গুরুর অবর্ত্তমানে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চলিল। এই সকল দেখিয়া পঞ্জাব কুমারী গুরুগোবিন্দকে পত্র লেখেন; গুরুগোবিন্দ মসন্দদিগকে শিরোপা দিবার উপলক্ষে একত্র করিবার পরামর্শ দেন; তদনুসারে মসন্দেরা একত্র হইলে পঞ্জাব কুমারীর সংবাদ অনুসারে গুরুগোবিন্দ তথায় উপস্থিত হয়েন। তিনি প্রথমে মসন্দগণকে মিষ্ট কথায় বুঝাইবার চেষ্টা করেন, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া, তাহাদিগকে কঠোরভাবে দণ্ডিত করিয়া, এমন কি অনেক গুলি মসন্দের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া, শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

আনন্দপুরপর্ব্ব।

অষ্টম পর্ব্বাধ্যায়।

—:•:—

গুরুগোবিন্দ সিং।—ভাঙ্গানির যুদ্ধ।

ক্রমে ভীমচাঁদের পুত্রের সহিত ফতেসার কন্যার বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল। গুরুগোবিন্দের সঙ্গে ফতেসার মিলন হওয়ায় অনেকের বোধ হইয়াছিল যে, সব গোলযোগ মিটিয়া গেল—বিশেষতঃ ফতেসা গুরুকে ঐ বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ভীমচাঁদের সহিত বিবাদ মিটিবার নহে।

গুরু লক্ষাধিক মুদ্রার দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিয়া দেওয়ান নন্দচন্দ ও পুরোহিত দয়ারামকে শ্রীনগরে বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠাইলেন। এদিকে বর লইয়া ভীমচাঁদও শ্রীনগরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যে পথে যাইতেছিলেন, সে পথে যাইতে হইলে পাঁওটা হইয়া যাইতে হয়; অন্য পথ দিয়া যাইতে গেলে অনেক কাল বিলম্ব হয়। ভীমচাঁদ প্রথমে পাঁওটার পথ ধরিয়া আসিয়া গুরুগোবিন্দের দুর্গের তিন ক্রোশ দূরে থাকিয়া পথ পাইবার জন্য গুরুগোবিন্দের নিকট মন্ত্রীকে পাঠাইলেন। গুরু পথ দিতে সম্মত হইলেন না। বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিনও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। অবশেষে ভীমচাঁদ নিরুপায় হইয়া সামান্যমাত্র লোক সঙ্গে দিয়া পাঁওটার পথে বরকে পাঠাইয়া স্বয়ং অপর দিক দিয়া ঘুরিয়া শ্রীনগর গমন করিলেন। বর পাঁওটার দুর্গের নিকট পৌঁছিলে গুরু তাঁহাকে উপহাস ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন যদি তোমায় আটক করিয়া রাখি, তাহা হইলে তোমার পিতা কি করিবেন?" এরূপ কথা

বলিলেন বটে, কিন্তু বরের পথ ছাড়িয়া দিলেন। বরকে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়, ইহা হিন্দু শাস্ত্রের বিধি। গুরু যে সে বিধি উল্লঙ্ঘন করিবেন না, ইহা গুরুর শত্রু ভীমচাঁদও বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই, স্বয়ং অন্য পথে যাইয়া, বরকে শত্রুপুরীর ভিতর দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের অসাধারণ মহত্ব!

হিন্দুজাতি সাধারণের এইরূপ বিধি প্রতিপালনে দৃঢ়তা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, এবং রাগ দ্বেষের সর্ব্বদা সংযম জন্য অতি সহজেই বিপুল সাম্রাজ্যে কোটি কোটি হিন্দুকে শাসন করা যায়; কিন্তু অহঙ্কার বশতঃ অনেক সময় লোকে ইহা বুঝিতে পারে না।

যাহা হউক, বর শ্রীনগরে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলে পর, যথাসময়ে যথারীতি পূর্ব্বক বিবাহ হইয়া গেল। গুরুর প্রেরিত নন্দচন্দ প্রভৃতিরা বিবাহের পূর্ব্বে পৌঁছিয়া উপঢৌকন দ্রব্যাদি রাখিয়া বিবাহের পরেই চলিয়া আসিতে চাহিলেন। কিন্তু ফতেসার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাদিগকে তথায় কিছুদিন থাকিতে হইল। ক্রমে ভীমচাঁদ সদলে আসিয়া পৌঁছিলে মহা সমারোহ হইল। শ্রীনগরের রাজ-প্রাসাদে নববধূ দর্শনের ধূম পড়িয়া গেল। এই সভায় সকলে যথারীতি উপঢৌকন দিতে লাগিলেন। ক্রমে গুরুগোবিন্দের প্রেরিত উপঢৌকন সকলে দেখিলেন। লক্ষাধিক মুদ্রার উপঢৌকন সকলের মন আকর্ষণ করিল; কিন্তু ভীমচাঁদ গুরু-গোবিন্দের উপঢৌকনের কথা শুনিয়াই জ্বলিয়া গেলেন।

সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিবাহে বর কন্যার কর্ত্তৃত্ব নাই। বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তন্মধ্যে বরকর্ত্তারই প্রভুত্ব প্রায় অপ্রতিহত। অনেক অর্ব্বাচীন বরকর্ত্তা হিন্দুর এই নিয়মের সুমহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া অনেক সময় প্রভুত্বের অপব্যবহার করেন। এস্থলেও তাহাই ঘটিল। বরকর্ত্তা ভীমচাঁদ

সভাস্থলে বলিলেন,—"দেখিতেছি যে, ফতেসার সহিত আমার শত্রু গোবিন্দের বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ। এরূপ স্থলে আমি বৈবাহিক বন্ধন রাখিতে ইচ্ছা করি না; তবে যদি ফতেসা অগ্রবর্ত্তী হইয়া আমার পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক গুরুগোবিন্দের সহিত যুদ্ধ করে, তাহা হইলে এ বৈবাহিক সূত্র রক্ষা হইতে পারে—নতুবা এই পর্য্যন্ত।" এই প্রকার কথা বলিতে বলিতে রুক্ষ ভাবে ভীমচাঁদ সভা হইতে উঠিয়া নিজ বাসায় চলিয়া গেলেন। নন্দচন্দ এবং দয়ারাম বাসায় গেলেন।

ফতেসা ভীমচাঁদকে যে বাসা দিয়াছিলেন, রাজপ্রাসাদ হইতে তথায় যাইতে হইলে নন্দচন্দের বাসার সম্মুখ দিয়া যাইতে হয়। নন্দচন্দ দেখিলেন যে, ফতেসা ভীমচাঁদের অনুগামী হইয়াছেন। তখন দয়ারাম ও নন্দচন্দ উভয়েই বুঝিলেন, যুদ্ধ অনিবার্য্য; তবে সময়ে গুরুকে সংবাদ দেওয়া উচিত। তাঁহারা ফতেসাকে না বলিয়াই শ্রীনগর পরিত্যাগ করিয়া পাঁওটায় উপস্থিত হইলেন, এবং শ্রীনগরের সমস্ত বৃত্তান্ত গুরুকে জানাইলেন। গুরুগোবিন্দও বুঝিলেন, যুদ্ধ অনিবার্য্য; সত্বরে শত্রুরা আসিয়া আক্রমণ করিবে।

উক্ত সময়ে পাঁওটা বেশ একখানি সুন্দর ও বৃহৎ গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোবিন্দ ভাবিলেন যে, যদি শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষায় পাঁওটাতেই বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তথাকার লোকের বড় কষ্ট হইবে। তিনি পূর্ব্বাহ্নেই শ্রীনগর-অভিমুখে ভাঙ্গানির ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত থাকা উচিত মনে করিলেন, এবং পাঁওটার দুর্গরক্ষার্থে কিঞ্চিন্মাত্র সৈন্য রাখিয়া ভাঙ্গানি যাইবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে অনুমতি করিলেন। তখন পূর্ব্বোল্লিখিত দিল্লীর বাদসার পরিত্যক্ত পাঠান সৈন্য ও সর্দ্দারগণের মধ্যে চারিশত সৈন্য ও তিনজন সর্দ্দার এতদিন গুরুর অন্নে প্রতিপালিত হইয়া এক্ষণে গুরুকে ত্যাগ করিয়া বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করিল;

কিন্তু সর্দ্দার কালেখাঁ ও একশত সৈন্য গুরুকে পরিত্যাগ করিল না। গুরু তাহাদেরও বিদায় দিতে প্রস্তুত আছেন জানাইলেও, তাহারা গুরুর সঙ্গে রহিল। গুরু দরবারে সামরিক কার্য্যে প্রস্তুত থাকিবার জন্য "উদাসী" সম্প্রদায় ভুক্ত ৭০০ শত লোক গুরুর অন্নে প্রতিপালিত হইতেছিল। আজ যুদ্ধ করিতে হইবে শুনিয়া তাহাদিগের মোহন্ত কৃপাল ব্যতীত আর সকলেই পলায়ন করিল! গুরু পরদিন প্রাতঃকালে এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন,"সকলে যাউক, যখন মোহন্ত কৃপাল রহিয়াছেন, তখন তাহাদের মূলই রহিয়াছে।" এইরূপে অনেকে পলাইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মুসলমান ফকীর বুদ্ধুসা যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রশংসিত পাঠান সর্দ্দারের মধ্যে তিনজন ৪০০ শত সৈন্য লইয়া গুরুগোবিন্দকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন তিনি বড়ই লজ্জিত হইলেন, এবং নিজে ৭০০ শত মুরিদ (অর্থাৎ শিষ্য) ও চারি পুত্র সঙ্গে লইয়া গুরুর সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন। গুরুর দল ভাঙ্গানির ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলে শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিল। ভাঙ্গানি পাঁওটা হইতে ছয় ক্রোশ দূরে। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বিচিত্র নাটকে স্বয়ং গুরুগোবিন্দ যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইলঃ—

"তাঁহা সাহা শ্রীসা সংগ্রাম কোপে। পঞ্চবীর রঙ্কে পৃথি পাঁয় রোপে॥
হঠি জীতমল্লং সুগাজী গোলাবং। রণং দেখিয়ে রঙ্গ রূপং সহাবং॥
হটেও মাহেরি চন্দেয়ং গঙ্গারামং। জীনে কেতিয়ং জীতিয়ং ফোজতামং॥
কোপেলাল চন্দং কীয়েলাল রূপং। জীনে গর্জ্জয়ং গর্ব্ব সিংহ অনুপং॥
কোপেও মাহেরুকাহেরু রূপ ধারে। জীনে খান খাবিনিয়ং ক্ষেত মারে॥
কুপেও দেব তেসং দয়ারাম যুদ্ধং। কিও দ্রোণ কি যেঁও মহাযুদ্ধ সুদ্ধং॥
কৃপাল কোপিয়ং কুৎকা সম্ভারি। হটিখান হায়ৎ কি শিশ ঝারি॥
উঠি ছিছ ইচ্ছা কড়া মেঝ যোরং। মনো মাখন মটকি কান ফোরং॥

তাঁহা নন্দচন্দ কিয়ে কোপ ভারো। লগাই বর্ষি কৃপাণং সম্ভারো॥
তুটিতেগ তৃক্ষি কঢ়ে যমদণ্ডং। হটি রাখিয়ং লজ্জ বংশ সনড্ঢং॥
তাঁহা মাতুলেয়ং কৃপাল ক্রুদ্ধং। ছকে ছোব ছত্রি করে যুদ্ধ সুদ্ধং॥
সহে দেহে আপং মহাবীর বাণং। করেও খান বাজী নাথালি পলানং॥
হটেও সাহেবং চন্দ ক্ষেত্র ক্ষত্রিয়ানং। হনে খান খুনি খোরাসান ভানং॥
তাঁহা বীর বঙ্কে ভলি ভাঁত মারে। বচে প্রাণলয়কে সিপাহি সিধারে॥
তাহ সাহ সংগ্রাম কিলে অথারে। ঘণে ক্ষেত মো খান খুনি লডারে॥
নৃপং গোপালয়ং খরো ক্ষেত গাজে। মৃগাঝুণ্ড মধং মনো সিংহ গাজে॥
তাঁহা একবীরং হরি চন্দ কোপেয়ং। ভলি ভাঁত সোক্ষেত মো পাঁও রোপেয়ং॥
মহা ক্রোধকে তীর তীথে প্রহারে। লগে জোনকে তাহে পারে পধারে॥"

অর্থাৎ তখন (১ম) সাহা শ্রীসা * ক্রোধ করিয়া সংগ্রামে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, (২য়) জিতমল্ল; (৩য়) গোলাপরায় গর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রূপে বড় শোভা হইয়াছিল। (৪র্থ) মাহেরি চন্দ ও (৫) গঙ্গারায় এই পাঁচজন বীর তাড়াইয়া যেন উড়িতে উড়িতে গিয়া ফৌজ জয় করিয়াছিলেন। লালচাঁদ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়াছিলেন, এবং ইঁহারা সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়াছিলেন। মাহেরু কুপিত হইয়া ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া খাঁদিগকে (খাঁ উপাধিধারী পূর্ব্বোক্ত পাঠান সর্দ্দারদিগকে) বাছিয়া বাছিয়া মারিয়াছিলেন। দয়ারাম ব্রাহ্মণও কোপে দ্রোণের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মোহন্ত কৃপাল কোঁতকা লইয়া হায়ৎ খাঁর মাথায় মারেন, তাহাতে রক্তের ধারার সহিত মজ্জা বাহির হইয়াছিল; যেন কানাই (শ্রীকৃষ্ণ) মাখনের মট্‌কি ভাঙ্গিয়াছিলেন। তখন নন্দচন্দ কোপ করিয়া বর্ষা ও তরবারি চালাইয়াছিলেন। পরে তরবারি ভাঙ্গিয়া গেলে

* ষষ্ঠ গুরুর কন্যা বিবি বিরোর পুত্র—ইনি গুরুগোবিন্দের পিসিত ভাই। সঙ্গুস যুদ্ধে বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখানয় গুরুগোবিন্দ তাঁহাকে সাহ শ্রীসা বলিতেন।

যমদণ্ড * লইয়া সোডিবংশের লজ্জা রক্ষা করিয়াছিলেন। নিজ শরীরে শত্রুর নানা বাণ সহ্য করিয়াছিলেন; খাঁদিগকে মারিতে যুদ্ধে ভঙ্গ দেন নাই। সাহেব চন্দ ক্ষত্রিয় যুদ্ধে স্থির ছিলেন। দুষ্ট খাঁদিগকে খোরাসানের তরবারী প্রহার করেন। অনেক বীরকে তাঁহারা মারিয়া ফেলেন; কেবল যাহারা পলাইয়াছিল, তাহাদেরই প্রাণ বাঁচিয়া ছিল। সঙ্গুসা খাঁদিগকে পদাঘাত করেন; অপর পক্ষে (চন্দেলির) রাজা গোপাল যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া মৃগদিগের মধ্যগত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছিলেন। (২য় বীর) হরিচন্দ ক্ষেত্রেতে খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বড় ক্রোধ করিয়া তীক্ষ্ণ তীর চালাইয়াছিলেন। সেই তীর যাহার শরীরে লাগিয়াছিল, তাহারই শরীর ভেদ করিয়াছিল।

এইরূপ যুদ্ধে গুরুগোবিন্দের পক্ষীয় সঙ্গুসা, মাহেরিচন্দ, বুদ্ধুসার দুই পুত্র এবং ভীমচাঁদের পক্ষে হরিচন্দ, চন্দেলির রাজা গোপাল, হায়ৎ খাঁ, নিজামত খাঁ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইলে ফতেসা সদলে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। এইরূপে ভাঙ্গানির ক্ষেত্রে "বাহ্ গুরুজী কি ফতে।"

---

* গদার ন্যায় অস্ত্র বিশেষ।

আনন্দপুরপর্ব্ব।

নবম পর্ব্বাধ্যায়।

গুরুগোবিন্দ সিং।—আনন্দপুরে প্রত্যাগমন।

ভাঙ্গানির যুদ্ধ শেষ হইলে গুরুগোবিন্দ সদলে পাঁওটায় ফিরিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যে যেমন কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেইরূপ পুরস্কার দিলেন। তন্মধ্যে বুদ্ধুসার কথা বিশেষরূপে সূর্য্য-প্রকাশে বর্ণিত আছে। গুরুগোবিন্দ বুদ্ধুসার কার্য্যে সবিশেষ সন্তোষলাভ করিয়া নিজ শিরোপা (পাগ্‌ড়ী) কঙ্গা (চিরুণী) এবং এক গুচ্ছ কেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, বুদ্ধুসা যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে সামান্য অর্থে তাঁহার পুরস্কার হয় না—যে শিরোপা প্রভৃতি দেওয়া গেল, ইহা তাঁহার সেই মহৎ কর্ম্মের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ, এবং ভবিষ্যতে ইহা হইতে উঁহার বংশধরগণের উপজীবিকাও হইতে পারিবে।” সূর্য্যপ্রকাশ লেখক বলেন যে, তিনি সেই শিরোপা প্রভৃতি দেখিয়াছিলেন। বুদ্ধুসা উহা গৃহের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখেন। ১৮১৭ সংবতে সেই দেওয়াল পড়িয়া যাওয়ার পর, এক্ষণে উহা রীতিমত সিংহাসনের উপর রক্ষিত। শিখগণ উহা দর্শন করিতে গিয়া পূজা দিয়া থাকেন।

এই যুদ্ধের পুরস্কারে পুরোহিত দয়ারামকে যে ঢাল দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে দয়ারামের বংশধর বিচিত্র সিংহের নিকট আনন্দপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। ঢালখানি গণ্ডারের চামড়ায় নির্ম্মিত। উহার ব্যাস দেড়হস্ত। ঢাল খানির সঙ্গে একখানি ফলকে লিখিত আছে:—

“শ্রীওয়া গুরুজী কি ফতে।”

"আজ্ঞা শ্রীগুরু মহারাজ কি লিখিয়ে পাটা দস্তি। বক্সী ঢাল প্রভু দয়ারামজীকো। লিখিতং খোদ তীরসে। সরবৎ সঙ্গত পরইয়েং থান। গুরু মহারাজজীকে হুকুম সে লিখ্‌দেতা সো। গুরু কি আজ্ঞা থাঁয়ি। সারস্বত ব্রাহ্মণ কো * * * সম্বৎ ১৭৪৪।"

ফলকখানিতে যেরূপ সঙ্কেতে লেখা, তাহাতে সকল অংশ ভাল পড়া যায় না। যদি সেই সময়ের লেখা হয়, তাহা হইলে তখন সম্বৎ ১৭৪৪ (১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ)।

পুরস্কারের কার্য্য মিটিয়া গেলে, পুনরায় আনন্দপুরে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব উঠিল। রাজা প্রকাশ মেদিনীকে সংবাদ দেওয়া হইল যে, গুরুগোবিন্দ সত্বরেই পাঁওটা পরিত্যাগ করিবেন। রাজা দেখিলেন যে, তাঁহার বড় বিপদ্। গুরু তাঁহার রাজ্যে থাকিয়া প্রায় অধিকাংশ পাহাড়ী রাজগণের সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়া চলিলেন। এক্ষণে তাহারা সকলে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে। তাঁহার মন্ত্রীগণ পরামর্শ দিলেন যে, এ সময় গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। প্রকাশ মেদিনী গোবিন্দের প্রেরিত দূতকে স্পষ্ট কোন কথা না বলিয়া, দুই এক দিনের মধ্যে যাইবেন বলিয়াছিলেন! দুই এক দিন পরে গুরু আবার লোক পাঠাইলেন—রাজার নিকট হইতে আবার ঐরূপ উত্তর গেল। এইরূপ আরও দুই এক বার, আজ যাইব—কাল যাইব, বলার পর প্রকাশ মেদিনী প্রধান মন্ত্রীকে গুরুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা ভীরুতার পরিচয় দিতেছেন দেখিয়া গুরু বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক পাঁওটা পরিত্যাগ করিলেন।

পথিমধ্যে অনেক ব্যক্তি গুরু দর্শনে পরম আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহাদের মধ্যে সূর্য্য-প্রকাশে রায়নগরের রাণীর বিশিষ্ট উল্লেখ আছে। রায়নগরের রাজ্য সামান্য হইলেও তথায় গুরু মহারাজ গমন করিয়া-

ছিলেন, এবং নিজ ঢাল তরবারি রাণীকে দিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া উহা শিখদিগের একটি তীর্থস্থানের ন্যায় হইয়াছে। রায়নগর ত্যাগের পর কীরতপুরে গোলাপ রায় প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিয়া গুরু আনন্দপুরে আসিয়া পৌছিলেন।

গুরুগোবিন্দ পাঁওটা হইতে ফিরিয়া আসিয়া একে একে পত্নীদ্বয়ের সহিত, মাতা গুজরী ও পিতামহী নানকীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, অন্তঃপুর মধ্যে যুদ্ধজয়ের আনন্দ উঠিল। যুদ্ধজয় করিয়া ফিরিয়া আসিলে শিখদিগের বুক আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা আনন্দপুরের নিকটবর্ত্তী ভীমচাঁদের অধিকার সমূহে মৃগয়া উপলক্ষে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিতে লাগিল। ভীমচাঁদ এই সংবাদ পাইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মন্ত্রীবর্গের সহিত পরামর্শ করিলেন। মন্ত্রীগণ ভীমচাঁদকে গুরুগোবিন্দের শরণ লইতে পরামর্শ দিলে ভীমচাঁদ প্রধান মন্ত্রীকে গুরুগোবিন্দের নিকট পাঠাইলেন। পরে গুরুগোবিন্দের অনুমতিক্রমে ভীমচাঁদও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীমচাঁদের এবারে ভ্রম ঘুচিয়া গেল; তিনি গুরুগোবিন্দের অনেক মহৎ গুণ দেখিতে পাইলেন এবং তাহাতে মুগ্ধ হইলেন।

প্রায় এই সময় (১৭৪৬ সম্বতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে) সুন্দরীজীর গর্ব্ভে গুরুগোবিন্দের প্রথম সন্তান অজিত সিংহ জন্ম গ্রহণ করেন। এই সময় আনন্দপুরে পূর্ণ আনন্দ চলিয়াছিল।

আনন্দপুরপর্ব্ব।

দশম পর্ব্বাধ্যায়।

—∞*∞—

গুরুগোবিন্দ সিং।—নাদাওনের যুদ্ধাদি ও শক্তি পূজা আরম্ভ।

যে সময়ে আনন্দপুরে আনন্দলহরী চলিয়াছিল, সে সময়টার সম্রাট আরাঙ্গীব দাক্ষিণাত্যে ছিলেন; তাঁহার মিয়াখাঁ, ওমরাও খাঁ প্রভৃতি অমাত্যগণ দিল্লী অঞ্চলের রাজকার্য্য চালাইতেছিলেন। উঁহাদিগের মধ্যে আলপ্‌খাঁ জম্বুতে গিয়া কটোচিয়ার পাহাড়ী রাজা কৃপালের নিকট দূত দ্বারা সংবাদ দেন যে হয় তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া শরণাপন্ন হউন; নতুবা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হউন। কৃপাল আলপ্‌খাঁর শরণাপন্ন হইয়া জানাইলেন যে পাহাড় অঞ্চলের রাজগণের মধ্যে ভীমচাঁদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। অতএব কুলহররাজ ভীমচাঁদকে হস্তগত করিতে পারিলে সমস্ত পাহাড় অঞ্চল বাদ্‌সাহের হস্তগত হইবে। তদনুসারে ভীমচাঁদের নিকট লোক প্রেরিত হইল। ভীমচাঁদ দিল্লীর বাদসাহের সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন, কি তাঁহার শরণাপন্ন হইবেন, সেই বিষয়ে অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলে, অমাত্যবর্গ পরামর্শ দিলেন যে, যখন গুরুগোবিন্দ তাঁহার উপর অনুকূল আছেন, তখন তিনি এ বিষয়ে যেরূপ পরামর্শ দিবেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য। ভীমচাঁদ গুরুগোবিন্দের নিকট দূত পাঠাইলে গুরু সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বলিয়া পাঠাইলেন যে, ভীমচাঁদ যুদ্ধ করিলে জয়লাভ করিবেন। এই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া ভীমচাঁদ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভীমচাঁদকে

দণ্ড দিবার জন্য সম্রাট সেনাপতি সসৈন্যে অগ্রসর হইলে নাদাওনের উপত্যকায় পাহাড়ীদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নাদাওনের যুদ্ধ বিলাসপুর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

পাহাড়ী রাজগণের মধ্যে যশবালিয়ার রাজা রাম সিং, ডঠবালিয়ার রাজা পৃথ্বীচাঁদ এবং যশরোটিয়ার রাজা সুখদেব, এই কয়জনের নাম ভীমচাঁদের পক্ষে এবং কটোচিয়ার রাজা কৃপাল ও বিজড়বালিয়ার রাজা দয়াল এই দুইজনের নাম আলপ্ খাঁর পক্ষে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। আলপ্ খাঁর পক্ষ অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি অধিকার পূর্ব্বক তথা হইতে গোলা গুলি ও তীরবৃষ্টি দ্বারা বিপক্ষ পক্ষকে একবারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। তখন ভীমচাঁদ গুরুগোবিন্দের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়া তিনি পরাজিত প্রায়, এক্ষণে গুরু আসিয়া উদ্ধার করুন। গুরু তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে যুদ্ধস্থলে আসিয়া স্বহস্তে বিজড়বালিয়ার রাজা দয়ালকে নিহত করেন। এই ঘটনায় আলপ্ খাঁর সৈন্যগণ ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে।

নাদাওনের যুদ্ধে তৎকালে অজেয় দিল্লীর সৈন্যদল সামান্য পাহাড়ী ও শিখের হস্তে পরাভূত হইতে দেখিয়া, পাঠানেরা * বড়ই অপমানিত বোধ করিল। তখন কাশ্মীরের সুবা বা সর্দ্দার দিলওয়ার খাঁর পুত্র এক সহস্র বাছা বাছা সৈন্য লইয়া অতর্কিতরূপে আনন্দপুর আক্রমণের জন্য বহির্গত হইলেন। ইচ্ছা ছিল যে, রাত্রিকালে শতদ্রু নদী পার হইয়া হঠাৎ আনন্দপুর আক্রমণ ও অধিকার করিয়া লইবেন। কিন্তু গুরুগোবিন্দ এই সম্বাদ জানিতে পারিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রহিলেন। এদিকে ভীষণ

* সূর্য্য-প্রকাশে বাদসা পক্ষকে "পাঠান পক্ষ" বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। মোগল বাদসাহদিগের অধিকাংশ মুসলমান সৈনিকই পাঠান জাতীয় ছিল। খাস মোগল এদেশে খুব কমই আসিয়াছিল।

শীতে শত্রুপক্ষ নদী পার হইতে অক্ষম হইয়া, এবং গুরুগোবিন্দের পক্ষ সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত আছে জানিতে পারিয়া, বিনা যুদ্ধে ফিরিয়া গেল।

যে কয়েক বর্ষের ঘটনার কথা উল্লিখিত হইল, সেই সময়ে শ্রীমতী জীতোজীর গর্ভে গুরুগোবিন্দের তিন পুত্র হয়। ইঁহাদের প্রথম ১৭০৮ সম্বতে (১৬৯১ খৃষ্টাব্দে) জুঝার সিং, দ্বিতীয় ১৭৫৩ সম্বতে (১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে) জোরাম্বর সিংহ এবং তৃতীয় ১৭৫৫ সম্বতে (১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে) ফতে সিং জন্ম গ্রহণ করেন। অজিত সিংহের জন্মকথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গুরুর এই চারি পুত্র। তাঁহার পুত্রগণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দিলওয়ার খাঁর পুত্র অকৃতকার্য্য হইয়া সসৈন্যে ফিরিয়া গেলে, গোলাম হোসেনী খাঁ নামক সম্রাট-সেনাপতি পাঁচ হাজার উৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া পাহাড়ী রাজগণকে আক্রমণ করেন। এবার ভীমচাঁদ ও কৃপাল ভয় পাইয়া মুসলমান পক্ষে মিলিলেন। গুলেরিয়ার অধিপতি গোপালও ঐ দলে মিলিবার উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ লইয়া হোসেনী খাঁর নিকট গিয়াছিলেন; কিন্তু হোসেনী খাঁ তাহার দ্বিগুণ অর্থ চাহিলে, রাজা গোপাল অনুপায় হইয়া গুরুগোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। হিন্দু রাজগণেরা সকলেই একজোট হইয়া যুদ্ধ করা শ্রেয় বিবেচনায় গুরুগোবিন্দ "সঙ্গতিয়া" নামক জনৈক শিখকে ভীমচাঁদ ও কৃপালের নিকট দূতস্বরূপ পাঠাইলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। মুসলমান পক্ষে কুলহর অধিপতি ভীমচাঁদ ও কটোচিয়া অধিপতি কৃপাল এবং অপর পক্ষে গুলেরিয়ার রাজা গোপাল, যশবালিয়ার অধিপতি এবং "সঙ্গতিয়া" শিখ মিলিত হইয়া যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে গোপাল কর্ত্তৃক কৃপাল নিহত হয়েন, এবং "সঙ্গতিয়া" শিখও এই যুদ্ধে হত হয়েন। এই যুদ্ধে কোন পক্ষেরই সম্পূর্ণ পরাজয় হইল না বটে, কিন্তু

পাহাড়িয়া রাজারা সম্রাট সৈন্যের ভীষণ আক্রমণে, দিল্লীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ অনুভব করিলেন, এবং গৃহবিচ্ছেদে নির্জ্জীব হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

যাহা হউক, শিখদিগের যন্ত্রণা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এতদিন শিখগণ স্বচ্ছন্দে নানাস্থান হইতে গুরু দর্শনে আসিতেন; কেহ কোন বাধা দিত না। এক্ষণে শিখগণ মুসলমান বাদসাহের শত্রু বলিয়া সর্ব্বত্রই পরিচিত হইয়া পড়িলে, পথে ঘাটে, যথা তথা মুসলমানগণ শিখগণকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অগত্যা শিষ্য রক্ষার্থে গুরুগোবিন্দ আদেশ প্রচার করিলেন যে, "শিখমাত্রেই সর্ব্বদা অস্ত্র ধারণ করিবে, এবং কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেই যুদ্ধ করিবে।" সেই সঙ্গে আরও বলিয়া দিলেন যে, "যুদ্ধে নিহত হইলে শিখগণ স্বর্গ সুখ ভোগ করিবে।—হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।" গুরুগোবিন্দ এই মহাবাণী প্রচার করিয়া দেওয়া অবধি ক্ষাত্রধর্ম্মী শিখগণ অনুক্ষণ অস্ত্রধারী হইয়াছেন।

ঐ সকল সংঘর্ষে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি সহ নিত্য নূতন গোলযোগ উঠিতে লাগিল। মুসলমানের তখন প্রবলতর পক্ষ। তাঁহারা ক্ষমা করিতে আদিষ্ট না হইয়া, তখন প্রবল প্রতাপ সম্রাটের দ্বারা পীড়ন করিতেই আদিষ্ট। গুরুগোবিন্দ দেখিলেন যে এরূপ প্রবল শত্রুর পীড়ন হইতে নিজের সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে হইলে দৈববলের আবশ্যক। মাৎসর্য্য বিহীন মহাপুরুষ মাত্রেই এইরূপ মনে করেন, এবং সেই জন্যই শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব হইয়াছিল। মহাশক্তি ব্যতীত বাঞ্ছা পূর্ণ আর কে করিবেন? কাত্যায়নী পূজা করিয়া তবে কৃষ্ণলাভ হয়। তাই আজ স্বীয় সম্প্রদায়ের দুর্দ্দিনে গুরুগোবিন্দ চণ্ডিকার আরাধনা করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

চণ্ডিকার আরাধনা-সংকল্প স্থির করিয়া গুরু নানা প্রদেশ হইতে

যাজ্ঞিক ও পণ্ডিতবর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন, এবং সেই সকল ব্রাহ্মণগণের আচার ব্যবহার স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া কয়েকজন সদাচারী ব্রাহ্মণকে এই মহাযজ্ঞে ব্রতী করিবার জন্য নির্ব্বাচিত করিলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা বলিলেন যে, ৺ কাশীধাম নিবাসী কেশবদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণই এইরূপ মহাযজ্ঞ সমাধা করিতে প্রকৃত উপযুক্ত। গুরু তাঁহাকে কিরূপে পাইবেন, চিন্তা করিবামাত্র লোকমুখে জানিতে পারিলেন যে, বিপ্র কেশবদাস তখন অদূরে জ্বালামুখীতে তীর্থ দর্শনে আসিয়াছেন। গুরু অবিলম্বে নন্দচন্দকে তথায় পাঠাইয়া বিশেষ বিনয় সহকারে বিপ্রবর কেশবদাসকে আনাইয়া চণ্ডিকা পূজার আচার্য্য কার্য্যে ব্রতী করিলেন, এবং স্বয়ং পূজা আরম্ভ করিলেন।

আনন্দপুরপর্ব্ব।

একাদশ পর্ব্বাধ্যায়।

—:*:—

গুরুগোবিন্দ সিং—যজ্ঞ—চণ্ডিকা নয়না দেবীর পূজা।

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্ব্বিজয়োভূতি ধ্রু'বা নীতির্ম্মতির্ম্মম॥"

যথায় ভগবদ্ভক্তি, যথায় জীব উদেযাগী, তথায় নিশ্চয়ই শ্রী, বিজয়, নীতি—এ সকল বর্ত্তমান। যে দেশ যখন এই মহাসত্য বুঝিয়াছে, তখন সেই দেশে উন্নতি দেখা দিয়াছে। নতুবা কেবল শারীরিক বলবৃদ্ধি অথবা মৌখিক ভগবদ্ভক্তিতে অতি সামান্য ফলই হয়। গুরুগোবিন্দের অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষার কথা বলা হইয়া গিয়াছে। এখন ভগবদ্ভক্তির সাধনা দেখা যাউক। এ বিষম সাধনায় যে সে লোকে যোগ দিতেই পারে না—দিলেও স্থির থাকিতে পারে না!

আনন্দপুরের সাত ক্রোশ উত্তরে পাহাড়ের উপর চণ্ডিকা নয়না দেবীর মন্দির। ইহা ভগবতীর বাহান্ন পীঠের মধ্যে একটি পীঠস্থান। এস্থলে ভগবতীর চক্ষু পতিত হইয়াছিল বলিয়া চণ্ডিকা দেবী সাধারণতঃ নয়নাদেবী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। গুরুগোবিন্দ কেবলমাত্র আচার্য্য কেশবদাসকে সঙ্গে করিয়া যজ্ঞের ঘৃতাদি উপকরণ দ্রব্যসহ দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। পরে গুরু অনুচরবর্গকে আজ্ঞা দিলেন যে, যে পর্য্যন্ত কার্য্য শেষ না হয়, ততদিন এই মন্দিরের নিকটে, এমন কি পাঁচ ক্রোশের মধ্যে, কেহ আসিতে না পারে। এইরূপে জন-শূন্য

মন্দিরে আচার্য্য কেশবদাসকে সঙ্গে লইয়া গুরুগোবিন্দ চৈত্র পুর্ণিমাতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

তখন আচার্য্য কেশবদাস গুরুগোবিন্দকে ষোড়শাক্ষর চণ্ডিকার মন্ত্র বলিয়া দিলেন, এবং অষ্টভুজার ধ্যান করিতে অনুমতি করিলেন। গোবিন্দ যজ্ঞকুণ্ডের পার্শ্বে পূর্ব্বমুখ হইয়া এবং আচার্য্য উত্তরমুখ হইয়া হোম করিতে বসিলেন। প্রথমে পাঁচ প্রহর ধরিয়া হোম করিলেন এবং এই প্রকারে পাঁচ মাস গেল। তৎপরে সওয়া সাত প্রহর কাল ব্যাপিয়া হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। এভাবেও তিন মাস গেল। যখন এইভাবে হোম করিতেছেন, সেই সময় এক নিশীথে গুরুগোবিন্দ স্বপ্ন দেখেন যে, দেবী যেন তাঁহাকে বলিতেছেন "এইভাবে চল—তোমাকে দর্শন দিব।" ইহাতে গুরু আরও উৎসাহিত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে দ্বাদশ প্রহর হোম করিয়া চারি প্রহরমাত্র বিশ্রাম লইতে লাগিলেন, এইরূপে চারি মাস চলিল।

ক্রমে আবার চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী আসিয়া উপস্থিত হইল—সেই অষ্টমীতে বার বার ভূমিকম্প, পূর্ব্বদিকে বিদ্যুৎ-জ্যোতিঃ প্রকাশ প্রভৃতি ঘটিতে লাগিল। তখন কেশব বলিলেন, "দেবীর দর্শন দিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কিন্তু দর্শন দিলে, একজন সুপাত্রকে বলি দিতে হইবে—একজন সুপাত্র স্থির করিয়া রাখুন।" গোবিন্দ বলিলেন, "আচার্য্য! তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত, পবিত্র সুপাত্র আর কোথায় কে আছেন; অতএব তুমিই প্রস্তুত থাক," এই কথায় কেশব ভীত হইয়া শৌচাদি কার্য্যের উল্লেখে পলায়ন করেন। আচার্য্য পলায়ন করিলেও গোবিন্দের কার্য্য সমভাবে চলিতেই লাগিল। অষ্টমীর তৃতীয় প্রহরে ভগবতী কালী মূর্ত্তিতে দর্শন দেন। সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়াও গুরু নির্ভীক হৃদয়ে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে

ভগবতী সিংহবাহিনী অষ্টভুজা মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া বর দিতে চাহেন। তখন গুরুগোবিন্দ নয়ন মুদিত করিয়া স্তব করিতে থাকেন।

সূর্য্য-প্রকাশে স্তবগুলি সম্পূর্ণ ভাবেই লিখিত আছে। এই যজ্ঞের কথা ইউরোপীয় ও মুসলমান ইতিহাস-বেত্তারাও উল্লেখ করিয়াছেন। "দশঁই বাদসা কি গ্রন্থে" যে "চণ্ডিকা" অংশ আছে, উহা এই যজ্ঞ উপলক্ষে লিখিত। উহা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আধুনিক কালের ঘটনা উল্লেখ জন্য অভিনব সংস্করণ বলিলেও চলে ; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ছয়টী স্তবই প্রধান—ইহা দশঁই বাদসা কি ছকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। গুরুগোবিন্দ অষ্টভুজার সম্মুখে নিমীলিতনেত্রে স্তব করিতে লাগিলেন ;—

১। ওঁ সৎগুরু প্রসাদ।

শ্রীভগবতীজী সহায় ॥

ভগবতীচ্ছন্দ ছক্কাপাত সাহি ১০ ॥

নম উগ্রদন্তী অনন্তি সবইয়া। নমো যোগ যোগেশ্বরী যোগমায়িয়া ॥ ১ ॥
নমো কেহরী বাহনী শক্রহন্তি। নমো শারদা ব্রহ্ম বিদ্যা পঢ়ন্তি ॥ ২ ॥
নমো ঋদ্ধিদা সিদ্ধিদা বুদ্ধিদায়নী। নমো কাল্‌কে কাল্‌কো কালছেনী ॥ ৩ ॥
নমো কাল আজাল হয়েহের তেরো। নমো তিনহুঁ লোক কিনো আহে রো ॥৪
নমো জ্যোতি জ্বালা তোমে বেদ গাঁয়ে। সুরাসুর ঋষীশ্বর মাহি ভেদ পায়েঁ ॥৫

তুহি যোগ যুগ্‌তেনি তুহিঁ খড়্গা ধারে।
তুহি জয় করন্তি অসুর গহি পছারে ॥ ৬ ॥
তুহি যোগনি খপ্রভরণী অদোখং।
রক্তবীজকে প্রাণকো পাকড়্ সোখং ॥ ৭ ॥
তুহি জল থলে পর্ব্বতে গিরি নিবাসী।
তুহি সভ ঘট্‌নমো নিরালম্ প্রকাশী ॥ ৮ ॥

তুহি দুষ্ট দাহনী তুহি সর্ব্বপালী। তুহি বৃছ পোহপা তুহি আপ্‌মালী ॥ ৯

তুহি বিশ্বভরণী তুহি জন্ প্রকাশি। তুহি অলখ বরণী তুহি ভূ আকাশী ॥১০
নমো জালপা দেবী দুর্গে ভবানী। তিহুলোক নব খণ্ডমৈ তুম প্রধানী ॥ ১১

অটল ছত্র ধারণী তুহি আদি দেবং।
সকল মুনী জনা তোহি নিশ দিন সরেবং ॥ ১২ ॥
তুহি কাল আকাল কি জ্যোতি ছাজৈ।
সদাজয় সদাজয় সদাজয় বিরাজৈ ॥ ১৩ ॥
য়িএহি দাস মাঙ্গে কৃপাসিন্ধ কিজৈ।
স্বয়ং ব্রহ্মকি ভক্তি সর্ব্বত্র দিজৈ ॥ ১৪ ॥
তুহি জাগতি জ্যোতি জ্বালা স্বরূপং।
তুহি জগ্ সকলমৈ রমন্তি অনুপং ॥ ১৫ ॥
মহামূঢ় হাঁও দাস দাসন্তেহারা।
পকড় বাঁহ ভব জল করো বেগ পারা ॥ ১৬ ॥
ফতেহি ডঙ্ক বাজে কৃপা ইত্রঁও করীজে।
এহি বারতা দাস কি নিৎ শুনিযে ॥ ১৭ ॥
করহু হুকুম্ আপনা সকল দুষ্ট ঘায়ুঁ।
তুরক্ হিন্দকা সকল ঝগ্‌রা মিটায়ুঁ ॥ ১৮ ॥
আগম স্থর বীরে উঠে সিংহ যোধা।
পাকড়্ তুর্কনকো কারঁবৈ নিরোধা ॥ ১৯ ॥
সকল জগৎমো খালিসা পন্থা গাজে।
জগে ধর্ম্ম হিন্দু তুরক্ দুন্দ্ ভাজে ॥ ২০ ॥
জপোঁ জাপঁ একা হরে হরি অকালং।
হয়ৈ তবহুনি সব্ ছিন্‌কমৈ নেহালং ॥ ২১ ॥
শুনো তুম ভবানী হামন্ কি পুকারে।
কর দাসোপর মেহর আপ্‌রম্ অপারে ॥ ২২ ॥

ভগবতী দোহরা।

দ্বার তোমারে ঠাঢ হোঁ একবর দিজে মোয়।
পন্থ চলে ত জগতমে দুষ্ট খেপাবহ তোঁয়॥

অর্থাৎ সৎগুরু প্রসাদে প্রাপ্ত একমাত্র ওঁকার মঙ্গলা-চরণরূপে ব্যবহৃত। শ্রীভগবতী দেবী সহায়। দশম গুরুর লিখিত ভগবতী সম্বন্ধীয় এই ছয় ছন্দ।

হে উগ্রদন্তি! (তুমি) অনন্ত অপেক্ষাও অধিক, তোমাকে নমস্কার। হে যোগমায়া! তুমি যোগ যোগেশ্বরী, তোমাকে নমস্কার। হে কেশরীবাহিনি! শত্রুসংহারিণি! তোমাকে নমস্কার। হে সারদা! তুমি ব্রহ্মবিদ্যা পাঠকারিণী, তোমাকে নমস্কার! হে সিদ্ধি ঋদ্ধি ও বুদ্ধিদায়িনী! তোমাকে নমস্কার। হে কালিকে! তুমি কালের কালকে ক্ষয় কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্ত কাল দেখিতে পাও. তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিলোক-ব্যাপিনী তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্যোতির প্রকাশক, বেদ তোমার গান করে, তোমায় নমস্কার। সুর অসুর ঋষিগণ তোমার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না। তুমি অসুরগণকে ধরিয়া পরাজয় পূর্ব্বক জয় লাভ কর। তুমি যোগযুক্ত, তুমি খড়্গাধারিণী। তুমি যোগিনী, খপ্রধারিণী, দোষ শূন্যা (পবিত্রা)। তুমি রক্তবীজকে ধরিয়া তাহার প্রাণ শোষণ করিয়াছিলে। তুমি জল স্থল পাহাড় পর্ব্বত নিবাসিনী। তুমি সর্ব্বঘটকে সর্ব্বদা প্রকাশ করিতেছ। তুমি দুষ্টকে দমন কর। তুমি সকলকে পালন কর। তুমি বৃক্ষ. পুষ্প, তুমিই স্বয়ং মালী। তুমি বিশ্ব ভরিয়া আছ। তুমি জগতকে প্রকাশ করিতেছ। তুমি অলক্ষ্যবরণী—অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর। তুমিই পৃথিবী, তুমিই আকাশ। হে জালপা দেবি! দুর্গে! ভবানি! তোমায় নমস্কার। ত্রিনলোক নবখণ্ডে তুমিই প্রধানা। অটল ছত্রধারিণী

তুমিই আদিদেব। সকল মুনিগণ নিশিদিন তোমায় স্মরণ করিতেছে। তুমি কাল অকালের জ্যোতি, তোমাতেই শোভা পাইতেছে। জয় সমূহ তোমাতেই বিরাজ করিতেছে। এ দাস এই প্রার্থনা করিতেছে যে, প্রকৃত ব্রহ্মভক্তি (ভগবদ্ভক্তি), সর্ব্বত্র প্রদান করুন। তুমি জাগতিক জ্যোতিঃ প্রকাশ স্বরূপ। তুমি সমস্ত জগতে অনুপম রমণ করিতেছ। আমি তোমার দাসানুদাস—অতি মূঢ়। আমার বাহু ধরিয়া সত্বরে ভববারি হইতে উদ্ধার কর। এমন কৃপা কর যে, জয় ডঙ্কা বাজুক। দাসের এই নিবেদন—সর্ব্বদা শুন। তুর্ক ও হিন্দুর সকল ঝগড়া মিটুক। স্বয়ং হুকুম কর, সকল দুষ্টকে নাশ করি। মহাসুর বীর যোদ্ধৃসিংহগণ উঠুক, তুর্কগণকে নিরোধ করুক! সমস্ত জগতে খালসাপন্থ (শিখধর্ম্ম) বিরাজিত হউক, হিন্দুধর্ম্ম জাগুক, তুর্ক অন্ধকার ঘুচুক। অকাল পুরুষের একমাত্র হরি হরি নাম জপদ্বারা সকল জগৎ ক্ষণমাত্রে তৃপ্তি লাভ করুক। হে ভবানি! তুমি আমার নিবেদন শুন, এই দাসের প্রতি এই অপার দয়া বিতরণ কর।

ভগবতী দোহরা (ভগবতী শব্দ মঙ্গলার্থ ব্যবহৃত। দোহরা—ছন্দ বিশেষ) তোমার দ্বারে আমি দাঁড়াইয়া আছি। আমায় এক বর দাও। জগতে (শিখ) পন্থ চালাই—তুমি দুষ্ট নাশ কর।

আনন্দপুরপর্ব্ব।

দ্বাদশ পর্ব্বাধ্যায়।

—ঃ০ঃ—

গুরুগোবিন্দ সিং।

ভগবতী নয়নাদেবীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তব।

ভগবতী চ্ছন্দ তুজা॥ ২

নমো কালিকা কালরূপী কৃপাণী। নমো শুম্ভ নৈশম্ভ নাশন ভবানী॥ ১
নমো চণ্ড আর মুণ্ড সংহারকারী। নমো রক্তবীজানকে প্রাণহারী॥ ২
নমো বেদ বিদ্যা নমো যজ্ঞরূপা। নমো অঞ্জনি পূর্ণা ভূপ ভূপা॥ ৩
নমো জয়নন্তি ভদ্রকালী অথাহং। নমো ভগবতী তেজবন্তী অগাহং॥ ৪
নমো শক্তিরূপী আগ্‌মনি আডোলা। নমো খড়্গাধারণি অছেদন্ অতোলা॥৫
নমো গর্ব্ব গঞ্জন শ্রী যোগমায়া। সভে থাক্ রহে মরম্ কিন্‌হুঁ না পায়া॥ ৬
তুহী জল অগ্নি পবন তুঁ হুর নুরা। তুহী জ্যোতি উড়্‌গণ্ তুহী চন্দ সূরা॥৭
তুহী খেচরা ভূচরা যোধ বীরে। তুহী রচ্ছিণী সৃষ্টিরূপণ গহিয়ে॥৮
তুহী জগৎ জননী অনন্তি অকালং। তুহী অন্নদায়িনী সভন্‌কো সম্ভালং॥৯
তুহী খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ভূমং স্বরূপী। তুহী বিষ্ণু শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র আনুপী॥ ১০
তুহী শিতলা তোতলা বাক্‌বাণী। নমো চণ্ডিকা মঙ্গলা শ্রীভবানী॥ ১১
নহি তুম্ বিনা কোই রক্ষক হামারা। তুহী আদি কোয়ারী দেবী অপারা॥
তুহী দেবকী কৃষ্ণ মাতা কহায়ং। তুহী নয়নাদেবী আলখ্ জগ্ সহায়ং॥১৩

তুহী থাম্বসোঁ নিকস্ নরসিংহ হোই।
উদর হিরণ্ কস্‌কা নখোঁ কর পারায়ি॥ ১৪

তুহী কচ্ছহৈব দৈত্য মধুকীট জারে। তুহী হোয় বৈরাহ হরণাক্ষ মারে ॥১৫
তুহী হোয় বামন মহাছল দেখায়ো। পাকড় রাজ বলিকো পাতালে পাঠায়ো॥১৬

তুহী হৈব পরশরাম জগমে প্রকাশী।.
সকল চ্ছত্রিয়ান্‌কো করেও ক্ষয় বিনাশী। ১৭

তুহী ফিরভেই রামচন্দ্রং অবতারা। পকড় দৈত্য লঙ্কেশ রাবণ পছারা ॥ ১৮
তুহী মুক্তিদায়িনী সদা শুভ করন্তি। তুহী সুরবলবীর দুষ্টন্‌ দহন্তী ॥ ১৯
তুহী রাধিকা রুকমণি তু কুশল্যা। তুহী অঞ্জনী রেনকা তু অহিল্যা ॥ ২০

তুহী ভরণি পোখনি সভনপয় কৃপালী।
করো মোহি মুক্তা কাটো ভরম্‌ জালী ॥ ২১

নমো দুখ হরন্তি আনন্দৎস্বরূপা। আপন্‌ দাস পর মেহের কিজে অনুপা ॥২২

ভগবতী দোহরা।

দাস জান কর আপনা কৃপা কিজে মোয়।
ইহে বেনতি দাস কি শুনহ ভবানী তোয় ॥

অর্থাৎ ভগবতীর স্তবের দ্বিতীয় ছন্দে।

কালিকা, কালরূপ, কৃপাণধারিণী! তোমায় নমস্কার। শুম্ভ নিশুম্ভ নাশকারিণী ভবানী, তোমায় নমস্কার। চণ্ড-মুণ্ড সংহারকারিণী, তোমায় নমস্কার। রক্তবীজের প্রাণহারিণী তোমায় নমস্কার। বেদ-বিদ্যা, তোমায় নমস্কার। যজ্ঞরূপা, তোমায় নমস্কার। অন্নপূর্ণা ভূপ ভূপা (রাজার রাজা), তোমায় নমস্কার। অনন্তজয়কারিণী, ভদ্রকালী, অসীম গভীরা, (অথৈ)! তোমায় নমস্কার। ভগবতী তেজবন্তী, সকলের আশ্রয়রূপ! তোমায় নমস্কার। শক্তিরূপী বুদ্ধির অগম্যা, স্থিরা, খড়্গধারিণী, অচ্ছেদ্যা, অতুলনীয়া, তোমায় নমস্কার। গর্ব্বগঞ্জনকারিণী, শ্রীযোগমায়া তোমায় নমস্কার।

সকলেই বিস্মিত হইয়াছে,—কেহ তোমার মর্ম্ম পায় নাই। তুমি

জল, অগ্নি, পবন, তুমিই ধরণী ও আকাশ। তুমি তারকাগণের জ্যোতি-তুমিই চন্দ্র এবং সূর্য্য। তুমি খেচর ভূচর জীবে যোধবীর; সৃষ্টরূপ ভার হইতে তুমিই রক্ষাকারিণী। তুমিই জগৎজননী, অনন্তী, অকাল। তুমি অন্নদায়িনী সকলকে রক্ষা-কারিণী। তুমি খণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে ভূমি স্বরূপ। তুমি বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, উপমা-রহিত। তুমি শীতলা তোতলা বাক্‌বাণী। চণ্ডিকা! মঙ্গলা! শ্রীভবানী! তোমায় নমস্কার। তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ রক্ষক নাই। তুমি আদি কুমারী দেবী অপার। তুমি দেবকী কৃষ্ণমাতা বলাইয়াছ। তুমি নয়না দেবী, সকল জগতের সহায়। তুমি নরসিংহরূপে স্তম্ভ হইতে বাহির হইয়া হিরণ্য-কশিপুকে নখে করিয়া বিদীর্ণ করিয়াছ। তুমি কচ্ছপ হইয়া মধুকৈটভকে নষ্ট করিয়াছিলে। তুমি বরাহ হইয়া হিরণ্যাক্ষ্যকে মারিয়াছিলে। তুমি বামনরূপে মহা ছলপূর্ব্বক বলিরাজকে ধরিয়া পাতালে পাঠাইয়াছিলে। তুমি পরশুরামরূপে জগতে প্রকাশিত হইয়া, সকল ক্ষত্রিয়কুলকে ক্ষয় করিয়া নষ্ট করিয়াছ। তুমি পুনরায় রামচন্দ্র অবতার হইয়া লঙ্কেশ দৈত্য রাবণকে পরাজয় করিয়াছ। তুমি মুক্তিদায়িনী, সদা শুভ করিতেছ। তুমি সুর বল-বীর দুষ্ট-দমনকারিণী। তুমি রাধিকা, রুক্মিণী, তুমি কৌশল্যা, তুমি অঞ্জনী, তুমি রেনকা, তুমি অহল্যা। তুমি ভরণ-পোষণকারিণী, সকলের প্রতি কৃপাময়ী। আমার মোহ মুক্ত কর; আমার ভ্রমজাল কাটিয়া দাও। হে দুঃখহারিণী আনন্দ স্বরূপা! তোমায় নমস্কার। হে উপমা-রহিত! আপনার দাসের প্রতি কৃপা কর।

ভগবতী দোহরা। আপনার দাস জানিয়া আমার প্রতি কৃপা কর। হে ভবানি! তোমার দাসের এই মিনতি শুন।

ছন্দ তিজা ॥৩

তুহী কল্পবৃচ্ছনি তুহী কামধেনা। তুহী অষ্ট সিদ্ধিনী তুহী সুরনৈয়না ॥ ১

তুহী স্বর্গ পাতাল বৈকুণ্ঠ ধরণী। তুহী পাপ খণ্ডনী উদর জগৎভরণী ॥ ২
তুহী ব্রহ্মণী বেদ পাঠনি সাবিত্রী তুহী ধর্ম্মনিকরণ কারিণী পবিত্রী ॥ ৩
তুহী গৌরজাঁ পার্ব্বতি যোগধারিণী। তুঁ লছমী আলখ্ রূপ অবনী ॥ ৪
তুহী সব জগৎকো উপায়ে ছেকায়ে। তুহী বহুর আপে ছিনাক্ মে খেপায়ে ॥৫
তুহী জগৎকর তার কি শক্তি র না। তুহী হরিসিমারকার ভই যোগধ্যানী ॥৬

অগম্ খেলু তুমরা কহো কো বাখানৈ।
তুহী ভেদ অপ্না আপন আপ জানে ॥ ৭
সকল ঢুণ্ড থাকি ও লথে ও কছুন ভেঁদা।
তুহী ঈশ্বরী দুঃখ বিনাশিনী অছেদা ॥ ৮
করো মিহর আপ্নি চরণ ধুলি পাউঁ।
তুমান দ্বার পর শিষ্ আপ্না ঘসাউঁ ॥ ৯
এহী দান মাঙ্গো করো জয় হামারী।
সভে দুষ্ট দৈত্যা খপৈঁ ছিন মঞ্ঝারী ॥ ১০

তুহী ডাকৃনি সাকৃনি সুরবীরে। তুহী রূপ নারায়ণী হরি শরীরে ॥ ১১
তুহী অলখ্ দুর্গা জগৎকরণহারী। সকল্ ছোড় কর ওট পাকড়ী তিহারী ॥১২
তুহী মচ্ছ হোয়া সিন্ধ ভিতর খলন্তি। তুহী দৈঁত্য শঙ্খা সুরকো দলন্তি ॥১৩
তুহী কৃষ্ণ হোয়া কংশ কেশী খপায়ো। তুমন্ মলচন্তুর গেহিকর্ উত্তায়ো ॥১৪
জগন্নাথ হোয়া দৈত্য গয়াসুর বিদারে। তুহী নিহ্ কলঙ্কী ভই খড়্গা ধারে ॥১৫

তুহী দৈত্য কিল্কা সুরেকো সংহরণী।
তুহী সব জগৎ বাঁচ অবতার ধারণী ॥ ১৬
যুগোযুগ সকল খেল তুম্হি রচায়ো।
তুমন্ খেল্কা ভেদ কিন্ হুন্ পায়ো ॥ ১৭
তুহী অষ্ট দুর্গে ভবানী অকালং।
তুহী সকল ব্রহ্মাণ্ড উপর দয়ালং ॥ ১৮

তুমন্ কুদ্‌রতী খেল কিনো অপারা।
তুমন্ তেজসো কোটি রবি শশী উজারা॥ ১৯
তুহী নিজ উজীরণ্ প্রভুদঁর শোভন্তি।
তুহী নিশ দিনা জাপ হরি হরি জপন্তি॥ ২০
নিরঞ্জন পুরুখ সাহসাহন্ অপারে। তুহী শক্তি হোয়া নিকটবর্ত্তী মুরারে॥২১
শুনহু দাস কি বেনতি হরি ভবানী। দয়া ধার মোহি লাজ রাখহু নিধানী॥২২

ভগবতী দোহারা।
দানোমারে রোহলে দেব বাঁচাহে তোহে।
সিং তোমারো রণগজে হাকনা ঝালস্ কোয়॥

অর্থাৎ—তৃতীয় ছন্দ। তুমি কল্পবৃক্ষ, তুমি কামধেনু। তুমি অষ্ট-সিদ্ধি দায়িনী। তুমিই আত্মাস্বরূপা। তুমিই স্বর্গ, পাতাল ও বৈকুণ্ঠ-ধারিণী। তুমিই পাপ-খণ্ডনকারিণী। তুমি জগতের উদর-ভরণ-কারিণী। তুমি ব্রহ্মাণী, বেদপাঠিনী, সাবিত্রী। তুমিই ধর্ম্মকরণ, কারিণী পবিত্রা। তুমিই গৌরী, পার্ব্বতী, যোগধারিণী। তুমি লক্ষ্মী, অদৃশ্যরূপা, অবর্ণা (বর্ণ হীনা)। তুমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও পালন কারিণী। তুমি আবার আপনি উহাকে নাশ কর। তুমি জগৎকর্ত্তার শক্তি ও রাণী। তুমিই হরির ধ্যান করিয়া যোগধ্যানী হইয়াছ। তোমার খেলা বুদ্ধির অগম্য: কে উহা ব্যাখ্যা করিতে পারে? তুমি আপনই আপনার মর্ম্ম জান। সকলে খুঁজিয়া ক্লান্ত হইয়াছে, তথাপি কেহ তোমার মর্ম্ম পায় নাই। তুমি ঈশ্বরী, দুঃখ বিনাশিনী, অচ্ছেদ্য। দয়া কর, তোমার চরণ ধূলি পাই। তোমার দ্বারে মস্তক ঘষিতেছি (প্রণাম করিতেছি)। এই দান ভিক্ষা করিতেছি যে, আমার জয় হউক। সকল দুষ্ট দৈত্যগণ ক্ষণ মধ্যে নাশ প্রাপ্ত হউক। তুমি সুরবীরগণের মধ্যে ডাকিনী, শঙ্খিনী। তুমিই সকল শরীরে নারায়ণী রূপা। তুমি দর্শ-

নেন্দ্রিয়ের অগোচর, দুর্গা, জগতের উৎপত্তিকারিণী। সকল ছাড়িয়া তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তুমিই মৎস্য হইয়া সিন্ধুর ভিতর খেলা করিয়াছিলে। তুমিই দৈত্য শঙ্খাসুরকে দলন করিয়াছিলে। তুমিই কৃষ্ণ হইয়া কংশ কেশীকে নাশ করিয়াছিলে। তুমিই মল্ল চণ্ডুকে ধরিয়া উড়াইয়া ফেলিয়াছিলে। জগন্নাথ হইয়া দৈত্য গয়াসুরকে বিদারিত করিয়াছিলে। হে খড়্গধারিণী! তুমিই নিষ্কলঙ্কিনী। তুমিই দৈত্য কলিকাসুরকে সংহার করিয়াছিলে। তুমিই সকল জগতের মধ্যে অবতার-ধারিণী। যুগে যুগে সকল খেলা তুমিই রচনা করিতেছ। তোমার খেলার মর্ম্ম কেহ পায় নাই। তুমি অষ্ট দুর্গা, ভবানী, অকাল। তুমিই সকল ব্রহ্মাণ্ডের উপর দয়ালু। তোমার দয়ার খেলা অপার হইয়াছে। তোমার তেজে কোটি রবি শশী উজ্জ্বল। তুমিই নিজের মন্ত্রী প্রভুর (ব্রহ্মের) দরবারে শোভা পাইতেছ। তুমিই নিশি দিন হরি হরি জপ করিতেছ। তুমিই নিরঞ্জন পুরুষ, সম্রাটের সম্রাট, অসীম। তুমি মুরারির নিকট শক্তি-স্বরূপা। হে হরি ভাবিনী! দাসের এই মিনতি শুন। হে নিধানি! দয়া করিয়া আমার লজ্জা রক্ষা কর।

(দোহরা।)

তুমি দৈত্যদের সংহার করিয়া দেবতাদের রক্ষা কর। তোমার সিংহ যখন যুদ্ধে গর্জ্জন করে, তখন কেহই তাহার তেজ সহ্য করিতে পারে না।

আনন্দপুর পর্ব্ব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—∞*∞—

গুরুগোবিন্দ সিং।

৺নয়নাদেবীর স্তবের শেষ ভাগ।

ভগবতী ছন্দ চৌথা। ৪

তুহী জ্যোতি জ্বালামুখী গোত্র দেখানী।
পর্ব্বত ফোড় লাটাঁ আগ্নি জগ্‌মোগানী॥ ১
তুহী হরণী ভরণী তুহী আপ মায়ে।
তুহী সর্ব্ব ঠাওরান রহি আপ ছায়ে॥ ২
তুহী উদ্ভুজা স্বেদ্‌জা শুভ নিধনী।
তুহী অণ্ডজা জেরজা চতর বাণী॥ ৩
তুহী তীর তরবার কাতি কাটারি।
তুহী শঙ্খ পদ্‌মন্ গদা চক্রধারী॥ ৪
তুহী তোপ বন্ধুক গোলা চলন্তি।
তুহী কোট গড়কো ধমক্‌সো ওড়ন্তি॥ ৫
তুহী বড়ি অজিতনি সকল দোখ হরণী।
তুহী হর অডোল্‌নি অগম খেল করণী॥ ৬
তুহী বল বলিষ্টনি চতুর্ভুজ ভবানী।
তুমন্ সর্ব্ব দুষ্টা কিয়ে মার ফানি॥ ৭
তুহী গুপ্ত প্রগ্‌ট সভন মোমেলন্তি।
তুহী শম্ভ মহিমা সুরকো দলন্তি॥ ৮

তুহী জগৎ মণ্ডন্ দয়াবন্ত ভারী।
সকল সিদ্ধি মুনী জনা লয়ত্যে উবারী॥ ৯
লখে নহিকো আজব খেল তেরা।
তুহী ধরণী ধরকৈ করেঁ ফির নিবেরা॥ ১০
তুহী বিজুলী হোত্র চড়গগন ঝিল্মিলানি।
তুমন্ চরণ পর্ সুরতি হমরি লাগানি॥ ১১
তুহী আলখ্ করতারনি শিব স্বরূপা।
তুহী সবঘটে দেব ত্নর্গে আনুপা॥ ১২
তুহী হৈয় সভণ বীচ সভসোঁ নিরালি।
তুহী সভ জগৎ কি করহিঁ প্রংপালি॥ ১৩
তুহী খাস ভগ্তন হরে হরি জপন্তি।
তুহী হরি চরণ পর আপন শির ধরন্তি॥ ১৪
তুহী হরি কৃপাসো আগম্ রূপ হোই।
সভে পচ্ মোয়ে পার পাওৎনা কোয়ী॥ ১৫
তুহী সুরবল বন্তনি গুণ গহিরে।
তুমন্ দোয়ার ঘুরহেঁ অনাহদ্ না ফিরে॥ ১৬
নিরঞ্জন স্বরূপা তুহী আদী রাণী।
তুহী যোগ বিদ্যা তুহী ব্রহ্ম বাণী॥ ১৭
নিরঞ্জন প্রভুনাথ কাদর মুরারে।
তাঁহা তু খাড়ি কুদ্রতি রূপ ধারে॥ ১৮
তুহী অম্বকে শক্তি কুদ্রতি ভবাণী।
তুমন্ কুদ্রতি জ্যোতি ঘট্ ঘট্ সমানি॥ ১৯
ধরণী পবণ আকাশ কুদ্রতি স্বরূপং।
তুহী কুদ্রতি আলখ্ দেবী অনুপম্॥ ২০

নাহি ভাথ্ সাকোঁ মহিমা তেহারি।
লখেও নাহি কিন্হুঁ তুমন্ অন্তপারি॥ ২১
এহি দাস তুম্‌রা চরণ ধুরি পায়ে।
তুমন্ দ্বার ঠাঢ়া সদা ধূলি লাগায়ে॥ ২২

ভগবতী দোহরা।

মুখ পসারে কাল্‌কা দৈত্য চবাবে দাঁত।
পন্থ চলাবে জগৎমে যুদ্ধ করহে তব সাঁৎ॥

অর্থাৎ ভগবতী ৪র্থ ছন্দ। তুমি জ্বালামুখীর জ্যোতিঃ হইয়া দেখা দিয়াছ। পর্ব্বত ফাটাইয়া অগ্নি শিখা জগ্‌মগ্ করিয়াছ। তুমিই হরণ কর তুমিই ভরণ পোষণ কর, তুমিই আপন মাতা। তুমিই সকল স্থানে আপনি ব্যাপিয়া আছ। তুমিই মঙ্গলদায়িনী। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, এই চারি প্রকার (প্রাণী)। তুমিই তীর, তরবারি, কাস্তে, কাটারি। তুমিই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী। তুমিই তোপ, বন্দুক, গোলা চালাও। তুমি দুর্গ প্রাচীর ধমকে (শব্দে) উড়াইয়া দাও। তুমি সর্ব্বত্র অজেয়, সকল দোষ হরণকারিণী। তুমি হরি, ঈশ্বরা, অবোধ্য ক্রীড়াকারিণী। হে চতুর্ভুজা ভবানি! তুমি বলিষ্ঠদিগের বল। তুমি সকল দুষ্টকে নাশ করিয়াছ। তুমি গুপ্ত, প্রকাশ্য, সকলে মিশিয়া আছ। তুমি মহিষাসুরকে দলন করিয়াছ। তুমি জগৎ পালন কর্ত্রী, অত্যন্ত দয়াবতী। তুমি সকল সিদ্ধ মুনিজনকে উদ্ধার করিয়া লও। কেহ তোমার আশ্চর্য্য খেলা দেখে না। তুমি ধরণী ধরিয়া পুনরায় উহা নাশ কর। তুমি বিদ্যুৎ হইয়া আকাশে চিক্‌মিক্ কর। তোমার চরণে আমার মতি লাগাও। তুমি অলক্ষ্য, কর্ত্রী, মঙ্গলস্বরূপা। তুমি সকল ঘটে অনুপমা দুর্গা দেবী। তুমি সকলের মধ্যে থাকিয়াও সকল হইতে নির্লিপ্ত। তুমিই সকল জগতকে প্রতিপালন করিতেছ। তুমিই প্রধান

ভক্ত (প্রধান বৈষ্ণব) হরি হরি জপ করিতেছ। তুমিই হরির চরণে আপন মস্তক ধরিয়াছ। তুমিই হরির কৃপায় আশ্চর্য্য রূপ ধরিয়াছ। তোমার চিন্তা করিয়া কত লোক পচিয়া গিয়াছে ; কিন্তু কেহ অন্ত পায় নাই। তুমিই সুর লোকের বল, গভীর গুণশালিনী। অনাহত শব্দ তোমার দ্বারে ঘুরিতেছে। হে নিরঞ্জনস্বরূপে! তুমিই আদিরাণী। তুমিই যোগবিদ্যা, তুমিই ব্রহ্মবাণী। নিরঞ্জন প্রভু নাথ মুরারির দ্বারে তুমি দয়ারূপে দাঁড়াইয়া আছ। হে জগৎ-মাতা! আদ্যাশক্তি তুমি স্বয়ম্ভূ। হে অলক্ষ্য দেবি! তোমার দয়ার তুলনা নাই। তোমার মহিমা ব্যক্ত করিতে কেহ সক্ষম নহে। তোমার অন্ত কেহ দেখে নাই। এই দাস তোমার চরণ ধূলি পাউক। তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া সদা তোমার আরাধনা করুক।

(দোহরা।)

আপনি কালী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুখ বিস্তার পূর্ব্বক দন্তে দৈত্যদিগকে চর্ব্বণ করিয়াছেন। এক্ষণে কৃপা করিয়া জগতে খালসা পন্ত প্রচারার্থ যুদ্ধ করিলে তবে আমার চিত্ত শান্ত হয়।

ভগবতী চ্ছন্দ পঞ্জোয়া।

নমো দেবী শাকম্ভরী হিঙ্গলাজা। তুহী সভ জগৎকে করেঁ সিদ্ধ কাজা ॥১

তুহী আলখ জ্বালা কামাখ্যা প্রধানী।

তুমন্ যশ সকল জগৎ করহে বাখানী ॥ ২

তুহী হরি নিরোঙ্কার ঠাকুর জপন্তি। তুহী রাক্ষসন্ কো পাকড় কর দহন্তী ॥৩

হামন্ বৈরিয়ন্ কো পাকড় ঘাত কিজে।

তবে দাস গোবিন্দকো মন্ পতিজে॥ ৪

তুহী আশ পূরণ জগৎ গুরু ভবানী।

ছত্র ছিন মোগলন্‌কো করো বেগ ফানী ॥ ৫

সকল হিন্দসে-ও তুরগ দুষ্ট বিদারহুঁ।
ধরম কি ধুজা কো জগৎ মে ঝলা রহো ॥ ৬
ত্হঁ পন্থমে কপট বিন্তা চালানি। বহোড় তিস্‌রা পন্থ কিজে প্রধানী ॥ ৭
যো উপ্‌জে মরে তাহে শিমরন্ না কিজে।
অটল পুরূখ অকাল কা নাম লিজে ॥ ৮
মঢ়ি গোর দেবল্ মসিতা গিরাপন্। তুহী এক অকাল হরি হরি জপাপম্ ॥
মটে হি বেদশাস্ত্র আঠারেঃ পুরাণা। মিটে হি বাঙ্গ সলবাৎ সুন্নৎ কোরাণা॥১০
সকল সৃষ্টি এক বর্ণ হোয়া কর ভুলানী।
ধর্ম্ম নেম কি যুক্তি কিনহুঁ না জানি ॥ ১১
কঠণ দুন্দ বার্ত্তে জগত মহি গুবারা। দয়া ধার কর মোহি লিজে উবারা ॥১২
তুহী কুদ্‌রতি শক্তি দুর্গে ভবানী। তুহী জগৎ মাতা সকল বিধি নিধানী ॥১৩
তুহী ব্যাস গোরখ অগস্তং কবিরে। তুহী ঋষিজ মুনি সুর তুহী গৌস পিরে॥১৪
নিরঞ্জন পুরুষ কো সদাতুঁ ধ্যায়ায়ে। প্রভু দোয়ারে ঠাঢ়ি উজিরণ কাহায়েঁ॥১৫
নহী তুম বিনা কোই দুসর হজুরে। তুহী অলখ্যানি হোয়ে রহি জগৎ পুরে॥১৬
আপন জান কর মোহি লিজে বাঁচাই। অসুর পাপীয়ন্ মার দেওঁ উড়াই ॥১৭
সকল জগৎকো সুখ বসায়হু আনন্দা। তুহী তুর্ক মেটন শ্রীহরি মুকুন্দা ॥ ১৮
এহী দেহ আজ্ঞা তুরকন্ গহি খাপাউঁ।
গৌ ঘাতকা দোষ জগৎ সেওঁ মিটাউঁ ॥ ১৯
ছত্র তক্ত মোগলন্ কো করহু মার দূরে।
ঘুরেহেঁ তব জগৎমে ফতেহি ধর্ম্ম তুরে ॥ ২০
তুমন্ দ্বার খাড়া দাস করহে পুকারা।
তুরকন্ মেট কিজে জগৎ মেহি উজারা ॥ ২১
তদ্‌হিঁ গীত মঙ্গল ফতে কে শুনাউঁ।
তুমন্‌কো সিমর দুঃখ সকলে মিটাউঁ ॥২২

ভগবতী দোহারা।

কৃপা কিজে দাস পর কণ্ঠ নেয়াউঁচার।
নাম তোমারা যো জপে ভৈয় সিন্ধু ভব পার।

ভগবতী পঞ্চম ছন্দ।

হে দেবি শাকম্ভরি! (হিঙ্গলা পর্ব্বত-নিবাসিনী) হিঙ্গলায়ে! তোমায় নমস্কার। তুমিই সকল জগতের কার্য্য সিদ্ধ কর। কামাখ্যা প্রধানী তুমিই অখণ্ড জ্যোতিঃ। সমস্ত জগৎ তোমারই যশঃ ব্যাখ্যা করিতেছে। তুমি নিরাকার ঠাকুর হরির জপ করিতেছ। তুমিই রাক্ষসগণকে ধরিয়া দহন কর। আমার শত্রুগণকে ধরিয়া মার। তবে তোমার দাস গুরুগোবিন্দের মনে প্রত্যয় হইবে। হে জগৎ-গুরু ভবানি! তুমি আশা পূর্ণ কর। মোগলদিগের রাজছত্র ছিন্ন করিয়া শীঘ্র উহাদিগের নাশ কর। সমস্ত হিন্দুস্থান হইতে দুষ্ট তুর্ককে বিদায় কর। ধর্ম্মের ধ্বজা জগতে ঝুলুক। উভয় পথেই (হিন্দু মুসলমানের উভয় পথেই) কপট বিদ্যা চলিয়াছে। পুনরায় তৃতীয়—পথ (শিখ ধর্ম্ম) প্রধান কর। যে জন্মে, মরে, তাহার বিষয় মনে চিন্তা করিও না। অটল অকাল পুরুষের নাম লও। দরগা, গোর, দেউল, মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া ফেলি। তুমি একমাত্র কালাতীত হরি হরি জপ কর। বেদশাস্ত্র ও আঠার পুরাণ নষ্ট হইতেছে; মুসলমান ধর্ম্ম, উহাদের আজান দেওয়া, কোরাণ প্রভৃতিও নষ্ট হইতেছে। সমস্ত জগৎ একবর্ণ হইয়া ভুলাইয়াছে। ধর্ম্মের নিয়ম যুক্তি কেহ জানেন না। জগতে ভয়ানক অন্ধকার হইয়াছে। দয়া করিয়া আমায় উদ্ধার করিয়া লও। হে দুর্গে ভবানি! তুমিই দয়া শক্তি। তুমিই জগৎ মাতা, সকল বিধি নিধান কর্ত্রী। তুমি ব্যাস, গোরখ, অগস্ত্য, কবীর। তুমি ঋষি, মুনি, সুর, তুমিই পয়গম্বর। নিরঞ্জন পুরুষকে সদা তুমি ধ্যান করিতেছ।

প্রভুর দ্বারে দঁড়াইয়া নিজকে উজীর বলাইয়াছ। তুমি বিনা কেহ প্রত্যক্ষ নাই। তুমি দর্শন ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়া জগৎপুরে রহিয়াছ। তুমি আমাকে আপনার জানিয়া উদ্ধার কর। অসুর পাপিগণকে মারিয়া উড়াও। হে আনন্দস্বরূপা! তুমি সকল জগৎকে সুখে বসাও। তুমিই তুর্কনাশ-কর্ত্রী শ্রীহরি মুকুন্দা। এই আজ্ঞা দাও যে, তুর্ক মারিয়া নাশ করি। গোঘাতকের দোষ জগৎ হইতে লুপ্ত করি। মোগলের রাজছত্র মারিয়া দূর করি; তবে জগতে তোমার জয় ধর্ম্ম ঘোষণা হয়। তোমার দ্বারে থাকিয়া দাস চীৎকার ধ্বনি করিতেছে। তুর্ক অন্ধকার লুপ্ত করিয়া জগৎকে আলোকিত কর। তবে জয় মঙ্গল গীত শুনাই। তোমাকে স্মরণ করিয়া সকল দুঃখ মিটাইয়া থাকি।

দোহারা। দাসের প্রতি কৃপা কর, নমস্কার করিতেছি। যে তোমার নাম জপে, সে ভবসিন্ধু পার হয়।

ভগবতী ষষ্ঠ ছন্দ।

নমো কষ্ট হরণি দুর্গা শক্তি মায়ে। সভে দুষ্ট দানো পাকড় তৈ খাপায়ে ॥১
তুমন্ ভবন ত্রিলোক পর যেহি বিরাজে। তাঁহানুর তুমরা অগমরূপ ছাজে ॥২
তুহি ধবলগিরি কোট কাঙ্গড় বসন্তী। তুহী অছল অনাথ দেবন্ অনন্তী ॥ ৩
রটউ নিশ দিনা জাপ তুমরা ভবানী। তুমন্ চরণ সিও প্রীতি হমরি লাগানী ॥৪
করহূ হরি ভবানী জগৎ কি সম্ভারে। হমন দুষ্ট দোষী স ভন হোঁহি ছারে ॥৫
সদা সর্ব্বদা চরণ তুমরে ধেয়াউঁ। তুমন্ মেহর সেউঁ দুষ্ট সকলে খপাউঁ ॥ ৬
এহী আশ পূরণ করো তুম্ হামারি। মিটে কষ্ট গৌঅণ্ ছুটে দুঃখ ভারী ॥ ৭

ফতেহি সৎগুরু কি জগৎ সেও বোলাউঁ।
শভনকো শব্দ ওয়াহি ওয়াহি দিড়াউঁ ॥ ৮
করো খালসা পন্থ তিসরা প্রবেশা।
জগেহি সিংহ যোধা ধরে নীল ভেসা ॥৯

সকল রাছ্‌সনকো পকড় গেহি থাপায়েঁ।
সভি জগৎ সেও ধুন ফতেকি বুলায়ে॥ ১০
তুহী সারদা বেদ গায়ন সরস্বতী। তুহী দেবী দুর্গে নিরঞ্জন প্রসূতি॥ ১১
এহী বেনতি খাস হমরি শুনিজে। অসুর মার কর রছ্‌ছ গৌয়ন করিজে॥১২
তুহী সিদ্ধি নও নিদ্ধিকো ভরণহারী। তুহী অন্নদায়িনী সকল জগ ভিখারী॥১৩
তুহী ঋষি বশিষ্ট তুহী হাঁয় দুর্ব্বাসা। তুহী যমদগ্‌ন সন্ত গোতম প্রকাশা॥১৪
তুহী কাল্‌কে অসুর সংহারকরণী। তুহী সেবকন্‌ পর সদা মেহের ধরণী॥১৫
কাঁহালও বাখানো তুমন্‌ গতি অপারে। তুহী জলপা অলক্ষ রূপন মুরারে॥১৬
তুহী হরিহরে হরি হরে হরি ভবানী। নিরঞ্জন পুরুখ পর ভৈতুঁ কুরবাণী॥১৭
এহী দেহবর মোহে সৎগুরু ধেয়াউঁ। অসুর জিতকর ধর্ম্ম নওবত বজাউ॥১৮
মিটেহি সভ জগৎসো তুরকন্‌ দুন্দ সোরা।
বাঁচেহি শান্ত সেবক খাপেঁহি দুষ্ট চোরা॥ ১৯
সভে সৃষ্টি প্রজা সুখী হোয় বিরাজে। মিটে দুষ্ট সন্তাপ আনন্দ গাজে॥ ২০
নছাড়ু কহুঁ দুষ্ট অসুরণ নিশানি। চলে সভ জগৎ মেহি ধরম্‌ কি কাহানী॥২১
ছত্র ধারিয়ান্‌ কো করহু বেগ নাশা।
আপন দাসকা দেখিয়ে তব তামাসা॥ ২২। ৬

দোহরা।

তব খড়্গা তামাসা দেখিয়ে হরি দুর্গে অবিনাশ।
পাকড় তেগ দুষ্টান্‌ হাতুঁ করহু ধরম প্রকাশ॥ ১
হরিভক্ত ভগবতী তিসে কির্যেরণ ীর ধরে।
তেহি অঙ্গসঙ্গ তুমন্‌ লাগরহু যো [illegible] পাগনা ধরে॥ ২

চৌ পাই।

ঋষ্ট ছন্দ ভগবতী মহা পুনিতে। তিস্‌ পঠবৎ উপজৎ প্রতীতে॥ ১
ইউ নিশ বাসর দুর্গে গুণ গায়ং। তেহি সহজে অটল অমর পদ পায়ং॥ ২

এহী থষ্টক চ্ছন্দ সম্পূর্ণ ভায়ো। তিস উচরাঁত সকল ভ্রমগেও ॥ ৩
হরি অলখ্ ঈশ্বরী ভয়ি কৃপালং। তিন্ দাস আপনা কিও নিহালং ॥ ৪
দুঃখ রোগ শোক ভয় মিটে ক্লেশা। বহু সুখ উপজে আনন্দ প্রবেশা ॥ ৫
ইৎ বিধি দুর্গে কৃপাধারী। তিম দাস আপনা লিও উধারী ॥ ৬ ইতি
শ্রীগোবিন্দ সিং বিরচিতে ভগবতী ছন্দ ঋষ্টকং সমাপ্তং।

ভগবতী ষষ্ঠ ছন্দ।

হে শক্তি মাতা! কষ্টহারিণী দুর্গা! তোমায় নমস্কার। সকল দুষ্ট দৈত্যদিগকে ধরিয়া তুমি নাশ কর তোমার ভবন ত্রিলোকের উপরে শোভা পাইতেছে। তথায় তোমার জ্যোতিঃ আশ্চর্য্যরূপ ব্যাপিয়া আছে! তুমি ধবলগিরি কোট কাঙ্গড়া নিবাসিনী। তুমি ছলনার অতীত, স্বয়ম্ভু অনন্তদেবী। হে ভবানি! নিশিদিন তোমার জপই রটনা করি। তোমার চরণ সেবায় আমার প্রীতি লাগাও। হে হরি! ভবানি! তুমি জগৎকে সামলাও। আমার দুঃখদাতা দোষিগণ নষ্ট হউক, সর্ব্বদা তোমার চরণ ধ্যান করি। তোমার দয়া স্মরণ করিয়া সকল দুষ্ট নাশ করি! তুমি আমার এই আশা পূর্ণ কর, গরুর কষ্ট মিটিলে তবে আমার দুঃখ দূর হয়। সদ্ গুরুর জয় জগতে বলাও। সকলকে "ওয়াহি ওয়াহি" (শিব শিব) শব্দ দাও। তৃতীয় খালসা পন্থ প্রকট কর। নীল বেশে সিংহ যোদ্ধৃগণ জাগুক। সকল রাক্ষসগণকে ধরিয়া নাশ করুক। সকল জগতে জয়ধ্বনি বলাই। তুমি সারদা বেদ গায়ন সরস্বতী। তুমি দেবী দুর্গে নিরঞ্জন প্রসূতি। আমার এই মুখ্য মিনতি শুন, অসুর মারিয়া গরুগণকে রক্ষা কর। তুমি সিদ্ধি, নব সিদ্ধির পোষণকর্ত্রী—(দাত্রী)। তুমি অন্নদায়িনী, সকল জগৎ ভিখারী; তুমি ঋষি বশিষ্ঠ, তুমি দুর্ব্বাসা, তুমি জামদগ্ন, তুমি যতি গৌতম হইয়া প্রকাশ হইয়াছিলে। হে কালিকে! তুমিই অসুর-সংহার কারিণী;

তুমি সেবকগণের প্রতি সদা দয়াকারিণী। তোমার অপার গতি কতই ব্যাখ্যা করিব। তুমি জ্বালপা, অলক্ষ্যরূপী মুরারি। তুমি হরি হরৈ হরি ভবানী। নিরঞ্জন পুরুষের প্রতি তুমি কৃপাময়ী হইয়াছ। আমাকে এই বর দাও, সদ্‌গুরুর ধ্যান করি। অসুর জয় করিয়া ধর্ম্ম নহবত বাজাই। জগৎ হইতে তুর্ক অন্ধকার ও কোলাহল লুপ্ত হউক। শান্ত সেবক বাঁচুক, দুষ্ট চোরগণ নষ্ট হউক। সকল সৃষ্টিতে প্রজা সুখী হইয়া শোভা পাউক। দুষ্ট সন্তাপ মিটুক, আনন্দ উত্থিত হউক। কোন স্থানেই দুষ্ট অসুরের নিদর্শন না থাকুক। সকল জগতে ধর্ম্মের কাহিনা (কথা) চলুক। ছত্রধারীগণের শীঘ্র নাশ কর। তবে আপন দাসের তামাসা দেখ।

দোহরা। হে অবিনাশী! হরি দুর্গে! তবে খড়্গা তামাসা দেখিও। দুষ্টগণকে তরবারি দ্বারা ধরিয়া ধর্ম্ম প্রকাশ কর। যে হরি-ভক্ত রণবীর যুদ্ধে পশ্চাদ্‌পদ না হয়, তাহার অঙ্গ সঙ্গ তোমাতেই লাগাইয়া রাখ।

চৌপাই (ছন্দ)। ভগবতীর এই ছয়টী স্তব (ছন্দ) বড় পবিত্র। ইহা পাঠ করিলে প্রতীতি উৎপন্ন হয়। এই প্রকার নিশিদিন যে দুর্গার গুণ গায়, সে সহজে অটল অমর পদ পায়। এই ছয় ছন্দ শেষ হইল। ইহা উচ্চারণ করিতে সকল ভ্রম গেল। হে হরি! অদৃশ্য ঈশ্বরী দয়ালু হইলে তোমার দাস ধন্য হয়, দুঃখ, রোগ, শোক, ক্লেশ মিটে, বহুসুখ উৎপন্ন হয়, আনন্দ প্রবেশ করে। দয়ালু বিধি দুর্গে! আপন দাসকে এখন উদ্ধার করিয়া লও।

ইতি শ্রীগোবিন্দ বিরচিত ভগবতী ছয় ছন্দ সমাপ্ত।

এইরূপ নানা প্রকার স্তব, হোম ও কঠোর তপস্যায় দেবী প্রসন্না হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

আনন্দপুর পর্ব্ব।

—— :*: ——

চতুর্দ্দশ পর্ব্বাধ্যায়।

যজ্ঞশেষ। মসন্দগণের শাসন।

ভগবতী প্রসন্না হইয়া কেশধারী খালসা সৃষ্টি করিতে অনুমতি দেন। শত্রু নিধন করিবার জন্য অসি প্রদান করেন। এই অসির নাম করদ। গোবিন্দ ভগবতীকে দেখিয়া প্রথমেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সেই জন্য ভগবতী বলেন যে তুমি যখন প্রথমেই চক্ষু মুদ্রিত করিলে, তখন তোমার জীবদ্দশায় খালসাগণের বিশেষ জয় লাভ হইবে না, পরে হইবে। ভগবতীর নিকট বলি প্রদানের কথা হয়। তাহাতে গোবিন্দ দেবীর উদ্দেশে শুদ্ধ মনে নিজ অঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া বলি প্রদান করেন এবং বলেন যে, তাঁহার পুত্রগণও যোদ্ধৃগণ যখন যুদ্ধে মস্তক দিবে, সে সকল মস্তকও দেবীর বলির স্বরূপগণ্য হইবে। এতদুপলক্ষে কেহ কেহ বলেন যে, এই সময় গুরু নিজ পুত্রগণের মধ্যে একটিকে বলি প্রদানের জন্য উদ্যত হইলে, গোবিন্দের মাতা গুজরী ইহাতে আপত্তি করেন এবং অবশেষে স্ব ইচ্ছায় নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত জনৈক শিখকে বলি-প্রদান করা হয়। এস্থলে শিখগ্রন্থে এরূপ কোন বলির উল্লেখ দেখা যায় না। ধর্ম্মযুদ্ধে যাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, তাহাদের সকলেরই যে তাহাতে দেবীর প্রীত্যর্থে আত্মবলি দেওয়া হইবে এই প্রকৃত জ্ঞান এবং ভক্তির বিষয়েই গুরু গোবিন্দ উপদেশ দিয়াছিলেন।

উক্ত প্রকার বরদান করিয়া দেবী অন্তর্দ্ধান হইলে শ্রীরাম চন্দ্রের বাহন হনুমানজী দর্শন দিয়া বলেন, তিনি এই যজ্ঞে পরম সন্তোষ লাভ

করিয়াছেন। এক্ষণে গোবিন্দের প্রীত্যর্থে কার্য্য করিতে উৎসুক হইলেন। এই সময় হনুমান নিজ কাছ (ছোট ইজের) গোবিন্দকে প্রদান করিয়া বলেন যে এইরূপ কাছ পরিয়া যুদ্ধ করায় বিশেষ সুবিধা। অতএব এইরূপ কাছ ব্যবহার করিবে এবং শিষ্যগণকে ব্যবহার করিতে শিখাইবে।

হনুমানের মূর্ত্তিও অদৃশ্য হইলে, গোবিন্দ যজ্ঞশেষ করিয়া ৺ নয়না-দেবীর মন্দির হইতে ক্রমে নামিতে থাকেন। দেবীর পাহাড়ের নিম্নে যে স্থলে প্রহরিগণ প্রতীক্ষা করিতে ছিল, তথায় অন্যান্য শিষ্য সেবকগণের সহিত বিপ্রবর কেশবদাসকে দেখিতে পাইলেন। কেশবকে পাইয়া গোবিন্দ পরম আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া যজ্ঞস্থলের সমস্ত ঘটনা বলিলেন। দেবী প্রকট মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া বর দিয়াছেন শুনিয়া বিপ্রবর বড় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, এক্ষণে পূর্ণা-হুতি দিয়া যজ্ঞ সমাধান করা আবশ্যক। তদনুসারে সকেশব গুরু দেবীর মন্দিরে ফিরিয়া গিয়া যথাবিহিত পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিলেন।

এইরূপে যজ্ঞকার্য্য ১৭৫৫ সংবতে (খৃঃ ১৬৯৫) শেষ করিয়া গুরু সদলে আনন্দপুর ফিরিয়া আসিলেন। এইবার যজ্ঞাঙ্গ দান ভোজনের কথাবার্ত্তা উত্থাপিত হইল। প্রথমে বিপ্রবর কেশবদাসকে যজ্ঞের দক্ষিণা দেওয়া হইল। সূর্য্যপ্রকাশ বলেন, সওয়া লক্ষমুদ্রা দেওয়া হইয়াছিল। এই দক্ষিণা দেওয়ার পর গুরু কেশবঠাকুরের সহিত প্রায় এক প্রকার সম্বন্ধ রহিতভাবে চলিতে থাকেন। এমন কি যজ্ঞান্তে যে দান ভোজনাদির মহোৎসব হয়, তাহাতে কেশব ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই; ইহাতে তাঁহার অভিমানও হইয়াছিল। যাহা হউক এই মহোৎসব উপলক্ষে অনেক দীন দুঃখীকে বহু অর্থ দান করা হইয়াছিল।

যে সময়ে গুরুগোবিন্দ এইসকল যজ্ঞদানাদি পবিত্রকার্য্যে রত হইয়াছিলেন, তখন সাধারণ শিখগণ যে পবিত্রভাবে চলে নাই, ইহা শিখ মসন্দগণের ব্যবহারে বুঝা যায়। বোধ হয় এই কারণেই গুরু-গোবিন্দের বর্ত্তমানে শিখ সম্প্রদায় তাঁহার আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারে নাই।

যখন কোন দেশে জাতীয় উন্নতি হয়, তখন দেখা যায় সেই জাতির এক একটি অণুস্বরূপ প্রত্যেক মানবও একটু উন্নত হইয়াছে। এই সেদিন দেখা গেল চীনের এবং রুসীয় বড় বড় রাজকর্ম্মচারিগণও অর্থলোভে করেন; অন্যায় কার্য্য ফলে জাপানের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্যের নিকট চীনের এবং রুষিয়ার ন্যায় সাম্রাজ্যকেও পরাস্ত হইতে হইল! যাহা হউক মসন্দেরা যে সকল কর আদায় করিতেন সে সমস্তই গুরুর ভাণ্ডারে আসিত না। জনৈক কাবুলী শিখ গুরুপত্নীর উদ্দেশে চুড়ানামক (চুড়ির ন্যায়) স্বর্ণালঙ্কার চেতো নামধারী পশ্চিমাঞ্চলের একজন বড় মসন্দের হস্তে দিয়াছিল। চেতো অলঙ্কারখানি গুরুপত্নীর নিমিত্ত না দিয়া আত্মসাৎ করে। গোবিন্দ এই সংবাদ পাইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনাইয়াছিলেন; চৌর্য্য প্রমাণ হইলে উত্তপ্ত গুড়ের জল তাহার অঙ্গে ঢালিয়া প্রাণদণ্ড করা হয়।

গুরুগোবিন্দ মসন্দগণের অন্যায় কার্য্যে ভীষণদণ্ড দিতেছেন ইহা জানিতে পারিয়া, সাধারণ শিখগণও ক্রমে ভাঁড়ের (নটের) মুখ দিয়া মসন্দগণের অত্যাচারের কথা গুরুগোবিন্দের গোচর করিতে লাগিল। তখন মুসলমান সম্রাটের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হইলেও, দেশের শাসন কার্য্যের ভার যে দেশের বড় বড় লোকের হস্তেই ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ১৭৫৬ সংবতে (খৃঃ ১৬৯৯) বৈশাখ মাসে একটি মেলা উপলক্ষে আনন্দপুরে মসন্দগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া

সর্ব্ব সমক্ষে অত্যাচারী মসন্দগণের বিচার করিয়া দণ্ড দেওয়া হয়। ইহাতে অনেকটা উপকার হইয়াছিল; কিন্তু সকল দোষ সারে নাই।

ইহার পরে জানিতে পারা যায় যে, গুরুর প্রধান কর্ম্মচারী দেওয়ান নন্দ চন্দও নিষ্কলঙ্ক ভাবে কার্য্য করিতেছেন না। প্রলোভনের কোন দ্রব্য পাইলে, আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হন। জনৈক সাধু একখানি গুরু গ্রন্থ নকল করিয়া গুরুর নিকট সেখানি উৎসর্গ করিয়া লইতে বাসনা করেন। নন্দচন্দ গুরুর স্বাক্ষর লইবার ছলনায় গ্রন্থখানি আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করেন। গুরু জানিতে পারিয়া নন্দচন্দকে বলেন যে, তিনি যদি ন্যায় ধর্ম্মানুসারে না চলেন, তবে তাঁহাকেও অন্যান্য মসন্দের ন্যায় দণ্ড লইতে হইবে।

এই উপলক্ষে নন্দচন্দ গুরুর সেবা ত্যাগ করিয়া কীরাতপুরে ষষ্ঠ গুরুর অপর প্রপৌত্র ধীরমলের নিকট গমন পূর্ব্বক গুরুগোবিন্দের নিন্দা করেন। ইহাতে ধীরমল গুলি করিয়া নন্দচন্দকে নিহত করেন।

আনন্দপুরপর্ব্ব।

——:*:——

পঞ্চদশ পর্ব্বাধ্যায়।

পহল বা শিখ সংস্কার।

মসন্দগণকে শাসন করিয়া পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৫৭ সংবতে (খৃঃ ১৭০০) গুরুগোবিন্দ আবার আনন্দপুরে বৈশাখী মেলা করিয়াছিলেন। ইহাতে সাধারণ শিখ সংস্কার হইবে বলিয়া সকলকে আহ্বান করেন। মেলার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড একটি মণ্ডপ; মণ্ডপের প্রায় মধ্যস্থলে গুরুর সিংহাসন। সিংহাসনের প্রায় সম্মুখে কিছুদূরে একটি তাঁবু খাটান হয়। তাঁবুর একমাত্র দ্বার রাখিয়া তাহাতে কেহ প্রবেশ করিতে না পায়, এই জন্য দ্বারবান এবং অতি গোপনে উহার মধ্যে পাঁচটি ছাগ রক্ষিত হইয়াছিল। যথাসময়ে গুরু আসিয়া সভার সিংহাসনে বসিয়া দুই চারি কথার পর বলিলেন, "বিশেষ ভক্ত কয়েকজন শিখের মস্তক আবশ্যক হইয়াছে। স্বেচ্ছাক্রমে গুরু কার্য্যের জন্য আত্ম বলিদানে প্রস্তুত কে আছে আইস।' গুরুর এই আহ্বানে সকলেই চমকাইল, কেহ কেহ বলিতে লাগিল, গত বর্ষে কয়েকজন মসন্দের প্রাণনাশ করা হইয়াছে. এবার অপর সাধারণ শিখের মস্তক চাহিতেছেন! কতকগুলি লোক এরূপ বলাবলি করিলেও কেহ গুরুর বিরুদ্ধবাদী হইতে পারিল না। সকলেই চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া রহিল। মস্তকদিবার জন্য একবার আহ্বানে কাহার উত্তর না পাইয়া, গুরু আবার দ্বিতীয়বার আহ্বান করিলেন। সেবারও কেহ কিছু বলিল না। অবশেষে তৃতীয়বার আহ্বানে (১) লাহোরবাসী দয়াসিংনামে জনৈক ক্ষত্রিয় শিখ উঠিয়া গুরুর কার্য্যে মস্তক দিতে প্রস্তুত হইল এবং প্রথম আহ্বানেই না উঠিয়া বিলম্ব করিয়াছে সেজন্য ক্ষমা

পহল উৎসব।

(১) গুরুগোবিন্দ (২) গুরুপত্নী সাহেব দেয়ী (৩) দয়াসিং (৪) ধরমসিং (৫) হিম্মৎসিং

(৬) মহকমসিং (৭) সাহেবসিং বা ধন্নাসিং। (২০৫ পৃঃ)

METCALFE PRESS.

প্রার্থনাও করিল। তখন নিষ্কোষিত অসি হস্তে গুরুগোবিন্দ তাঁহাকে সুবহু প্রশংসা করিতে করিতে হস্তধারণপূর্ব্বক একদ্বার বিশিষ্ট তাঁবুর ভিতর লইয়া গেলেন। তথায় তাঁহাকে স্থিরভাবে বসাইয়া একটি ছাগ বলিদান পূর্ব্বক রক্তসিক্ত তরবারী হস্তে পুনরায় সিংহাসনে উঠিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। এবারও তিনবার আহ্বানের পর (২) হস্তিনাপুর-নিবাসী ধর্ম্মসিং নামে জনৈক জাঠ শিখগুরুর কার্য্যে মস্তক দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এবারও ধর্ম্মসিংকে তাঁবুর মধ্যে লইয়া গিয়া দ্বিতীয় ছাগ বলিদান পূর্ব্বক গুরু ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে একে একে (৩) দ্বারকাবাসী মহকম সিং নামে জনৈক ছীপা (যাহারা কাপড়ে ছাপ দেয়) শিখ, (৪) বিদর্ভপুর নিবাসী সাহেব সিং নামে জনৈক নায়েন (নাপিত) শিখ এবং (৫) উড়িষ্যা জগন্নাথপুরী নিবাসী হিম্মৎ সিং নামে জনৈক ঝিবর (কাহার) শিখ বলিদানের জন্য প্রস্তুত হইলে গুরু একে একে তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁবুতে লইয়া গেলেন। কিন্তু শেষবারে পাঁচ জনকেই সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবার তাহাদিগকে আনিয়া আপন সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহাদের নির্ভীকতার বহু প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই পাঁচজনও প্রকৃত "শিখ" নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। তিনি আরও বলেন যে, প্রথমে গুরু নানকও এইরূপ আসল শিখ পরীক্ষা করায়—সমস্ত শিখ মণ্ডলী মধ্যে একমাত্র (লহনা) গুরু অঙ্গদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছিলেন। অর্থাৎ গুরুর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, গুরু বাক্যের উপর কোন প্রকার সংশয় না করিয়া দিন নাই রাত্রি নাই, পাত্রাপাত্র বিচার নাই, মরি বাঁচি জ্ঞান নাই গুরুর আজ্ঞায় এরূপ ধ্রুব বিশ্বাস যাহার মনে স্থান পায় সেই প্রকৃত "শিখ" নামের উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে আমার পরীক্ষায় যখন পাঁচ জনও উক্তরূপ দৃঢ় বিশ্বাসী শিষ্য

পাইয়াছি, তখন আমার বিশ্বাস হইল যে এই শিখ সম্প্রদায়—"খালসা" (খাঁটি) শিখনামে অভিহিত হইবার যোগ্য হইতে পারে এবং ইহাদের অনুগামী শিখ মাত্রেই এই নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত পাত্র। অর্থাৎ ইহারা সকলেই প্রকৃত "খালসা" (খাটি)। এক্ষণে ইহাদিগকে মন্ত্রপূত করিয়া লওয়া যাউক। এই কথা বলিয়া একটি লৌহপাত্রে জল আনাইয়া তাহাতে ভগবতী দত্ত করদ (তরবারী) ডুবাইয়া "জপজী" "জাপজী" প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ করিয়া সেই জল অমৃত বলিয়া প্রস্তুত করা হইল। এই অমৃতের তেজ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য উপস্থিত দুই চড়াই পক্ষীকে উহা পান করান হইল। চড়াই দ্বয় এই অমৃত পান করিয়া এত তেজী-য়ান হইল যে আপনাদের পূর্ব্বভাব ভুলিয়া গিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে দুইটিই হত হইল। এই সকল ঘটনায় সকলে আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য প্রকাশ গ্রন্থকার বলেন যে, তিনি এই অংশের বর্ণনা রাম কুমার নামক জনৈক শিখের নিকট শুনিয়াছিলেন। রাম কুমার এক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি চড়াইদিগের কাণ্ড দেখিয়া মাতা জীতোজীর নিকট গিয়া বলেন, এক্ষণে গুরুশিষ্য প্রস্তুত করিতেছেন. গুরুপিতৃস্থানীয় এসময় মাতৃস্থানীয়া গুরুপত্নী উপস্থিত হইলে সকলে সুখী হয় এবং অমৃতের ভয়ানকশক্তির কথাও শুনিতে পায়। জীতোজী এই সংবাদে কিছু মিষ্টান্ন হস্তে দীক্ষা মণ্ডপে গিয়া উপস্থিত হয়েন।

গুরুগোবিন্দ পত্নীকে মিষ্টান্ন হস্তে উপস্থিত দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং শুভলক্ষণ বলিয়া মিষ্টান্ন অমৃত জলে দেওয়া হইলে বলিলেন, ইহাতে শিখদিগের বিশেষ উপকার হইবে। কারণ, ইহা না দিলে উহারা নিতান্ত উগ্র হইয়াই থাকিত, এক্ষণে উহারা তেজ এবং গাম্ভীর্য্য উভয়ই পাইবে। এই বলিয়া সেই অমৃত জল এক এক গণ্ডূষ করিয়া পাঁচবারে পাঁচ গণ্ডূষ করিয়া উক্ত পাঁচ জন শিখকে পান

করাইলেন। তৎপরে ইহাদের চক্ষে ও মস্তকে দিয়া বাকী অমৃত ও উহাদিগকে পান করিতে দিলেন। তৎপরে বলিলেন, এক্ষণে তোমরা খালসা হইলে, এক্ষণে তোমাদের সহিত গুরুর বিভিন্নতা রহিল না। ইহাও বলিলেন :—"খালসা গুরুসে আউর গুরু খালসা সে হোই এক দুসরে কো তাঁবিদার হোই।

অতঃপর তোমাদের পূর্ব্বনাম ও নিবাস ভুলিয়া যাও। এই সংস্কারে তোমাদিগের জন্ম সংস্কার হইল। এক্ষণে তোমাদের জন্মস্থান কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে পাটনা, বাসস্থান আনন্দপুর, জাতি সোভি বংশীয় ক্ষত্রিয়।

এখনও শিখ সংস্কারের সময় এইরূপ বলা হয়। অধিকন্তু বলা হয়, পিতা গুরুগোবিন্দ ও মাতা সাহেব দেয়ী। গুরুগোবিন্দের দুই বিবাহের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার আর এক পত্নী ছিল, তাঁহার নাম সাহেব দেয়ী। ইঁহার সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন। সেই অবধি সকল শিখাই সাহেব দেয়ীর পুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

এইরূপে যে পাঁচ জন খালসা প্রস্তুত হইল, ইঁহারাই বীজ স্বরূপ গণ্য হইয়া থাকেন। পরে এই পাঁচ জনের শিষ্যেরাই খালসা নামে অভিহিত হইয়াছে।

গুরু শিখ পাঁচ জনকে নানা উপদেশ দিলেন। তন্মধ্যে বলিলেন, শিখগণ হইতে যে নানা সম্প্রদায় হইয়াছে তাহাদের সহিত, মসন্দিয়া অর্থাৎ মসন্দদিগের বংশধরগণের সহিত, ধীরমলিয়া অর্থাৎ ধীরমলের বংশধরদিগের সহিত, রামরিয়া অর্থাৎ রামরায়ের দলভুক্তদিগের সহিত এবং কন্যা হত্যাকারীদিগের সহিত মিশিবে না। বেশ্যাগমন করিবে না; দ্যূত ক্রীড়া করিবে না; গুরুবাণী নিত্য পাঠ করিবে, "সেবা, ভক্তি, প্রেম মন ধারণা" অর্থাৎ মনে সেবা ভক্তি প্রেম ধারণা করিবে। জপজী

(নানক কৃত প্রধান মন্ত্র), জাপজী (গুরুগোবিন্দ কৃত প্রধান মন্ত্র), আনন্দজী, রহরাস, আরতি এবং কীর্ত্তন এই ছয়টি প্রত্যহ পাঠ করিবে। কাম, ক্রোধ, মিথ্যা, কুতর্ক এবং জবাইকরা মাংস ত্যাগ করিবে। তামাক এবং যবনের হাতের মদ্য ও মাংস নিষেধ জানিবে। পাঁচ কক্ক অর্থাৎ কেশ, কৃপাণ, কাঙ্গা (চিরুণী) কচ্ছ (ছোট ঢিলেইজের) এবং কড়া (লোহার বালা) সর্ব্বদা নিজ নিজ অঙ্গে রাখিবে। সৎপথে ব্যবসায়াদি কার্য্য করিবে। পরস্পর সহোদর ভ্রাতার ন্যায় প্রীতি রাখিবে। গুরুনিন্দুককে মারিয়া ফেলিবে। গুরুগ্রন্থ প্রত্যহ পাঠ করিবে এবং উহাকে গুরু স্বরূপ জানিবে। প্রত্যহ শস্ত্রের (অস্ত্রের) অভ্যাস রাখিবে। তুর্ককে * বিশ্বাস করিবে না। কোন শিখকে অর্দ্ধেক নামে ডাকিবে না, মন হইতে কাতরতা ত্যাগ করিবে। যোদ্ধার বাহুবল ইহপরলোকের সুখ নির্ভর করে জানিবে। মত (বা মনের আদর্শ) উচ্চ কিন্তু মন নম্র রাখিবে। কবরাদির পূজা করিবে না। তরবারীই প্রধান সহায় জানিবে।

এইরূপ উপদেশ দেওয়ার পর ২॥০ টাকা দক্ষিণা দান ও কড়া প্রসাদ (সমভাগ চিনি ঘৃত ও সুজী দিয়া উত্তম মোহনভোগ) ভোগ দিয়া পহল কার্য্য সাঙ্গ হইল।

উক্ত পাঁচ শিখই অতঃপর নূতন শিখ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা উক্ত পাঁচ শিখের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দেবী প্রসন্না হইতে বিলম্ব হওয়ায় গোবিন্দ পুত্রগণকে বলিদান দিতে উদ্যত হয়েন, কিন্তু মাতা গুজরী পুত্রগণের মধ্যে কাহাকেও না দেওয়ায় শিষ্যগণের মধ্যে উক্ত পাঁচ জন ; কেহ কেহ বলেন পাঁচিশ

---

* গ্রন্থান্তরে জানা গিয়াছে "তুর্ক" অর্থে মোগল পাঠান ও সৈয়দ মুসলমানকে বুঝায়, অপর ভারতীয় মুসলমানকে বুঝায় না।

জন) আত্মবলিদানে উদ্যত হয়েন, এবং গুরু তাঁহাদের মধ্যে একজনকে বলি দিয়াছিলেন। বোধ হয় যাবনিক ইতিহাস-বেত্তারা দেবীর যজ্ঞ ও বলিদান প্রসঙ্গের সহিত পহল বা শিখ সংস্কার প্রসঙ্গের গোলমাল করিয়া মিলাইয়া ফেলিয়াছেন।

আনন্দপুর-পর্ব্ব।

—∞✱∞—

ষোড়শ পর্ব্বাধ্যায়।

জাতিভেদ-প্রথা।

দেবতা, গো এবং ব্রাহ্মণ এই তিনটি হিন্দুত্বের প্রধান চিহ্ন-স্বরূপ। এই তিনটিকে যে অবজ্ঞা করে, তাহাকে হিন্দু বলা যায় বলিয়া মনে করি না। সন্ন্যাসাশ্রমী পরমহংসগণ যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করেন এবং দেবদেবীর পূজায় রত থাকেন না বটে, কিন্তু তাঁহারাও দেবতা, গো এবং ব্রাহ্মণকে অমান্য করেন না।

আশ্রম-ভেদে এবং তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক অবস্থা-ভেদে যে পূজাদির ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকার আছে, তাহা অহিন্দুগণ জ্ঞাত নহেন। সেই অধিকার-ভেদ-বিষয়ক ব্যবস্থায় অজ্ঞতাবশতঃ বৈদেশিকেরা মনে করেন যে, প্রত্যেক গুরুর প্রত্যেক বাণীই প্রত্যেক শিখ সমানরূপে পালন করিতে পারে। এরূপ বিশ্বাস যে একান্ত ভ্রমাত্মক, তাহা বলা বাহুল্য। গুরু নানক উচ্চ অধিকারী শিষ্যের পক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের অপেক্ষা উচ্চ জিনিষ দেখাইলেন। ইহাতেই ইউরোপীয়েরা মনে করিলেন যে, নানক সকল ব্রাহ্মণকেই অবজ্ঞা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কোন খৃষ্টান যদি বলেন যে, যখনই ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের উপাসনা করিবে, তখনই "রবিবার"—ভগবানের সেবায় আবার দিন ক্ষণ কি? ইহাতে যেমন খৃষ্টীয় সমাজে সাধারণ-ভাবে প্রচলিত রবিবারের ভজনায় অশ্রদ্ধা করা হয় না—উহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ উপযুক্তদিগের

জন্য দেখান হয় মাত্র, সেইরূপ ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মশিক্ষকের মনে অধিকার-ভেদের তথ্যটি সর্ব্বদা জাগরূক থাকায় উহাঁদের সকল উপদেশই, ঐ ভাবে বুঝিতে হয়।

প্রায় সকল ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তার মতে শিখেরা একবারেই দেবদেবীর পূজা করেন না এবং তাঁহারা জাতিভেদ মানেন না। গুরু নানক ও অন্যান্য গুরুদিগেরও কোন কোন বাণীতে ওরূপ কথার উল্লেখ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু শিখদিগের শীর্ষস্থানীয় গুরুগোবিন্দ যে দেবদেবী স্বীকার করিতেন, তাহা ৺ নয়নাদেবীর পূজা ও স্তবাদিতে দেখান গিয়াছে। * এক্ষণে জাতিভেদ সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ মত ছিল, তাহাই কথঞ্চিৎ দেখান যাইতেছে।

যখন গুরুগোবিন্দ প্রথম "পহল" বা শিখ-সংস্কার করিয়া "খালসা" পথ প্রবর্ত্তিত করেন, তখন জাতিভেদসম্বন্ধে কোন কথাই উঠে নাই। তবে, যে পাঁচজন গোবিন্দের চিহ্নিত শিষ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন মাত্র ক্ষত্রিয়। † যেখানে ধর্ম্মার্থে বা গুরুর আজ্ঞায় যাহারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন, এরূপ মহাত্মাদিগের কথা হইতেছে, সে স্থানে জাতিভেদের কথা উঠিতে পারে না—তাঁহারা সকলেই যেন শিবত্ব পাইতে উন্মুখ! পহলের সময় এই জন্যই জাতিভেদের কথা উঠে নাই। ফলতঃ হিন্দুর আশ্রম বিশেষে জাতিবিচার প্রায় নাই বলিয়া যেমন

---

* "রেহৎ নামা" নামে গুরুগোবিন্দের লিখিত একখানি পুস্তক আছে। তাহাতে দেবদেবীর পূজা-বিধি নাই; কিন্তু "গ্রন্থ" মধ্যস্থ চণ্ডীর-স্তবাদিতে ও ৺ নয়নাদেবীর পূজা প্রভৃতিতে ইহার কিরূপ সামঞ্জস্য হয়, তাহা শিখেরা বলিতে পারেন না। আমাদের মনে হয় যে, শিষ্যের আধ্যাত্মিক অবস্থাভেদে ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রাখা হইয়াছে।

† ইংরাজী ইতিহাসবেত্তারা বলেন, একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় এবং তিনজন শূদ্র ছিলেন।

হিন্দুকে জাতিভেদ বিচারশূন্য বলা যায় না, সেইরূপ "গুরুদ্বারে জাতি-বিচার প্রায় নাই, অথবা যে সময়ে প্রথম পহলের অমানুষিক বীরত্ব-সম্পন্ন শিষ্য-নির্ব্বাচন হইয়াছিল, সে সময়ে জাতিবিচার করা হয় নাই; একথায় শিখদিগকে জাতি বিচার সম্বন্ধে বিরোধী বুঝায় না।

গুরুদ্বারে বা গুরুর কার্য্যকালে সকল শিখই সমান উচ্চ। সাধারণ হিন্দুও জগন্নাথক্ষেত্রে জাতিভেদ মানেন না। ভগবানের উপাসনাকালে যখন সকল মনুষ্যই আপনাকে কীটানুকীট তুল্য বুঝিতে পারে, তখন আর জাতিভেদ কিরূপে থাকিবে? পিতাও ৺ভগবতীকে 'মা' বলিতেছেন, পুত্রও 'মা' বলিতেছেন; ঈশ্বর-সন্নিধানে জাতি ও সম্পর্ক ভেদ থাকে না। তান্ত্রিক উপাসকদিগের সম্বন্ধে উপদেশ আছে—

প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃপৃথক্ পৃথক্ ॥

ফলতঃ বিবাহাদি নিজ নিজ সামাজিক কাজের সময় শিখদিগের মধ্যে বর্ণ-পার্থক্য ঐ তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ধরণেই আছে। বিভিন্ন বর্ণসম্ভূত শিখদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হয় না এবং "মহাপ্রসাদের" ন্যায় "কড়া প্রসাদ" সম্বন্ধে ছোঁয়ালেপার দোষ গ্রাহ্য না হইলেও, অন্য আহার্য্য বিষয়ে লোকটা জল-আচরণীয় বর্ণের কি না, এ অনুসন্ধান করা হয়। সুতরাং জাতিভেদ যে সুস্পষ্টরূপেই আছে, তাহাই বুঝা যায়।

শিখদিগের মধ্যে "অকাল" নামে এক সম্প্রদায় আছে। ইঁহারা বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া যত্র তত্র বিচরণ করেন; বিবাহাদি করেন না; সুতরাং ইঁহাদিগকে গার্হস্থ্যাশ্রমী বলা যায় না। শিখদিগের মধ্যে যে ইঁহাদের বিশেষ মান্য আছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইঁহারা প্রাণের মায়া রাখেন না; ধর্ম্মযুদ্ধে ইঁহারা প্রাণ দিতে 'সর্ব্বদাই' প্রস্তুত। আর সংসারের মায়া ছাড়াইয়া যাঁহারা সন্যাসাশ্রমী হইয়াছেন, সেই সকল

উচ্চাদর্শ-প্রণোদিত লোকদিগের প্রতি কি হিন্দু, কি মুসলমান, উভয়েরই চিরদিন শ্রদ্ধা আছে। এই "অকালী শিখ"-গণ জাতিভেদ স্বীকার করেন না। যাঁহাদের বিবাহই নাই, তাঁহাদের আর জাতি-বিচার কিসের ?

কোন সময় গুরুগোবিন্দের তরবারির কোষের জন্য সূত্র আবশ্যক হইলে, নিকটস্থ সকল শিষ্যগণ সূত্র অনুসন্ধান করিতে থাকেন। সে সময় তথায় গুরুগোবিন্দের খালশাপন্থের প্রথম শিষ্য ক্ষত্রিয় দয়াসিং উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপন যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িয়া, উহা গুরুর তরবারি-কোষের সূত্ররূপে ব্যবহার জন্য দেন; তৎপরে তিনি আর নূতন যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করেন নাই। ক্ষত্রিয় দয়াসিং নূতন যজ্ঞসূত্র গ্রহণ না করায়, কয়েকদিন মধ্যে শিখ-সমাজে একটা গোল উঠিল এবং ক্রমে এ বিষয়ের কথা গুরুগোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি দয়াসিংকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, দয়াসিং বলিলেন,—"আমি যজ্ঞসূত্র গুরুকে দিয়াছি, পুনরায় কিরূপে গ্রহণ করিব ? আর গুরু নানক বলিয়াছেন :—

> দয়া ক পাহা সন্তোষ সুত যৎ গণ্ডি সত্যবট।
> ইয়ে জনউ জীয়েকা হই ত পাণ্ডে যৎ॥
> না ইয়ে টুটে না মল লাগে না ইয়ে জলনা যায়।
> ধন্য স মানস নানক যে গল চলে পায়॥

অর্থাৎ দয়ার তুলা, সন্তোষের সূতা, যতির (যে পরস্ত্রী দেখেনা তাহার) গাঁইট, সত্যের পাক লাগান (যে যজ্ঞসূত্র) তাহা ছেঁড়েনা,—ময়লা হয় না,—পোড়ান যায় না; যে এরূপ যজ্ঞসূত্র গলায় দিয়া চলে, নানক বলেন, সে ধন্য।—এই সকল বুঝিয়া যজ্ঞসূত্র পুনর্ব্বার গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ হয় না।" যাহা হউক 'দয়া সিংহের' এই কথা গুরুগোবিন্দ নীরবে অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করিতে বলেন নাই।

"অকালী শিখগণ" এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া সকল শিখদিগের যজ্ঞ-

সূত্র ত্যাগ করিতে বলেন এবং কোন দ্বিজ খালশাপন্থের প্রথম পথিক হইলে, তাহার যজ্ঞসূত্র ছিন্ন করিয়া দেন। কিন্তু ম্যালকলম সাহেব ভাই গুরুদাস ভল্লার * পুস্তক হইতে যে কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন,তাহাতে দেখা যায় যে, গুরুগোবিন্দের পুত্রগণ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেন। আমাদের সংহিতাকার মনু বলিয়াছেন—

বাগ্‌দণ্ডো মনোদণ্ডশ্চ কায়দণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

অর্থাৎ কায় মন বাক্য এই তিনটি সম্যক্ দমন করিতে হইবে, ইহা যাঁহার বুদ্ধিতে সদা নিহিত আছে, তিনিই যথার্থ ত্রিদণ্ডী বা যজ্ঞসূত্রধারী।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, জ্ঞানিগণ যজ্ঞসূত্রকে নিতান্ত কার্পাস সূত্র বলিয়া মনে করেন নাই; মনের সাধনাই প্রধান যজ্ঞসূত্র। দয়াসিংহের কথায় গুরুগোবিন্দের নীরব ভাবে থাকায় দেখায় যে, তিনি যে মহাব্রত ধারণ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য শিষ্যগণকে প্রস্তুত করিতেছেন এবং যে মহাপ্রাণতা শিক্ষা দিতেছেন, সেই বিষয়ের পরীক্ষায় যিনি সর্ব্বপ্রথম উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সেই দয়াসিং প্রকৃতপ্রস্তাবেই অতি 'উচ্চাধিকারী' বলিয়া তিনি স্বীকার করিলেন।

ফলতঃ যজ্ঞসূত্র ত্যাগ উচিত কার্য্য নহে; কিন্তু গুরুর প্রয়োজন সাধন অবিলম্বে করাও একান্তকর্ত্তব্য।—এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে দয়াসিং সাত্ত্বিক মনে গুরুকে উৎসর্গ করিয়া যজ্ঞসূত্র দিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞসূত্র ত্যাগ সাধারণ বেল্লিকের যজ্ঞসূত্র ত্যাগের ন্যায় জিনিস নহে; ৺জগন্নাথদেবকে কোন একটি জিনিষ উৎসর্গ করিয়া দেওয়ার ন্যায়।—সে জিনিষ আর ব্যবহার করা যায় না! গুরুগোবিন্দ দয়াসিংহের কার্য্য এইরূপ একটা বিশেষ

* তৃতীয় গুরু অমর দাসের বংশীয়গণ 'ভল্লা' উপাধি দ্বারা পরিচিত।

বিধির মধ্যে ফেলিয়া নীরব ছিলেন। উহা দয়াসিংহের যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের ন্যায় কার্য্য। নানকের উদ্ধৃত বাণীও একান্ত উচ্চাধিকারীর পক্ষে। ফলতঃ হিন্দু ও শিখের মধ্যে সকল অধিকারীর পক্ষে যজ্ঞসূত্র যে প্রয়োজনীয় নহে, তাহা সন্ন্যাসী বানপ্রস্থ ও পরমহংসের যজ্ঞসূত্র ত্যাগ দ্বারা আজও প্রদর্শিত হইতেছে।

গুরুর বাণী মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিতে হয়। শিখেরা তাহা করিয়া থাকেন। শিখদিগের মধ্যে গুরুর বাণী আলোচনা করিবার সভা হয়। কিছুকাল হইল লাহোরের একটি সভায় "জাতিভেদ" প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল। তাহাতে অনেকে বলেন,—গুরুগোবিন্দ সিংহের মতে জাতি বর্ত্তমান কর্ম্মানুসারে ধরাই বিধেয় অর্থাৎ একজন ব্রাহ্মণ যদি কসাইয়ের কার্য্য করে, তবে তাহাকে কসাই বলিয়া ধরাই উচিত। সেইরূপ কসাই যদি ব্রাহ্মণের কার্য্য করে, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা উচিত। কিন্তু লোকে তাহা বলিতে চাহেনা; এইজন্য তাহাকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া শুধু "শিখ" বল।

উক্ত স্থলে আরও কথা হয়—"তুর্গ" বলিলে বুঝিতে হইবে মোগল, পাঠান ও সৈয়দ এই তিনটি জাতি। অপর মুসলমানগণ প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থানবাসী বা ভারতবাসী; তাহারা 'কৃত - মুসলমান' এই জন্য তাহাদিগকে শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারা যায়। তবে অবস্থা বুঝিয়া এ সকলের বিবাহ বিষয়ে ব্যবস্থা দেওয়া হয়। যেমন এতদঞ্চলে "মেল" "পর্য্যায়" প্রভৃতি বিচারিত হয়, উহাও তদ্রূপ বোধ হয়। মোট কথা—যুদ্ধক্ষেত্রে বা যোদ্ধৃজাতির পক্ষে—সামাজিক জাতিভেদপ্রথা যেরূপ একটু শিথিল রাখা আবশ্যক, গুরুগোবিন্দ তাহাই করিয়াছিলেন।

—*—

আনন্দপুরপর্ব্ব।

—৩৩•৩৩—

সপ্তদশ পর্ব্বাধ্যায়।

দশহঁ বাদশাকা গ্রন্থ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "শ্রীগ্রন্থজী সাহেব" দুইভাগে বিভক্ত। এক-ভাগ প্রধানতঃ গুরু নানকের বাণী লইয়া পঞ্চম ও ষষ্ঠ গুরুকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে এবং উহাতে নবম গুরু পর্য্যন্ত ও অন্যান্য সাধুগণের বাণীও নিবেশিত হইয়াছে। অপর ভাগ গুরুগোবিন্দের লিখিত—ইহাই "দশহঁ বাদশাকা গ্রন্থ" বলিয়া খ্যাত। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ইহা এক সময়ের লেখা নহে। কথিত আছে, যখন গোবিন্দ সিং গুরুপদে অধিষ্ঠিত হয়েন, তখন "গুরুগ্রন্থ" কীরাতপুরে গুরুগোষ্ঠীয়-দিগের নিকট ছিল। গুরুগোবিন্দ গুরুপদ পাওয়ার কিছুদিন পরে উহা আনন্দপুরে আনিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তখন গুরু-গোষ্ঠীয়েরা গুরুগোবিন্দের প্রতি কতকটা দ্বেষ-পরবশ ছিলেন। তাঁহারা "গ্রন্থসাহেব" না দিয়া বলেন, গোবিন্দ যখন গুরুপদে বসিয়াছেন—গুরুগণের শক্তি সমূহ উঁহাতে অন্তর্নিবিষ্ট আছে, তখন উনি ইচ্ছা করিলে, ওরূপ গ্রন্থ আরও লিখিতে পারেন; এ গ্রন্থের আবশ্যক কি? জ্ঞাতিগণের এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া গুরুগোবিন্দ এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে কীরাতপুরের গ্রন্থও আনন্দপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়।

আদি গ্রন্থের ন্যায় ইহাও নানা ছন্দে লিখিত। ইহার ভাষা প্রথমে হিন্দি, শেষভাগে কতকটা পারসী; কিন্তু সমস্ত ভাগই গুরুমুখীতে লেখা। ইহার হিন্দিটা পঞ্জাবী অপেক্ষা অনুগঙ্গ প্রদেশের হিন্দি-সংস্পৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। গুরু নানক পঞ্জাবে জন্মিয়াছিলেন, পঞ্জাবেই শিক্ষালাভ

করিয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দ কোথায় কি ভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা যদিও বিশেষভাবে বর্ণিত নাই, কিন্তু তিনি যে গঙ্গাতীরস্থ পাটনায় জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় কিছুদিন শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি যে কোন কালে অপর সাধারণের ন্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এ কথা শিখেরা বলিতে চাহেন না। অস্ত্রশিক্ষা—খেলার ছলে অভ্যাস হইয়াছিল; কিন্তু শাস্ত্রবিদ্যা তিনি অতি-মানুষী শক্তিতেই শিখিয়াছিলেন, শিখেরা ইহাই বলেন। যাহা হউক, দশম গুরু গ্রন্থের এক অংশে "বিচিত্র নাটক" বলিয়া গোবিন্দের আত্মজীবনের পরিচয় কতকটা আছে। কেহ কেহ বলেন, গোবিন্দসিংহ উহা দমদমায় অবস্থানকালে লেখেন। উহার অংশবিশেষ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। "আদিগ্রন্থের" ন্যায় এ গ্রন্থেও অন্যান্য ভক্তের লেখা আছে। তন্মধ্যে শ্যাম ও রামের নাম অধিক শুনা যায়। কিন্তু তাঁহাদের কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, তাঁহারা গোবিন্দের শ্রীমুখের বাক্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

(১ম) দশই বাদশাকা গ্রন্থের প্রথমে "জাপজী"। উহা প্রথম গ্রন্থের "জপজীর" ন্যায় শ্রদ্ধাসহকারে পঠিত হয়। ইহাও সংক্ষেপ, জপ; প্রধানতঃ প্রাতে পঠনীয়। ইহাতে ছোট বড় প্রায় ২০০ শ্লোক আছে। আরও সংক্ষেপ করিয়া পড়িবার আবশ্যক হইলে, ইহার প্রথম ও শেষ শ্লোক পঠিত হয়। ইহার প্রথম শ্লোকটি এই—

জাপ শ্রীমুখ বাক্ পাদশাহী দশ। ছপে ছন্দ। তৎপ্রসাদ।
চক্র চিহ্ন অর বরণজাত আরপাত নহিন যেঃ।
রূপ রঙ্গ অররেক ভেক কোউ কহ ন শকৎ কেঃ।
অচল মুরত অনুভও প্রকাশ অমিতোজী কহৎ যেঃ।
কোটি ইন্দ্র ইন্দ্রান সাহ সাহান গনিজ্জে।

ত্রিভুবন মহীপ সুর নর অসুর নেত নেত বণ তৃণ কহৎ।
তব সর্ব্বনাম কথে কোন কর্ম্মনাম বর্ণাৎ সুমৎ॥১

পণ্ডিতগণ ইহার নানাপ্রকার অর্থ করেন এস্থলে মোটামুটি অর্থ দেওয়া যাইতেছে—

দশম গুরু শ্রীমুখনিঃসৃত জাপ। ইহার ছন্দ ছপে। (হে ভগবান্) তব কৃপা। যাহাতে চক্র চিহ্ন বর্ণ জাতি অথবা শ্রেণী নাই, রূপ রং নির্দ্দিষ্ট রেখা ও শ্রেণী যাহার কেহ বলিতে পারে না, (যাঁহার) মূর্ত্তি নির্ব্বিকার, (যিনি) অনুভব দ্বারা প্রকাশ, (যাঁহার) বল পরিমাণ করা যায় না, কোটি ইন্দ্রের ইন্দ্র, সম্রাটের সম্রাট যাঁহার গুণগান করে, ত্রিভুবনের ঈশ্বর দেব, মানব, অসুর, বন, তৃণ (অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম) যাঁহার গুণগান করিতেছে, আর বলিতেছে কিছুই জানি না—তোমার কি কর্ম্ম কি বর্ণ বলিবার ক্ষমতা নাই।

(২য়) "অকালস্তুতি"—অর্থাৎ ভগবানের স্তব। প্রাতে পাঠ্য।
ইহার প্রথম অংশ নমুনাস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"প্রণমো আদি এক ওংকারা। জল স্থল মই অল কিও পসারা॥
আদি পুরুথ অবগৎ অবনাশী। লোক চতুর্দ্দশ জ্যোৎপ্রকাশি॥
হস্তি কীটকে বিচ সমানা। রাও রঙ্ক যেহ একসর জানা॥
অদৈ অলখ পুরুথ অনগামী! সব ঘট ঘটকে অন্তরজামী॥
অলক্ষ্য রূপ অচ্ছ অনভেখা। রাগ রঙ্গ জেহ রূপ না রেখা॥
আদি পুরুথ অদৈ অবিকারা। বরণচিহন সভহুতে নিয়ারা॥
বরণ চিহন জিহ জাত না পাতা। শত্রু মিত্র জিহ তাত ন মাতা॥
সভতে দূর সভন তে নেরা। জল থল মহি অল জাঁহে বসেরা॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু অন্ত নহি পা এও। নেত নেত মুখ চার বতাএও॥

অর্থাৎ আদিতে আমি সেই এক ওঁকাররূপী ব্রহ্মকে নমস্কার করি,

যিনি জল স্থল ত্রিভুবন ব্যাপিয়া আছেন, চতুর্দ্দশ লোকে যাঁহার জ্যোতি প্রকাশ হইতেছে, সেই অনাদিপুরুষ যাঁহার গতি বুঝা যায় না। হস্তী কীট মধ্যে যিনি একরূপে বিরাজমান আছেন, এবং প্রতি জীবের অন্তরের ভাব যাঁহার অবিদিত নাই। যাঁহার রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল অনুভব দ্বারা কল্পনা করা যায়। যিনি বর্ণ চিহ্ন জাতি বা শ্রেণী রহিত এবং যাঁহার কেহ মাতা বা পিতা নাই। যিনি সকলের অতি দূরবর্ত্তী আবার নিকটের ও নিকট জল স্থল স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বব্যাপী হইয়া আছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁহার অন্ত পায় না, চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা নানাপ্রকারে বর্ণনা করিতেছেন ইত্যাদি ইহাতে বেশ বুঝা যায় এই স্তবে তিনি ঈশ্বরের বিরাটরূপের বর্ণনা করিয়াছেন এবং শিখেরা বলেন, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় তিনি কেবল নামের মহিমা দ্বারাই এই কলিযুগে জীবের উদ্ধারের কর্ত্তা বলিয়া নিজ শিষ্যগণকে প্রেমভক্তিযুক্ত মনে পরব্রহ্মের উপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন।

৪র্থ হইতে ১১শ এই আট অংশে গুরুগোবিন্দ প্রধানতঃ পুরাণোক্ত অনেক কথা সংস্কৃত হইতে সহজ গুরুমুখীভাষায় সংক্ষেপে লিখিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার সূত্রভাগ মাত্র গুরুগোবিন্দের নিজের লেখা।

(৩য়) "বিচিত্র নাটক" (বা অদ্ভুত কথা) ইহা গোবিন্দের নিজের লেখা। ইহাতে চৌদ্দটি পরিচ্ছেদ। দুষ্ট দমনের জন্য তিনি প্রেরিত হইয়াছেন—এই ভাবই ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে গুরুগোবিন্দ নিজের পরিচয় সংক্ষেপে জানাইয়াছেন।

(৪র্থ) "চণ্ডী চরিত্র" ইহার দুইভাগ, প্রথমভাগ প্রায় মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসারে লিখিত। তবে ইহাতে মধুকৈটভ, ময়াক্ষুর, ধূম্রলোচন, চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ, নিশুম্ভ, শুম্ভ প্রভৃতি বধের সহিত তিতান নামক দৈত্য বধের কথাও আছে। এইরূপ কিছু কিছু বিভিন্নতা ইহাতে দেখা যায়।

(৫ম) "চণ্ডী চরিত্র" দ্বিতীয়ভাগেও প্রধানতঃ প্রথমভাগেরই কথা কেবল অন্যপ্রকার ছন্দে লিখিত হইয়াছে।

(৬ষ্ঠ) "চণ্ডী কি বার"—চণ্ডী কথার শেষ ভাগ। ইহাও ভগবতী-স্তুতি।

(৭ম) "জ্ঞান প্রবোধ"—ইহাও ভগবানের স্তব।

(৮ম) "চৌপাইন চৌবিষ অবতারন্ কীয়ান্"—ইহা দশইঁ বাদশাহী গ্রন্থের অনেকটা অংশ ব্যাপিয়া আছে। ইহা শ্যামের লিখিত, ইহাতে ভগবানের ২৪টি অবতারের কথা আছে। যথা (১) মৎস্য (২) কূর্ম্ম (৩) সিংহনর (৪) নারায়ণ (৫) মোহিনী (৬) বরাহ (৭) নরসিংহ (৮) বামন (৯) পরশুরাম (১০) ব্রহ্মা (১১) রুদ্র (১২) জলন্ধর (১৩) বিষ্ণু (১৪) নাম নাই ; কিন্তু বিষ্ণুর এক অবতার বলিয়া কথিত (১৫) অনন্তদেব জৈনদিগের একজন জীন বা মহাপুরুষ (১৬) মনুরাজা (১৭) ধন্বন্তরি (১৮) সূর্য্য (১৯) চন্দ্র (২০) রাম (২১) কৃষ্ণ (২২) নর বা অর্জ্জুন (২৩) বোধা (শালগ্রামশিলা) (২৪) ভবিষ্য অবতার কল্কি। এই ২৪টি অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছে।

(৯ম) ইহাতে মেহেদী মীরের কথা আছে—ইনি কল্কি অবতারের সহিত বাহির হইবেন বলিয়া বর্ণিত। কেহ কেহ বলেন ইহা শিয়া মুসলমানদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত।

(১০ম) ইহাতে ব্রহ্মার সাত অবতারের এবং পুরাকালের আটজন রাজার কথা আছে। ব্রহ্মার সাত অবতার যথা—(১) বাল্মীকি (২) কচ্ছপ (৩) শূকর (৪) বাচেস্ (৫) ব্যাস (৬) ষড় ঋষি *

* কোন সময় ব্যাস অবতারের অহঙ্কার হইয়াছিল। সে জন্য অকাল পুরুষ তাঁহার দেহ কাটিয়া ছয় ভাগে বিভক্ত করেন ; কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার জীবাত্মা ভিন্ন করা হয় নাই ; সেই জন্য এই ছয় ঋষি এক অবতার বলিয়া গণ্য।

(৭) কুলদাস। আটজন রাজা (১) মনু (২) পৃথি (৩) সগর (৪) বেন (৫) মান্ধাতা (৬) দিলীপ (৭) রঘু (৮) উজ।

(১১শ) রুদ্র বা শিবের দুই অবতারের কথা। অবতার দ্বয় (১) দত্ত (২) পরেশ নাথ।

(১২শ) "শস্ত্রমালা"। অনেকে বলেন ইহা গোবিন্দের নিজের লেখা নহে। কিন্তু এই অংশ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ইহাতে অস্ত্র সমূহের নাম ও কীর্ত্তন আছে।

(১৩শ) "শ্রীমুখ বাক্য সওয়া বত্রিশ"। ইহাতে বেদ, পুরাণ ও কোরান সম্বন্ধে লেখা; কোন কোন কথায় অনেকের বোধ হয় যেন গোবিন্দ ও গুলির নিন্দা করিয়াছেন। যেমন গীতার কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া অনেকে বলেন, গীতায় বেদের নিন্দা আছে; গুরুগোবিন্দের মুখে বেদপুরাণাদির নিন্দাও তদ্রূপ সম্ভবে অর্থাৎ কেহ কেহ বেদপুরাণের কথা লইয়া কেবল কুতর্ক করেন, হৃদয়ে ধারণা করেন না - উহার ভিতর প্রবেশ করেন না; তাঁহাদের পক্ষে বেদ পুরাণ কোরান সকলই বৃথা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সে সকল লোককে "বেদবাদরতাঃ" প্রভৃতি বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন। যে বেদের শিরোভাগ উপনিষদই গীতাদুগ্ধের গাভীস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত, সেই গীতা কিরূপে বেদের নিন্দা করিতে পারেন, বুঝিতে পারিনা। তদ্রূপ যাঁহার পিতা হিন্দুধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, যিনি নিজে "জগে ধর্ম্ম হিন্দু" বলিয়া ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনিই বেদের নিন্দা করিয়াছেন, একথা বুঝিলাম না। বরং বুঝি যে যাঁহারা বেদ-নিন্দক এবং বেদ-নিন্দার স্বপক্ষে বড়-লোকের মত উদ্ধৃত করিতে উৎসুক, তাঁহারাই অর্থবিপর্য্যয় ঘটাইয়া গোবিন্দের মুখে বেদনিন্দার কথা প্রচার করিয়াছেন—বস্তুতঃ তিনি বেদের নিন্দা করেন নাই; অহঙ্কারীর নিন্দা করিয়াছেন।

(১৪শ) "হাজারে শব্দ"—এক সহস্র শব্দের ছন্দ। কিন্তু ইহাতে দশটি মাত্র ছন্দে ভগবানের ও সৃষ্টির প্রশংসা আছে। কেহ কেহ বলেন, এস্থলে—'সহস্র' শব্দ বহুমূল্য-বোধক। ইহাতে যেন গুরুগোবিন্দ সাধারণতঃ দেব ও সাধু পূজার অনুমোদন করেন নাই, এরূপ অর্থ করা যায়। ইহা গোবিন্দের নিজের লেখা।

(১৫শ) " স্ত্রী চরিত্র "—রমণী চরিত্র বুঝিবার জন্য ইহাতে ৪০৪টি গল্প আছে। অধিকাংশ গল্পের লেখক শ্যাম। কোন রাজার মন্ত্রিগণ তাহাদের রাজাকে রমণী-চরিত বুঝাইবার জন্য গল্পগুলি বলিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণিত। এই রাজার রাণী সপত্নী পুত্রে আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন, কিন্তু সপত্নী-নন্দন রাণীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করায় রাণী রাজার নিকট সপত্নীপুত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা গ্লানি করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজা রাজপুত্রকে কাটিতে হুকুম দেন। তখন মন্ত্রিগণ রাজাকে যে গল্পগুলি বলিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মুসলমানদিগের আমলে এরূপ গল্প প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত ছিল। শিখেরা বলেন, গুরুগোবিন্দ এই উপন্যাস উপলক্ষ্য করিয়া শিখদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, এজগতে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও চরিত্র বুঝা ভার; অতএব তোমরা কোনরূপে তাহাদের কুহকে বা মায়াজালে জড়িত হইয়া বিপথ-গামী না হও। এই "পান্থখালসা" অর্থাৎ শস্ত্রধারী যোদ্ধৃশিখ প্রস্তুত করাই গুরুগোবিন্দের প্রধান উদ্দেশ্য। সেইজন্যই তিনি শিখদিগকে "যতিধর্ম্ম" পালনের অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। ইহা তাহারই অন্য রূপ।

(১৬শ) "হিকায়ৎ"—ইহা পারস্য ভাষায় গুরুমুখী অক্ষরে দ্বাদশটি গল্প। গুরুগোবিন্দ নিজে সম্রাট আরঙ্গজেবকে বিদ্রূপ ছলে এই গল্পগুলি লিখিয়া দয়াসিং ও আর চারিজন লোক দ্বারা সম্রাটের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

আনন্দপুর পর্ব্ব।

——:*:——

অষ্টাদশ পর্ব্বাধ্যায়।

শিখ সংস্কার-কার্য্যের পর।

পহল বা শিখ-সংস্কার কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, গুরু গোবিন্দ নিজে আনন্দপুর-ভবনে বসিয়া শিষ্যগণকে নানাপ্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। এ সময়ে শিখদিগের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সাধক গোবিন্দের বাক্‌সিদ্ধি গুণে অনেকের অনেক মানসিক পূর্ণ হইতে লাগিল। এক ব্যক্তির একে একে সাতটি কন্যা হয়। সে অনন্যোপায় হইয়া গুরুর পদ আশ্রয় করিল। গুরু আশীর্ব্বাদ করিলেন,—আগামীবারে পুত্র হইবে। সময়ে তাহাই হইল। তদ্রূপ একজন অশ্বাদি বিক্রেতার কারবারে প্রায় ক্ষতি হইত। একবার পণ্যদ্রব্য লইয়া যখন বিক্রয় করিতে যায়, তখন মানসিক করে যে এবার যদি উত্তম লাভে বিক্রয় হয়, তবে লাভের দশম ভাগ গুরুগোবিন্দকে দিব। ভাগ্যক্রমে সেবারে অতি সত্বরে সমস্ত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হইয়া গিয়া বিশেষ লাভ হইল। তখন সে ব্যক্তি মানসিক অনুসারে দশম ভাগ লইয়া গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহার বেশ প্রভৃতি শিখের ন্যায় না থাকায়, গোবিন্দ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসায় সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া, তাহার মানসিক তাহার "নিজ" গুরুকে প্রদান করিতে বলেন এবং নানক সাহী ধর্ম্মে আস্থা রাখিতে বলেন। সে ব্যক্তি তাহাতে তুষ্ট না হইয়া তাহাকে শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য এবং মানসিক গ্রহণ জন্য অনুনয় করে। এই

সময় হিন্দু মুসলমানে বিবাদভঞ্জন করিবার জন্য ভারতে, বিশেষতঃ পঞ্জাব অঞ্চলে, উভয় ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধায়ক অনেক উপধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয়। তন্মধ্যে মুসলমান ভাব অধিক লইয়া "সুলতানী" নামে একটি সম্প্রদায় হয়। এই ব্যক্তি সেই সম্প্রদায় ভুক্ত। সেই জন্য ইহাকে মুসলমান মনে করিয়া গুরু বলেন :—

"গুরু কহে ও হিন্দু হ্যায় যোই। বন যে হ্যায় হামারা শিখ তেই ॥
তুর্ক শত্রু হাম মারণ করণে। পাকৃড়ো খণ্ডা তিন্‌কো হরণে ॥"

অর্থাৎ গুরু বলিলেন ; যে হিন্দু সেই আমার শিখ হইতে পারে ; তুর্ক আমাদের শত্রু, তাহাকে মারিবার জন্য খড়্গ ধর। তুর্ক অর্থে মোগল পাঠান ও সৈয়দ বুঝায়, ইহাদের শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয় না—অপর মুসলমান শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে।

এই কথায় সে ব্যক্তি বলে যে, সে প্রকৃত হিন্দুসন্তান ; বুঝিতে না পারিয়া বিপথে গিয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ কথা বলিয়া পূর্ব্ব কার্য্যের জন্য অনুশোচনা করিয়া থাকে। তখন গুরু তাহাকে শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহার মানসিক গ্রহণ করেন। এইরূপ ঘটনায় শিখসম্প্রদায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

শিখেরা নীলবর্ণের কাপড় পরিবে বলিয়া গুরুগোবিন্দ আদেশ করেন। কোন কোন যাবনিক ইতিহাসবেত্তা মনে করেন যে, ঐ আদেশ হিন্দু মতের বিরোধী এবং গুরু ইহা শুধু মুসলমান সম্প্রদায়কে তুষ্ট করিবার জন্যই ব্যবস্থা করেন। এ কথাটি তাঁহারা কেন বলেন, ঠিক বুঝা যায় না। কাপড়ে নীলরং হিন্দুর অপ্রিয় নহে—শ্রীরাধা "নীল পট্টধারিণী" বলিয়া বর্ণিতা। তবে যে নীলরংটি সাধারণ লোকের কাপড়ে ব্যবহার হয়, উহার বাণিজ্যাদি বিদেশীর হস্তগত। কেহ কেহ অনুমান করেন, সেই কারণে নীল রংয়ের কাপড় পূজাদি কার্য্যে প্রশস্ত

নহে। তদ্রূপ দশাহীন কাপড়ও পবিত্র কার্য্যে নিষিদ্ধ, কিন্তু বিলাতী কাপড় হইয়া আজকাল সে সকল কথা কে শুনে?*

নরসিংহ পুরাণে। ন রক্তমুল্বনং বাসো ন নীলঞ্চ প্রশস্যতে।
মলাক্তঞ্চ দশাহীনং বর্জ্জয়েদম্বরং বুধঃ॥
আহ্নিকতত্ত্বে। ঈষদ্ধৌতং নবং শুভ্রং সদশং যন্নধারিতং।
আহতং তদ্বিজানীয়াৎ সর্ব্ব-কর্ম্ম-সুপাবনং॥
প্রচেতাঃ। দশানাভৌ প্রয়োজয়েৎ॥
কালিকা পুরাণে। নির্দ্দশং মলিনং জীর্ণমিত্যাদি॥
গোভিলঃ। আহতে বাসসী পরিধায়েত্যাদি॥

আনন্দপুরপর্ব্ব।

——:*:——

ঊনবিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

আনন্দপুরে যুদ্ধ।

নাদাওনের যুদ্ধের পর গিরিপতি ভীমচাঁদ আসিয়া গুরুগোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করায় মনে হইয়াছিল, এবার নিশ্চয়ই পাহাড়ী রাজাগণ গুরুর বশ্যতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাহা হইবার নহে। ভীমচাঁদ জিদ ছাড়িবার লোক ছিলেন না। হাতি প্রভৃতি লইবার উপলক্ষেই দেখা গিয়াছে, তিনি কত রকম ছলনা করিতে পারিতেন।—এই ভয় দেখাইতেছেন, এই অর্থলোভ দেখাইতেছেন, আবার কখন বড় আত্মীয়তা দেখাইতেছেন। গুরুগোবিন্দ শরণাগতকে মারেন না, তাই ভীমচাঁদ ছলনা করিয়া আবার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলেন।

শিখগণের শিকার উপলক্ষে পাহাড়ীগণের সহিত প্রায়ই বিবাদ হইতেছিল; কিন্তু শিখেরা দিন দিন যেরূপ প্রবল হইতেছিল তাহাতে পাহাড়ীগণ আর আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। পাহাড়ীরাজগণ ক্রমে তদুপলক্ষে মিলিত হইতে লাগিল। এমন সময় মৃগয়া উপলক্ষে আগম সিং প্রমুখ শিখগণের সহিত পাহাড়ীরাজা আলম চাঁদ ও বলিয়া চাঁদের যুদ্ধ হয়। ইহাতে আগম সিং জয়লাভ করিয়া আনন্দপুরে ফিরিয়া আসেন।

আগম সিং আনন্দপুরে ফিরিয়া আসিবার পর, দ্বাবিংশজন পাহাড়ী রাজা একত্র হইয়া দিল্লীতে সম্রাটের নিকট গুরুগোবিন্দের প্রতাপ বর্ণন করিয়া আবেদন প্রেরণ করেন এবং উহাতে প্রার্থনা থাকে, যেন

সত্বরে সসৈন্যে আসিয়া গুরুকে দমন করা হয়। এই আবেদনকারী-গণের মধ্যে ভীমচাঁদ মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। সে সময়ে আরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র প্রতাপ হ্রাস করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন।

ভীমচাঁদ প্রমুখ দলের লোক দিল্লীতে পৌছিলে আনন্দপুর আক্রমণ করিবার জন্য দীনাবেগ ও পায়েণ্ডাখাঁ নামক দুইজন সেনাপতিকে প্রত্যে-কের অধীনে পাঁচ হাজার সৈন্য দিয়া দুই রাস্তা দিয়া প্রেরণ করা হয়। তখন সম্রাটের সেনাদলের সহিত উক্ত কলুরিয়া (কুলহর) অধিপতি ভীমচাঁদ, যশ বলিয়ার রাজা বীরসিং ও নাহনের (শির-মোহরের) রাজা মদনপাল আসিয়া মিলিত হয়েন। ইহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্বযুদ্ধে যশবালিয়া প্রভৃতি স্থানের যে সকল রাজা ছিলেন, এবার তাঁহাদের মধ্যে অনেকের উত্তরাধিকারীরা যুদ্ধে অগ্রসর।

সম্রাটের প্রেরিত উভয় সেনাপতি পাহাড়ী রাজগণের সহিত একত্রে মিলিত হইয়া আনন্দপুর আক্রমণ করিল। গুরুগোবিন্দের সৈন্যসংখ্যা সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, তিনি প্রত্যেক শিখগৃহ হইতে প্রাপ্ত বয়স্ক চারিজন পুরুষের মধ্যে দুইজনকে লইবার নিয়ম করিয়াছিলেন এবং সেই নিয়ম অনুসারে তাঁহার ৮০০০০ হাজার শিখসৈন্য হইয়াছিল। আনন্দ-পুরের অদূরে ভীষণ যুদ্ধ হইল। অবশেষে গুরুগোবিন্দ স্বয়ং সনাপতি পায়েণ্ডা খাঁ হত ও দীনাবেগকে আহত করেন। ইহাতে সম্রাটপক্ষীয় সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। ইহার সঙ্গে পাহাড়ীরাজগণও সসৈন্যে পলায়ন করেন কিন্তু তাঁহারা আবার সদলে আসিয়া আনন্দ-পুর আক্রমণ করিয়া মাসাধিককাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিয়া- ছিলেন।

আনন্দপুরপর্ব্ব।

বিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

আনন্দপুরে পুনরায় যুদ্ধ।

সম্রাটের সেনাপতি পায়েণ্ডাখাঁ নিহত হইলে অতি অল্পদিনের জন্যই যুদ্ধাদি বন্ধ ছিল। পাহাড়ীরাজগণ আবার সমবেত হইয়া গুরুগোবিন্দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সর্ব্বশুদ্ধ বাইশজন রাজা এই কার্য্যের জন্য একত্র হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে (১) কুলহররাজ ভীমচাঁদ (২) কাটোরিয়ার রাজা (৩) যশবলিয়ার রাজা কিশোরী চাঁদ (৪) হাণ্ডুরিয়ার রাজা (৫) কুল্লুরের রাজা (৬) কৈঠরের রাজা (৭) ভূটংয়ের (ভোটানের ?) রাজা (৮) জম্বুররাজা (৯) ডঢবলিয়ার রাজা (১০) শ্রীনগরের রাজা (১১) চান্দেরীর রাজা (১২) নুরপুরীর রাজা (১৩) দালোরীর রাজা (১৪) মণ্ডীর রাজা ও (১৫) চম্বার রাজা এই কয়জনের নাম উল্লেখ সূর্য্যপ্রকাশে পাওয়া যায়। এই বাইশজন রাজা একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের সকল সৈন্য সমবেত হইলে প্রায় তিন লক্ষ হইবে। সুতরাং তাঁহারা যদি একযোগে গুরুর বিরুদ্ধে গমন করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরাস্ত করিতে পারিবেন। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সকলে একযোগে কুলহররাজ ভীমচাঁদকে মুখপাত্র স্বরূপ লইয়া গুরুকে এক পত্র লিখিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, গুরুগোবিন্দের পিতা তেগবাহাদুর কুলহররাজকে অর্থ দিয়া মাখোওয়াল নামক স্থানটী লইয়া

তথায় আনন্দপুর স্থাপন করিয়াছিলেন। গুরু তেগবাহাদুর অতীব ধীর-পুরুষ ছিলেন, তাঁহার জন্য কাহাকেও কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। এক্ষণে গুরুগোবিন্দ গুরুদরবারে বসিয়া কুলহররাজকে এক কপর্দ্দকও দেন নাই; আবার তাঁহার উৎপাতে সকলেই জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছেন, অতএব সত্বরে কুলহর রাজসরকারে করপ্রেরণ করিবেন এবং উৎপাত করিবেন না, নতুবা তিনি যেন আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন; যদি এই দুইয়ের এক পথ অবলম্বন না করেন, তবে সত্বরেই সসৈন্যে আনন্দপুর আক্রমণ করা যাইবে। গুরু এইরূপ পত্র প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, "সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ভাগ দ্বারা কর প্রদান করিবেন।" তিনি রাজগণের প্রতি দিব্য দিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হয় সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া পাওটার ক্ষেত্রে বা ভাঙ্গানি ক্ষেত্রে যেরূপ কর গ্রহণ হইয়াছিল সেইরূপ কর গ্রহণ কর (অর্থাৎ যুদ্ধে হারিয়া যাও) নতুবা শরণ লও।

গুরু পত্রের উত্তর দিয়া, শিখসৈন্য সংগ্রহে সচেষ্ট হইয়া শতদ্রু ও বিপাসা নদীর মধ্যবর্ত্তী মাঝা হইতে দীর্ঘাকার ৫০০ শিখ আনাইলেন এবং তাঁহার নিয়মিত সৈন্য ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতেও নানা প্রকার শিখ আনাইলেন। এমন সময় গুরুদরবারে জানিতে পারা গেল যে সত্বরেই পাহাড়ীগণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে দেখিয়া গুরুগোবিন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র অজিৎসিংহের যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু পিতার নিকট বলিতে সঙ্কুচিত হওয়ায় উদয়সিং নামক জনৈক শিখ দ্বারা গুরুগোবিন্দকে এ বিষয় জ্ঞাত করাইল। ইহাতে গুরু অজিতের বিশেষ প্রশংসা করিয়া যুদ্ধে যাইতে অনুমতি দেন।

আনন্দপুরে গুরুগোবিন্দের দুইটী দুর্গ ছিল। একটীর নাম ফতেগড় অপরটীর নাম লোহগড়। এক্ষণে সাহেবসিং, উদয়সিং, অজিৎসিং,

ধর্ম্মসিং, দয়াসিং প্রভৃতি যোদ্ধাগণ দুর্গদ্বয় রক্ষার্থে বাহিরে থাকিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। পাহাড়ীগণের মধ্যে যশবলিয়ার রাজা কিশোরীচাঁদ প্রথমে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে গুজর (গোপ) ও ছেরপাল (মেষ-পালক) নামক দুইটী সামান্য জাতীয় লোক আসিয়াছিল। উহাদের সর্দ্দার যমতুলাভাও সমস্তদিন যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়েন। সন্ধ্যাকালে যুদ্ধ বন্ধ হইলে উভয়পক্ষীয় দলের শিবিরে নানা কথা হইতে লাগিল। পাহাড়ীগণের শিবিরে ভীমচাঁদ, হাণ্ডুরিয়া, কটেরিয়া, যশবালিয়া, মণ্ডী প্রভৃতির রাজা মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মণ্ডীর-রাজা গুরুর শৌর্য্যের প্রশংসা করিয়া সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিলে ভীমচাঁদ কতকটা সম্মত হইলেও হাণ্ডুরিয়ার রাজা সম্পূর্ণ অমত করিলেন।

আনন্দপুর পর্ব্ব।

---:o:---

একবিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

আনন্দপুর বেষ্টন ও সমবেত পাহাড়ী রাজাগণের সহিত যুদ্ধ।

সম্মুখ সমরে যে সুবিধা হইতেছে না ইহা পাহাড়ী রাজারা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলে তাঁহারা স্থির করিলেন যে আনন্দপুর ঘেরিয়া কিছুদিন অবস্থান করা যাউক। তাহা হইলে শিখেরা রসদ অভাবে অনাহারেই প্রাণত্যাগ করিতে থাকিবে। এইরূপে গুরুপক্ষীয়গণ দুর্ব্বল হইলে পুনরায় আক্রমণ করা যাইবে। প্রথম দিনের যুদ্ধের পর নিশীথে এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে পরদিন সম্মুখ সমর ত্যাগ করিয়া সকলে মিলিত হইয়া আনন্দপুর বেষ্টন করিয়া রহিলেন। তাঁহারা এইরূপে মাসাধিক কাল কাটাইলেও, কিন্তু রসদ আসা বন্ধ হইল না। যে স্থান দিয়া রসদ আনয়ন স্থির হয়, আনন্দপুরে আবদ্ধ শিখেরা সেই স্থানটী হঠাৎ সবলে আক্রমণ করিয়া দৃঢ়রূপে আয়ত্বাধীন করিয়া ফেলে এবং পরক্ষণেই দুর্গে রসদ প্রবিষ্ট হইয়া যায়। পাহাড়ী রাজগণ ইহাতে বাধা দিতে গেলে সকলের সমবেত চেষ্টা চাই। ততক্ষণে শিখেরা আবার অপর দিক দিয়া রসদ প্রবেশ করাইয়া লয়। এইরূপে ছোট খাট যুদ্ধের সহিত মাসাধিক কাটিয়া গেলে এক রাত্রিতে পাহাড়ী রাজাগণ আহারে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এরূপ সময়ে ভীমচাঁদ নিজপক্ষীয় গণকে উৎসাহিত করিবার মানসে ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "কৈ মাসাধিক কাটিয়া গেল কিছুই করিতে পারা গেল না! সম্মুখস্থ লৌহগড়টী পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারা গেল

না, তবে আর কি হইবে, আইস গুরুগোবিন্দের পদানত হইয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাই!" এই কথায় প্রায় সকলেরই অভিমান বোধ হইল। যশবালিয়ার রাজা কিশোরী চাঁদ উদ্ধত ভাবে বলিলেন "যদি আগামী কল্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে লৌহগড় অধিকার করিতে না পারি তবে পূর্ব্ব পুরুষগণের নরকে বাস হইবে।" এই প্রকার শপথের সহিত লৌহ-গড় অধিকারের প্রতিজ্ঞা হইল।

যশবালিয়ার রাজার এক মত্ত হস্তী ছিল। তিনি পরদিন তাহার মুণ্ডের দুই দিকে দুই তরবারী বান্ধিয়া এবং বর্ম্ম পরাইয়া বিপক্ষ দলের দিকে ছাড়িয়া দিবেন মন্ত্রণা করিলেন। পাহাড়ী রাজাদিগের এই পরামর্শ গুপ্ত চর দ্বারা রাত্রিমধ্যে গুরুগোবিন্দের নিকট পৌঁছিল। তিনি এই সংবাদ পাইয়া অমৃতসহর নিবাসী মসন্দ দুনিচাঁদকে মত্তহস্তীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন। দুনিচাঁদ এই ইঙ্গিতে বড়ই ভীত হইলেন। তিনি ব্যাকুল হইয়া গুরুর প্রধান প্রধান অনুচর বর্গের নিকট যাহাতে যুদ্ধ না করা হয় সেই ভাবে প্রস্তাব করিতে লাগিলেন, সকলেই দুনিচাঁদকে সাহস দিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক ভীরুতা হেতু কিছুতেই সাহস হইল না। দুনিচাঁদ পূর্ব্বোক্ত মাঝাবাসী শিখদিগের অধিনায়ক হইয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই মাঝাবাসি-গণকে স্বদলে টানিলেন এবং রাত্রি মধ্যেই স্বদলে পলায়ন করিলেন। দুনিচাঁদের পলায়নকালে পা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি গৃহে পৌঁছিলেই সর্পদংশনে জীবন ত্যাগ করেন।

গুরু পরদিন প্রাতে উঠিয়া দুনিচাঁদের সহিত মাঝাবাসিদিগের পলায়ন সংবাদ পাইয়া মাঝাবাসিদিগকে অভিসম্পাত ছলে আশীর্ব্বাদ দেন যে যেমন মাঝাবাসিগণ যুদ্ধের ভয়ে পলায়ন করিল, তেমনি তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ নির্ভীক হইয়া যুদ্ধের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

ইংরাজের অধীনে যে সকল পঞ্জাবী ও শিখগণ সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই মাঝাবাসী। এই কারণে শিখেরা মনে করেন যে গুরুর অভিসম্পাত অনুযায়ী কার্য্য হইতেছে। ভুনিচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পৌত্র অনুপ সিং এবং স্বরূপ সিং পিতামহের ভীরুতায় লজ্জিত হইয়া গুরুদরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দুঃখ প্রকাশ করার পর তাঁহারা গুরুগৃহে স্থান পাইলেন।

এদিকে কিশোরীচাঁদ সুসজ্জিত ও অন্যান্য রাজগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া এবং মত্ত হস্তীকে অগ্রসর করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুগোবিন্দ নিজের অঙ্গরক্ষক চারিজনের মধ্যে বিচিত্র সিংহকে উপযুক্ত বোধে হস্তীর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিলেন এবং কিরূপে সেই হস্তীকে সহজে নিধন করিতে পারিবেন তাহারও উপায় বলিয়া দিলেন। বিচিত্র সিংহের পশ্চাতে উদয় সিংহকে দিলেন। উদয় সিং কিশোরীচাঁদকে নিহত করিবেন বলিয়া বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। বিচিত্র সিং প্রমুখদল লৌহড়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবামাত্র মত্ত হস্তী সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিচিত্র সিং গুরুর পরামর্শ মত হস্তীর মস্তকে সজোরে বর্ষার আঘাত করিলেন। মত্ত হস্তী ঐ নিদারুণ আঘাত পাইয়াই মস্তক নত করিয়া পাহাড়ী পক্ষের দিকে উন্মত্তবৎ ফিরিয়া ধাবমান হইল। মত্ত হস্তীর গতি ফিরিবা মাত্র পাহাড়ী পক্ষ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, বহুসংখ্যক পাহাড়ী সেনা হস্তীর আঘাতেই মারা গেল।

শত্রু পক্ষের মধ্যে আকস্মিক গোলমালের সুযোগে, শিখেরা পাহাড়ী-দিগকে সবেগে আক্রমণ করিল। উদয় সিং কিশোরীচাঁদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাহাকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। উদয় সিং গুরুগোবিন্দের নিকটে বলিয়াছিলেন যে সত্বরেই কিশোরীচাঁদের মস্তক আনিয়া গুরুকে উপহার

দিবেন। এক্ষণে তিনি সেই মস্তক বর্ষার উপর উঠাইয়া লইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন। শিখ দুর্গে মহা আনন্দধ্বনি উঠিয়া গেল। ভীমচাঁদ যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে চাহিলেও কিশোরীচাঁদ তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া যুদ্ধে রত করিয়াছিলেন, এই জন্য শিখেরা কিশোরীচাঁদকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুদ্রোহী বলিয়া জানিত। এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই আশা করিতে লাগিলেন যে, আর সহজে কেহ উৎসাহ দিবে না—শান্তিস্থাপন হইবে।

এ দিকে, মত্ত হস্তী মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া শিখ পক্ষকে আক্রমণ করিতে উদ্যত দেখিয়া মহকম সিং নামক জনৈক শিখ তাহার শুণ্ড কাটিয়া দেয় এবং বিচিত্র সিংহের তীরে উহার প্রাণ বাহির হয়।

এই ঘটনায় পাহাড়ী পক্ষীয় সৈন্যগণ একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং সহস্র সহস্র যোদ্ধা শিখ হস্তে মারা পড়িতে থাকে। হাণ্ডুরিয়ার রাজা তাহাদিগকে সাহস দিয়া স্থির রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই সাহেব সিংহ নামক জনৈক শিখ হাণ্ডুরিয়ার রাজাকে আহত করার পর সন্ধ্যাকালে যুদ্ধ বন্ধ হইল। তখন দেখা গেল সমবেত পাহাড়ী রাজগণের প্রায় তিন লক্ষ সৈন্যের মধ্যে অর্দ্ধেক নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

সেই রাত্রিতে শিখ শিবিরে বিচিত্র সিং ও উদয় সিংকে মহা সম্মান দেওয়া হইল। অপরদিকে, ভীমচাঁদ, কটোরিয়ার রাজা, জম্বুপতি, মণ্ডীপতি, গুলেরিয়ার রাজা, কৈঠনের রাজা, কুল্লর রাজা, ভুটংয়ের রাজা প্রভৃতি রাজগণের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। এ রাত্রিতে ভীমচাঁদ কেবল মাত্র নৈরাশ্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কটোরিয়ার রাজা উৎসাহ দিলে আবার পরদিন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই কটোরিয়ার রাজা সামন্তচন্দ সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার

পর আলম সিং নামক জনৈক শিখ দ্বারা সামন্তচান্দের অশ্ব হত এবং তিনি নিজে আহত হয়েন। এইরূপে সে দিন যুদ্ধশেষ হইলে ভীমচাঁদ আর আনন্দপুরের সম্মুখে তিষ্ঠিতে সাহস না পাইয়া সদলে নিশিযোগে পলায়ণ করিলেন।

এইরূপে সকল পাহাড়ী রাজগণের চেষ্টা বিফল হইলেও ভীম চাঁদের মনে গুরুদ্রোহিতা হ্রাস হইল না। তিনি আবার সম্রাটের সাহায্য চাহিলেন। এবার দিল্লীতে লোক না পাঠাইয়া সরহিন্দের সুবা উজীদ খাঁর নিকট এবং দক্ষিণে সম্রাটের নিকট লোক পাঠাইলেন। আবার দিল্লী হইতে গুরুগোবিন্দের বিষয় বর্ণন করিয়া সংবাদ গেল। গুরু-গোবিন্দও বুঝিলেন যে, এখনও অনেক যুদ্ধ হইবে। এই জন্য সুযোগ মতে তীর, গুলি, এবং কয়েকটা কামান প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টি যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন যে, বর্ত্তমানকালে শান্তির সময়টী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার অবকাশ মাত্র! এই কলিকালে যে জাতি এই কথা ভুলিয়া যায় তাহাকেই ঠকিতে হয়। শান্তি সুখে চীন যুদ্ধ সজ্জায় অমনোযোগ করিয়াছিল, সেই জন্য জাপানের নিকট হতমান হইল। ইউরোপীয়দিগের যুদ্ধ সজ্জার এক মুহূর্ত্তও বিরাম নাই। ১৯১৪ অব্দে আরব্ধ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে দেখা গিয়াছে যে সকলেই অনেকটা প্রস্তুত ছিলেন।

আনন্দপুর পর্ব্ব

—∞∗∞—

দ্বাবিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

আনন্দপুর ত্যাগ ও তথায় প্রত্যাগমন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ষাকাল চলিয়া গেল। দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে গুরুগোবিন্দ অস্ত্রগুলি পরিষ্কার করাইয়া একটী বেদীর উপর স্থাপন করাইলেন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে অস্ত্র শস্ত্রগুলির রীতিমত পূজা করিলেন। পূজার কয়দিন সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী এবং গুরুগোবিন্দের নিজের লিখিত গুরুমুখী চণ্ডী এতদুভয়ই পঠিত হইয়াছিল। "আয়ুধ-পূজা" যাহা হইল তাহাও চণ্ডী পূজা বলিলেই চলে—সেই স্তব সেই স্তোত্র সকলই সেই, কেবল দেবী মূর্ত্তির স্থলে আয়ুধ। ইহার পর দশমীতে সকলে সশস্ত্র হইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিয়া পরস্পর সম্ভাষণাদি করিলেন।

বিজয়া দশমীর দিন সমস্ত ভারতবাসীর নিকট অতি পবিত্র দিন। ঐ দিন আমরা সকলেই কতকটা "জাতীয় এক প্রাণতা" উপলব্ধি করিয়া থাকি। ঐ দিনে পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষ অনেকটা ত্যাগ করা হয়। বর্ষা কাল এ দেশের যুদ্ধোপযোগী সময় নয়। বর্ষা শেষে

সমস্ত উদ্‌যোগ সমাপ্ত করিয়া শক্তি পূজা ও চণ্ডী পাঠের পর বিজয়া দশমীর দিনই এ দেশে যুদ্ধ যাত্রার প্রকৃষ্ট সময়। সমস্ত শীতকাল ও বসন্ত কাল সম্মুখে থাকে। হিন্দু রাজারা বিজয়াদশমীর দিনই যুদ্ধ যাত্রা করিতেন। ইদানীন্তন কালে পুণা হইতে মহারাষ্ট্রীয় বাহিনী বিজয়া দশমীর দিনই ভারত জয়ে বহির্গত হইত।

এ দিকে পাহাড়ী রাজগণেরও যুদ্ধোদ্যোগ চলিতে ছিল। গত বারে যখন তাহারা আনন্দপুর হইতে নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সে সময়ে ভীমচাঁদের জনৈক উজীর বলেন যে তিনি এক অদ্ভুত উপায় দ্বারা গুরুকে আনন্দপুর ছাড়াইতে পারেন। এক্ষণে ভীমচাঁদ সেই উপায় অবলম্বন করিতে অনুমতি করিলে উজীর একটী ময়দার গরু নির্ম্মাণ করিয়া রাত্রি মধ্যে আনন্দপুরের দ্বারে স্থাপন করিয়া আসিলেন এবং সেই ময়দার গরুর গলদেশে এক পত্রিকায় লিখিয়া দিলেন যে গুরু যদি অবিলম্বে আনন্দপুর ত্যাগ না করেন তাহা হইলে গোবধের মহাপাতক তাঁহাকে বর্ত্তিবে।

প্রাতে নগরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া এই ব্যাপার নয়নগোচর হইলে গুরুগোবিন্দের নিকট সংবাদ গেল। তিনি এ কাণ্ডটা উপেক্ষা করিলেন না। আনন্দপুর অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ত্যাগ করাই স্থির করিলেন। উদয় সিং প্রমুখ শিখগণ এ বিষয় উপেক্ষা করিতে বলিলে গুরু বলিলেন পাহাড়ী রাজগণ ক্ষত্রিয়; তাহারা যে কাপুরুষের ন্যায় গোবধ দিব্য দিয়া স্থান ত্যাগ করিতে বলিতেছেন তাহাও বুঝিয়াছি। কিন্তু 'গোবধ' দিব্য যদি আমিই উপেক্ষা করি তবে সাধারণে কি করিবে?

গো সম্বন্ধে ধর্ম্ম প্রাণ হিন্দুর হৃদয়ে যে কি অচিন্তনীয় শ্রদ্ধা আছে, তাহা অহিন্দুগণ কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা এই ঘটনাটীকে

তুচ্ছ বোধ করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা জন্য অবতীর্ণ মহাপুরুষ গোবিন্দ সিং তাহা পারিলেন না; তিনি আনন্দপুর ত্যাগ করিলেন, তবে দয়া সিং প্রভৃতির কথায় স্বীকার করিলেন যে আবার ফিরিয়া আসিবেন।

কেহ কেহ মনে করেন যে এবারের আক্রমণে শত্রুপক্ষের বলাধিক্য বুঝিয়া তাঁহার হিতৈষী কেহ গোবধ দিব্য দিয়া তাঁহাকে সরাইয়া দিয়াছিল। ওরূপ দিব্য না দিলে হয় ত গুরু আনন্দপুর ছাড়িতেন না, পরিবার বর্গকেও অন্যত্র পাঠাইতেন না।

এইরূপে গুরু আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া অদূরস্থ নির্ম্মোহ গ্রামে গিয়া পৌছিলে পাহাড়ী রাজগণ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ইতি মধ্যে ভীমচাঁদ প্রভৃতি সম্রাটের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তদনুসারে সরহিন্দের শাসনকর্ত্তা উজীদ খাঁও ঐ সময়ে সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। একদিকে পাহাড়ীগণ ও অপরদিকে উজীদ খাঁর পক্ষ একবারে নির্ম্মোহ গ্রামখানি ঘেরিয়া ফেলিল। গুরু কৌশল সহকারে পরিবার-বর্গকে এই সময়ে বিশালীর রাজবাটীতে পাঠাইয়া দেন এবং নিজেও সসৈন্যে শত্রুদল ভেদ করিয়া শতদ্রু নদী পার হইয়া গেলেন। শতদ্রু তীরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে সাহেবচাঁদ নিহত হয়েন। সেই জন্য বা গুরু শতদ্রু পার হইয়া গেলেন, আর কেন—এইরূপ বিবেচনায় পাহাড়ী রাজগণ আর গুরুর অনুসরণ করিলেন না। উজীদ খাঁও সদলে সরহিন্দে ফিরিয়া গেলে গুরুগোবিন্দ সসৈন্যে বিশালীতে গিয়া নিজ পরিবার-বর্গের সহিত মিলিত হইলেন। ফলতঃ এবারের যুদ্ধে গুরুকে কতকটা স্থান ত্যাগ করিত হইয়াছিল। শতদ্রুর পূর্ব্ব পারে স্থির থাকিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, বিশালীতে অল্প দিন থাকিয়া শীকার খেলিবার

উপলক্ষে গুরু বন্তোর নামক অপর একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হয়েন। বন্তোরের রাজা গুরুগোবিন্দকে বিশেষ যত্ন করেন। গুরুও কিছুদিনের জন্য পরিবারবর্গকে তথায় বিশালী হইতে আনাইলেন। গুরুগোবিন্দের পরিবারবর্গের সহিত বিশালীর রাজাও বন্তোরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং গুরু তাঁহারই কোন দোষে তাঁহাকে এত সত্বরে ত্যাগ করিয়াছেন মনে করিয়া পুনরায় তাঁহাকে বিশালীতে যাইবার জন্য অনুনয় বিনয় করেন। গোবিন্দ অতি মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া দিলেন যে রাজার কোন দোষ নাই, কার্য্য বশতঃই চলিয়া আসিয়াছেন। বিশালী-রাজ বিদায় হইলেন।

বন্তোরে থাকিতে থাকিতে গুরু মধ্যে মধ্যে শীকার উপলক্ষে শতদ্রু পার হইয়া আসিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ী রাজাদিগের অনুচর বর্গের সহিত ছোটখাট যুদ্ধ বিগ্রহও হইতে লাগিল। শতদ্রুর পূর্ব্ব ভাগ এবং আনন্দপুর পুনরধিকারের বন্দোবস্তই যে বন্তোরে আসার উদ্দেশ্য তাহা সুস্পষ্টই দেখা যায়। মহাত্মারা বাধা ও বিপত্তি ঘটিলে বরং অধিকতর যত্ন ও বিবেচনার সহিত উদ্দেশ্যে বদ্ধ লক্ষ্য হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন—নিরুৎসাহ হন না।

যাহা হউক, এই সময়ে দক্ষিণ হইতে কতকগুলি শিখ গুরু দর্শনে আসিতেছিল। কালমোট নামক স্থানে মুসলমানেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগের নিকট হইতে উপঢৌকন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লয়। এই সংবাদ গুরুগোবিন্দের নিকট পৌঁছিলে তিনি কালমোঠের মুসলমানগণকে উপযুক্ত দণ্ড দিবার জন্য তিনি সসৈন্যে ত্বরিতপদে যাত্রা করিলেন এবং রাতারাতি কালমোটের নিকট পৌঁছিয়া প্রাতেই তথাকার দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কালমোটের মুসলমান গণ অসাবধানে ছিল সুতরাং স্বয়ং গুরুর অধীনে উত্তেজিত

শিখগণ যেরূপ ভীষণ বেগে আক্রমণ করিল তাহাতে তাহারা সহজেই পরাজিত হইল। গুরু কালমোট অধিকার করিয়া শিষ্যগণের প্ররোচনায় আবার আনন্দপুর যাত্রা করিলেন।

আনন্দপুরপর্ব্ব।

—:•:—

ত্রয়োবিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর তৃতীয় বিবাহ ও ভীমচাঁদের দূত।

আনন্দপুরে গুরু প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, পাহাড়ীরাজগণ তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করিবেন, সেই বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে পূর্ব্বের ন্যায় আবার আনন্দপুরে বহু শিখেরা সমাগম হইতে লাগিল। সেই সমস্ত শিখের মধ্যে একদিন ঝিলাম জেলাস্থ রোতাস নিবাসী জনৈক ক্ষত্রিয় শিখ আসিয়া আপন কন্যাদায় নিবেদন করিলেন এবং গোবিন্দকেই তাঁহার সাহেবদেয়ী নামা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। গুরু উত্তর করিলেন যে, তিনি ৺চণ্ডীপূজা অবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন; সুতরাং বিবাহ করিতে সম্মত নহেন। শিখ নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া শেষে বলিলেন—"তবে কন্যাটিকে অবিবাহিতাই থাকিতে হইবে; কারণ আমি উহাকে গুরুকে দান করিব বলায় সাধারণ শিখবর্গ উহাকে মাতৃ সম্বোধন করে। সুতরাং তাহারা কেহ আর উহাকে বিবাহ করিতে পারে না।" এই কথা বলার পর গুরু অগত্যা বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং কয়েকদিন মধ্যে শুভবিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু গুরু ব্রহ্মচারীর আচার ত্যাগ করিলেন না। এই মাতা সাহেবদেয়ীই পরে পুত্র প্রার্থনা করিলে, গুরু সকল খালশাকে ইঁহার পুত্ররূপে প্রদান করেন। এই সকল

অলোকসামান্য—সাধারণ মনুষ্যের অচিন্তনীয়—পবিত্র আচার দ্বারাই মহাপুরুষের মাহাত্ম্য আপনা আপনি প্রকাশিত হয় এবং সেই সদাচার-মুগ্ধ সাধারণ লোকের মন সম্পূর্ণরূপে স্বতঃই মহাপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল বিষয়েই মহাপুরুষে এবং সাধারণ মানুষে পার্থক্য দেখা যায়; নচেৎ আহার গ্রহণ, নিদ্রা, মৃত্যু প্রভৃতিতে বৈষম্য নাই।

ও দিকে ভীমচাঁদ-প্রমুখ পাহাড়ীরাজগণ আপাততঃ গুরুর সহিত মিত্রভাবে চলাই স্থির করিলেন। ভীমচাঁদ তৎপক্ষে একজন দূতকে গুরুর নিকট পাঠাইয়া জানাইলেন যে তিনি গুরুর প্রভাব এক্ষণে বুঝিয়াছেন; পূর্ব্বেও একবার এইরূপ জানাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে কুপরামর্শ বশতঃ পুনরায় বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—এক্ষণে আর সেরূপ হইবে না। এইভাবে গুরুর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে ঔৎসুক্য দেখাইলে, গুরুগোবিন্দ স্বীয় অসাধারণ ঔদার্য্যগুণে সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া জানাইলেন যে, গুরুর ঘরে কোন বৈষম্য নাই—যে শরণ লয় তাহাকেই আশ্রয় দেওয়া হয়। ভীমচাঁদের দূত তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলে, ভীমচাঁদ নিজমন্ত্রীকে গুরু দরবারে পাঠাইলেন। ইঁহার মন্ত্রণাতেই আনন্দপুরের দ্বারে ময়দার গরু বাঁধা হইয়াছিল। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। এই উপলক্ষে সূর্য্যপ্রকাশ গ্রন্থকার ব্রাহ্মণদিগের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রী নিজপ্রভুর শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অধ্যবসায়শীল লোক ছিলেন; ব্রাহ্মণের উপযুক্ত উচ্চ সদ্গুণ তাহার ছিল না বটে, কিন্তু তাহা "সকল" ব্রাহ্মণে সম্ভবে না। গুরুগোবিন্দ ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব; ভীমচাঁদও তাই। কিন্তু ভীমচাঁদের দোষে সমস্ত ক্ষত্রিয়কে গালি দেওয়া হয় নাই! ফলতঃ এই সকল লেখকের অনুগ্রহে যেমন অনেক বিষয় জানিতে পারা

যায়, আবার স্থানে স্থানে তাঁহাদের একদেশদর্শিতার গোড়ামীতে তদ্রূপ অনেক বিষয়ের বিবরণ বিকৃত হইয়াও যায়। এমন কি, যে হিন্দুত্ব রক্ষা করিবার জন্যই গুরু তেগবাহাদুরের মৃত্যু এবং তৎপুত্র গুরুগোবিন্দের অবতার হওয়া বর্ণিত, সেই গুরুগোবিন্দই যেন সেই হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া চিত্রিত হইয়া পড়েন। যাহা হউক এই ব্রাহ্মণ গুরু-দরবারে আসিয়া জানাইল যে, যাহাতে আর কোনরূপ বুঝিবার ত্রুটি বা গোলমাল না ঘটে, সে জন্য গুরু দরবারে উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত ভীমচাঁদ তাঁহাকে অনুমতি করিয়াছেন। তদনুসারে ভীমচাঁদের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী গুরুসভায় স্থায়ী ভাবেই দূত স্বরূপ রহিলেন। সূর্য্যপ্রকাশে ভীমচাঁদের এই মন্ত্রীর নাম পম্পা বলিয়া উল্লিখিত আছে। পম্পা শব্দে ও অঞ্চলে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে বুঝায়। ভীমচাঁদের দিকে গুরুর মন বিশ্বস্ত রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গুরুর নিকট ভীমচাঁদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গুরু উহাকে 'শঠ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। অল্পদিন মধ্যে মিষ্টভাষী পম্পা আনন্দপুরের ক্ষমতাপন্ন শিখদিগের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এখনকার কালে ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় রাজ্যের যে সকল দূত ইউরোপের অন্যান্য স্থানের রাজ্যে অবস্থান করেন, তাঁহাদের ন্যায় পররাষ্ট্রের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ দেওয়াই এই পম্পার কার্য্য ছিল।

কোন সময় পম্পা গুরুর ঘোড়া চুরির সুবিধা জানিয়া ভীমচাঁদকে সংবাদ দিয়াছিলেন; কিন্তু ভীমচাঁদের লোক গুরুর ঘোড়া চুরি করিতে পারে নাই—অপর একটি ঘোড়া লইয়া গিয়াছিল। তৎপরে ভীমচাঁদ প্রভৃতি পাহাড়ী রাজগণের মধ্যে কিরূপে গুরুকে কৌশল পূর্ব্বক লইয়া যাইবেন, পম্পা তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

—:o:—

আনন্দপুরপর্ব্ব।

চতুর্ব্বিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

রোয়ালসর তীর্থ পর্য্যটন ও তথা হইতে আসার পর
যোগে মাতা জিতোজীর দেহত্যাগ।

একদিন পম্পা গুরুকে কথা প্রসঙ্গে জানাইলেন যে রোয়ালসর অতি চমৎকার তীর্থ—তথায় সরোবরে শিলা ভাসমান রহিয়াছে—এই তীর্থ দর্শনে বিশেষ পুণ্য হয় বলিয়া, তৎকালে তথায় বহুলোক সমাগম হইয়াছে। এই কথার কোন উত্তর না দিয়া গুরুগোবিন্দ গম্ভীরভাবে রহিলেন। কিন্তু ক্রমে এই কথা অন্তঃপুরমধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িলে, রমণীগণ ঐ তীর্থ দর্শনে একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। পম্পার কুঅভিপ্রায় গুরুগোবিন্দ বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার অশ্বপালকও সন্দেহ করিয়াছিল। উঁহারা দুইজনে এই তীর্থ ভ্রমণের পক্ষপাতী হইলেন না বটে, কিন্তু অন্তঃপুরস্থ রমণীগণের এবং অন্যান্য শিখগণের আগ্রহাতিশয্যে গুরুকে রোয়ালসরে গমন করিতে হইল। কিন্তু গুরু যেরূপ সরঞ্জাম লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে যুদ্ধ আবশ্যক হইলে তাহাও চলিতে পারিত।

এইরূপ সাবধান হইয়া গুরু সপরিবারে রোয়ালসরে যাত্রা করিলে, পম্পা ও ভীমচাঁদ প্রভৃতিকে সংবাদ দিয়া, গুরুগোবিন্দের সঙ্গে তীর্থে গমন করিলেন। ভীমচাঁদ স্বয়ং তথায় আসিতে পারেন নাই। যশবালিয়ার রাজা প্রভৃতি তিনজন রাজা আসিয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্যসামন্তের

বন্দোবস্ত দ্বারা গুরু যেরূপ সাবধান হইয়া আছেন, তাহা দেখিয়া কেহ যুদ্ধ বিগ্রহে সাহস করেন নাই।

রোয়ালসর তীর্থ মণ্ডী হইতে বারক্রোশ দূরে। গুরুগোবিন্দ তথায় পৌঁছিলে জনৈক ব্যক্তির নিকট এই তীর্থের আদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। শিখেরা বলেন, মানবরেওয়া নাগকন্যার পুত্র রেওয়াল। তাঁহারই নামে এই তীর্থ স্থানটির নাম রোয়ালসর হইয়াছে। ইনি গুরুদর্শন করিবেন বলিয়া মানবদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং নিজ বৃত্তান্ত গুরুকে জানাইয়াছিলেন। তেজস্বী হইবার জন্য তাঁহার মাতা তাঁহাকে তপশ্চরণ করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে তপ করিয়া তিনি তেজস্বী হয়েন এবং মণ্ডীর রাজা হয়েন। পরে তেজ হ্রাস হইয়া আসিলে জনৈক যক্ষকর্ত্তৃক তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হয়েন। রোয়ালের দুঃখ শুনিয়া গুরু তাঁহার পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে উদ্‌যোগী হন এবং ধনুকে :টঙ্কার দেন। সে শব্দে পাহাড়শ্রেণীতে প্রতিধ্বনি হয় এবং যক্ষ আসিয়া দর্শন দেন। যক্ষও গুরুর প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের সামান্য বিবাদে মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত গুরুর কিছু করা অনাবশ্যক, ইহাই দেখাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে যক্ষ কতকগুলি ভবিষ্যবৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শিখদিগের আপাততঃ যুদ্ধে জয়লাভ হইবে না, পরে হইবে এবং মুসলমান রাজত্ব থাকিবে না এবং নানাপ্রকার রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তন হইবে—এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। ইহার পর রোয়াল ও যক্ষ উভয়েই গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন এবং গুরু সদলে আনন্দপুরে ফিরিয়া আসেন।

গুরু আনন্দপুরে ফিরিয়া আসিলে, আবার শিষ্যগণ-পরিবৃত হইয়া নিয়মিতরূপে সভায় বসিতে লাগিলেন এবং শিষ্যগণ নানাবিষয়ের প্রশ্ন করিয়া উপদেশ লইতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে সূর্য্যপ্রকাশের অনেক

অধ্যায় পূর্ণ হইয়াছে। এই সকল প্রশ্নের আভাষ বুঝিবার জন্য নিম্নে এক দিনের প্রশ্ন সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল। এ দিন প্রশ্ন হইল, মূর্ত্তিপূজা করা যায় কি না? তদুত্তরে গুরু বলিলেন :—

নাম জগৎ হরভক্ত হরিধ্যান ধরোহরজ্ঞান।
শিলা পূজতে প্রেমবিন্ তামস ভক্ত পছান॥

অর্থাৎ নাম জপিয়া হরিভক্ত হয়, ধ্যান ধারণা করিলে জ্ঞান লাভ হয়। আর প্রেম ভক্তি বিনা যাহারা শিলা পূজিয়া থাকে, তাহাদিগকে তামস ভক্ত জানিবে।

গুরুমৎ হয় ভজন নিৎ ধ্যানযুক্ত রহে রাস।
করম করে নিজধরমলখ্ গুরু প্রসন্ন শিখতান্॥

অর্থাৎ কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ধ্যানযুক্ত হইয়া নিয়ত ভজন করাই গুরুর মত। স্বধর্ম্মে লক্ষ্য রাখিয়া নিজ কর্ম্ম করিলে তাহাতে গুরু প্রসন্ন থাকেন।

যাঁহারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সামান্যভাবে পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এসকল কথা নূতন না হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে, হাজার বার মনে করিয়া দিলেও লোকে এই সকল সনাতন সত্য সর্ব্বদাই ভুলিতেছে। এজন্য উহাদের একটা নিত্য নূতনত্ব আছে। যিনি যত অধিক সময় পর্য্যন্ত এই সকল বিষয়ে লোকের মন আবদ্ধ রাখিতে পারেন,তিনি তত বড় গুরু এবং প্রচারক ও শিক্ষক। ফলতঃ হিন্দুজাতির যে গূঢ় জীবনী শক্তি আছে, তাহারই গুণে বৈদিক মহাবাক্য সকলের চর্চ্চা লোপ হইয়া আসিলেই গুরুগোবিন্দের ন্যায় মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হয়। গুরুগোবিন্দ এইরূপে শিখগণকে উপদেশ দিবার কালে উজ্জয়িনীনিবাসী হরগোপাল নামক জনৈক শিখকে উপলক্ষ করিয়া শিখদিগের কর্ত্তব্য ও আচারাদির নিয়ম অনেক বলিয়া দিয়াছেন। শিখের আরও একপ্রকার হিন্দুর পবিত্র আচার।

যে সময়ে গুরু শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়া দিন যাপন করিতেছেন, সেই সময় মাতা জীতোজী যোগশিক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। গুরুগোবিন্দ ধর্ম্মপত্নীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য কিরূপ চিত্তবৃত্তির নিরোধপূর্ব্বক যোগ অভ্যাস করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দেন। স্বল্পাহারী হইয়া প্রশান্তমনে সেই অভ্যাস বৎসরেককাল করিতে করিতে গুরুর অনুগ্রহে তাঁহার এতটা শিক্ষা হইয়া পড়িল যে, তাঁহার কতকটা ভবিষ্য-দৃষ্টিও জন্মিল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে, মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহার তিনটি সন্তানই নিহত হইবে। ইহাতে অপত্যস্নেহে মুগ্ধ হইয়া উহার কোন উপায় বিধানের নিমিত্ত স্বামীর নিকট প্রার্থনা করেন এবং যাহাতে নিজবংশ রক্ষা হয়, সেজন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদুত্তরে গুরু বলিয়াছিলেন, তুমি যোগে অনেকটা উন্নতি করিয়াছ, তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু এখনও মায়াজাল কাটিতে পার নাই। নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়া যে যাহার আপন পথে চলিবে, সে বিষয়ে ভগবানের যেরূপ ইচ্ছা, তাহার বিরুদ্ধে কোন চেষ্টা করা উচিত নয়। মায়াজালে বদ্ধ হইয়া পার্থিব পুত্রতে মুগ্ধ হইও না। তখন জীতোজী বলেন—"তবে এরূপ অনুমতি করুন, যাহাতে আমাকে পুত্রশোক ভোগ করিতে না হয়; সে সকল হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিবার আগেই যেন আমি যাইতে পারি।" গুরু "তাহাই হইবে" বলিয়া অনুমতি প্রদান করিলে, জীতোজী একবার স্বামীর আপাদমস্তক দর্শন করিলেন এবং বিশেষ করিয়া স্বামীর শ্রীচরণ-দর্শন পূর্ব্বক ধ্যান করিতে করিতে নিভৃত স্থানে গমন করিয়া যোগে তনুত্যাগ করেন। পরিবারবর্গ সকলে মাতা জীতোজীর জন্য শোক করিতে থাকেন; কিন্তু গোবিন্দের জ্ঞান বৈরাগ্যের কথায় সকলে ক্রমশঃ শান্তিলাভ করেন।

গুরু গোবিন্দ আবার যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। ভাণ্ডারের

বহুমূল্য অনাবশ্যক দ্রব্যাদি নষ্ট করিতে লাগিলেন। প্রথমে কিংখাপ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র গুলিতে অগ্নিপ্রদান করিলেন, পরে স্বর্ণ রৌপ্যাদি শতদ্রু নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। পম্পা ভীমচাঁদকে এই সমস্ত ঘটনার সংবাদ দেন। তদনুসারে তাঁহার লোক রাত্রিতে আসিয়া নদী হইতে সেই সকল স্বর্ণাদি উঠাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু সফলকাম হইতে পারে নাই।

এই সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া শিখদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে।—জনৈক ফকির আসিয়া গোবিন্দকে বলেন যে, সম্প্রতি স্নানের সময় ডুব দিবামাত্র কে একজন স্ত্রীলোক যেন তাঁহার হাতে ধরিয়া কোথায় লইয়া যায়। তথায় গিয়া দেখিয়াছিলেন, একজন মহাপুরুষ সর্পবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি বলেন, গুরুগোবিন্দকে গিয়া বলিবে যে, তাঁহার প্রেরিত ৯ কোটী ৭২ লক্ষ ও ১০ কোটী একুনে ১৯ কোটী ৭২ লক্ষ মুদ্রা তিনি যথাক্রমে তাহার দুই পত্নীদ্বারা পাইয়াছেন; যথাসময়ে ঐ টাকা যেন তাঁহার নিকট গ্রহণ করা হয়। এক্ষণে সেই মহাপুরুষের কথা স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে। এই বলিয়া ফকির গুরুগোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ সর্পবেষ্টিত মহাপুরুষ কে? গুরু উত্তর করিলেন—“সমুদ্র। শতদ্রু ও গোদাবরী-নামক দুই নদীকে তাঁহার দুই পত্নী বলিয়া জানিবে।”

আনন্দপুর পর্ব্ব।

—:o:—

পঞ্চবিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

চামকোরে প্রথম যুদ্ধ। তামাক সেবন নিষেধ এবং কেশধারণ ব্যবস্থা।

বর্ণিত সময়ে একটী সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হয়। গুরু তদুপলক্ষে কুরুক্ষেত্র তীর্থদর্শনে যাত্রা করেন। পরিবারবর্গ সঙ্গে যাইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু গুরু তাহাদের কাহাকেও সঙ্গে লয়েন নাই। যেরূপ ধরণে মাতা গুজরীকে পর্য্যন্ত সঙ্গে লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে গৃহে রাখিয়া একজন সশস্ত্র শিষ্যমাত্র লইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, গুরু স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, বাহিরে গেলে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবেন। সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরু-ক্ষেত্রে বৃহৎ মেলা হইয়াছিল। গুরু তীর্থস্থানে উপস্থিত হইয়া যথারীতি দর্শনাদি করিয়া মেলায় অনেকগুলি ঘোড়া ক্রয় করেন। তথায় কোন হাঙ্গামা হয় নাই। প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে খেড়িগ্রামের নিকট ময়ভোগ নামে জনৈক বৃদ্ধা গুরুগোবিন্দের অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া তাঁহাকে থামাইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধার সহিত গুরু যেরূপ ধরণে কথা-বার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তাহাতে যেন পূর্ব্ব হইতে উভয়ের মধ্যে পরিচয় ছিল বলিয়া বোধ হয়। গোবিন্দ বৃদ্ধাকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া চামকোর ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক কয়েকদিন অবস্থান করিলেন।

পম্পার নিকট ভীমচাঁদ এই সংবাদ পাইয়া লাহোরের সুবাকে এবং পাহাড়ী রাজগণকে জানাইলেন যে, গুরুগোবিন্দ তীর্থদর্শন উপলক্ষে পথিমধ্যে অবস্থান করিতেছেন; এ সময়ে আক্রমণ করিলে সহজেই তাঁহাকে পরাজয় করা যায়। যখন ভীমচাঁদের প্রেরিত সংবাদ লাহোরে পৌঁছিল, সেই সময়ে সৈয়দাবেগ ও আলপ্‌খাঁ নামক সম্রাটের দুইজন সেনাপতি প্রত্যেকে পাঁচহাজার সেনা লইয়া লাহোর হইতে লুধিয়ানার পথ দিয়া দিল্লী যাইতে ছিলেন। ভীমচাঁদের প্রেরিত হাণ্ডুরিয়ারাজ ভুপচাঁদের পরামর্শে তাঁহারা সে পথ ত্যাগ করিয়া চামকোর পথে আসিয়া গুরুকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। সৈয়দাবেগ গুরুগোবিন্দকে পূর্ব্বে একবার দর্শন করিয়াছিলেন। এ বারে দর্শন করিয়া হঠাৎ এরূপ মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে, আর গুরুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। গুরুর শরণাগত হইয়া কৃপাপ্রার্থী হইলেন। সৈয়দাবেগের সৈন্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের সেনাপতির পথ অনুসরণ করিল এবং কেহ বা পলায়ন করিল; কিন্তু অধিকাংশই আলপ্‌খাঁর সৈন্যদলে যোগ দিল। এই ঘটনায় মোগল সৈন্য মধ্যে এরূপ বিশৃঙ্খলতা ও পরস্পরে অবিশ্বাস ঘটিল যে, অতি সামান্য যুদ্ধেই আলপ্‌খাঁ সসৈন্যে পলায়ন করিলেন। গুরুগোবিন্দ ইহার পর চামকোর ত্যাগ করিয়া আনন্দপুরে আসিলে শিখগণ অতি সমারোহে অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। আবার পূর্ব্বের ন্যায় গুরুগোবিন্দ শিষ্যবর্গকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া দিন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন আনন্দপুরের নিকট অশ্বারোহণে বেড়াইবার সময় গোবিন্দের অশ্ব চমকাইয়া উঠে। তখন গোবিন্দ শিষ্যবর্গকে বলেন, অদূরে ঐ তামাকু ক্ষেত্রের গন্ধে ঘোড়া চমকাইয়াছে; তামাকু অতি মন্দ পদার্থ, উহা ব্যবহার করা উচিত নয়। এই উপলক্ষে সূর্য্যপ্রকাশে বর্ণিত আছে যে,

গুরুগোবিন্দ আরও বলিয়াছিলেন যে, স্কন্দসংহিতায় ভগবান্ শিব নিজ পুত্র কার্ত্তিককে বলিতেছেন, দ্বাপর যুগের অন্তে পাণ্ডুবংশে মেঘনাদ নামে আজমীড়ে জনৈক রাজা হইয়া প্রজাকে উৎপীড়ন করেন; তাহাতে পশ্চিম হইতে এক যবনপীর আসিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করেন; তখন রাজা সন্ন্যাসিবেশে পুষ্করতীর্থে গমন করেন; তথায় একজন সাধুর সহিত তাঁহার দেখা হয়; সন্ন্যাসী রাজা পিপাসাতুর হইয়া সাধুর নিকট জল প্রার্থনা করেন; সাধু তাঁহার পাপের উল্লেখ করিয়া বলেন, তুমি পাত্র স্পর্শ করিলে উহা অপবিত্র হইবে; এইরূপে ঘৃণিত হওয়ার কিছু দিন পরে রাজা সন্ন্যাসিবেশ ত্যাগ করিয়া আজাপালের রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং পুনরায় রাজা হইয়া গোমেধ-যজ্ঞ করেন; সেই যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে তামাকুর উদ্ভব হয়; তামাকু যে গোহত্যা হইতে উদ্ভূত, গুরু ইহাই শিষ্যবর্গের ধারণা করাইয়া দেন। স্থানান্তরে একথাও বলিয়াছেন যে, তামাকু সেবনে মন্ত্রস্ফূর্ত্তি হয় না। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে তামাকু প্রথমে ভারতবর্ষে আমদানী হয় এবং অল্প শিখেরা যে তামাকুকে বিশেষ ঘৃণা করেন, তদ্বিষয়ে একটী গল্প অল্পকাল পূর্ব্বে খবরের কাগজে দেখা গিয়াছিল। পাতিয়ালার মহারাজ একজন ইংরাজ কামিনাকে শিখ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার জাতি যায় নাই। কিন্তু একদিন কোন ইংরাজ ভদ্রলোক একটী চুরুট দিয়া আপ্যায়িত করিতে গেলে, তিনি সহসা হস্ত সরাইয়া বলেন, "আমি আপনার সৌজন্যে কৃতজ্ঞ; কিন্তু আমি শিখ"। "আমি শিখ" এই কথাতেই মহারাজ বুঝাইতে চাহিলেন যে "তামাকু আমার একান্তই অস্পৃশ্য"। ইংরাজটী এত বুঝিলেন না; তিনি মনে করিলেন মহারাজ "সিক বা পীড়িত"! তিনি বলিলেন, "বিশেষ কোন ব্যারাম নয় ত?"

একদিন গুরুর নিকট শিষ্যবর্গ প্রশ্ন করেন যে, কেশধারণ অন্য কোন সম্প্রদায়ে দেখা যায় না ; ইহার কারণ কি ? তদুত্তরে গুরু বলেন, মস্তক মুণ্ডন সম্বন্ধে পূর্ব্বে শাস্ত্রে বিধি ছিল না। কলিযুগ প্রবর্ত্তমানের দুই সহস্র-বৎসর পরে নন্দনামে জনৈক ব্যক্তি রাজা হয়েন। তিনি ক্রমে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া উঠেন। তখন তাঁহার এই মনে হয় যে, যদি কেহ তপঃপ্রভাবে তাঁহার ঐশ্বর্য্য হস্তান্তর করিয়া লয়, তবে কি উপায়ে তাহা নিবারণ হইতে পারে ? মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, মস্তক-মুণ্ডন করিলে তপঃপ্রভাব হ্রাস হইয়া যাইবে। তদনুসারে বলপ্রকাশপূর্ব্বক রাজাজ্ঞায় ব্রাহ্মণগণের মস্তক-মুণ্ডন আরম্ভ হয়। তখন মুণ্ডনের সমর্থক কয়েকটী শ্লোক প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। মস্তক-মুণ্ডনে তপঃপ্রভাব খর্ব্বীকৃত হইয়াছে এবং মন্ত্রের স্ফূর্ত্তিও পূর্ব্বের ন্যায় হয় না ; এইজন্য খালসাদিগকে কেশধারণ করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। সামগায়ীরা মস্তক-মুণ্ডন করিতেন বলিয়া অনেক স্থলে উল্লেখ আছে ; সে সকলই যে প্রক্ষিপ্ত বাক্য একথা বলিবার শক্তি আমাদের নাই। বৌদ্ধ যতিগণ মস্তক-মুণ্ডন করিয়া থাকেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যে নন্দ নামে প্রতাপশালী রাজা ছিলেন ; গুরুগোবিন্দ তাঁহাকেই উল্লেখ করিয়াছেন কিনা, তাহাও বলা যায় না।

ক্ষৌরকার্য্য না করিলে যে তেজো বৃদ্ধি হয়, একথা আমাদের শাস্ত্রেও আছেঃ—

"কেশশ্মশ্রু ধারয়তামগ্রা ভবতি সন্ততিঃ"

(শুদ্ধিতত্ত্বম্। অশৌচসঙ্কর।৩৫)

কেশ এবং শ্মশ্রু রাখিলে তেজো বৃদ্ধি হয়।

যখন ৺ তারকনাথ বা অন্য কোথাও হত্যা দিতে হয় অর্থাৎ একান্ত একাগ্রচিত্তে শিবোপাসনা করিতে হয় এবং যখন বিশেষ শুচিভাবে পারদ

বা হরিতাল ভস্ম করিতে হয়, তখন নখ চুল রাখিবার বিধি আছে। "জটাধারী তপস্বী" কথাই প্রচলিত। চাতুর্ম্মাস্যে ক্ষৌরকার্য্য হয় না। ফলতঃ একচিত্তে "বিশেষ" তপস্যার সময় ক্ষৌরকার্য্য আমাদের শাস্ত্রমতেও অপ্রশস্ত। নৈমিত্তিক পূজা স্বস্ত্যয়নাদি দিনে ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে নাই। শিখেরা যাবজ্জীবন গুরুদত্ত মন্ত্রসাধনে একান্তেই একাগ্রচিত্তে থাকিতে আদিষ্ট। এই জন্যই উহাদের নাপিত স্পর্শ নিষেধ। "কামালে জোমালেই বর" অর্থাৎ ক্ষৌরকার্য্য কতকটা বেশভূষার উৎকর্ষসাধনের সামিল। অনেক ছেলের মাথা কামাইয়া দিলে অসুখ করে, ইহাও অনেকে দেখিয়াছেন। শিখদিগের কেশ এবং শ্মশ্রু রাখা শুধু ভয়ানক বেশ ধারণের জন্য বলিয়া যাঁহারা ব্যাখ্যা করেন, এই মাত্র বলিতে পারি, প্রকৃত হউক, আর না হউক, ক্ষৌরকর্ম্ম না করিলে তেজোবৃদ্ধি হয়, এই বিশ্বাসে যে গুরু এই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ সূর্য্যপ্রকাশে রহিয়াছে। এরূপও হইতে পারে যে, গুরু-গোবিন্দ ভাবিয়াছিলেন যে, অশৌচকালে ক্ষৌরকর্ম্ম হয় না এবং পরাধীন জনগণ নিত্য অশুচি।

আনন্দপুর পর্ব্ব

—:০:—

ষড়্‌বিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

পুনর্ব্বার যুদ্ধ।

মুসলমান সেনাপতি সৈয়দাবেগ এক্ষণে গুরুগোবিন্দের অনুগত। গুরুগোবিন্দ চামকোর হইতে আনন্দপুর আসিবার সময় সৈয়দাবেগ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। এক দিন গুরুদরবারে সকলের সমক্ষে সৈয়দাবেগ বলিলেন যে, তাঁহারা লাহোর হইতে দিল্লী যাত্রাকালে ভীমচাঁদের দূতমুখেই গুরুর চামকোর মাঠে অবস্থানের সংবাদ পাইয়াছিলেন, এবং ভীমচাঁদের দলের প্ররোচনায় আলপ্‌খাঁ এবং তিনি সসৈন্যে তথায় আসিয়াছিলেন। সৈয়দাবেগের কথায় ভীমচাঁদের পক্ষপাতী উপস্থিত শিখগণকে সম্বোধন করিয়া গুরু বলিলেন,—"বহুদিন হইতেই বলা যাইতেছে যে ভীমচাঁদের মৈত্রীভাব শঠতা মাত্র। উহার সহিত সরল ব্যবহার বৃথা কষ্টের কারণ হয়।" এই সময়ে কয়েক জন শিখ সুবিধা বুঝিয়া পাহাড়তলীতে ভীমচাঁদের অধিকারে মৃগয়া করিবার জন্য গুরুর অনুমতি লইল।

গুরুর অনুমতি লাভ করিয়া শিখেরা দলে দলে পাহাড় ও উপত্যকা ভূমিতে মৃগয়া করিতে গমন করিতে লাগিল। তথায় যে সকল জনপদের লোক গুরুর অধীনতা স্বীকার করিল, তাহারা সর্ব্ব প্রকার উৎপীড়নের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। এইরূপে ঐ প্রদেশের কতক অংশ গুরুগোবিন্দের অধিকার ভুক্ত হইয়া গেল।

উৎপীড়িতের মধ্যে অনেকে গুরুর অধীনতা স্বীকার না করিয়া, ভীমচাঁদকে উপদ্রবের কথা জানাইতে লাগিল। ভীমচাঁদ পুনঃ পুনঃ এই সকল সংবাদ পাইয়া, ইতি-কর্ত্তব্যতা স্থির করিবার জন্য হাণ্ডুরিয়ার রাজা ভুপচাঁদ, চাম্বেলের রাজা, ফতেপুরের রাজা উজীর সিং এবং নাহোনের রাজা দেবশরণের সহিত পরামর্শ করিলেন। কিশোরী চাঁদ প্রভৃতি বীরগণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন বলিয়া নিরুৎসাহ হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম ইত্যাদি বাক্যে হাণ্ডুরিয়ার রাজা উৎসাহ দিলেন এবং বলিলেন—"পুনঃপুনঃ বাদশাহের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াই বা কি হইবে, স্বাবলম্বন চাই।"

এদিকে হুসিয়ারপুরের নিকট বসীগ্রামের এক পাঠান এক ব্রাহ্মণের নব বিবাহিতা পত্নীকে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া গুরুদরবারে আসিয়া এই সংবাদ দিয়া বলে,—"যদি তাহার পত্নীকে অবিলম্বে উদ্ধার করিয়া না দেওয়া হয়, তবে সে গুরুদরবারে প্রাণত্যাগ করিবে।" গুরুর অনুমতিক্রমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিত সিং অবিলম্বে একশত সশস্ত্র শিখ লইয়া বসীগ্রামে যাত্রা করিলেন। বসীগ্রাম আনন্দপুর হইতে বহুদূর হইলেও বিশেষ চেষ্টা করিয়া অজিতসিং সেই রাত্রিতেই গিয়া উক্ত পাঠানের বাড়ী ঘেরাও করেন। এই পাঠান প্রকৃতই মন্দ লোক ছিল। রাত্রিশেষে তাহার বাড়ী ঘেরাও হইয়াছে শুনিয়াও তাহার প্রতিবাসীদিগের মধ্যে কেহ তাহাকে সাহায্য করিলেন না; বরং সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন অজিত সিং বিনা রক্তপাতে ঐ পাঠানকে ও নব-ব্রাহ্মণ-বধূকে লইয়া আনন্দপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রাহ্মণের বধূ ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইল এবং গুরুর আজ্ঞায় ঐ পাঠানের প্রাণদণ্ড করা হইল। মুসলমান মহলে সকলে ত সকল বিবরণ জানিল না; শুধু জানিল এক জন

সম্পত্তিশালী মুসলমানকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গুরু তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। সুতরাং সাধারণতঃ মুসলমানদিগের মধ্যে গুরুর প্রতি বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া উঠিল।

এদিকে পাহাড়ীরা পরামর্শ করিয়া যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন, এবং গুরুগোবিন্দকে পত্র লিখিলেন যে শিখেরা "দুনে" (অর্থাৎ উপত্যকা ভূমিতে) আসিয়া বড় উৎপাত করে; তাহাদিগকে এ বিষয়ে নিবারণ করিবে; নতুবা সসৈন্যে গিয়া ইহার প্রতিফল দেওয়া যাইবে। গুরুগোবিন্দ এই পত্র পাইলে শিখ-সভায় যেন জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। সংবাদ পাওয়া গেল পাহাড়ীরা দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে। গুরুগোবিন্দ পাহাড়ী রাজগণকে উত্তর দিলেন যে, তিনি প্রতিফল গ্রহণের জন্য সশস্ত্র প্রস্তুত আছেন। এই পত্র সহিত পাহাড়ী রাজগণের দূতকে বিদায় দিয়াই তিনি আট হাজার সশস্ত্র শিখ লইয়া প্রস্তুত হইলেন এবং শত্রুকে আনন্দপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে দিলে সাধারণ লোকের বিশেষ কষ্ট হইবে এইজন্য পরিবার বর্গকে আনন্দপুর রাখিয়া তিনি সসৈন্যে পাহাড়তলীর দিকে অগ্রসর হইয়া প্রান্তর ভূমিতে শত্রুগণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পাহাড়ী রাজারা আসিয়া আক্রমণ করিল। সৈন্য সংখ্যা অধিক থাকায় প্রথমের প্রচণ্ড আক্রমণে পাহাড়ীয়ারা শিখগণকে কতকটা হটাইয়া আনিল। কিন্তু শিখগণের ধৈর্য্যগুণে পাহাড়ীরা সে ভাবে অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিল না। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা নিস্তেজ হইয়া পলায়ন করিল। শিখেরা সানন্দে আনন্দপুরে ফিরিয়া আসিলেন। সকল দেশে এবং সকল সময়েই পাহাড়ী সৈন্যের প্রথম ধাওয়া অতি ভয়ানক হয়। হাইলাণ্ডারদিগের সহিত কভেনাণ্টেরদিগের যুদ্ধে, নৌশেরায় শিখদিগের সহিত পাঠান গোষ্টিয়দিগের যুদ্ধে, আজকাল

ও ভারত গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদিগের প্রতি সীমান্ত গোষ্ঠীয়দিগের গাজিদলের আক্রমণে পাহাড়ীদের এই প্রথম আক্রমণ প্রতিরোধ করা বড় কঠিন ব্যাপার। অধিক ধৈর্য্যশালী ও একত্র যুদ্ধ করিতে শিক্ষিতা সমতলবাসী সৈন্য প্রায়ই শেষে জয়ী হয় বটে, কিন্তু সে দিনকার সামান্য উজীরীদের ধাওয়াতেই ওয়ানোর রণস্থলে আমাদের কম ক্ষতি হয় নাই। ম্যাগাজিন রাইফেলের এবং ম্যাক্‌সিম তোপের দিনেই যখন এমন, তখন সেকালের পাহাড়ী সৈন্যের আক্রমণ যে কিরূপ ভীষণ হইত, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

যাহা হউক পাহাড়ী রাজগণ পলাইয়া গিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না। তাঁহারা আবার বাদশাহের সাহায্য গ্রহণ স্থির করিয়া বহুমূল্য উপঢৌকন সমেত দিল্লীতে দূত প্রেরণ করিলেন। এদিকে শিখেরা আনন্দপুরে ফিরিয়া গেলে তথায় যুদ্ধ জয়ের বাদ্য বাজিতে লাগিল; গুরুর বাণী-সকল গীত হইতে লাগিল; সেই সঙ্গে দরিদ্রদিগকে অর্থদান ও যুদ্ধে আহতদিগকে ঔষধদানও হইতে লাগিল।

গুরু তেগ বাহাদুরের আমল হইতেই বেশ স্পষ্টরূপে দেখা গিয়াছে যে, শিখদিগের স্বজাতি-প্রিয়তা বড় প্রবল এবং সেজন্য স্বজাতি উৎপীড়নকারী মুসলমানের প্রতি উঁহাদের বিদ্বেষভাব দাঁড়াইয়াছিল। এক্ষণে হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় পাহাড়ী রাজগণের গুরুর প্রতি পুনঃ পুনঃ আক্রমণে গুরু দরবারে শিখদিগের মধ্যে একটু হিন্দু-বিদ্বেষ জন্মিতে লাগিল। রাজগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত এবং তাহারই প্রভাব গুরু গোবিন্দও বলিয়াছেন:—

"দুহুঁ পন্থমে কপট বিদ্যা চালানী।
বহোর তিসরা পন্থ কিজে প্রধানী॥"

হিন্দু-মুসলমান এতদুভয় পথেই কপটতা চলিয়াছে; অতএব তৃতীয় খালসা বা শিখ বা নানক পন্থাকেই প্রধান কর।

হিন্দুত্বরক্ষা করিবার জন্য গুরু তেগ বাহাদুর প্রাণ দিয়াছিলেন—তাঁহার

উপযুক্তপুত্র, যিনি বেদপুরাণ রক্ষা করিবার জন্যই অবতার বলিয়া শিখ-দিগের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছেন—তিনি পিতৃপথ অনুসারে চলিতে চলিতে কেন যে এক একবার হিন্দুভাবকে মুসলমানের ভাবের সঙ্গে একভাবে লইয়াছিলেন অর্থাৎ খালশা যেন একটী স্বতন্ত্র ভাব বা ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন এবং কেনই যে নানকের ধর্ম্ম ও গুরুগোবিন্দের ধর্ম্ম যেন এক নয় বলিয়া অনেকের সন্দেহ হয়—তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠা কঠিন। তবে গুরু নানকের ও গুরুগোবিন্দের ধর্ম্মে পরস্পর সাত্ত্বিক ও রাজসিক বিভিন্নতা আছে, সন্দেহ নাই। এবং কুবুদ্ধি পাহাড়ী হিন্দু রাজারা উহার মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়াই উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

এবার যুদ্ধ জয়ের পর গুরু আনন্দপুরের দরবারে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে যশবালিয়া রাজ্যের বীর সিং নামক জনৈক শিখ আসিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই মন্দ হইয়াছে; কিন্তু শিখের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; কিরূপে উহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। তদুত্তরে গুরু বলিয়াছিলেন।

'খানা খাওয়ে ধরমকা করে সারনে মেল।
তবে খালসা জাপে সোজানে ভারত পেল।"

অর্থাৎ, ধর্ম্মপথে থাকিয়া পরিবার পোষণ করিবে এবং সারবান্ লোকের সহিত মিলিবে; তবে খালসার উন্নতি ভারতে প্রকাশ হইবে। ভারতে সেই একই ভাবের উক্তি চিরকাল! "সৎপথে জীবন যাত্রা এবং সৎসঙ্গ" ফলে—"যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"। এতদুপলক্ষে গুরু আরও বলিয়াছিলেন, "খালসাগণ প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিবে, পরে সাধু সঙ্গ করিয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। কলিযুগে ভক্তি এবং ভগবানের নামই সার। আর গুরু সেবাই খালসাগণের উন্নতির কারণ হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য সকল সম্প্রদায় বা ধর্ম্মাবলম্বিগণ গুরু বিনা ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িবে—সামান্য ভৃত্য হইয়া পড়িবে।"

আনন্দপুরপর্ব্ব

——:o:——

সপ্তবিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

খোদ বাদশার আসন টলিল।

ভীমচাঁদ-প্রমুখ পাহাড়ী রাজগণ বহুমূল্য উপঢৌকন সমেত এবার দিল্লীতে লোক যে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার ফলে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে গুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করাই বাদসাহের প্রতিনিধি সভায় স্থির হইল এবং তদনুসারে বহুসংখ্যক (সূর্য্য প্রকাশের মতে একলক্ষ পঁচিশ হাজার) সৈন্য লইয়া সৈদাখাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে গুরুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল।

সৈদাখাঁ প্রথমে থানেশ্বরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। গুরুর বিরুদ্ধে এই অগণ্য সেনা আগমন করিতেছে জানিতে পারিয়া থানেশ্বর-নিবাসী জনৈক শিখ সত্বর আনন্দপুর গমনপূর্ব্বক গুরুকে সংবাদ দিল। তখন আনন্দপুরে পাঁচশত মাত্র বাছাই বাছাই শিখযোদ্ধা উপস্থিত ছিল। এরূপ অবস্থায় যদিও যুদ্ধ করিতে যাওয়া উচিত নয়, তথাপি গুরু শিখ-গণের উৎসাহ-বাক্যে আনন্দপুর হইতে অল্প মাত্র দূর অগ্রসর হইয়া, নগর ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে যত অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহা দ্বারা বিচিত্র কৌশলে ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক স্থির হইয়া রহিলেন।

অতি সত্বরেই সম্রাটসৈন্যের অগ্রবর্ত্তী দল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, যে লক্ষাধিক মোগল সেনা আসিতেছে শুনিয়া শিখ পক্ষে কাহারও জয়ের আশা ছিল না। যাহা হউক, যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

গুরুভক্ত পূর্ব্বোক্ত সৈয়দাবেগ শিখদিগের সহিত বাদসাহের সৈন্য সমাবৃত পাহাড়ী রাজা হরিচন্দকে আক্রমণ করিলেন এবং সেই যুদ্ধে সৈয়দাবেগের হস্তে হরিচন্দ নিহত হইলেন। তখন সম্রাটের সৈনিক দীনাবেগ যুদ্ধ করিয়া সৈয়দাবেগকে নিহত করিলেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে যিনি সম্রাটের প্রধান সেনাপতি, তিনি প্রতিনিধি সভার আদেশ অনুসারে গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাঁহার কিছু মাত্রই ঔৎসুক্য ছিল না। তিনি পূর্ব্ব হইতেই গুরুগোবিন্দের গুণকীর্ত্তন লোকমুখে শুনিয়া তাঁহার দর্শন লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন—কেবল জাতীয় স্নেহ ও সামাজিক লজ্জা প্রভৃতিতে তাঁহাকে সে ভাব গোপন রাখিতে হইয়াছিল। এক্ষণে কতক্ষণে তাঁহার দর্শন লাভ করিবেন, এই চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ সমরাঙ্গনে গুরুর দর্শন পাইয়া সেনাপতি সৈদাখাঁ একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন; এবং ত্বরিত পদে গুরুর নিকট গিয়া তাহার মোহ জাল কাটিয়া দিতে ভক্তি-সহকারে অনুরোধ করিলেন। গুরু বলিলেন, —"স্ত্রী পুত্রের স্নেহ এবং লোকলজ্জা ভয় বজায় রাখা এবং মোক্ষলাভ এক সঙ্গে হয় না।" সৈদাখাঁ গুরুর চরণে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন; গুরু তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া দেওয়ার পর তিনি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া সমরাঙ্গন হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন সম্রাটের দ্বিতীয় সর্দ্দার রমজান খাঁ সৈদাখাঁর স্থান গ্রহণ করিয়া, যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রমজান খাঁ অবিলম্বেই গুরুকে লক্ষ্য করিয়া তীর চালাইলে, গুরু সেই তীর ঢাল দ্বারা সামলাইয়া, সেনাপতি রমজান খাঁকে এক তীরেই বধ করিলেন।

এইরূপে পরপর দুইজন সেনাপতিকে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র বিগতবৈর বা হতজীবন হইতে দেখিয়া মুসলমান সেনাগণ একান্তই

অদৃষ্টবৈগুণ্য স্থির করিয়া ভগ্নোৎসাহ এবং শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়িল এবং তাহাদের অধিকাংশই আপনাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া সরহিন্দের পথে পলায়ন করিল। কিন্তু মোগল সম্রাটের সেনা অগণ্য। উহাদের এক দল খানিক ঘুরিয়া গিয়া অপর এক দিক হইতে আনন্দপুর আক্রমণ করিতে ছিল। উহারা প্রধান সেনাপতিদের ব্যাপার দেখে নাই; সুতরাং সেই দলের মুসলমান সেনা ওরূপ সহজে পলায়ন করিল না। উহারা আনন্দপুরের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া অল্পসংখ্যক রক্ষীদিগকে নিহত করিয়াই সম্পূর্ণ যুদ্ধ জয় হইয়াছে স্থির করিল এবং তাড়াতাড়ি নগর লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন অসম্ভবনীয়রূপে বিপদজাল হইতে যেন সাক্ষাৎ দৈবানুগ্রহে উত্তীর্ণ শিখেরা সমরক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া গিয়া সেই দ্বিতীয় মুসলমান সেনাদলকে অতি ভীষণবেগে আক্রমণ করিয়া সহজেই তাহাদিগকে আনন্দপুর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

এদিকে সম্রাট আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া গুরুগোবিন্দের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কথা শুনিতেছিলেন। তিনি গোলকুণ্ডা হইতে গুরুগোবিন্দের আচরণ বিষয়ে কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই পরওয়ানা পত্রে বাদসাহ লিখিয়াছিলেন, যে—"আমি পীর মুরিদের (শান্তসেবকের বা ফকির সন্ন্যাসীর) পালক। তুমি বড় দুর্ব্বৃত্ত হইয়াছ বলিয়া সংবাদ আসিতেছে। যদি শান্তিতে থাক, তবে কোন ভয় নাই; নতুবা তোমাকে শাসনদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।" তদুত্তরে গুরুগোবিন্দ সম্রাটকে যে নিবেদন পত্র দেন, তাহাই "জঙ্গনামা" বলিয়া খ্যাত।

আনন্দপুর পর্ব্ব।

——:*:——

অষ্টবিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

জঙ্গনামা। তত্ত্বকথা।

গুরুগোবিন্দ সিংহের উপর সম্রাটের প্রথম পরওয়ানার ও "জঙ্গনামা" নামক উত্তর সম্বন্ধে শিখলেখকগণের বর্ণনা মাত্র পাওয়া যায়; অবিকল ভাবে বা "গুরুর বাণী" বলিয়া পাওয়া যায় না। নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তিতে মূল কথাগুলি বেশ সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে:—

"আরঙ্গজেব যো লেখেয়া দক্ষিণো পরওয়ানা।
তু—গুরুগোবিন্দ সিং সর্দারেদা কলাবান যোধা মর্দ্দানা॥
হুকুম মেরা কান্ধার বিচ্ কাবুল খোরাসানা।
সব রাজে দক্ষিণ পাহাড় দে আয়ে করন সলামা॥
সাচে তেরে বিচ্ছায় সচ্ কসম কোরানা।
পরওয়ানা দেখকে মিল সতাব, নহি কর যুদ্ধ সমিয়ানা॥
মএ পকড়ঙ্গা পর নাল করে ফতে দামামা॥
মএ ছুনা লাঁ প্রভাৎয়া কসম কোরানা॥
এ হে ছোড়েঙ্গে ধরমনু ল্যাবন্ ইমানা।
ওঃ কুতুয়া মেরা পঢ়েঙ্গে বিচ দোঁহা জাহানা॥
মৈ ছাড়াঙ্গা তিনানু যে পড়ন কোরানা।
হকিকৎশুন কাশ্মীরদিবর্ত্তীপণ্ডিতানা।
মৈ ভেজা একো বাজনুঙ্গ চিঁড়িয়া তামা॥

অর্থাৎ—আরঙ্গজেব দক্ষিণ হইতে পরওয়ানায় লিখিয়াছিলেন, হে

গুরুগোবিন্দ সিং তুমি বলাও যে, তুমি বলবান্, যোদ্ধা এবং বীর। কান্দাহার কাবুল খোরাসানের মধ্যে আমার হুকুম চলে এবং দক্ষিণের পাহাড়ের সব রাজাগণ পর্য্যন্ত দণ্ডবৎ হইয়াছে। কোরানের দিব্য লইয়া বলিতেছি, এই পরওয়ানা দেখিয়া সত্বরে আসিয়া আমার সহিত মিলিবে; নতুবা যুদ্ধের জন্য কঙ্কন (বিবাহের সূত্র) বাঁধিবে বা প্রস্তুত হইবে। আমি সজোরে তোমায় ধরিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইব। যখন ধরিব, তখন জিজিয়া কর ডবল করিয়া বসাইব। তখন হিন্দুগণ ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমার ধর্ম্ম ধরিবে এবং ইহ পরলোকের মধ্যে কলমা পড়িবে। যে কোরান পড়িবে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব। তাহার সাক্ষী দেখ কাশ্মীরের পণ্ডিতগণের কি দশা করিয়াছি। আমি এমন এক বাজপক্ষী পাঠাইব যে তুমি তাহার নিকট চড়াই পক্ষী হইয়া যাইবে।

উক্ত পত্রের উত্তরে গুরুগোবিন্দ লিখিয়াছিলেন :—

সৎগুরু সচে পাদশা পড়েয়া পরোয়ানা।
লিখে জবাব এহে ভেজেয়া যোবি সব্ নামা॥
লিখিয়া সব হকিকতা যে সমর নিদানা।
তৈ কসম যো কিতি দাগেদিমৈ দিলে দি জানা॥
তুকর হঙ্কার যো বোলেয়া নাপাগ জবানা।
যে সাহেব কিড়ি বলধরে ফিল উসদা পানা॥
মএ পাকৃড়ি ওট অকালদি কোই হোরনা জানা।
যে আয়া হুকুম অকালদা হাত বন্ধা গানা॥
মএ পান্থ করা খালসা বিচ্ দোহা জাহানা।
সাধা গমে আঁকিয়া হাকিম সুলতানা॥
ছুন্দ পবেগা মুলুক বিচ্ কেয়া আপন বেগানা।
আন্দাগে চলেন্গে মারা মোগল পাঠানা॥

দোহাই দেন অশনদি মোহে যায় নিধানা।
মার ডুর কারঙ্গা সরানু যায় সুন্নত এমানা।
চিঁড়িয়া মারণ গজনু কর খাওন তামা॥

অর্থাৎ সৎগুরু সচ্‌বাদসা গুরুগোবিন্দ সিং উক্ত পরওয়ানা পাঠ করিয়া যথাযথ উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, যথা ;—তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা বুঝিয়াছি। তুমি যে শঠতা করিবার মানসে দিব্য গালিয়াছ, তোমার সে মনও জানিতে পারিয়াছি তুমি অহঙ্কার বশতঃ যে সকল বৃথা কথা বলিয়াছ, সে বিষয়ে জানিও, যদি ভগবান্ কীটকে বল দেন, তবে সে হাতীকে খাইতে পারে। আমি একমাত্র অকাল পুরুষের আশ্রয় লইয়াছি আর কিছু জানি না। যখন অকাল পুরুষের হুকুমে আসিয়াছি, তখন যুদ্ধের তাগা হাতে বাঁধিয়াই বসিয়া আছি। (তুমি যেমন ইহ পরকালের মধ্যে কলমা পড়াইতে চাও তেমনই) আমি ইহ পরলোকের জন্য খালসা পন্থ চালাইয়াছি। ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে বৈরীদিগকে দণ্ড দিব। তখন আপন পরের মধ্যে সমস্ত দেশে একটা ধূম পড়িয়া যাইবে। তখন বারুদ না গাদিতেই গোলা চলিয়া মোগল পাঠান মারিবে। তখন উহারা (মোগল পাঠানেরা) অকাল পুরুষের দোহাই দিবে। আমি তোমার সুন্নত কোরানের ধর্ম্ম মারিয়া দূর করিব। তখন চড়াই বাজকে আপন ভক্ষ্য জানিয়া মারিবে।

এই তেজঃপূর্ণ পত্র দিল্লীশ্বরের নিকট প্রেরিত হইল! গুরুগোবিন্দ সমগ্র ভারতের বাদসাহের অনুজ্ঞা বলিয়া একপদও বিচলিত হইলেন না। আনন্দপুরে বসিয়া ধীর গম্ভীর ভাবে শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং অস্ত্র শস্ত্র গুলি শাণিত রাখিতে লাগিলেন।

এরূপ গোলযোগের দিনেও সে সময় গুরুগোবিন্দ আনন্দপুরে শিষ্যবর্গকে কিরূপ উপদেশ দিয়া তাহাদিগের সহিত দিন যাপন করিতে

ছিলেন, তাহার কতকটা আভাষ দেওয়া আবশ্যক। অনেকে বলেন যে, সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে ভগবৎ-কথার আলোচনা করা যায় না। কিন্তু গুরুগোবিন্দের ঝঞ্ঝাট কতই গুরুতর! স্বয়ং দিল্লীশ্বর বাদশা তাহার প্রতি বিমুখ—প্রতিবাসী রাজগণ যাঁহার বিরুদ্ধে নিত্য ষড়যন্ত্র করিতে ব্যাপৃত! একদিন জনৈক শিষ্যের নিবেদন অনুসারে ভগবানের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইল ঃ—

জীব ও ঈশ্বর উভয়েই চৈতন্যস্বরূপ হইলেও ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও জীব অল্পজ্ঞ। জীবের লক্ষণ ছয়টী ;—জন্ম, মরণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হর্ষ, শোক। ঈশ্বরের লক্ষণ ছয়টী ঃ—লক্ষ্মী, জ্ঞান, বৈরাগ্য, উদার, যশ, ও ঐশ্বর্য্য।

ইয়াতে স্বষ্ট উপাবন পারণ। নাশ কারণ ঈশ্বর ত্রয় কারণ॥

অর্থাৎ ইহা হইতে (ঈশ্বরের উক্ত ছয় গুণ হইতে) উৎপত্তি পালন ও নাশ হয়।

অতএব এরূপ ঈশ্বরের সহিত জীবের একত্ব কিরূপে বলা যাইতে পারে।

"জীবপরতন্ত্র দুঃখী গুণ হীন। কিম দোয়েন যি একতা লীন॥"

অর্থাৎ (ঈশ্বর স্বাধীন) জীব পরতন্ত্র, দুঃখী গুণহীন। কিরূপে এহেন জীব ও ঈশ্বরে এক হইতে পারে? তবে,

"দুঃখী পরতন্ত্র অল্পজ্ঞতা জীব। তিনো ত্যজে পাছে যো থিব॥

সর্ব্বজ্ঞতা ষট্‌গুণ সুখী সে ঈশ। তিনোত্যজে পশ্চাৎ রহিস॥

সচ্চিদানন্দ দোনোমে রহে ও। ইয়াতে একতা দোনা লহে ও॥

অর্থাৎ জীব দুঃখী, পরতন্ত্র ও অল্পজ্ঞ। উহার এই তিন গুণ মুছিয়া গেলে, এবং ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা, ষড়্‌গুণ ও সুখ বাদ দিলে, উভয়েই সচ্চিদানন্দ বাকী থাকিবে। তখন উভয়ে একত্র হইতে পারে।

এইরূপ আনন্দের বাক্যালাপেই গুরু দরবারে দিন কাটিত! সঙ্গে

সঙ্গে অপর বিষয়ের কথাও হইত। সওয়া প্রহর রাত্রি থাকিতে শিখদিগের শয্যাত্যাগ করিবার নিয়ম ; যে সেরূপ করিতে না পারে, সে অন্ততঃ ছয় দণ্ড বা চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করিবে। শয্যা ত্যাগ করিয়া শৌচাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে স্নান করিবে। তৎপরে সত্যনাম স্মরণ করিবে। গুরুর বাণীর অর্থ চিন্তা করিবে। এইরূপ করিতে করিতে দিনমান হইলে, সত্যনাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সংসারের কার্য্য করিবে। লোভী যেরূপ অন্যকার্য্যের সঙ্গে ধন চিন্তা করে, সুবোধ শিখ সেইরূপ সর্ব্বদা সত্যনাম চিন্তা করিবে। সাপের মন্ত্রের ন্যায় আওড়াইতে হয়—মন্ত্রার্থ জানিবার প্রয়োজন নাই, এই রূপ বুদ্ধি হিন্দুর বা শিখের কাহারও নহে। "সন্ধ্যার মন্ত্রার্থ জ্ঞানে যত্ন" করিবার বিধি আছে। শিখকে বাণীর অর্থ চিন্তা করিতে হয়।

আনন্দপুরপৰ্ব্ব।

—:০:—

ঊনত্রিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

ভীমচাঁদের অভিমান।

"জঙ্গনামা" অর্থে যুদ্ধ করণের অভিপ্রায় প্রকাশ। সুতরাং জঙ্গনামা প্রেরিত হইলে পর সত্বরেই যুদ্ধ হইবে এটী বুঝিয়াও গুরু ধীরভাবে শিষ্যগণের সহিত ভগবৎকথায় আলোচনাতেই দিন যাপন করিতেছিলেন। তবে সংসার সমরাঙ্গনে তত্ত্ব কথার সহিত যেমন সাধারণতঃ অন্তঃশত্রু দমনের জন্য মানসিক অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করিবার উপদেশ দেওয়া হয়, সংযমাদির অভ্যাস করিতে হয়, গুরুগোবিন্দের তত্ত্ব কথার সঙ্গে অন্তর্বহিঃ উভয় শত্রু দমনের সমান চেষ্টা রহিল। তত্ত্ব কথার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করিবার এবং অস্ত্র চালনা শিক্ষা ও দলবদ্ধ হইয়া কাওয়াজেরও বন্দোবস্ত হইতেছিল।

এদিকে ভীমচাঁদ পুনঃ পুন পরাজিত হইয়াও নিবৃত্ত নহেন। এবার তিনি হাণ্ডুরিয়ার রাজাকে সঙ্গে করিয়া স্বয়ং দিল্লী দরবারে উপস্থিত হইলেন। তথাকার বর্ত্তমান সুবার নিকট গুরুগোবিন্দের অশেষ নিন্দা করিয়া খোদ বাদশাহের সহিত দেখা করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন এবং বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া বাদশাহের সহিত দেখা করিলেন।

বাদসাহ ভীমচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গুরুর সহিত তাঁহার বিবাদের কারণ কি?" তদুত্তরে ভীমচাঁদ বলিলেন, -"গুরু 'আপনাকে' পিতৃহন্তা মনে করেন এবং এক খালসা সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি

আমাকে ঐ খালসা সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইতে অনুরোধ করিতেছেন, আর বলিতেছেন যে, তাঁহার শরণাগত হইলে, তিনি আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়া স্বাধীন রাজা করিয়া দিবেন। এমন কি, এখন দিল্লীর রাজকোষে কর প্রেরণ করিতে আমাকে নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু আমি চিরদিন দিল্লীর বাদসাহের অধীন; কিরূপে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিব? গুরুর রাজদ্রোহী মতলবে যোগ না দেওয়াতেই গুরু আমার উপর অকথ্য অত্যাচার করিতেছেন।” ভীমচাঁদ নিজের রাজভক্তির পরিচয় দিয়া এইরূপে গুরুর বিরুদ্ধে তাঁহার নিজের যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল তাহা গোপন করিলেন। সম্রাট আরঙ্গজেব গুরুর উপর পূর্ব্ব হইতেই বিরূপ ছিলেন; তাহার উপর আবার সম্প্রতি জঙ্গনামা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহার সঙ্গে ভীমচাঁদের এই সকল বাক্যে সম্রাটের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, গুরুকে দমন করা একান্তই আবশ্যক। তদনুসারে দিল্লী লাহোর ও সরহিন্দের সুবার উপর গুরুকে আক্রমণ করিবার জন্য পরওয়ানা জারি করিলেন; এবং ভীমচাঁদকেও উত্তর দিক হইতে গুরুর বিরুদ্ধে সসৈন্যে আসিতে পরামর্শ দিলেন। ভীমচাঁদ বাদসাহ দর্শনে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়াছেন মনে করিয়া, পুনরায় দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় সুবার সহিত দেখা করিয়া বাদসাহের সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল, সে সকল জানাইয়া স্বরাজ্যে আসিলেন।

ইহার অত্যল্প দিন পরেই ক্রূরমতি কিন্তু একান্ত উৎসাহশীল ভীমচাঁদ কুলহরে আসিয়া অন্যান্য পাহাড়ী রাজগণকে ডাকাইয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

আনন্দপুর পর্ব্ব

—০০০•০০০—

ত্রিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

সমর বাধিল।

আনন্দপুরের উত্তরে গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়; পশ্চিমে তরতর বেগে শতদ্রুনদী প্রবাহিত; দক্ষিণে সমতল বিস্তীর্ণ প্রান্তর; পূর্ব্বদিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি।—ঐরূপ ভূমিকে পঞ্জাবীরা "ওট" বা "দমদমা" বলিয়া থাকেন। আনন্দপুরের পূর্ব্বদিকের এই উচ্চভূমির একভাগের নাম "ওট" এবং অপরভাগের নাম "দমদমা" (পারসিক শব্দ উচ্চভূমি)।

ভীমচাঁদ স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলে, অতি অল্পদিনের মধ্যেই পাহাড়ী সেনা সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন। ওদিকে সম্রাটের আদেশ মতে দলে দলে বাদসাহী সৈন্য আনন্দপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই পাহাড়ী ও মোগল সেনায় আনন্দপুর সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

ইংরাজী ইতিহাসবেত্তৃগণ এই যুদ্ধের বর্ণনায় আনন্দপুরকে উহার পূর্ব্বনাম ধরিয়া "মোখওয়াল" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

দিল্লী ও সরহিন্দের সৈন্য এক যোগে ৩৫০ দল পরিমিত। এই সৈন্যদলের অধিনায়ক উলীদ খাঁ রোপরের পথে রহিলেন। লাহোরের সুবা জবরদস্ত খাঁ আরও ৪৫০ দল সৈন্য লইয়া শতদ্রুর পশ্চিম পথে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রোপর আনন্দপুরের পূর্ব্ব দক্ষিণে অবস্থিত। সুতরাং আনন্দপুরের পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বাদসাহী সেনা আসিয়া দাঁড়াইল।

আর উত্তর হইতে ভীমচাঁদ সসৈন্যে আসিয়াছিলেন। পাহাড়ী সেনার মধ্যে (১) রাণে (২) রাপ ((৩) গুজর (৪) রাঙ্গড় (৫) প্রভৃতি এবং বাদসাই সেনার মধ্যে (১) মোগল (২) সেখ (৩) সৈদা (৪) পাঠান (৫) কাবুলী (৬) গান্ধারী সেনা ছিল। এই সকল সেনা এক-যোগে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আনন্দপুরের গড়বন্দী সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এখনকার কালে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইউরোপীয় সামরিক ইঞ্জিনিয়ারগণ স্থির করিয়াছেন যে, কোন সহরের রক্ষার জন্য সেই সহরটী মাত্র গড়বন্দী করা পর্য্যাপ্ত নহে। নগরের প্রাচীর হইতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া ছোট ছোট দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিতে হয় এবং তদ্দ্বারা নগরের সীমার নিকটে শত্রু আসিতে পারে না। পারিস নগরের চতুর্দ্দিকে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মিত আছে; সুপ্রসিদ্ধ মেটজ এবং ভার্ডন দুর্গেও ঐ বন্দোবস্ত। সিভাষ্টপোলের বিষম যুদ্ধে বিখ্যাত রুসীয় ইঞ্জিনিয়ার টডলিবেন ঐ প্রণালী অনুসারে দুর্গ প্রাকার হইতে অগ্রসর হইয়া শত্রুপক্ষীয়দিগকে বাধা দিয়াছিলেন এবং বহুকাল পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নৈসর্গিক রণ-পাণ্ডিত্যসম্পন্ন গুরুও আনন্দপুরের গড়বন্দী সেকালেই এই উৎকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে করিয়াছিলেন! তিনি আনন্দপুরের দক্ষিণ কেশগড় এবং পশ্চিম দিকে লোহগড় নামক দুইটী সুদৃঢ় দুর্গ আনন্দপুরের গড়বন্দী হইতে অনেকটা আগু বাড়াইয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ব দিকের উচ্চ ভূমিতেও সৈন্য স্থাপনের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। সশস্ত্র শিখেরা আনন্দপুরের দুর্গের মুর্চ্চায় * অবস্থান করিতে-

* দুর্গের দেওয়ালের মধ্যে মধ্যে এবং কোণে কোণে যে সকল প্রকাণ্ড ঢিবি থাকে এবং যে স্থানে গুপ্তভাবে থাকিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে গোলা চালান যায়, সেই স্থানকে মুর্চ্চা কহে।

লাগিল। গুরু নিজ পুত্র অজিৎসিংহকে ৫০০ সৈন্য লইয়া কেশগড় রক্ষা করিতে পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গের সম্মুখে সরহিন্দের বাদসাহী সেনা দল ছাউনি করিয়াছিল। যে দিকে জবরদস্ত খাঁর ছাউনি সেই পশ্চিম দিকে লোহগড়। গুরুর আদেশ ক্রমে নাহর সিং ও শের সিং নামক শিখ সেনাপতিদ্বয় লোহগড় দুর্গ রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আনন্দপুরের পূর্ব্বস্থিত ওট অংশ রক্ষা করিবার জন্য আলমসিং এবং দমদমা অংশের জন্য একশত সৈন্য লইয়া উদয় সিং নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহকুম সিং ও সাহেব সিং নামক শিখদ্বয় চারিশত সৈন্য লইয়া সর্ব্বত্র তত্ত্বাবধারণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং উত্তরে দয়া সিং পাহাড়ী সেনা দলের বিরুদ্ধে অবস্থিত হইয়াছিলেন।

শত্রুপক্ষ চতুর্দ্দিক হইতে হল্লা করিয়া আক্রমণ করিলে, গুরুর আদেশ-ক্রমে মুর্চ্চা হইতে আবশ্যক মত তোপ চালান হইতে লাগিল। শত্রু-পক্ষের অনেকে মারা পড়িল। অথচ শত্রুপক্ষ হইতে যখন তোপ দাগা হইতে লাগিল, তখন দুর্গমধ্যে সুরক্ষিত গুরুর সেনার প্রায় কিছুই ক্ষতি হইল না। প্রায় দুইপ্রহরকাল এইরূপ তোপ যুদ্ধে কাটিয়া গেল। বহু সৈন্য বৃথা নিহত হইতেছে দেখিয়া উজিদ খাঁ ও জবরদস্ত খাঁ পরামর্শ করিয়া প্রথমদিনের যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন। আনন্দপুর যে অরক্ষিত স্থান নহে, গুরুর পক্ষে যে উৎকৃষ্ট তোপ ও গোলন্দাজী সৈন্য সংগৃহীত ও সুশিক্ষিত হইয়াছিল, এবং গুরুর আশীর্ব্বাদে উৎসাহিত শিখেরা যে প্রাণপণেই যুদ্ধ করিবে, বাদশাহী সেনাপতিগণ তাহার বিশেষ পরিচয় এই প্রথমদিনের সংঘর্ষেই প্রাপ্ত হইলেন।

আনন্দপুরপর্ব্ব।

—:•:—

একত্রিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

আনন্দপুরে দ্বিতীয়দিনের যুদ্ধ ও নগরবেষ্টন।

প্রথম দিনের যুদ্ধশেষে বাদশাহী সেনার শিবিরে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাতে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে গুরুপক্ষ দুর্গমধ্যে সুরক্ষিত থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছে; সেইজন্য এরূপ স্থলে জয়লাভ করিবার সুবিধা খুব কম এবং এরূপ ক্ষেত্রে রণপাণ্ডিত্য দেখাইবারও উপায় নাই।

শিখেরা বলেন, গুরু নৈসর্গিক শক্তিবলে ঐ সকল কথা জানিতে পারিয়া পরদিন বিপক্ষ পক্ষের এই আক্ষেপোক্তি মিটাইবার জন্য স্বয়ং দুই সহস্র সৈন্য লইয়া রণক্ষেত্রে, উপস্থিত হইলেন। শত্রুপক্ষকে একটু হটাইতে পারিলেই সকল যুদ্ধবিশারদ বীরগণই বিপক্ষ পক্ষকে অনুসরণ করতঃ আক্রমণ করিয়া থাকেন; অবরুদ্ধ থাকিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে সৈন্যেরা ক্রমশঃ অসাবধান এবং নিরুদ্যম হইয়া পড়ে; এই জন্য ইউরোপীয় যুদ্ধশাস্ত্রে দুর্গরক্ষীদিগকে লইয়া অবরোধকারীদের প্রতি মধ্যে মধ্যে হঠাৎ আক্রমণ (Sortie) করিবার বিশেষ বিধিই আছে। ইদানীন্তন কালের সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টি বলিতেন,—"আত্মরক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বিপক্ষকে তাড়াইয়া গিয়া আক্রমণ।" জবরদস্ত খাঁ ও উজিদ খাঁ ভীমচাঁদের দ্বারা গুরুর রণক্ষেত্রে আগমন জানিতে পারিলেন এবং তাঁহার মূর্ত্তিও চিনিলেন। তখন গুরুর উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। কিন্তু ঐ সময়ে বায়ুর

গতি নিরুদ্ধ থাকায় বাদশাহী তোপের ধূম তাঁহাদেরই চক্ষু একবারে অন্ধ করিয়া তুলিল। এই সুযোগে গুরুর অধীন অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন শিখগণ অনেক যবনসৈন্য হত ও আহত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এরূপভাবে এক প্রহর কাল যুদ্ধে মোগল সৈন্য একটু হটিয়া গেল। সেদিনের মত যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া গুরুও দুর্গমধ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

সেই রাত্রিতেও মোগল শিবিরে জবরদস্ত খাঁ উজিদ খাঁ এবং ভীমচাঁদ মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বাদশাহী সেনাপতি জবরদস্ত খাঁ এবং উজিদ খাঁ গুরু হইতে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও প্রকৃত বীর ছিলেন। তাঁহারা সরল মনে গুরুর রণপাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিলেন এবং গুরু যে নৈসর্গিক বলে বলীয়ান্ একথা স্বীকার করিলেন। কিন্তু ঐ কথাগুলি স্বজাতিদ্রোহী ঈর্ষাপরায়ণ ভীমচাঁদের মনঃপূত হইল না। কিরূপে গুরু হতশ্রী হইবেন, কেবল ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা। অবশেষে তিনি পরামর্শ দিলেন, নগর বেষ্টন করিয়া রসদ বন্ধ করা হউক; হাতে মারিতে পারিতেছি না, সুতরাং ভাতে মারিতে হইবে।

যাহা হউক নগর বেষ্টন করিয়া রসদ বন্ধ করাই স্থির হইল। পর দিন নগরের আড়াই ক্রোশ দূরে প্রত্যেক পথে ও স্থানে স্থানে অবরোধকারী মোগল সৈন্য সমাবেশ করা হইল।

গুরু এই ঘটনা জানিতে পারিয়া নিজ সৈন্যগণকে দুর্গের মুর্চ্চায় সাবধান হইয়া থাকিতে বলিলেন। এই ভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ভীমচাঁদ নিজে উত্তর দিক রক্ষা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে সুবাদ্বয়ের সঙ্গে দেখা করিতেন, তাঁহাদের তোষামোদ করিতেন এবং যাহাতে গুরুর বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের মনটা নরম হইয়া না পড়ে, সে জন্য নানা কথা বলিতেন।

এই সময় শিখেরা একটি অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন,—

তাঁহারা বলেন,--যদিও যবনসেনা ও সেনানায়কগণ দুর্গ হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থান করিতে ছিলেন; তথাপি গুরু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেন। একদিন সুবাদ্বয় একটি আম্রবৃক্ষতলে বসিয়া পাশা খেলিতে ছিলেন। গুরু দুর্গ হইতে তাহা জানিতে পারিয়া এক তীর নিক্ষেপ করেন। তীরটী জবরদস্ত খাঁর চৌপাইয়ের পায়ায় লাগে। উহা যে গুরুগোবিন্দেরই তীর, ইহা সকলেই জানিতে পারিল। কারণ গুরুগোবিন্দের তীরে যে মরিবে, তাহার সৎকার খরচা স্বরূপ স্বর্ণ মুদ্রা গুরুর সকল তীরের সঙ্গে আঁটা থাকিত! যাহা হউক, এই ঘটনায় সকলেই চমৎকৃত হইলেন। গুরু (কেরামৎ) যাদুবিদ্যা জানেন বলিয়া সুবাদ্বয় উল্লেখ করিতে লাগিলেন। গুরু যেন এ সকল জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ আবার একটি তীর নিক্ষেপ করিলেন। উহাতে নবম গুরু যাদুবিদ্যার নিন্দাবাদ করিয়া যে গুরুমুখী শ্লোক (কেরামৎ কাহার ইত্যাদি) রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া এবং নিজেদের কথাবার্ত্তা গুরু কিরূপে বুঝিলেন, ইহা ভাবিয়া গুরুর প্রতি মুসলমান সেনাপতি-দিগের একটা অমানুষ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। গুরুর অমানুষিক ক্ষমতা থাকিলেও যাঁহারা গুরুর সকল কার্য্যই মানুষ ভাবেই হইয়াছিল ভাবিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন যে, তাঁহার তীর অন্য সকল লোকের অপেক্ষা দূরে যাইত; পূর্ণ আড়াই ক্রোশের ঘটনা নাই হইল; যেখানে তীর পৌঁছিবে কেহ মনে করে নাই, সেখানে পৌছিয়াছিল মাত্র।

এইরূপে দিন যাপন হইতেছে--শিখদিগের ঐকান্তিক যত্নে ও অনেক সাহসিক কার্য্যে কখন কখন কিছু কিছু রসদও নগরমধ্যে রাত্রি কালে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু রসদের আমদানি খরচের অনুরূপ না হওয়ায় নগরমধ্যে ক্রমেই রসদ কমিয়া আসিতে লাগিল।

এক দিন অন্ধকার রজনীতে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইয়াছিল। লৌহগড় দুর্গে শেরসিং ও নহরসিং নামক দুই জন শিখ সর্দ্দার ৫০০ সৈন্য লইয়া মুর্চ্চা রক্ষা করিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে যে সকল অবরোধকারী মুসলমান সৈন্য ছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। এমন সময় এক দিন অন্ধকার রাত্রিতে শের সিং ও নহর সিং পরামর্শ করিয়া মোগল শিবিরে গুপ্তভাবে গমন করিয়া নিদ্রিত কয়েকটী সেনাকে হত ও আহত করিলে, যেই মোগল শিবিরে গোলমাল হইল, তাঁহারা অমনি নিঃশব্দে পলাইয়া আসিলেন। পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে অবিলম্বে মোগলদিগের দিকে দুর্গ হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। মুসলমান সৈনিকেরা হঠাৎ জাগরিত হইয়া মনে করিল, বুঝি বহু সংখ্যক শিখ সৈন্য তোপ সহ বাহিরে আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করিয়াছে। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে এবং বিষম গোলমালে আত্মপর বুঝিতে না পারিয়া মোগল সৈনিকেরা ত্রাসে ও ক্রোধে পরস্পর মারামারি করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। পর দিন প্রাতে মোগল সৈনিকেরা মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একটীও শিখসৈন্য দেখিতে না পাইয়া যুগপৎ দুঃখ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল।

এরূপ গুপ্তভাবে গিয়া শত্রু নিধন করায় পাছে গুরু কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করেন, সেজন্য শের সিং ও নহর সিং কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাতে গুরু সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না।

আনন্দপুর পর্ব্ব

—•—

দ্বাত্রিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

শত্রুবেষ্টিত আনন্দপুর।

ক্রমে দুর্গমধ্যে রসদের হ্রাস হইয়া আসিলে গোপনে রসদ আনিবার বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। একদিন নিশীথ কালে ভোজ্য দ্রব্যাদি লইয়া একদল শিখ বনপথ দিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় উহারা বিপক্ষ পক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। শিখেরা তখন দ্রব্যাদি ভূমিতে রক্ষা করিয়া বিপক্ষের সম্মুখীন হইলে উভয় দলে যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে শিখেরা পরাজিত ও প্রায় সকলেই নিহত হয়।

কেবল একজন মাত্র শিখ জীবিত ছিল। কিন্তু তাহাকে বিপক্ষেরা ধরিয়া লইয়া গিয়া কলমা পাঠ সুন্নৎক্রিয়া প্রভৃতি সমাপন পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এই কৃত মুসলমান শিখ কয়েকদিন পরে আনন্দপুরে গুরুদরবারে আসিয়া সকল বিবরণ প্রকাশ করে এবং তাহাকে মুসলমানধর্ম্মে বলপূর্ব্বক দীক্ষিত করায় বিশেষরূপে অনুতাপ করিতে থাকে।

তখন গুরু প্রসন্ন হইয়া তাহাকে কয়েকটী প্রশ্ন করেন; তন্মধ্যে প্রধান কথা এই যে, ঐ ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন মুসলমানী-গমন করিয়াছে কি না? সে ব্যক্তি উহাতে রত হয় নাই জানিয়া উহাকে পুনরায় শিখ সম্প্রদায় ভুক্ত করা হইল এবং সরবত বা তরবারীসিক্ত অমৃত

পানাদি দ্বারা, খালসাপন্থে দীক্ষিত করিবার যে নিয়ম আছে পুনরায় তাহা করা হইল।

সেই অবধি নিয়ম হইল যে যদি কোন শিখ বিপন্ন অবস্থায় মুসলমান হয় এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মুসলমানী গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় শিখসম্প্রদায়ভুক্ত করা যাইতে পারে।

বাদশাহী ও পাহাড়ী দলের সেনাপতিরা এই সময়ে একদিন মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, অনেকদিন হইতে তাঁহারা নগরটি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, ইহাতে সকলেরই কষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু বুঝা যাইতেছে যে নগর মধ্যে আর রসদ নাই ; সুতরাং গুরু আর অধিকদিন এভাবে থাকিতে পারিবেন না। ভীমচাঁদ বলিলেন যে, দুর্গমধ্যে যখন রসদের কষ্ট হইয়াছে,এই সঙ্গে জলকষ্ট সংঘটন করিয়া দিতে পারিলে গুরু অবশ্যই বশ্যতা স্বীকার করিবেন। আনন্দপুরের মধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত ছিল। ভীমচাঁদ এই নদীর উৎপত্তিস্থল বন্ধ করিয়া দেওয়ার— অন্ততঃ নদীর স্রোত আনন্দপুর হইতে ফিরাইয়া দেওয়ার পরামর্শ দিলে, তদনুসারে কার্য্য করা হইল। ভীমচাঁদই স্বয়ং সদলে পাহাড়ের উপর গিয়া সেই নদীর উৎপত্তিস্থলে কতকগুলি প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিয়া আনন্দপুরাভিমুখে উহার গতি নিবারণ করিলেন।

ঐ সময়ে গুরু চেষ্টা করিয়া শতদ্রুনদীর একটি শাখা বাহির করিয়া আনন্দপুরের নিকট পর্য্যন্ত আনেন। সূর্য্যপ্রকাশে শতদ্রু আনয়ন ব্যাপারটী অদ্ভুতরসে লিখিত হইয়াছে। গুরু জনৈক শিখকে শতদ্রুর নিকটে গমন করিয়া নদীকে সত্বরে আনন্দপুর অভিমুখে আসিতে অনুরোধ করিয়া এবং কোন মতে পশ্চাৎদিকে লক্ষ্য না করিয়া একটি যষ্টি দ্বারা দাগ কাটিয়া আসিতে বলেন। শিখ তদনুসারে শতদ্রুতীরে গমনপূর্ব্বক তাহাকে আনন্দপুরাভিমুখে আসিতে অনুরোধ করিয়া

একটি যষ্টি দ্বারা পথে চিহ্ন দিতে দিতে আনন্দপুর অভিমুখে গমন করিতে থাকেন। আনন্দপুরের নিকটে পেঁৗছিয়াই শতদ্রু কিরূপ ভাবে আসিতেছেন দেখিবার জন্য শিখের অদম্য কৌতূহল জন্মিল এবং সে ফিরিয়া দেখিল যে তাহার যষ্টির দাগ অনুসারে শতদ্রুস্রোত প্রবলবেগে বহিয়া আসিতেছে। কিন্তু যেস্থলে আসিয়া শিখ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল শতদ্রু তথায় আসিয়া আর অগ্রসর হইলেন না। শতদ্রুর যে অংশ এই-রূপে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে তাহার নাম "হেমাইতী নালা"।

যে সময়ে শত্রুবেষ্টিত অবস্থায় আনন্দপুরে এইরূপ অন্নকষ্ট জলকষ্ট প্রভৃতি চলিতেছে, সেই সময় উজ্জয়িনী অঞ্চল হইতে জনৈক ধনশালী বণিকজাতীয় শিখ আসিয়া সাহায্যকরণার্থে একখণ্ড বহুমূল্য প্রস্তর (পরশ পাথর) গুরুকে দান করেন। গুরু উহা শতদ্রু জলে নিক্ষেপ করেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, তাঁহার কিছুরই অপ্রতুল নাই।

এইরূপে সাতমাস কাটিয়া গেল। নগর অবরোধ ব্যাপারে ক্রমে শত্রুপক্ষ ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। ওদিকে বাদশাহ আরঙ্গজেব এইরূপে বহুদিন ধরিয়া নগরবেষ্টন করিয়া বৃথা অর্থ ব্যয় হইতেছে বলিয়া অবরোধ ত্যাগের অনুমতিসূচক পরওয়ানা জারী করিলেন। স্বয়ং ভীমচাঁদও ক্লান্ত হইয়া আসিলেন; কিন্তু তাঁহার মনের ক্ষোভ মিটিল না। তিনি আনন্দপুর ত্যাগের জন্য লোক পরম্পরায় গুরুর নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠান। এই প্রস্তাবে শিখদিগের মধ্যে অনেকে রাজী হইলেন; কারণ শিখগণও বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু স্বয়ং গুরু-গোবিন্দ ইহাতে রাজী হইলেন না। সামান্য শিখেরা এ বিষয়ে অনুরোধ করিয়া কিছুই করিতে পারিল না দেখিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া গুরুর পিতৃষ্বস্বপুত্র শ্যাম সিং গোপাল রায় প্রভৃতি পদস্থ শিখগণকে এমন কি

স্বয়ং গুরুমাতা গুজরীকে পর্য্যন্ত স্থান ত্যাগের প্রস্তাবে রাজী করিলেন। ঐ বিষয়ে উহাঁরা গুরুকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন গুরুগোবিন্দ বলিলেন—"শত্রুপক্ষ যে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছে উহা সরল কথা নয়; ভীমচাঁদ কতবার কত প্রকার শঠতা করিয়াছে তাহা কি মনে নাই? এবারও সেইরূপ শঠতা জানিবে। এখন আমরা দুর্গ ত্যাগ করিলেই শত্রুপক্ষ আমাদিগকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিবে। যাহা হউক গোবিন্দ মাতার নিকট বলেন যে, শত্রুর প্রস্তাব যে কপটতাপূর্ণ, তাহা তিনি সত্বরেই প্রমাণ করিয়া দিবেন। কিন্তু তখন দুর্গমধ্যে অন্নকষ্ট এত হইয়াছে যে ধৈর্য্য আর থাকে না। এই অবস্থা দেখিয়া গুরু স্থান ত্যাগের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ভীমচাঁদকে জানাইলেন যে, যদি সত্যসত্য স্থান ত্যাগ করানই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁহার দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য ৫০০ বলদ দিয়া যেন সাহায্য করা হয়। তদনুসারে শত্রুপক্ষ হইতে ৫০০ বলদ পাঠান হইল। কিন্তু গুরু তাহাতে নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বোঝাই না দিয়া, চর্ম্ম আবর্জ্জনা প্রভৃতি দিয়া এরূপভাবে বোঝাই করিলেন যেন বাহির হইতে বুঝিতে না পারা যায় যে, ভিতরে কি আছে। বলদগুলি সেই সকল বোঝাই লইয়া আনন্দপুর হইতে কিছু দূর যাইতে না যাইতেই শত্রুপক্ষ আসিয়া প্রচণ্ডবেগে তাহাদের উপর পড়িল এবং শেষে সেই সকল বলদ লুঠ করিয়া লইয়া গেল।

আনন্দপুর পর্ব্ব।

ত্রয়স্ত্রিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

আনন্দপুর ত্যাগ সর্ষায় যুদ্ধ।

বলদের ভার লুণ্ঠন হইতে দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন যে, শত্রুপক্ষেরা প্রকৃতই শঠতাপূর্ব্বক গুরুর দুর্গ পরিত্যাগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তখন শিখেরা দুর্গ মধ্যেই কোন প্রকারে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে মনস্থ করিল; কিন্তু জঠরানলের জ্বালা বড় জ্বালা—এ জ্বালায় সময়ে সময়ে পুত্র-শোক পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দেয়! সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই শিখেরা আবার বাহিরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিল। ওদিকে বস্তার মধ্যে অব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি দেখিয়া পাহাড়ীরা বুঝিল যে গুরু তাহাদের শঠতা পূর্ব্বেই বুঝিয়া ছিলেন। উহারা কয়েক দিন লজ্জিত ভাবে কাটাইল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আলিঙ্গনের উদ্দেশ্য পূর্ব্ব হইতে জানিয়া, লৌহময় ভীম তাঁহার সম্মুখে ধরাইয়া ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র দৃঢ় আলিঙ্গনে সেই লৌহনির্ম্মিত ভীমমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ছিলেন। ভীমের প্রতি স্নেহ ভরে আলিঙ্গন নয়, হিংসা পূর্ব্বক তাহার প্রাণ সংহারই ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল। এস্থলে গুরু শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই ঠিক বুঝিয়াছিলেন। এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় অকৃতকার্য্য পাহাড়ী ও বাদশাহী পক্ষীয়েরাও অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন।

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বেহায়াদিগের লজ্জার হ্রাস হইয়া গেল। তাহারা আবার দূত পাঠাইয়া জানাইল, যে সকল সৈন্য বা লোক উচ্ছৃঙ্খল লুণ্ঠনকারীদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। উহারা পুনরায় গুরুর দুর্গত্যাগের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, বহির্গমনে উৎসুক শিখগণ আবার চঞ্চল হইল।

এবার পাহাড়ী দূত লোক-পরম্পরায় জানিলেন যে, মাতা গুজরী দুর্গ পরিত্যাগে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন। দূত ক্রমে ক্রমে গুজরীর নিকটে আপনাদিগের সাধুতা জানাইলেন। মাতা গুজরী তখন বলিলেন যে, যদি মুসলমানগণ কোরান স্পর্শ করিয়া এবং হিন্দুরা দেবদেবীর সম্মুখে শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, দুর্গ হইতে বাহির করিয়া দেওয়াই ভীমচাঁদ পক্ষীয়গণের উদ্দেশ্য, তদ্ভিন্ন তাহারা অন্য কোন অনিষ্ট করিবেন না—তাহা হইলে দুর্গ হইতে বাহির হওয়ার ব্যবস্থা হইবে। সরল-হৃদয়া রমণীর এই প্রস্তাবে শঠ ভীমচাঁদ-পক্ষীয়েরা তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন এবং তদনুসারে কার্য্যও করাইলেন। মুসলমান মোল্লা ও হিন্দু ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ প্রভুগণের তরফ হইতে শপথ করিলেন। তখন শিখগণ মাতা গুজরীসহ দুর্গত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। গুরু বলিলেন,—তোমরা এতদিন শিখ গুরুর আশ্রয়ে ছিলে, এক্ষণে পেটের জ্বালায় শঠদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে চলিতেছ, ইহাতে শিখগুরুর দায়িত্ব কাটিয়া গেল। অতএব সকলে তদনুরূপ একখানি "বেদাওয়া" লিখিয়া দিয়া যথা ইচ্ছা গমন কর। তখন পেটের জ্বালায় প্রায় সকলেই "বে-দাওয়া" লিখিয়া বাহিরে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কেবল মাত্র চল্লিশজন শিখ গুরুকে ত্যাগ করিল না।

এইবার বড় ভীষণ সময় আসিল। সেই দিন প্রথম প্রহর রাত্রিতেই মাতা গুজরী গোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয়কে (ফতেসিং ও জুরুরসিং)

এবং গুরুপত্নীদ্বয়কে (মাতা সাহেবদেয়ী ও মাতা সুন্দরীজীকে) সঙ্গে লইয়া এবং উক্ত ৪০ জন শিখ ব্যতীত অবশিষ্ট শিখগণে পরিবৃত হইয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বমুখে চলিলেন।

তৎপরে গুরুর মনও উদাস হইল। তিনিও দুর্গ মধ্যে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তিনি বাকী চল্লিশজন শিখ এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়কে (অজিৎ সিং ও জোরাবর সিংকে) সঙ্গে লইয়া সশস্ত্রে দুর্গ ত্যাগ করিলেন। যাহা হউক, গুরু জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় ও উদয় সিং, দরদ সিং, মহকুম সিং, শান্ত সিং, সঙ্গত সিং প্রভৃতি সশস্ত্র শিখবীরদিগকে লইয়া দুর্গ হইতে অলক্ষ্যে বাহির হইয়া প্রথমে পিতৃসমাধিস্থল বা গুরু তেগ বাহাদুরের স্থানে গিয়া তথায় গুরুবক্স নামক জনৈক উদাসী সাধু শিখকে তথাকার সেবায়ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনার অল্পক্ষণ পরে শত্রুপক্ষেরা জানিতে পারিল যে গুরু দুর্গ ত্যাগ করিয়াছেন। তখন তাহারা পূর্ব্ব শপথ সমস্ত ভুলিয়া গুরুর দলকে অনুসরণ করিল এবং আনন্দপুর হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে নির্ম্মোহ নামক স্থানে আসিয়া গুরুর দলকে ধরিল। তখন স্বয়ং গুরু অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। অজিৎ সিং পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করিতে ছিলেন। ইনিই শত্রুদিগের অনুসরণ প্রথমে জানিতে পারিয়া, শত্রুগণের প্রতিরোধে প্রস্তুত হয়েন এবং যুদ্ধারম্ভ করেন। তখন গুরু প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সাহেব ঢিবি নামক অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে পৌঁছিয়া জানিতে পারেন যে, অজিৎ সিং শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। তখন কয়েক জন লোক সমভিব্যাহারে উদয় সিংকে অজিৎ সিংহের সাহায্যার্থে পাঠাইয়া দেন। উদয় সিং গিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গুরুর আজ্ঞা অনুসারে অজিৎ সিংকে গুরুর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। গুরু উদয় সিংহের সাহায্যে কয়েক জন লোক

সঙ্গে জীবন সিংকে পাঠাইলেন। এইরূপে শত্রুপক্ষের প্রতিরোধ করিতে করিতে নিশাশেষে সকলে সর্ষায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তথায় উদয় সিং ও জীবন সিং উভয়েই শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইলেন।

এই সময়ের মধ্যে গুরুর দল মাতা গুজরীর দলের সঙ্গে মিলিত হইয়া গিয়াছিল। শত্রুপক্ষ প্রবলবেগে আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া মাতা গুজরীর গাড়ী গ্রামের দিকে লইয়া পলায়ন করিবার জন্য গুরু অনুমতি দেন। উহাতেই গুরুর কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় ছিলেন। মোগল সৈন্য মধ্যেও দুই এক জন ভক্ত প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতেন। সেইরূপ একজন সৈন্যের সাহায্যে গুরুপত্নীদ্বয়ের গাড়ী রোপরে যাইবার ব্যবস্থা হইল।

এক্ষণে আনন্দপুরের দুর্গস্থিত প্রায় সকল শিখ একত্র হওয়ায় গুরুর অধীনতায় ৫০০ শিখ সৈন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সর্ষানদী তীরের যুদ্ধে পাঁচজন শিখ আহত হয়। ঐসময়ে গুরু স্বয়ং কিছুক্ষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া পঁইত্রিশজন শিখ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন শত্রুপক্ষ মনে করিল, গুরু যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

আনন্দপুর পর্ব্ব।

——:o:——

চতুস্ত্রিংশ পর্ব্বাধ্যায়।

চামকোরে বিখ্যাত যুদ্ধ।

শিখদিগের মতে চামকোরে যুদ্ধের ন্যায় যুদ্ধ আর হয় নাই। গুরু চল্লিশজন মাত্র শিষ্য লইয়া তথায় যে অগণ্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, একথা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনায় মনে হয় যেন চামকোরে একটা বড়ই অভেদ্য দুর্গ ছিল। গুরু তাহারই বলে অত অল্পসংখ্যক লোক লইয়া তত অধিক সংখ্যক লোকের সম্মুখীন হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু চামকোরে "সেরূপ" কিছুই ছিল না।

গুরুর স্নেহময়ী মাতা তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়কে লইয়া এক পথে এবং প্রিয়তমা পত্নীদ্বয় শত্রুপুরী দিল্লীর পথে গিয়া পড়িয়াছেন—শিষ্যগণ কেহ বা হত, কেহ বা শত্রুহস্তে নিপতিত, কেহ বা পলায়িত—এখন আর আনন্দপুরের আনন্দ নাই—এখন শ্মশানের ঔদাস্য ও বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের সময় সেই পথাবলম্বী যে চল্লিশজন শিষ্য সঙ্গে ছিলেন—তাঁহাদের কোথায় বাড়ী কোথায় আত্মীয় স্বজন! তাঁহারা সকলেই সে সকল ভুলিয়া গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই জানিতেন যে, অতুলপ্রতাপ আরঙ্গজেব যখন তাঁহাদের বিরোধী, তখন প্রাণের আশা নাই; তাঁহারাও বৈরাগ্য আশ্রিত। যাঁহাদের মায়া

মোহ কাটিয়া গিয়াছে; মৃত্যু তাঁহাদের পক্ষে অতি তুচ্ছ পদার্থ। সঙ্গে গুরু—গুরুর জন্য প্রাণ উৎসর্গীকৃত। এহেন শিষ্যগণ যদি "মুক্ত পুরুষ" বলিয়া গণ্য না হইবেন, তবে আর সংসারে অবস্থিত কাহাকে মুক্ত পুরুষ বলিব? শিখ ইতিহাসে শিখ লেখকেরা ইঁহাদিগকে মুক্ত পুরুষ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

এইরূপ চল্লিশ জন মাত্র শিষ্য সমভিব্যাহারে সর্ষা যুদ্ধের পর গুরু কোথায় যাইবেন, স্থির নাই। ক্রমে চামকোর গ্রামের নিকট একটি আম্র বাগিচায় আসিয়া পৌছিলেন। শত্রুপক্ষ যে তাঁহাকে প্রথমে সর্ষায় নিহত মনে করিয়া তাঁহার দেহ খুজিয়া ছিল এবং তাহা না পাইয়া পরে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে এবং অবিলম্বেই আসিয়া পড়িবে, এ সকল সংবাদ গুরু লোকমুখে জানিয়াছিলেন; সুতরাং সত্বরেই একটি আশ্রয় লওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। চামকোর একটি অতি সামান্য গ্রাম; তখন উহাতে কয়েকখানি পর্ণকুটীর মাত্র ছিল; কেবল গ্রামের সামান্য জমিদারের বাড়াটী মাটীর প্রাচীরে বেষ্টিত—উহার ভিতরে সরিকানী বিভক্ত কয়েক খানি গৃহ ছিল। নিকটে কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার উপযোগী স্থান অনুসন্ধান করিতে গিয়া রণকুশল গুরুর নয়ন উহাতেই আকৃষ্ট হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে এই বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করাই যুক্তি সঙ্গত মনে করিয়া, সেই বাড়ীর একজন কর্ত্তাকে ডাকাইয়া গুরু আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অন্তঃপুর মধ্যে চল্লিশজন শিষ্য লইয়া রাজদ্রোহী গুরুগোবিন্দকে আশ্রয় দানে চামকোর জমিদার রাজী হইলেন না। তখন গুরু ঐ বাটীর অপর একজন কর্ত্তাকে ডাকাইলেন এবং তাহারও নিকট নিজ উদ্দেশ্য জানাইয়া ৫০টী মুদ্রা দিলেন। যে দেশে "জ্ঞাতি শত্রু, অতিথি দেবতা" তাহাতে একজন জ্ঞাতি যে বিষয়ে আপত্তি করিয়াছেন, সে:সৎকার্য্য করিতে সহজেই আগ্রহ হয়। সে বিষয়ে আবার

৫০ মুদ্রা লাভ! দ্বিতীয় কর্ত্তা রাজী হইলেন বটে, কিন্তু বাটীর অপর জ্ঞাতিগণ এই সংবাদ পাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তখন সশিষ্য গুরু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে কর্ত্তা মুদ্রা লইয়া ছিলেন, তিনি সদল গুরুকে গুপ্ত দ্বার দিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। গুরু তৎক্ষণাৎ সেই সামান্য গৃহকে কথঞ্চিৎ দুর্গ স্বরূপ করিয়া লইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। সিপাহি মিউটিনির সময়ে স্থানে স্থানে সাধারণ ইংরাজ সৈনিকেরাও সামান্য সামান্য গৃহেই অতি দৃঢ়তার সহিত আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ভগবত্তেজোংশ-সম্ভূত দশম শিখগুরু 'মুক্ত পুরুষ' শিষ্য সহ যে তদপেক্ষা অনেক বৃহত্তর কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ কেনই সরল ভাবে বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাহা বলা যায় না।

এদিকে দিল্লী হইতে নফর খাঁ, সৈয়জ খাঁ, পোলাদ খাঁ, সনাইল খাঁ, খাঁ, আম্‌ান খাঁ, সুলতান খাঁ, জমান খাঁ, মিয়া খাঁ; ভূরে খাঁ, সৈয়দ খাঁ, বাহাদুর দূরে খাঁ, হোসেন খাঁ, গুলে খাঁ, মৃজা হায়েত বেগ, করম বেগ, সৈয়দ, মামুদ, আলিবেগ, নুর বেগ, জাফর খাঁ, প্রভৃতি প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ, কাবেলী, গান্ধারী, ছর্য়বি, পেসোরি,বল্ক বোখারি, রুমী,গজনিন, ইরানী, তুরানী, কাশ্মীরী প্রভৃতি সৈন্য লইয়া পূর্ব্বদিক হইতে চামকোর আসিয়া পৌছিলেন। উত্তর দিক হইতে জবরদস্ত খাঁ ও উজির খাঁ এবং পাহাড়ী রাজারাও ক্রমে চামকোরে আসিলেন।

সূর্য্যপ্রকাশে এ সময়ে গুরুর দলে তাঁহার পুত্রদ্বয় (অজিৎ সিং ও জোরায়র সিং) পঞ্চ প্যারে অর্থাৎ পাঁচজন প্রিয় (এই পাঁচজন গুরু-গোবিন্দের সৃষ্ট শিষ্যের মধ্যে প্রথম অমৃত ভোজী), পঞ্চ মুক্ত (মান সিং, ধ্যান সিং, দাম সিং, ধন্না সিং, এবং আলম সিং; এতদ্‌ব্যতীত শ্যাম সিং, মোহর সিং, বীর সিং, সুক্ষা সিং, শান্ত সিং, সন্তোষ সিং, কোঠা

সিং, মদন সিং প্রভৃতি কয়েক জনের নামের উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যায়। শত্রুগণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিয়া গুরু ব্যর্বস্থা করিয়াদিলেন প্রত্যেক দিকে আটজন করিয়া বত্রিশজন থাকিবে। কোঠা সিং ও মদন সিং দ্বার রক্ষা করিবে। গুরু নিজের পুত্রদ্বয় দয়া সিং ও শান্ত সিংকে সঙ্গে লইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে ছাদের উপর রহিলেন। আলম সিং ও মান সিং চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া সংবাদ দিতে নিযুক্ত হইলেন।

চামকোরের জমিদারেরা জাতিতে জাঠ। গুরু সদলে উহাদের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে যাহারা বিশেষ আপত্তি করিয়াছিল, তাহাদিগকে অগত্যা বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, উক্ত জমিদার কর্ত্তৃক বিতাড়িত জাঠগণ শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল; ক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গুরুগোবিন্দের যুদ্ধ নীতি অনুসারে প্রথম গুলি গুরুগোবিন্দের পক্ষ হইতেই ছোঁড়া হইল। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় গড়ি (চামকোরের জমিদার বাটী—এক্ষণে গুরুগোবিন্দের গড় বা গড়িতে পরিণত) হইতে শস্ত্র চালনা হইতে লাগিল। বহু সংখ্যক শত্রুসেনা নিপাতিত হইল। কিন্তু ক্রমে আর সেরূপ চলিল না (সঙ্গে গোলা গুলি অধিক না থাকিলে শেষে সঙ্গিন তলোয়ারেই নির্ভর করিতে হয়)। মরণ নিশ্চয় করিয়া একে একে শিখগণ বাহির হইতে লাগিলেন। প্রথমে কোঠা সিং ও মদন সিং দ্বার রক্ষক দ্বয় বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ করেন। তাঁহারা নিহত হইলে খাজান সিং, দান সিং, ধ্যান সিং একত্র বাহিরে আসিয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তৃতীয় বারে একক মহকুম সিং, চতুর্থ বারে হিম্মৎ সিং ও সাহেব সিং, পঞ্চম বারে পঞ্চমুক্ত, ষষ্ঠ বারে মোহর সিং, সুকির সিং, আনন্দ সিং, লাল সিং, কেশব সিং, অমূলক সিং ক্রমে ক্রমে গিয়া এবং কতক শত্রু নিপাত পূর্ব্বক সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

এইরূপে অর্দ্ধেক শিখ নিহত হইল দেখিয়া গুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিৎ সিং বাহিরে গিয়া সম্মুখ সমরের সাধ জানাইয়া পিতৃআজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। গুরু প্রিয়পুত্রকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিবার সময় বলিয়া ছিলেন, অভিমন্যুর ন্যায় আত্মসমর্পণ কর। তখন অজিৎ সিংহের সহিত আলম সিং, জবাহির সিং, ধ্যান সিং, সুক্ষা সিং ও বীর সিং গড়ির বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রথমে বাহিরে আসিয়া আনোয়ার খাঁ অজিৎ সিংহের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তৎপরে তূণে যতক্ষণ তীর ছিল, ততক্ষণ তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিয়া পরে তরবারি হস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুসেনা-সাগরে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থে যে সকল শিখ যুদ্ধ করিতেছিল, তাহারাও একে একে নিহত হয়। অজিৎ সিং নিহত হইলে, গুরুগোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্র, নবম বর্ষীয় বালক, জোরায়র সিং পিতৃ-আজ্ঞা লইয়া পাঁচজন শিখ সমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জ্যেষ্ঠের পথ অনুসরণ করেন। এইরূপে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়া গেলে, কেবল গুরু স্বয়ং এবং পাঁচজন শিষ্য (দয়া সিং, মান সিং, শান্ত সিং, সন্তোষ সিং ও ধরম সিং) মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তখন গুরু নাহর খাঁ, গৈয়রত খাঁ প্রভৃতি সর্দ্দার ও অন্যান্য বহু শত্রু সংহার করিয়াছিলেন।

আনন্দপুর পর্ব্ব

—:০:—

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চামকোর পরিত্যাগ।

চামকোর যুদ্ধের অবসানে সন্ধ্যাকালে গুরুর পুত্রদ্বয়ের নিধনবার্ত্তা ও তাঁহাদের রণকৌশলাদির বিশেষ বিবরণ গুরুর নিকট পৌঁছিল। গুরুপুত্র অজিৎ সিংহের অসীম সাহসের কথা বর্ণনা করিয়া দূত বলিতে লাগিলেন—"সম্রাট-সেনার অধিনায়ক অজিৎকে বলিয়াছিলেন যে, শিখ পক্ষে যে সামান্য সৈন্য ছিল, তাহা আর প্রায় নাই; এক্ষণে শিখগুরু দরিদ্রের আশ্রয় স্থল এবং জগতের পালক—সম্রাট আলমগীর আরঙ্গজেবের সৈন্য হস্তে নিপতিত; সেই সৈন্যসাগর হইতে উদ্ধারের আশা তাঁহার পক্ষে বাতুলতা মাত্র; সুতরাং তিনি প্রবলপ্রতাপ সম্রাটের শত্রুতা ছাড়ুন এবং বৃথা পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া, ইসলাম (মুসলমান) ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, আত্মরক্ষা করুন।"

এ কথায় গুরুপুত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া দূতকে বলিয়াছিলেন—"এরূপ আর এক কথা কহিবি ত তোর দেহ হইতে মস্তক ছেদ করিব এবং দেহ টুকরা টুকরা করিব;—এতবড় স্পর্দ্ধা যে আমার প্রভুকে এরূপ কথা বলে!" তৎপরে নিষ্কোষিত অসি হস্তে অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া অজিৎ সম্মুখ সমরে দেহ ত্যাগ করেন।

এইরূপে যুদ্ধের নিদারুণ সংবাদ সমস্ত শুনিতে শুনিতে গুরু আপনার

দেহে বৈরাগ্য, সাহস, ধীরতাদির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি শিষ্যবর্গকে দেখাইয়া ভগবানের নির্ভরতা শিক্ষা দিলেন।

এই সকল কথার পর বাকী পাঁচজন মাত্র শিষ্যের মধ্যে দুই জনের চামকোর দুর্গে থাকা এবং গুরুর স্থানান্তরিত হওয়াই স্থির হইল। যাহাদিগকে দুর্গে ছাড়িয়া যাওয়া হয়, তাহাদের একজনকে কেবল তীর চালাইতে এবং অপরকে বন্দুক চালাইতে এবং শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত যুদ্ধে রত থাকিতে গুরু উপদেশ দিলেন। যদি গুরুর সহিত থাকায় আগ্রহ-বশতঃ পাঁচজন শিষ্যই গুরুর সঙ্গে চলিয়া যাইতেন, এবং চামকোরে কেহই না থাকিতেন, তাহা হইলে শত্রুপক্ষীয়েরা অবিলম্বে তাহা বুঝিতে পারিত এবং তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্ধাবমান করিয়া গুরুর পলায়ন পক্ষে ব্যাঘাত জন্মাইত। কিন্তু শিষ্যবর্গ গুরুর জন্য আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল।

যাহা হউক শান্ত সিং ও সন্তোষ সিংকে দুর্গমধ্যে রাখিয়া ধরমসিং দয়াসিং এবং মানসিংকে লইয়া গুরু দুর্গ ত্যাগ করিলেন।

ভারতবর্ষীয় নামগুলি কি সুন্দর! দয়া, ধর্ম্ম এবং মান গুরুকে শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিল না—আভিধানিক অর্থে এমনও বলা যায়। এদিকে আবার শান্ত এবং সন্তোষ অবস্থাতে স্থির ও ধীর!

গুরুগোবিন্দ এই সময় বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। যে দুইজন শিষ্য সকল ছাড়িয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দুর্গমধ্যে রহিল, তিনি তাহাদের একজনের মস্তকে নিজ উষ্ণীষ প্রদান করিয়া বলিলেন :—

"(ব) ওহা গুরু হায় সব খালসা
(ব) ওহা গুরু কি ফতে।"

অর্থাৎ সকল খালসা ভগবান্ গুরুর স্বরূপ; ভগবান্ গুরুর জয় হউক।

তৎপরে আরও স্নেহময় বাক্য দ্বারা খালসাই যে শিষ্যমাত্রের গুরু স্বরূপ এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন।

স্ব সমাজ ও স্ব-ধর্ম্মের উপরে ভক্তি ও প্রীতি শিক্ষাদানই গুরুগোবিন্দ সিংহের মহামন্ত্র। সেই মহামন্ত্রের অনুশীলন-প্রভাবেই মুষ্টিমেয় শিখ ভগবানের কৃপা পাইয়া অতি প্রবল হইয়াছিল। সেই মহামন্ত্রের অভাবেই বিরাট সমাজ সকলে জাতীয় নির্জ্জীবতা!

যাহা হউক, উষ্ণীষপ্রাপ্ত শিষ্য * সবিনয়ে বলিয়াছিলন :—

"হাম যায়সে তুমকো জন লাখহো
হামকে তুম একে জগদীশ।"

অর্থাৎ আমার মত শিষ্য তোমার লক্ষ লক্ষ হইবে, কিন্তু তুমি আমাদের একমাত্র জগদীশ।

অর্দ্ধযামিনী কাটিয়া গেলে চন্দ্রোদয় হইতেছে এমন সময় গুরু শিষ্যত্রয় লইয়া চামকোর দুর্গ ত্যাগ করিলেন। দুর্গস্থ শিষ্যদ্বয়কে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন ঐ সময়ে শত্রুপক্ষের দিকে একজন তীর ও অপর জন গুলি চালাইতে থাকে। তাহারাও তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিল। সঙ্গী শিষ্যত্রয়কে একটী নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র দেখাইয়া বলিলেন যে, যদি আমাদের চারিজনের মধ্যে কেহ সঙ্গীহারা হই, তবে আমরা সকলেই ঐ নক্ষত্র অনুসরণে গমন করিব। এইরূপ গতি নির্ণয় করিয়া দুর্গ ত্যাগ কালে চিৎকার করিয়া বলিলেন—"হিন্দুর গুরু দুর্গ ত্যাগ করিয়া যাইতেছে"। শত্রুপক্ষ এই কথায় ইতস্ততঃ তীর বর্ষণ আরম্ভ করিল। তখন অন্ধকারে শত্রুপক্ষীয়েরা আত্মপর না বুঝিয়া অনেক

* শিষ্যদ্বয়ের মধ্যে কে (শান্ত সিং বা সন্তোষ সিং) উষ্ণীষ পাইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

স্বপক্ষীয়কে নিধন করিয়া ফেলিয়াছিল। গুরু বা তাঁহার শিষ্যত্রয়ের কিছুই ক্ষতি হয় নাই ; তবে তাঁহারা সঙ্গ ছাড়া হইয়া পড়িলেন। শ্রীগুরু একলা ক্রোশাধিক গিয়া এক বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পদব্রজে প্রহরেক রজনী থাকিতে মাছিওয়াড়া গ্রামের নিকটে গিয়া পৌঁছিলেন।

ছদ্মবেশ পর্ব্ব

——:০:——

প্রথম পর্ব্বাধ্যায়।

গুরুর ছদ্মবেশ এবং মাছিওয়াড়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ।

গুরুগোবিন্দ মাছিওয়াড়া গ্রামে পৌছিয়া তথায় গোলাপ সিং নামক জনৈক শিখের গৃহে আশ্রয় লইলেন। গোলাপ সিং প্রথমে গুরুকে প্রণামাদি করিয়া খাতির করিল; কিন্তু পরে সকল অবস্থা মনে মনে বুঝিয়া ভয় পায়; এবং পরদিন প্রাতেই গুরুকে বিদায় দিবার জন্য সে রাত্রি থাকিতেই শ্রীগুরুর ঘুমভাঙ্গাইয়া বিদায়ী উপঢৌকন সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করে। ইহাতে গুরু বুঝিতে পারেন যে, গোলাপের ভয় হইয়াছে এবং সেজন্য তাহাকে সাহস দিয়া বলেন,—"কেহ তোমার কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না।" কিন্তু কিছুতেই তাহার সাহস হইল না। সে বলিতে লাগিল,—"গুরু আপনি সবই করিতে সমর্থ; কিন্তু আমি নিতান্ত সামান্য লোক। আমার ঘরে আপনার অবস্থান জানিলে বাদসাহের লোকে আমায় একবারে নষ্ট করিবে।" এই কথা বার বার বলায় গুরু দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"তবে তাহাই হইবে।"

এ দিকে শত্রুপক্ষীয় প্রায় দুই হাজার লোক শ্রীগুরুর সন্ধান করিতেছে। কেহ বলিতেছে, গুরু চামকোর যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, কেহ বলিতেছে, গুরু পলায়ন করিয়াছেন। এমন সময় নবী খাঁ ও গণি খাঁ

নামক গুরুর দুই মুসলমান শিষ্য এবং গুরুসঙ্গহারা পূর্ব্বোক্ত দয়া সিং, ধরম সিং ও মান সিং আসিয়া শ্রীগুরুর সহিত মিলিত হইল। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, এই সময়ে গুরু পথিমধ্যে নেম খাঁ ও গাজি খাঁ নামক দুইজন পাঠান কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন; তাহারা তাঁহাকে তথাকার শাসন কর্ত্তার নিকটে লইয়া যাইবে স্থির করিয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্বে গুরুর নিকট কোন উপকার পাইয়াছিল বলিয়া এক্ষণে তাহারা তাঁহাকে লুধিয়ানা জেলা পার করিয়া দিয়াছিল। হয়ত সূর্য্যপ্রকাশের উক্ত নবী খাঁ ও গণী খাঁই অপর ঐতিহাসিকের নেম খাঁ ও গাজি খাঁ। সে যাহা হউক, শ্রীগুরু নবী খাঁ ও গণী খাঁকে কাল (নীল) রংয়ের কাপড় প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধা শিখ স্ত্রীলোক আসিয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া স্বহস্তে প্রস্তুত এক থান কাপড় দিল। তিনি উহাও নীল রঙ্গে রঞ্জিত করাইয়া লইলেন। এই সকল নীল রংয়ের কাপড় পরিয়া কেশ এলাইয়া শ্রীগুরু খাটিয়ায় বসিলেন এবং নবী খাঁ ও গণী খাঁকে চৌপাইর (বা খাটিয়া) আগেকার পায়া এবং ধরম সিং ও মান সিংহকে পশ্চাতের পায়া ধরিয়া উঠাইয়া চলিতে বলিলেন। দয়া সিং ময়ূরপুচ্ছের এক পাখা হস্তে শ্রীগুরুকে বাতাস করিতে করিতে চলিল। কেহ পথে জিজ্ঞাসা করিলে, মুসলমান শিষ্য নবী ও গণী উত্তর দেয় "উচ্‌কা (উচ্চ) গ্রাম নিবাসী পীর চলিয়াছেন।" মুসলমানের মুখে ছদ্মবেশী গুরুর এই পরিচয়ে অনেকেই বিশ্বাস করিতে লাগিল। ইনিই যে শ্রীগুরু গোবিন্দ সিং তাহা কেহ কেহ বুঝিলেও এ সজ্জার শোভা দেখিয়া যেন মুগ্ধ হইয়া তাহারা তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না।

এইরূপে তাহারা ওমরাও নামক গ্রামের প্রধান ব্যক্তির বাটীর সম্মুখ দিয়া যখন যাইতেছিলেন তখন ওমরাও পীরকে দেখিতে চাহিল। নবী ও গণী বলিলেন,—"ইনি উচকা পীর (উচ্চ গ্রামবাসী পীর)। ইনি সাধারণতঃ

মহম্মদ হাজি বলিয়া পরিচিত ; এক্ষণে বিশেষ রোজায় (ব্রতে) আছেন। ইঁহার জন্য তাঁবু দাও ত ইঁহাকে এস্থলে রাখি। এইরূপ কথা বলায় ওমরাও গুরুর জন্য তাঁবু করিয়া দিলে, গুরু তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেন। ওমরাও তাহার সন্দেহ মিটাইবার জন্য হিন্দুর অখাদ্য কোন খাদ্য লইয়া ছদ্মবেশী গুরুকে খাইতে দেয়। এই পরীক্ষায় গুরু পাছে ধরা পড়েন, এই ভয়ে মানসিং বলেন যে হাজি উপস্থিত এক বৎসরের রোজা ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। গুরু পরে শিষ্যত্রয়কে বলিয়া দেন,—"তোমরা ঐ খাদ্য খাইবার পূর্ব্বে অস্ত্র স্পর্শ করিয়া "তব প্রসাদ" বলিবে ; অর্দ্ধেক মাত্র লইবে এবং কিছু গোপনে রাখিয়া দিবে।" এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া শিখত্রয় খাদ্য খাইবার পূর্ব্বে উহা কাটিবার জন্য ছুরি বসাইবার সময় তিনবার "তব প্রসাদ" এই বাক্য উচ্চারণ করিতেই দেখা গেল যে, উক্ত খাদ্য "কড়া প্রসাদে" (নিবেদিত মোহন ভোগে) পরিণত হইয়াছে!

এমন সময় নুরপুরগ্রামের এক সৈয়দ তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সে গুরুকে চিনিয়া তাঁহাকে প্রণাম করে এবং ওমরাকে বলে—"তুমি এসব কি করিতেছ? উনি বড় সহজ লোক নহেন ; উনি বিরক্ত হইলে তোমার বিষয় বৈভব উল্টাইয়া দিতে পারেন, উঁহাকে ঠাণ্ডা করিয়া বিদায় দাও।' সৈয়দের এইরূপ কথা শুনিয়া, ওমরাওয়ের ভয় ভক্তির উদয় হইল। তখন গুরু সৈয়দের উপর সন্তোষজনক পরওয়ানা লিখিয়া বিদায় দিয়া শিখত্রয় ও নবীখাঁ এবং গণী খাঁকে সঙ্গে করিয়া গ্রামান্তরে চলিলেন।

তৎপরে গুরুকানেরা গ্রামে গিয়া তথাকার জমীদার ফতা নামক জাঠের বাড়ী গিয়া সেবা লয়েন এবং তাহার নিকট একটী ঘোড়া চাহেন। কিন্তু ফতা ভাবিল বৃথা ভাল ঘোড়া দিয়া কি হইবে? সে একটী সামান্য ঘোড়া আনিয়া দিয়া বলে, ভাল ঘোড়াটা জামাই লইয়া গিয়াছে। এই

প্রবঞ্চনা-বাক্যে গুরু দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, তুমি এবং তোমার ভাল ঘোড়া উভয়েই নষ্ট হইবে। সেই দিনই সেই ভাল ঘোড়াটা ও ফতা জাঠের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়।

গুরু তৎপরে হেহের গ্রামে কৃপাল উদাসীর নিকট গিয়া বিশেষ যত্নলাভ করেন। এই সময় জেঠী নামক একজন স্ত্রীলোক আসিয়া তাহার পুত্রের বিবাহ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে। তাহাতে গুরু উহার পুত্রের ও পৌত্রের বিবাহ আশীর্ব্বাদ করিয়া ছিলেন। এই সময় গুরু নবীখাঁ ও গণী খাঁর সঙ্গত্যাগ ইচ্ছা করিয়া তাহাদের একখানি পত্র দেন। তাহাতে লেখা থাকে যে, যখনই ইহারা এই পত্র যে কোন শিখকে দেখাইবে, তাহাদের যথাসাধ্য এই পাঠানদ্বয়কে অর্থাদি সাহায্য দিতে হইবে। পাঠানদ্বয়ের বংশীয়েরা এই হুকুমনামা দেখাইলে শিখরাজাদিগের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অর্থ এখনও পাইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, এই সময় গুরু তাঁহার পার্সী শিক্ষকের নিকট কয়েকদিন কাটাইয়া ভাতিন্দার জঙ্গলে প্রবেশ করেন। শিখেরা গুরুকে আজন্ম 'শিক্ষক' বলিয়াই বলেন, তিনি আবার কোন কালে 'শিক্ষা করিয়া'ছিলেন, তাঁহার আবার পার্সী শিক্ষক ছিল, এরূপ কথা ভক্ত শিখ সন্তোষ সিং লিখিত "সূর্য্যপ্রকাশে" নাই।

যাহা হউক গুরুগোবিন্দ যখন এইরূপে তুর্কদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ঘুরিতেছিলেন, তখন গুরুমাতা গুজরী শিশুপুত্রদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া আনন্দপুর হইতে সরহিন্দ গিয়াছেন; তাঁহাদের তত্ত্ব লওয়া উচিত, গুরু এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন সময় রায়দা কোটে উপস্থিত হইলে তথাকার উমাহা (মালিক) কল্লারাও তিনশত সৈন্য লইয়া আসিয়া শ্রীগুরুচরণ বন্দনা করিলেন। গুরু বলিলেন, "এ সময় তুমি একবার সরহিন্দে গিয়া সত্বরে তথাকার সংবাদ আনিয়া দাও।" ইহাতে

কল্লারাও বলিল,—"সরহিন্দ এখান হইতে প্রায় দশ যোজন (৪০ ক্রোশ) পথ; কিন্তু আমার মাহি নামক এক ভৃত্য আছে সে পবনবেগে গিয়া সরহিন্দের সংবাদ আনিয়া দিবে। আমি নিজে তত শীঘ্র পারিব না।" প্রভুর আজ্ঞানুসারে মাহি সরহিন্দে সংবাদ আনিতে চলিল।

মাহি পথে যাইতে যাইতে বাদসাহের সৈন্যের সহিত গুরুগোবিন্দের যুদ্ধের নানাপ্রকার গল্প শুনিতে লাগিল। সকলেই গুরুর বীরত্বের প্রশংসার সহিত বলিতে লাগিল—গুরু দিল্লী, লাহোর, কাবুল, কান্দাহার পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। কেহ বলিল—গুরু অবশেষে যুদ্ধে মারা গিয়াছেন। কেহ বলিল—'না ঐ গুরু আসিতেছেন!' অনেকে যুদ্ধে মারা গিয়াছে বলিয়া তাহাদের আত্মীয়বর্গ রোদন করিতেছে। চারিদিকে হায় হায় শব্দ। এইরূপ সবকথা শুনিতে শুনিতে মাহি সরহিন্দ চলিয়াছে।

এদিকে গুরুগোবিন্দ কল্লারাওয়ের সহিত কথা বার্ত্তায় যাহাতে উহার অধিকার মধ্যে গোহত্যা নিবারিত হয়, সে জন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কথিত আছে, সে জন্য প্রজারা শতদ্রুর দিব্য (জামিন) দিয়াছিল এবং কিছুকাল পরে রায়দাকোটে গোহত্যা ঘটিতে দেওয়ায় শতদ্রু নাকি উহার কতক অংশ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

ছদ্মবেশ পর্ব্ব।

——:০:——

দ্বিতীয় পর্ব্বাধ্যায়।

সরহিন্দের লোমহর্ষণ সংবাদ।

পূর্ব্বোক্তরূপে কল্লারাওয়ের সহিত শ্রীগুরুর কথাবার্ত্তায় দুই প্রহর কাটিয়া গেলে, গুরু কল্লারাওকে বলিলেন,—"দেখ মাহি আসিতেছে কিনা।" কল্লারাও বলিল,—শ্রীগুরুর ইচ্ছায় সকলই সম্ভব ; কিন্তু এতশীঘ্র চল্লিশ ক্রোশ গিয়া সে কিরূপে সংবাদ লইয়া আসিতে পারে ? আজত কোন মতেই সম্ভব নয়—'যদি কাল আসিয়া পৌছে!" পাছে অন্যে জানিতে পারে, এজন্য মাহি অশ্বপৃষ্ঠে যায় নাই। গুরুর আদেশে মাহি আসিতেছে কিনা দেখিবার জন্য একজনকে উচ্চ বৃক্ষে উঠাইয়া দেওয়া হইল। সূর্য্যপ্রকাশ গ্রন্থকার বলেন, মাহি তিন প্রহরে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু একমাত্র গুরুশক্তি ভিন্ন অন্য কিছুতে তিনিও ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। তখন মাহি আদেশক্রমে জানাইল যে, মাতা গুজরী ও গুরুকুমারদ্বয় মারা গিয়াছেন। কল্লারাও বলিল,—"তুমি যেরূপ ঘটনা শুনিয়াছ, আনুপূর্ব্বিক বল।" তদনুসারে মাহি বলিতে লাগিল,—"মাতা গুজরী গুরুকুমারদ্বয় ও এক ভৃত্য লইয়া ছপ্‌পরওয়ালা শকটে আনন্দপুর হইতে অতি ব্যাকুলচিত্তে বহির্গত হন। তৎপরে পথে আসিয়া শ্রীগুরুর পুরাতন পাচক ব্রাহ্মণ গঙ্গুর সহিত দেখা হয়। গঙ্গুর দেখা পাইয়া মাতা কিছু আশ্বস্ত হয়েন। গঙ্গু যে অপরাধী হইয়া

আনন্দপুর হইতে তাড়িত হইয়াছিল, তিনি সে কথা ভুলিয়া গেলেন। গঙ্গু তাঁহাদিগকে সরহিন্দের নিকট খেড়ীগ্রামে নিজ ভবনে লইয়া গেল।

নিজ ভবনে পৌছিবার পূর্ব্বেই গঙ্গু জানিতে পারে যে, মাতার সঙ্গে একটী খুরজীতে (থলেতে) অনেক অর্থ আছে ; সে চতুরতা করিয়া উহা সরাইয়া ফেলে এবং নিজ ভবনে প্রবেশের সময় সে বলিতে থাকে, এখানে বড় চোর ডাকাতের ভয়, অতএব খুব সাবধানে থাকিবেন। তখন মাতা গুজরী ভৃত্যকে বলেন, সব দ্রব্যাদি দেখিয়া লও। ভৃত্য বলে, সব দেখিতেছি, কিন্তু অর্থের থলেটী দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে গুজরী গঙ্গুকে বলেন,—'থলেটী দেখিয়াছ কি ?' ইহাতে গঙ্গু ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে থাকে,—'পুরাতন মনিব বিপদে পড়িয়াছ বলিয়া, আমি আপন বিপদ না ভাবিয়া ঘরে আনিলাম ; তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ দূরে থাকুক, আমার উপর চোর বদনাম ! অতএব আমি এ সংবাদ চৌধুরীকে (পুলিস কর্ম্মচারীকে) দিয়া রাখি।' এইরূপে চৌধুরীর নিকট হইতে উচ্চতর কর্ম্মচারী হাজরাতের নিকট উপস্থিত হইয়া, গুরুমাতা এবং গুরুপুত্রদিগের অতিথি সংকার দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে মুসলমানের হস্তে ধরাইয়া দিয়া গঙ্গু তাহাদিগের নিকট নিজ পুরস্কারের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইল !

"এইরূপে হাজরাতের সহিত পরামর্শ করিয়া সরহিন্দের সুবা উজিদা খাঁর হস্তে মাতা গুজরী ও গুরুকুমারদ্বয়কে অর্পণ করা হইল। গঙ্গু জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া "সূর্য্যপ্রকাশ" গ্রন্থকার সন্তোষ সিং এই উপলক্ষে সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি বিলক্ষণ কটাক্ষ করিয়া লইয়াছেন। সরহিন্দ নগরবাসিগণ এই ব্যাপার শুনিয়া ক্রমে মাতা গুজরী ও গুরুকুমারদ্বয়কে দেখিতে আসিতে লাগিল।

"সুবা উজিদা খাঁ মাতা গুজরী ও কুমারদ্বয়কে বুরুজে (জেলে) সাবধানে রাখিতে হুকুম দিলেন। মাতার বাক্য নাই ; তাঁহার চক্ষু দিয়া

দরদরধারে অশ্রুবিগলিত হইতে লাগিল। লোকে অল্প দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া গঙ্গুকে অজস্র গালি দিতে লাগিল।”

তৎপরে শ্রীগুরু জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মাহি! তুমি এসকল কথা কিরূপে জানিলে?” তাহাতে মাহি বলিল,—“আমি সরহিন্দের একজন শিখের নিকট যেরূপ শুনিয়াছি,তাহাই শ্রীগুরু সাক্ষাতে যথাযথ বলিতেছি, এবং এই সকল কথা যথাযথ শুনিয়াছি, তাহাও অপর লোকের কথার সহিত মিলাইয়া প্রতীতি হইয়াছে। তৎপরে স্থবা উজিদা খাঁ গুরু-কুমারদ্বয়ের বিচারার্থে স্থবা সরহিন্দের জমিদার প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া এক সভা করিলেন। এই সভায় হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম্মের লোকই উপস্থিত হইয়াছিল।

“তখন স্থবা উজিদা খাঁ মোরডে নামক এক ব্যক্তিকে বলিলেন,—মিষ্ট কথায় গুরুকুমারদ্বয়কে সভায় লইয়া আইস। তখন কেহ কেহ মোর-ডেকে বলিয়া দিল—‘বালকদ্বয়কে বুঝাইয়া বলিয়া আনিবে যেন এখানে আসিয়া স্থবাদার প্রভৃতি মান্য ব্যক্তিকে সেলাম করিয়া খাতির ও মান্য দেখায়।’ মোরডে গিয়া মাতা গুজরীকে বলিল,—মাতা গুরুকুমারদ্বয়কে আমার সঙ্গে দিন; স্থবা উহাদিগকে সভাস্থলে আহ্বান করিতেছেন।’ তাহাতে মাতা কাতরস্বরে বলিলেন,—‘আমার জ্যেষ্ঠ পৌত্র তাহার পিতার নিকটে আছে, ইহারা নিতান্ত শিশু (বয়স ৬।৮ বৎসর মাত্র); ইহাদিগকে আমি পালন করিতেছি মাত্র, ইহারা সভায় পাঠাইবার উপযুক্ত নয়।’ ইহাতে মোরডে সভায় ফিরিয়া গিয়া জানাইল যে, গুরুমাতা উক্ত-রূপ কথা বলিতেছেন।

“এই সভায় ক্ষত্রিয় জমিদার স্থচানন্দ দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন। কথিত আছে যে, গুরু গোবিন্দের সহিত ইহার শত্রুতা ছিল। ইনি সময় পাইয়া বলিলেন,—‘গুরু সহজ লোক নহেন; তাঁহার পুত্রেরা সাপের

সলুই ; তাহারা সহজে হুজুরে হাজির হইতে চাহেনা ; গুরুমাতা এখন বলিতেছেন ইহারা নিতান্ত শিশু, কিন্তু গুরু যখন রাজদ্রোহীর কার্য্যে উত্থিত হইয়াছিলেন তখন মাতা তাঁহাকে নিবারণ করেন নাই।' এইরূপ উৎসাহ-বাক্যে সুবা উজিদা খাঁ পুনরায় মোরডেকে পাঠাইয়া বলিয়া ছিলেন,—'বালকেরা যদি সহজে না আইসে, তবে তাহাদিগকে জোর করিয়া আনিবে ; তবে বুঝাইয়া বলিও, আমরা বালকদ্বয়কে সভায় দেখিতে চাহিতেছি ; এখানে পাঠাইতে কোন দোষ নাই।' মোরডে তদনুসারে পুনরায় মাতা গুজরীর নিকটে গিয়া সহজভাবে জানাইল, সুবা একবার গুরুকুমারদ্বয়কে সভায় দেখিতে চাহিতেছেন। তখন মাতা গুজরী বসিয়া নয়নজলে ভাসিতেছিলেন, আর কুমারদ্বয় তাঁহার ক্রোড়ে মাথা দিয়া ও একটা চাদর মুড়িদিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। এবার মোরডের কথা শুনিয়া কুমারদ্বয় গায়ের চাদর ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং জ্যেষ্ঠ জুঝার সিং বলিলেন,—'দাদি কেন আমাদিগকে বৃথা আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছ, তাহা ত পারিবে না ; পিতা ধর্ম্মরক্ষার্থে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে উহারা আমাদিগকে শত্রু সন্তান বলিয়া জানিয়াছে। কর্ত্তা (ঈশ্বর) যাহা করিবেন তাহাই হইবে।' এইরূপ কথা বলিয়া পিতামহীর মৌন সম্মতিক্রমে কনিষ্ঠ ফতে সিংকে সঙ্গে করিয়া জুঝার সিং সভায় চলিলেন। বালকদ্বয়কে দেখিয়া প্রায় সকলেরই মায়া হইয়াছিল, এবং পরস্পর বলাবলি করিয়াছিল যে, সুবা অবশ্য মায়া বশতঃ ইহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন।

"গুরুকুমারদ্বয় সভায় আসিয়া ধীরভাবে দাঁড়াইলে, সুবাকে সেলাম করিবার জন্য কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন। তাহাতে জুঝার সিং বলিলেন,—'এ মস্তক একমাত্র অকাল পুরুষের নিকট নমিত হইয়াছে,

আর কোথায় নোয়াইব ?' সুবাও সেলাম করিতে বলিলে, (সূর্য্য প্রকাশের ভাষায় বলি) জুঝার সিং উত্তর দিলেন :—

করাতা পুরুখ (পুরুষ) অকাল কৃপালু।
সবতে বড়ো কালকে কালু॥
তিস্ আগে হাম্ অর্পে শিস্।
সকল কলা সমরথ জগদীশ॥"

অর্থাৎ 'সেই অকাল কর্ত্তা পুরুষ দয়াময় (তিনি) সকলের বড়, কালের কাল, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ জগদীশ তাঁহার অগ্রেই আমার মস্তক অর্পিত হইয়াছে। আর তুমি কি ? তুমিত সদাত্মা নহ ! দুরাত্মা ! তোমার অগ্রে এ মস্তক নত হয় না।' সুবা বলিলেন—'তুমি যে বাপের বড়াই করিতেছ, তিনিত নিহত হইয়াছেন ; তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও নিহত হইয়াছেন ; তোমাদের আনন্দপুর এখন আমাদের ; এখন তুমি আমারই আশ্রিত। 'এইরূপ কথা বার্ত্তার সময়, নীচপ্রবৃত্তিসম্পন্ন সুচানন্দ বলিলেন,—'দেখুন, ভুজঙ্গশিশু ভুজঙ্গ অপেক্ষা ভয়ানক ; এ দুইটীকে তদ্রূপ জানিবেন।' জুঝার সিং বলিলেন, —'আমার পিতা আকাশ সদৃশ ; কে আকাশকে নিহত করিতে পারে ?' এইরূপ বলিতে বলিতে জুঝার সিং কনিষ্ঠের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—'ভাই ফতে সিং আমার ত এই কথা ; তুমি কি বল ?' তখন ফতে সিং বলিল,—'দাদা আমাদের পিতা পিতামহ ধর্ম্মের জন্য মস্তক দিয়াছেন ! উহাই আমাদের বংশের ধারা ! আমরা কি উহার অন্যথা করিতে পারি ?' যেনাস্য পিতরো যাতা, যেন যাতাঃ পিতামহাঃ,—সংযত, ভক্তিমান্, বিনয়ী, সুজাত হিন্দুসন্তান এই সহজ সরল কথা ভিন্ন আর কি বলিবে ?

"তখন সুবা ও অন্যান্য সকলে কুমারদ্বয়কে বুঝাইতে লাগিলেন। সুবার এক কথা,—'তোমরা তোমাদের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসল-

মান ধর্ম্ম গ্রহণ কর; তাহা হইলে ভোগসুখ সকলই পাইবে; এই সকল বড় বড় জমিদার অপেক্ষা উচ্চ পদ পাইবে; উচ্চ ঘরে (এমন কি বাদশাজাদির সাহত) তোমাদের বিবাহ দিব; তোমাদের পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াছে; এখন তোমরা সম্পূর্ণ আমার আশ্রিত।' এইরূপ কথা পুনঃ পুনঃ বলায় জুঝার সিং আবার বলিলেন,—'আমাদের ধর্ম্মই হৃদয়ের ধন, লোভ দেখাইয়া ধর্ম্ম ত্যাগ করাইতে পারিবে না; পাপাত্মারাই এরূপ লোভ দেখায়।' ইহাতে সুচানন্দ দেওয়ান আবার সুবাকে বলিল, 'আপান কেন মিছামিছি উহাদিগকে অত বলিতেছেন? দেখিতেছেন না আপনাকে সেলাম পর্য্যন্ত করিল না! ওরা সেই গুরুগোবিন্দের ছেলে, যে দেশটা কাঁপাইয়া তুলিয়াছে; উহাদের রাখিলে উহারা ডবল গোবিন্দ হইবে।' তখন মলের কোটলা নিবাসী এক পাঠান বলিল—'এমন কচি বালককে মারিলে কি হইবে? ইহাতে কোন পৌরুষ নাই।' তখন সুবা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়াই জল্লাদকে (ঘাতককে) খুঁজিতেছিলেন। সত্বরেই গিল্‌জা নামক জল্লাদকে পাইয়া গুরুকুমারদ্বয়ের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে হুকুম দিলেন। তখন উহাঁদিগকে সভা হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়া উহাঁদের দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করা হইল।"

শিখদিগের "পন্থ প্রকাশ"নামক গ্রন্থে লেখা আছে যে,গুরুকুমারদ্বয়কে দাঁড় করাইয়া ইষ্টক দিয়া গাঁথিতে আরম্ভ করা হয়, এবং প্রত্যেক ইষ্টক গাঁথিবার সময় বলা হয়, 'তোমরা মুসলমানের ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে ছাড়িয়া দিব।' তথাপি গুরুকুমারদ্বয় স্থিরভাবে আপন ধর্ম্মে স্থির থাকিয়া প্রাণ দিয়াছিলেন। অনেক ইংরাজী ঐতিহাসিক ইহাই বর্ণন করিয়াছেন। যাহা হউক সূর্য্যপ্রকাশে লিখিত মাহির উক্তিই এখানে লেখা হইয়াছে।

তৎপরে শ্রীগুরুর আজ্ঞায় মাহি আবার বলিতে লাগিল—"যখন

গুরুকুমারদ্বয় নিহত হইলেন, তাহার অব্যবাহিত পরেই টোডরমল নামক জনৈক শ্রীগুরুর ভক্ত ধনী মহাজন আসিয়া উপস্থিত হইল। এ সময় আঁধি (ধূলি পূর্ণ প্রবল বায়ু) আসিয়াছিল। টোডর মল প্রথমে এসকল ব্যাপারের সংবাদ জানিতে পারেন নাই। পরে যখন শুনিলেন গুরুকুমার-দ্বয় উক্তরূপে সুবার হস্তে পড়িয়াছেন, তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন, গুরুকুমারদ্বয়ের প্রাণরক্ষার্থে যত টাকা লাগে তিনি দিবেন। পরে, আসিয়া যখন দেখিলেন, গুরুকুমারদ্বয়কে মারিয়া ফেলিয়াছে, তখন তাঁহার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল। তখন তিনি গুরুমাতা গুজরীর নিকট গমন করিলেন এবং 'হায় হায়' করিতে করিতে, সুবার হুকুমে গুরু কুমারদ্বয় নিহত হইয়াছেন মাতাকে এই ভীষণ সংবাদ জানাইলেন। তখন তিনি দেখিলেন, মাতাও মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন—তাঁহার দাঁত লাগিয়া গিয়াছে। কিছুপরে তাঁহার চৈতন্য হইলে, দেয়ালে কপাল ঠুকিয়া ফাটাইয়া এবং টোডরমলের হস্তস্থিত অঙ্গুরীর হীরক লইয়া মাতা গুজরী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। টোডরমলই মাতা গুজরীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিয়াছিলেন।"

শ্রীগুরু এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে খাটিয়া হইতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মলের কোটলার পাঠান ব্যতীত আর কোন পাঠান (মুসলমান) কুমারদ্বয়ের প্রাণরক্ষার্থে বলিয়াছিলেন কি না?

মাহি বলিল,—আর কোন পাঠানের মুখে ওরূপ কথা শুনা যায় নাই। তখন 'মলের কোটলার পাঠান ব্যতীত অপর সকল পাঠান (মুসলমান) নষ্ট হইবে ও সরহিন্দবস্তিও নষ্ট হইবে' এই বলিয়া গুরু অভিসম্পাত করিলেন। স্বজাতিদ্রোহী সুচানন্দের নাম উচ্চারণও করিলেন না।

ছদ্ম পর্ব্ব

তৃতীয় পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর দীনাগ্রামে অবস্থান ও শিখ সমাগম।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, গুরুগোবিন্দ সরহিন্দের এই নৃশংস সংবাদ অর্থাৎ গুরুপুত্রদ্বয়ের এবং গুরুমাতার নিধনসংবাদটি, ঘটনার তিন-মাস পরে পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, সকল পাঠান (মুসলমান) নষ্ট হইবে, এই অভিসম্পাত শুনিয়া কল্লারাও ভীত হইল; কল্লারাও নিজে পাঠান (মুসলমান) কিন্তু গুরুর ভক্ত। শ্রীগুরু বাক্-সিদ্ধ, ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। তখন সে আত্মরক্ষার্থে গুরুকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে, সে নিজে ও পরিবারবর্গকে অন্তঃপুর হইতে আনাইয়া, শ্রীগুরুর পদতলে পড়িয়া থাকিবে। গুরুগোবিন্দ তখন ভক্তের বিনয়ে তুষ্ট হইয়া তাহাকে চারিখানি কৃপাণ (তরবারি) দিয়া বলিলেন, তুমি বা তোমার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে যতদিন এই কৃপাণ চতুষ্টয়ের পূজা করিবে, সদাচারে থাকিবে, এই কৃপাণ নিজ অঙ্গে ব্যবহার না করিবে, ততদিন শত্রু তোমার কিছু করিতে পারিবে না; ইহারাই তোমায় নষ্ট হইতে রক্ষা করিবে। গুরুগোবিন্দ কল্লারাওকে এইরূপ বর দিয়া, দয়াসিং প্রভৃতি অনুচরবর্গকে খাটিয়া উঠাইতে বলিলেন। কল্লারাও তাঁহাকে নিজ ভবনে লইয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু গুরু "এখন আমি বনচারী, আমার বাসস্থান অরণ্য" এইরূপ বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। কল্লারাও

এবং তৎপুত্র ঐ কৃপাণ-পূজায় ও সদাচারে ভালই ছিল ; কিন্তু তাহাদিগের দেহত্যাগের পর, কল্লারাওয়ের পৌত্র উহা অগ্রাহ্য করায় একটা হরিণ মারিতে গিয়া ঐ কৃপাণেই নিহত হয়।

গুরুগোবিন্দ তৎপরে পূর্ব্ববৎ "উচকাপীর" রূপে খাটিয়ায় বসিয়া চলিতে চলিতে পথিমধ্যে এক কুলতলায় বসিলেন। এমন সময় সেবক সিং আসিয়া তাঁহাকে একটা ঘোড়া উপঢৌকন দিল। গুরু এই ঘোড়ায় উঠিয়া খাটিয়া ত্যাগ করিলেন। তৎপরে অনুচর সহ দীনাগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই দীনাগ্রাম ও কাঙ্গড়াপুরীর অধিপতিগণ বহুদিন হইতে গুরু-ভক্ত—শিখ। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন ইহাদিগকে বড় প্রীতি করিতেন। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ যোধবীর ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দকে যুদ্ধস্থলে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই যোধের পৌত্রত্রয় (সমীর, লছমীর ও ভক্তমল) এখন রাজত্ব (জমিদারী) করিতেছিলেন। ইঁহারা লোকমুখে গুরু গোবিন্দের শুভাগমন সংবাদ পাইয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিজভবনে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন ; কিন্তু গুরু বলিলেন, তোমরা বালক—বুঝিতেছ না যে, তোমাদের গৃহে আমি গমন করিলে (আমি চলিয়া গেলেও) বাদসাহের লোক তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে। তখন তাঁহারা গুরুগোবিন্দকে এক মিস্ত্রীর ঘরে বসাইয়া কিছু দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিলেন।

এই মিস্ত্রীর ঘরে গুরুগোবিন্দ কয়েকদিন বাস করেন। এ সময়ে তিনি মৃগয়াছলে নিকটস্থ স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইতে থাকেন। এই স্থানের প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত শ্রীগুরুর ভক্ত শিখ রূপা ও তৎপুত্র সিন্ধু ক্ষেত্রে কার্য্য করিত। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের উত্তাপে তাহারা জল পান করিত। একদিন ঐরূপ কার্য্য করিয়া পিপাসার্ত্ত হইয়া জল পান

করিতে গিয়া দেখে,জল অতি শীতল; তখন তাহাদের মনে হয়, শুনিতেছি শ্রীগুরু রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে এই জল পান করাইতে পারিলে, তবে আমাদের তৃষ্ণা মিটে। তখন তাহারা জল পান না করিয়া শ্রীগুরুর শুভাগমনের প্রত্যাশায় এই জল রাখিয়া দিয়া দুই দিন অপেক্ষা করে। প্রেমের এমনি অদ্ভুত খেলা যে, শ্রীগুরু ভক্তের বাঞ্ছা যেন মনে মনে জানিতে পারিয়া, দুইদিন পরে বেলা দুই প্রহরের সময় তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন ভক্তের যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা ভক্ত ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারে কি! যাহা হউক, গুরু সেই শীতল জল পান করিয়া দীনাগ্রামে মিস্ত্রীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

এই সময়ে নিকটস্থ অনেক শিখ আসিয়া ক্রমে ক্রমে গুরুগোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে ধরমসিং ও পরম সিং নামে দুই ভক্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা গুরুকে একটি ঘোড়া দিয়াছিলেন এবং শ্বেত কাপড় দিয়া গুরুর নীলরংয়ের কাপড় ছাড়াইয়াছিলেন। এ সময়েও গুরু ভক্তগণকে অধ্যাত্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে বিমুখ হয়েন নাই। তাঁহার মাতা ও পুত্রদ্বয় নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছেন, এই কথার উল্লেখ করিয়া কেহ আক্ষেপ করিলে, গুরুগোবিন্দ বুঝাইয়া দিতেন যে, উহাই সাংসারিক নিয়ম; মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; উহার জন্য শোক না করিয়া যাহাতে হৃদয়ে সচ্চিদানন্দের আবির্ভাব হয়; তাহা কর।

শিখেরা এ সময়ে শ্রীগুরুর নিকটে আসিয়া, পরস্পর নানা কথার আলোচনা করিতেন। কেহ বলিতেছে, কেন যুদ্ধ হইল জান? কেহ বা উত্তর করিল, শ্রীগুরুর ইচ্ছা; কেহ বা বলিল, ধর্ম্মরক্ষার্থে; কেহ বা বলিতেছে এবার যুদ্ধ হয় ত আমি অনেক পাঠান মারিব; কেহবা বলিতেছে, আমিত আছিই, আরও বিশজন বা চল্লিশ জন লোক

দিয়া যুদ্ধের সাহায্য করিব। গুরুগোবিন্দও সকলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন; কখন বা কাহারও ইচ্ছায় পুনরায় নীল রংয়ের কাপড় পরিয়া "উচকাপীরের" রূপ দেখাইতেছেন; কিন্তু সকলকেই সেই অকাল পুরুষে নির্ভর করিতে শিক্ষা দিতেছেন। "সূর্য্য-প্রকাশ" বলেন, এ সময় গুরুর সঙ্গে প্রায় পাঁচ হাজার শিখ ছিল।

এই সময়ে একদিন উক্ত সমীর আসিয়া শ্রীগুরুকে এক যোড়া শাল অর্পণ করিল। গ্রন্থান্তরে দেখা যায়, তখন গুরু ফিরোজপুর জেলার কাঙ্গার গ্রামে আসিয়াছিলেন; কিন্তু সূর্য্যপ্রকাশ বলেন যে, শ্রীগুরু তখন দীনা গ্রামে ছিলেন। যাহা হউক শ্রীগুরু তখন সমীরকে কতকগুলি ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া দিতে বলেন। সমীরের মাতুল যদিও এসময় সমীরের সঙ্গে আসিয়া ছিল, কিন্তু শ্রীগুরুতে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না। তিনি "পাঁচপীরী" সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, গুরুকে ঘোড়া দেওয়া হয়। যাহা হউক, সমীর একদিন রুটী তরকারী রন্ধন করিয়া শ্রীগুরুকে সেবা দিল। গুরু আহারে বসিলে, সমীর কিঞ্চিৎ প্রসাদ যাচ্ঞা করিল। গুরু তাহাকে কিঞ্চিৎ দিতে গেলেন; তাহাতে সে বলিল, "আপনার আহার শেষ হউক; আমি প্রসাদ লইয়া ঘরে গিয়া সকলকে দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিব।" সমীর তদনুসারে প্রসাদ লইয়া ঘরে গেল এবং নিজ ভ্রাতৃদ্বয় (লেছমীর ও ভক্তমল) ও মাতুলকে বলিল,—"আমি মহাপ্রসাদ লইয়া আসিয়াছি।" তখন সেই প্রসাদ খুলিয়া দেখে, উহা ঝট্‌কা (এক কোপে কাটা রাঁধা মাংস) আর সে রুটী তরকারী নাই! এখন সমীরের মাতুল বলিল, উহা খাইয়া কাজ নাই—উহা খাইলে হয়ত পীরগণ রাগ করিয়া অত্যাচার করিবেন; উহা মাটীতে পুতিয়া ফেল। তখন তর্ক বিতর্কের পর প্রসাদ মাটিতে প্রোথিত করা হইল। তৎপরদিন প্রাতঃকালে সমীর

গুরুগোবিন্দের নিকট পৌঁছিলে, প্রসাদ সম্বন্ধে গুরুর প্রশ্নানুসারে সমীর যথাযথ সকল বিষয় সত্য বর্ণন করিল। ইহাতে গুরু দুঃখভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এরূপে অন্নত্যাগ করায় দুর্ভিক্ষ হইবে। যাহা হউক, সমীরের ভক্তির জন্য শ্রীগুরু তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। তাহাতে সমীর বর প্রার্থনা করিল যে, শ্রীগুরু আমাকে এরূপ বর দিউন, যাহাতে আর চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে না হয়—আমার মুক্তি হয়। তাহাতে গুরু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। এইরূপে দুই দিন চলিয়া গেলে, শ্রীগুরু সমীরকে আবার বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সমীর পূর্ব্বের ন্যায় আবার মুক্তি বর প্রার্থনা করিলে, শ্রীগুরু আবার ঐ বিষয়ে নীরব হইলেন। এই রূপে আবার দিন দুই কাটিয়া গেল। এইরূপে বর প্রার্থনা করিতে করিতে এক রাত্রিতে সমীর স্বপ্ন দেখিল, যেন তাহার শরীর একটি রাজহংসে পরিণত হইল। আবার সে শরীর পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য পশুর অবয়ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে নানা প্রকার পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পুরুষ স্ত্রী রূপ পরিবর্ত্তনের পর, পুনরায় মানুষরূপ হইয়া মালয় দেশে শতাধিকবার জন্ম গ্রহণ করিল। এইরূপে এক জন্মে যেন সে পিলু ফল খাইতেছে। এমন সময় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে সে দেখিল, চর্ব্বিত পিলুফল তাহার দাঁতে লাগিয়া রহিয়াছে এবং প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়ায় গমন করিয়া দেখে, বাহ্যের সহিত পিলুফলের বীজ বাহির হইয়াছে। তখন পিলুফলের সময় নয়! এই ঘটনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সে শ্রীগুরুর নিকট গমন করিল। তখন শ্রীগুরু বলিলেন,—এইবার তোমার চুরাশী লক্ষযোনি ভ্রমণ হইয়া গেল; আর তোমার জননকষ্ট পাইতে হইবে না— তুমি মুক্ত হইলে। শ্রীগুরুর এই বর পাইয়া সমীর বিশেষ আনন্দ পাইল। এই বরের বিষয় শিখদিগের কয়েকখানি পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

কথিত আছে, ইহার পর দয়ালপুরনিবাসী এক মিস্ত্রী শিখও সমীরের ন্যায় বর প্রার্থনা করায়, শ্রীগুরু তাহারও প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

গুরুগোবিন্দ দীনাগ্রামে রহিয়াছেন এই সংবাদ শিখদিগের মধ্যে প্রচারিত হইলে, সরহিন্দবাসী একজন ধীর সাধু আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। ইঁহার নাম দয়ালদাসপুরী। সরহিন্দনগরে মাতা গুজরী ও পুত্রদ্বয় নিহত হওয়ায়, গুরু যে ঐ নগর নষ্ট হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন, সে বিষয়ে আত্মরক্ষার কোন উপায় করিবার জন্য দয়ালপুরী শ্রীগুরুকে জানাইলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর দয়ালের অনুনয় বিনয়ে তুষ্ট হইয়া, শ্রীগুরু বলিলেন,—তুমি তোমার গৃহের ছাদে উঠিয়া শঙ্খধ্বনি করিবে, ঐ শঙ্খধ্বনি যতদূর যাইবে,ততদূর তোমার শিষ্য শিখগণ রক্ষা পাইবে। বাকি অংশ নষ্ট হইবে—বাজার ময়দানে পরিণত হইবে। তদনুসারে দয়ালপুরী নিজভবনে গিয়া শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন।

ক্রমে এই সংবাদ সরহিন্দের সুবা উজিদার্খাঁর কর্ণগোচর হইল। উজিদার্খাঁ এই সংবাদ পাইয়া, সমীরের উপর পরওয়ানা জারি করিলেন যে, তুমি যখন শিখ-গুরু গোবিন্দকে নিজভবনে রাখিয়াছ,তখন এ কার্য্যের সন্তোষজনক কৈফিয়ত না দিতে পারিলে, তোমাকে রাজদ্রোহী বিবেচনা করা হইবে এবং তুমি দণ্ড পাইবে। একথা গুরুগোবিন্দকে জানান হইলে, তিনি সমীরকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি সুবার সম্মানার্থ উপঢৌকন পাঠাইয়া জানাও আমি গুরুকে গৃহে আনি নাই—তিনি যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণকরিতেছেন।" এই পরামর্শ দিবার সময় গুরু দক্ষিণ হস্তস্থিত চুলকনাগুলি তরবারী দ্বারা চুলকাইতে ছিলেন! তাহা দেখিয়া গুরুর অনুচর মানসিং বলিলেন, "গুরু পাঠানদিগের জড় উখড়াইতেছেন। কি সামান্য সুবার কথা বলিতেছ? অতঃপর বাদশা আরঙ্গজেব শ্রীগুরুর জাফরনামা (তীব্র পারসীপত্র) দ্বারা অস্থির হইবেন।" জাফরনামাতে

"ওয়া গুরুজীকা ফতে" শব্দগুলি অগ্রে ও পশ্চাতে লেখা ছিল; এবং বলা হইয়াছিল যে,আরঙ্গজেব নিজ ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য পিতাকে কারারুদ্ধ ও ভ্রাতাকে ছলনায় নিহত করিয়াছেন; ঐ সকল অপকর্ম্মের জন্য শ্রীভগবানের নিকট শ্রীগুরু আবেদন করিয়াছেন; এক্ষণে বাদশাহ কৈফিয়ত দিতে প্রস্তুত হউন;—জাফরনামা এইরূপ তীব্র ভাবে পারসী-ভাষায় লিখিত। মানসিং এইরূপ ভবিষ্যৎ বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন।

তৎপরে গুরু ঐরূপ কয়েকখানি পত্র (জাফরনামা) লিখিয়া অনুচর ধরম সিংহকে উহা লইয়া দক্ষিণদেশে যাইতে আদেশ করিলেন। তদনু-সারে ধরমসিং নীলবস্ত্র সঙ্গে লইয়া দিল্লী, আগ্রা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থান হইয়া আহমদাবাদে গিয়া পৌছিলেন। তখন সম্রাট্ আরঙ্গজেবের ছাউনি বা প্রধান আড্ডা আহমদাবাদে। ধরমসিং যে নীলবস্ত্র সঙ্গে লইয়া ছিলেন, তাহা কখন কখন পরিয়া অপর শিখদিগকে "উচকাপীর" রূপ দেখাইতে ছিলেন এবং শ্রীগুরু ধর্ম্মের জন্য এবং স্বজাতির রক্ষার জন্য কতকষ্ট সহ্য করিতেছেন, তাহা আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি যে সকল স্থান দিয়া গিয়াছিলেন, তথাকার শিখদিগকে জানাইয়া ছিলেন। ধরমসিং আগ্রা হইয়া দক্ষিণযাত্রা করিলে, গুরু অপর অনুচর দয়াসিংকেও তদ্রূপ অন্যান্য পথ দিয়া দক্ষিণে পাঠাইলেন। ধরমসিং ও দয়াসিংহের সহিত অপর শিখও গিয়াছিল। এইরূপে শিখসমাজে গুরুগোবিন্দ সিংহের বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা জানাইতে জানাইতে সকলেই আহমদাবাদে পৌছিলেন।

শ্রীগুরু যেন সমীরকে সাহস দিবার জন্যই কয়েক দিন দীনাগ্রামে থাকিয়া, তৎপরে দক্ষিণযাত্রা করিলেন। এই সময় জেঠাসিং নামক জনৈক ভক্ত শিখ আসিয়া, শ্রীগুরুর সাক্ষাৎলাভ করিল এবং মহারাজ পাতিয়ালা, মহারাজ নাভা প্রভৃতি বড় বড় রাজগণ যে বংশোদ্ভূত, সেই

বৃহৎ-বংশীয় রয়রাড় জাতির লোকেরা আসিয়া শ্রীগুরুর চাকরের কর্ম্ম করিতে লাগিল। শ্রীগুরু দীনাগ্রামের নাম লোহাগড় রাখিয়া ছিলেন এবং ঐ গ্রাম ত্যাগ করিবার সময় সমীরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন যে, তোমার বংশে লোকহিতার্থে সুরবীর জন্মিবে ।

ছদ্ম পর্ব্ব।

——:০:——

চতুর্থ পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর নানাস্থানে ভ্রমণ ও সোডীবংশীয় কৌল মিলন।

গুরুগোবিন্দ দীনাগ্রাম ত্যাগ করিয়া কিছু দূর গিয়া একটি গ্রামের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ গ্রামের নাম কি?' উত্তর. "রোথালা" গ্রাম। ("রোথালা" শব্দের অর্থ "রুক্ষ")। তাহাতে গুরু-গোবিন্দ বলিলেন, না, ইহার নাম 'রাখওয়ালা' থাকা উচিত ("রাখওয়ালা" অর্থ "রক্ষাকরণ ক্ষম")। তদবধি ঐ গ্রামকে লোকেও উহাকে "রাখওয়ালা" বলে। গুরু যখন এইরূপে চলিতেছেন, শিখগণ সঙ্গে আসিতেছে, আবার কেহ বা সঙ্গ ত্যাগও করিতেছে, কেহ বা গুড় প্রভৃতি দ্রব্য গুরুকে উপঢৌকন দিতেছে। জালাল-নিবাসী একজন শিখ একটি বর্ষা আনিয়া গুরুকে দিলে, গুরু আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,— "বর্ষাদাতার জয়"। সেই জয়ধ্বনি অন্যান্য শিখগণের মুখে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গুরু এই সময় দেখিলেন, শিখেরা পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতেছে, হাসিতেছে, খেলিতেছে—তখন বলিলেন, এই স্থানের নাম "গুরুসর" রহিল।

এইরূপে গুরু ভগতা গ্রামে পৌছিলেন। "সূর্য্যপ্রকাশে" এস্থলে ভূত কর্ত্তৃক বিবৃত বলিয়া অনেক কথার উল্লেখ আছে। পিশাচ-সিদ্ধ কয়েক জন ভক্ত হইতে এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। গুরু-

গোবিন্দ তন্মধ্যে "ভক্তা" নামক ভক্তের পৌত্রের সহিত নিকটস্থ অরণ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তথায় গুরু একটি "তিতির পক্ষী" দেখাইয়া বলিলেন, উহার একটি চক্ষু অন্ধ। ভক্তের পৌত্রেরা ঐ পক্ষীটিকে ধরিয়া দেখে, প্রকৃতই উহার এক চক্ষু কাণা; তাহাতে তাহারা বিস্মিত হয় এবং গুরুর প্রতি উহাদের বিশেষ ভক্তি হয়। অতঃপর পক্ষীটিকে মুক্তি দান করা হয়।

এই সময়ে এক শিখ নিজ শিশুপুত্র সহিত কিছু সিদ্ধ ছোলা (ঘুঘুনি) লইয়া আসিয়া, গুরুকে ঐ ছোলা ভেট দেয়। গুরু ঐ শিশু-পুত্রটিকে আদর করিয়া তাহার নাম কুঙ্গনিয়া সিং রাখিয়া ছিলেন। গুরু তিন দিন ভক্তা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

ভক্তা গ্রাম ত্যাগ করিয়া গুরু বন্দর গ্রামে পৌঁছিলেন। গুরু যে গ্রামেই যাইতেন, গ্রামের নামের ব্যুৎপত্তি ও পূর্ব্ব ইতিহাস যতটুকু পাওয়া যায়, তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন। বন্দর (বানর) গ্রামের নাম শুনিয়াই হাস্যরসের উদ্দীপনা হইল। বান্দর গোত্রীয় লোক কর্তৃক এই গ্রাম স্থাপিত হইয়াছিল।

তৎপরে গুরু বনগাদি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। কপুর সিংহের ভ্রাতা এই গ্রামে বাস করিত। গুরুগোবিন্দকে দেখিয়া, কপুরের ভ্রাতার মনে হইয়াছিল যে, তিনি তাহার বিরোধী ভ্রাতার পক্ষীয়। পরে প্রকৃত তথ্য বুঝিতে পারিয়া তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা হইয়াছিল। কপুরের বিষয় পরে বর্ণিত হইবে।

তৎপরে গুরুগোবিন্দ বহবল গ্রামে পৌঁছিলেন। তথায় অবস্থাপন্ন লোক কেহ ছিল না। গুরুর সঙ্গে অনেক শিখ; কে ইহাদের আহার দিবে? গ্রামবাসিগণ স্থির করিল যে, প্রত্যেকে অবস্থানুসারে এক বা দুইজনকে নিমন্ত্রণ করিবে। তন্মধ্যে একজন বিশেষ দরিদ্র—তাহার

লোটা (ঘটি) ও কম্বল মাত্র সম্বল। কিন্তু তাহার একজন শিখকে সেবা দিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল। সে লোটা কম্বল বন্ধক দিয়া ময়লাগর সিংহের সেবা করিল। তৎপর দিন কে কিরূপ সেবা পাইয়াছে, গুরুগোবিন্দ সকলের নিকট সংবাদ লইলেন। তন্মধ্যে দরিদ্রের অতিথি ময়লাগর সিং বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলে, গুরু সকলকেই ময়লাগর সিংহের ন্যায় সন্তোষ সাধন করিতে উপদেশ দিলেন এবং ঐ দরিদ্রকে আশীর্ব্বাদ দিলেন।

গুরুগোবিন্দ তৎপরে কপুরকোট সহরে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে মানসিং ও অন্যান্য শিখগণ ছিল। এই স্থানেই কপুর রাজের কাছারী। গুরু দেখিলেন, কপুরের দুর্গটি বেশ; উহা যদি ব্যবহার করিতে পাওয়া যায়, তবে শত্রুবিমর্দ্দন করা সহজ হয়। গুরু এক খাটিয়ায় বসিলেন। অপর খাটিয়ায় শস্ত্রসমূহ রক্ষিত হইল। ভক্তগণের মধ্যে একজন গুরুকে, অপর জন অস্ত্র-সমূহকে চামর ব্যজন করিতে লাগিল। এমন সময় কপুরসিং স্বয়ং নানা উপঢৌকন—খাদ্যাদি ঘোড়া প্রভৃতি—লইয়া আসিলেন। গুরুকে অভিবাদন করিবার পর সেখানে শিকার খেলা কিরূপ চলে এবং শিকারের দ্রব্য কি আছে ইত্যাদি প্রশ্নে কপুর বলিলেন, শিকারের উত্তম স্থান আছে এবং শিকারের জন্য কুকুর শিক্‌রে পাখী প্রভৃতি উত্তম উত্তম বস্তু আছে। কপুর যখন গুরুর নিকট উপস্থিত হয়েন, সেই সময়ে তাঁহার ও সমভিব্যাহারিগণের চলনে অত্যন্ত ধূলা উড়িতে ছিল; ময়লাগড়সিং সেই কথা উল্লেখ করায় কপুরের মনে ক্রোধ জন্মিয়াছিল; এজন্য সে অহঙ্কৃত ভাবেই গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। অস্ত্রসমূহ খাটিয়ায় রক্ষিত হইয়া পূজিত হইতেছে দেখিয়া, কপুর শিকার সম্বন্ধীয় দুই একটি কথার উত্তর দিয়াই 'অস্ত্রসমূহের ওরূপ পূজা কেন,' এই ভাবের কথা বলায়, গুরুগোবিন্দ

বলিলেন,—'এই অস্ত্রগণের সাহায্যেই আমরা শত্রুগণ হইতে আত্মরক্ষা করি, শত্রুগণকে নিহত করি—এমন কি যদি তোমার এই দুর্গের সাহায্য পাই, তাহা হইলে, তুর্কগণকে বিতাড়িত করিতে পারি।' কপুর একজন তুর্কের গোঁড়া। সে এইবাক্য শুনিয়া গুরুকে বলে,—'আপনি বলেন কি? এ রাজদ্রোহী বাক্য আমার সাক্ষাতে বলিবেন না; এমন কি আমার ভয় হয়, আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, ইহা বাদশাহের লোক জানিতে পারিলে,আমার সমস্ত ধন দৌলত সব যাইবে, আমাকেও প্রাণে মারিবে।' এইরূপ কথায় গুরু কপুরকে অভিসম্পাত করিয়া বলেন, 'তুমি তুর্ক কর্ত্তৃক নিহত হইবে, রণে মরিবে না, তুর্ক তোমায় ফাঁসি দিবে।' তখন ভীরু কপুর আর অন্য কথা না বলিয়া দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল।

এ দিকে, দীনাগ্রামে গুরুর অবস্থান কালে সরহিন্দের সুবার নিকট সমীরের যে কৈফিয়ত পত্র যায়, তদনুসারে সুবা প্রথমে গুরুর বিরুদ্ধে হাজার হাজার সৈন্য পাঠাইবেন, মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে স্থির করিলেন যে, চামকোর যুদ্ধে গুরুর যে বিক্রম দেখা গিয়াছে, তাহাতে যুদ্ধ সজ্জায় যাওয়া অপেক্ষা গুরুকে এখানে ধরিয়া আনাই শ্রেয়ঃ। এই পরামর্শ স্থির করিতে কালবিলম্ব হওয়ায়, সুবার লোক আসিয়া দেখিল যে, গুরু দীনাগ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তখন গুরুর সন্ধান করিয়া ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইল।

এ দিকে, গুরু কপুরের ব্যবহারে অসন্তুষ্টচিত্তে তাহার গ্রামত্যাগ করিয়া, ঢেল্লুগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন এস্থানে সোডীবংশীয় গুরুকুলোদ্ভবগণ বাস করিতে ছিলেন। পৃথ্বীবংশীয় বৃদ্ধ কৌল; তাহার চারিপুত্র (১) সদানন্দ (২) হরানন্দ (৩) অমূকরায় ও (৪) বনমালী; বনমালীর পুত্র অভয়রাম: অভয়রামের চারি পুত্র (১) শ্রীরাম, (২) প্রজাপৎ (৩) রাম কোয়ার ও (৪) যশপত। এই সকল সোডী-

বংশীয়গণ ও গোষ্ঠীবর্গ গুরুগোবিন্দের শুভাগমন শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। অভয়রামের পুত্র শ্রীরাম তখন শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন। শ্রীগুরুর শুভাগমন শুনিয়া তাঁহার এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, শ্রাদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত অবস্থায় হস্তস্থিত কুশাঙ্গুরীয় ত্যাগ না করিয়াই তিনি শ্রীগুরুর দর্শনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ তাঁহার হস্তস্থিত কুশাঙ্গুরীয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন সময় একি? তাহাতে তিনি যে ভাবে শ্রাদ্ধ-কার্য্য হইতে আসিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। তাহাতে গুরু বলিলেন—মুক্তপুরুষগণের উদ্দেশে একার্য্য কেন? তাহাতে শ্রীরাম বলিলেন,—শ্রীচাঁদ মাতৃ-আজ্ঞায় বাবা নানকের শ্রাদ্ধ করিয়া ছিলেন; আমি সেই মহাজন পদাঙ্কুর ধরিয়া চলিয়াছি। শ্রীরামের এই কথায় গুরু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তৎপরে বৃদ্ধ কৌল আসিয়া শ্রীগুরুকে অভিবাদন করিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে কপুরের উপর ফাঁসীর অভিসম্পাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন,—'কপুরের মূল আমাতে, এজন্য আমাকে অগ্রে নষ্ট না করিলে কপুরকে নষ্ট করা যায় না।' ইহাতে গুরু বলিলেন,—তবে তাহাই হইবে। এই কথায় কৌল দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। তখনও গুরু নীল বস্ত্র পরিয়াছিলেন। কিছু পরে কৌল পুনরায় আসিয়া গুরুকে শ্বেতবস্ত্র দিলেন। গুরু সেই শ্বেতবস্ত্র পরিয়া নীলবস্ত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং সম্মুখে অগ্নি জ্বালাইলেন। ছিন্ন নীলবস্ত্রের টুকরা একে একে অগ্নিতে ফেলিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন:—

"নীলবস্ত্রনে কাপড়ে ফাড়ে তুর্কপাঠানী আমল গিয়া, (অর্থাৎ নীলবস্ত্র ছিন্ন করায় তুর্কপাঠানের রাজত্ব গেল, ইহাই সূচিত হইতেছে)।

ইহাতে কৌল বলিলেন,—'গুরু আপনি ও কি কথা বলিতেছেন? আপনার কি মনে নাই আদি গুরু নানক কি বলিয়াছিলেন? আদি গ্রন্থে

কি লিখিত আছে?' আদিগ্রন্থে লেখা আছে,—"নীল বস্ত্রনে কাপড়ে পহরে তুর্ক পাঠানী আমলকিয়া" অর্থাৎ নীলবস্ত্রের পরিধানে তুর্কপাঠানের রাজত্ব সূচিত হইল। বৃদ্ধ কৌল আরও বলিলেন,—আপনার কি মনে নাই রামরায় গুরুবাণী উল্টাইয়া ছিলেন বলিয়া গুরুগদি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন?' অষ্টমগুরু হরকিষণের অভিষেক উপলক্ষে আমরা এ কথা পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। যাহা হউক এক্ষণে কৌলের এই কথা শুনিয়া গুরুগোবিন্দ বলিলেন,—'চাটুকার রামরায় বাদশাহের সন্তোষের জন্য গুরুবাণী উল্টাইয়াছিলেন, আর আমি,

"চার পুত দিয়ে ইস্ কাজু।
কৌন গেনে সব সদন সমাজু॥"

অর্থাৎ এই কার্য্যে চারিপুত্র (বলি) দিয়াছি; ইহার মর্ম্ম কে জানে—গুরু নানকের বর ও শাপ রক্ষা করিয়াছি। আরও বলিলেন আনন্দপুরের আনন্দ ত্যাগ করিয়াছি, খালসা সৃষ্টি করিয়াছি, আমার চারি পুত্র বলি দেওয়ায়, এক্ষণে সাতজন মহাপুরুষ-হত্যা হইয়াছে; তবে কেন একার্য্যে গুরুনানকের বাণী পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইব না।

গুরুবংশীয়গণ সাধারণ শিখ অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিক শক্তি-সম্পন্ন মনে করেন; এজন্য বৃদ্ধ কৌল মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার শক্তিতে তাঁহার প্রিয় কপুর রক্ষিত হইবে। এক্ষণে বুঝিলেন, ত্যাগ স্বীকারে ও গুরুপদে থাকায় গুরুগোবিন্দ তাঁহার অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন। তখন ওবিষয়ে তর্কাদি ত্যাগ করিয়া তিনি গুরুর আতিথ্য কার্য্যে মনোযোগী হইলেন।

ছদ্ম পর্ব্ব।

—— *:——

পঞ্চম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর নানাস্থানে ভ্রমণ ও ক্রমে যুদ্ধের উপক্রম।

ক্রমে নিজের সঙ্গে অনেক দ্রব্যাদি যুটিল দেখিয়া, গুরুগোবিন্দ তাহার অধিকাংশ উক্ত কৌলের নিকট রাখিয়া, ঢেলু গ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। পথে গ্রাম দেখিতে দেখিতে সেগুলির নামাদি জিজ্ঞাসা করেন।. এইরূপে কোন স্থানে একব্যক্তি বলিল, এখানে নিতান্ত অল্প-সংখ্যক লোকের বাস ; এগ্রামের নাম আর কি বলিব, এ সামান্য গ্রাম। তাহাতে গুরু বলিলেন, সামান্য বলিও না—আজ সামান্য বলিতেছ, এখানে এমন এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে, যদ্দ্বারা এই গ্রামই এ দেশের শ্রেষ্ঠত্ব পাইতে পারে। যাহা হউক, এইরূপে চলিতে চলিতে কোঠে ও মুলুক গ্রামের মধ্যে প্রান্তরে গিয়া তাঁবু ফেলাইলেন। সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত হইলে, পর দিন প্রাতঃকালে মুণ্ডিত মস্তক দিওয়ানা নামক এক ব্যক্তি গুরু দর্শনের জন্য তাঁবু মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিল। দ্বাররক্ষক তাহাতে বাধা দেওয়ায় ক্রমে মারামারি হইল এবং আগন্তুকের দেহে এরূপ আঘাত লাগিল যে, তৎপরেই (গুরু দর্শনের পর, গুরুর নিকট মুক্তি বর পাইয়াই) তাহার মৃত্যু হইল।

তৎপরে দিওয়ানার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া সদলে গুরু তথা হইতে জেতোসহরে গিয়া সরোবরতীরে তাঁবু ফেলিলেন। গ্রামের লোকে মহিষ

দুগ্ধ দিয়া সদল গুরুর আতিথ্য রক্ষা করিয়াছিল। এ সময় মধ্যে মধ্যে লোক মুখে শুনা যাইতে লাগিল সরহিন্দের সুবা উজিদাখাঁ গুরুকে ধরিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইতেছে। এ দিকে পূর্ব্বোক্ত কপুরসিং ঘোড়ায় চড়িয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং গুরুকে প্রণাম করিয়া বলিল,—তুর্কের (মুসলমানের) বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে যেমন ভয় হইতেছে, তেমনি গুরুর মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে মনে কষ্ট পাইতেছি। তখন গুরু তাহাকে উৎসাহিত করিয়া, এক ঢাল ও এক তরবারি দিয়া বিদায় করিলেন। গুরু একথাও বলিয়া দিলেন, এখন তুর্ক আর সে তুর্ক নাই, এখন তুর্ক কুত্তা (কুকুর) হইয়াছে। কপুরসিং চলিয়া যাওয়ার পরই এক শিখদূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, গুরুর বিরুদ্ধে সুবা উজিদাখাঁর সৈন্যদল আসিতেছে। তখন গুরু বলিলেন, এ সংবাদ কপুরকে দাও। তদুত্তরে কপুরসিং বলিয়া পাঠাইল, গুরুর ছাউনি ঐ স্থান হইতে উঠাইয়া উহা অপেক্ষা উচ্চতরস্থান রামিয়ানায় যাইতে বল। এ স্থানে থাকিলে বৃথা লোকক্ষয় হইবে।

তদনুসারে গুরু রামিয়ানা অভিমুখে যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে শিখেরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া তুর্ক বাহিনীর সংবাদ দিতেছে। পথিমধ্যে একব্যক্তি ডেলাফল (বন্য ফলসা বা ছোট কুলের ন্যায় ফল) তুলিতেছে। গুরু তাহাকে বলিলেন,—ফলগুলা ফেলিয়া দাও—সে সামান্য কতকগুলি ফেলিয়া দিল। গুরু সকল ফলগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতে বলিলেন; বিশেষ করিয়া বলায় সে এক চতুর্থাংশ রাখিয়া অবশিষ্টগুলি ছড়াইয়া ফেলিল। তখন গুরু বলিলেন,—এখানে বহু শস্য হইবে, তবে সকলগুলি ফেলিলে, ষোল আনা হইত। এক্ষণে বার আনা রকম হইবে। শিখেরা বলেন, অদ্যাপি ঐ স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য হয়, অন্যত্র সেরূপ হয় না। এ সময় পথি মধ্যে জনৈক বিড়ঙ্গ জাঠের সহিত এক শিখের দেখা হইল।

ছদ্ম পর্ব্ব

তৃতীয় পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর দীনাগ্রামে অবস্থান ও শিখ সমাগম।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, গুরুগোবিন্দ সরহিন্দের এই নৃশংস সংবাদ অর্থাৎ গুরুপুত্রদ্বয়ের এবং গুরুমাতার নিধনসংবাদটি, ঘটনার তিন-মাস পরে পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, সকল পাঠান (মুসলমান) নষ্ট হইবে, এই অভিসম্পাত শুনিয়া কল্লারাও ভীত হইল; কল্লারাও নিজে পাঠান (মুসলমান) কিন্তু গুরুর ভক্ত। শ্রীগুরু বাক্‌-সিদ্ধ, ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। তখন সে আত্মরক্ষার্থে গুরুকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে, সে নিজে ও পরিবারবর্গকে অন্তঃপুর হইতে আনাইয়া, শ্রীগুরুর পদতলে পড়িয়া থাকিবে। গুরুগোবিন্দ তখন ভক্তের বিনয়ে তুষ্ট হইয়া তাহাকে চারিখানি কৃপাণ (তরবারি) দিয়া বলিলেন, তুমি বা তোমার পুত্র পৌত্রাদিক্রমে যতদিন এই কৃপাণ চতুষ্টয়ের পূজা করিবে, সদাচারে থাকিবে, এই কৃপাণ নিজ অঙ্গে ব্যবহার না করিবে, ততদিন শত্রু তোমার কিছু করিতে পারিবে না; ইহারাই তোমায় নষ্ট হইতে রক্ষা করিবে। গুরুগোবিন্দ কল্লারাওকে এইরূপ বর দিয়া, দয়াসিং প্রভৃতি অনুচরবর্গকে খাটিয়া উঠাইতে বলিলেন। কল্লারাও তাঁহাকে নিজ ভবনে লইয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু গুরু "এখন আমি বনচারী, আমার বাসস্থান অরণ্য" এইরূপ বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। কল্লারাও

এবং তৎপুত্র ঐ কৃপাণ-পূজায় ও সদাচারে ভালই ছিল; কিন্তু তাহাদিগের দেহত্যাগের পর, কল্লারাওয়ের পৌত্র উহা অগ্রাহ্য করায় একটা হরিণ মারিতে গিয়া ঐ কৃপাণেই নিহত হয়।

গুরুগোবিন্দ তৎপরে পূর্ব্ববৎ "উচকাপীর" রূপে খাটিয়ায় বসিয়া চলিতে চলিতে পথিমধ্যে এক কুলতলায় বসিলেন। এমন সময় সেবক সিং আসিয়া তাঁহাকে একটা ঘোড়া উপঢৌকন দিল। গুরু এই ঘোড়ায় উঠিয়া খাটিয়া ত্যাগ করিলেন। তৎপরে অনুচর সহ দীনাগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই দীনাগ্রাম ও কাঙ্গড়াপুরীর অধিপতিগণ বহুদিন হইতে গুরু-ভক্ত—শিখ। পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন ইহাদিগকে বড় প্রীতি করিতেন। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ যোধবীর ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দকে যুদ্ধস্থলে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই যোধের পৌত্রত্রয় (সমীর, লছমীর ও ভক্তমল) এখন রাজত্ব (জমিদারী) করিতেছিলেন। ইঁহারা লোকমুখে গুরু গোবিন্দের শুভাগমন সংবাদ পাইয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিজভবনে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন; কিন্তু গুরু বলিলেন, তোমরা বালক—বুঝিতেছ না যে, তোমাদের গৃহে আমি গমন করিলে (আমি চলিয়া গেলেও) বাদসাহের লোক তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে। তখন তাঁহারা গুরুগোবিন্দকে এক মিস্ত্রীর ঘরে বসাইয়া কিছু দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন আনিয়া দিলেন।

এই মিস্ত্রীর ঘরে গুরুগোবিন্দ কয়েকদিন বাস করেন। এ সময়ে তিনি মৃগয়াছলে নিকটস্থ স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াইতে থাকেন। এই স্থানের প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত শ্রীগুরুর ভক্ত শিখ রূপা ও তৎপুত্র সিন্ধু ক্ষেত্রে কার্য্য করিত। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের উত্তাপে তাহারা জল পান করিত। একদিন ঐরূপ কার্য্য করিয়া পিপাসার্ত্ত হইয়া জল পান

করিতে গিয়া দেখে,জল অতি শীতল; তখন তাহাদের মনে হয়, শুনিতেছি শ্রীগুরু রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে এই জল পান করাইতে পারিলে, তবে আমাদের তৃষ্ণা মিটে। তখন তাহারা জল পান না করিয়া শ্রীগুরুর শুভাগমনের প্রত্যাশায় এই জল রাখিয়া দিয়া দুই দিন অপেক্ষা করে। প্রেমের এমনি অদ্ভুত খেলা যে, শ্রীগুরু ভক্তের বাঞ্ছা যেন মনে মনে জানিতে পারিয়া, দুইদিন পরে বেলা দুই প্রহরের সময় তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন ভক্তের যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা ভক্ত ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারে কি! যাহা হউক, গুরু সেই শীতল জল পান করিয়া দীনাগ্রামে মিস্ত্রীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

এই সময়ে নিকটস্থ অনেক শিখ আসিয়া ক্রমে ক্রমে গুরুগোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে ধরমসিং ও পরম সিং নামে দুই ভক্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা গুরুকে একটি ঘোড়া দিয়াছিলেন এবং শ্বেত কাপড় দিয়া গুরুর নীলরংয়ের কাপড় ছাড়াইয়াছিলেন। এ সময়েও গুরু ভক্তগণকে অধ্যাত্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে বিমুখ হয়েন নাই। তাঁহার মাতা ও পুত্রদ্বয় নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছেন, এই কথার উল্লেখ করিয়া কেহ আক্ষেপ করিলে, গুরুগোবিন্দ বুঝাইয়া দিতেন যে, উহাই সাংসারিক নিয়ম; মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; উহার জন্য শোক না করিয়া যাহাতে হৃদয়ে সচ্চিদানন্দের আবির্ভাব হয়, তাহা কর।

শিখেরা এ সময়ে শ্রীগুরুর নিকটে আসিয়া, পরস্পর নানা কথার আলোচনা করিতেন। কেহ বলিতেছে, কেন যুদ্ধ হইল জান? কেহ বা উত্তর করিল, শ্রীগুরুর ইচ্ছা; কেহ বা বলিল, ধর্ম্মরক্ষার্থে; কেহ বা বলিতেছে এবার যুদ্ধ হয় ত আমি অনেক পাঠান মারিব; কেহবা বলিতেছে, আমিত আছিই, আরও বিশজন বা চল্লিশ জন লোক

দিয়া যুদ্ধের সাহায্য করিব। গুরুগোবিন্দও সকলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন; কখন বা কাহারও ইচ্ছায় পুনরায় নীল রংয়ের কাপড় পরিয়া "উচকাপীরের" রূপ দেখাইতেছেন; কিন্তু সকলকেই সেই অকাল পুরুষে নির্ভর করিতে শিক্ষা দিতেছেন। "সূর্য্য-প্রকাশ" বলেন, এ সময় গুরুর সঙ্গে প্রায় পাঁচ হাজার শিখ ছিল।

এই সময়ে একদিন উক্ত সমীর আসিয়া শ্রীগুরুকে এক যোড়া শাল অর্পণ করিল। গ্রন্থান্তরে দেখা যায়, তখন গুরু ফিরোজপুর জেলার কাঙ্গার গ্রামে আসিয়াছিলেন; কিন্তু সূর্য্যপ্রকাশ বলেন যে, শ্রীগুরু তখন দীনা গ্রামে ছিলেন। যাহা হউক শ্রীগুরু তখন সমীরকে কতকগুলি ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া দিতে বলেন। সমীরের মাতুল যদিও এসময় সমীরের সঙ্গে আসিয়া ছিল, কিন্তু শ্রীগুরুতে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না। তিনি "পাঁচপীরী" সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, গুরুকে ঘোড়া দেওয়া হয়। যাহা হউক, সমীর একদিন রুটী তরকারী রন্ধন করিয়া শ্রীগুরুকে সেবা দিল। গুরু আহারে বসিলে, সমীর কিঞ্চিৎ প্রসাদ যাচ্ঞা করিল। গুরু তাহাকে কিঞ্চিৎ দিতে গেলেন; তাহাতে সে বলিল, "আপনার আহার শেষ হউক; আমি প্রসাদ লইয়া ঘরে গিয়া সকলকে দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিব।" সমীর তদনুসারে প্রসাদ লইয়া ঘরে গেল এবং নিজ ভ্রাতৃদ্বয় (লেছমীর ও ভক্তমল) ও মাতুলকে বলিল,—"আমি মহাপ্রসাদ লইয়া আসিয়াছি।" তখন সেই প্রসাদ খুলিয়া দেখে, উহা ঝট্‌কা (এক কোপে কাটা রাঁধা মাংস) আর সে রুটী তরকারী নাই! এখন সমীরের মাতুল বলিল, উহা খাইয়া কাজ নাই—উহা খাইলে হয়ত পীরগণ রাগ করিয়া অত্যাচার করিবেন; উহা মাটীতে পুতিয়া ফেল। তখন তর্ক বিতর্কের পর প্রসাদ মাটিতে প্রোথিত করা হইল। তৎপরদিন প্রাতঃকালে সমীর

গুরুগোবিন্দের নিকট পৌঁছিলে, প্রসাদ সম্বন্ধে গুরুর প্রশ্নানুসারে সমীর যথাযথ সকল বিষয় সত্য বর্ণন করিল। ইহাতে গুরু দুঃখভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, এরূপে অন্নত্যাগ করায় দুর্ভিক্ষ হইবে। যাহা হউক, সমীরের ভক্তির জন্য শ্রীগুরু তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। তাহাতে সমীর বর প্রার্থনা করিল যে, শ্রীগুরু আমাকে এরূপ বর দিউন, যাহাতে আর চুরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে না হয়—আমার মুক্তি হয়। তাহাতে গুরু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। এইরূপে দুই দিন চলিয়া গেলে, শ্রীগুরু সমীরকে আবার বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সমীর পূর্ব্বের ন্যায় আবার মুক্তি বর প্রার্থনা করিলে, শ্রীগুরু আবার ঐ বিষয়ে নীরব হইলেন। এই রূপে আবার দিন দুই কাটিয়া গেল। এইরূপে বর প্রার্থনা করিতে করিতে এক রাত্রিতে সমীর স্বপ্ন দেখিল, যেন তাহার শরীর একটি রাজহংসে পরিণত হইল। আবার সে শরীর পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য পশুর অবয়ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে নানা প্রকার পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পুরুষ স্ত্রী রূপ পরিবর্ত্তনের পর, পুনরায় মানুষরূপ হইয়া মালয় দেশে শতাধিকবার জন্ম গ্রহণ করিল। এইরূপে এক জন্মে যেন সে পিলু ফল খাইতেছে। এমন সময় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে সে দেখিল, চর্ব্বিত পিলুফল তাহার দাঁতে লাগিয়া রহিয়াছে এবং প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়ায় গমন করিয়া দেখে, বাহ্যের সহিত পিলুফলের বীজ বাহির হইয়াছে। তখন পিলুফলের সময় নয়! এই ঘটনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সে শ্রীগুরুর নিকট গমন করিল। তখন শ্রীগুরু বলিলেন,—এইবার তোমার চুরাশী লক্ষযোনি ভ্রমণ হইয়া গেল; আর তোমায় জননকষ্ট পাইতে হইবে না—তুমি মুক্ত হইলে। শ্রীগুরুর এই বর পাইয়া সমীর বিশেষ আনন্দ পাইল। এই বরের বিষয় শিখদিগের কয়েকখানি পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

কথিত আছে, ইহার পর দয়ালপুরনিবাসী এক মিস্ত্রী শিখও সমীরের ন্যায় বর প্রার্থনা করায়, শ্রীগুরু তাহারও প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

গুরুগোবিন্দ দীনাগ্রামে রহিয়াছেন এই সংবাদ শিখদিগের মধ্যে প্রচারিত হইলে, সরহিন্দবাসী একজন ধীর সাধু আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন। ইঁহার নাম দয়ালদাসপুরী। সরহিন্দনগরে মাতা গুজরী ও পুত্রদ্বয় নিহত হওয়ায়, গুরু যে ঐ নগর নষ্ট হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন, সে বিষয়ে আত্মরক্ষার কোন উপায় করিবার জন্য দয়ালপুরী শ্রীগুরুকে জানাইলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর দয়ালের অনুনয় বিনয়ে তুষ্ট হইয়া, শ্রীগুরু বলিলেন,—তুমি তোমার গৃহের ছাদে উঠিয়া শঙ্খধ্বনি করিবে, ঐ শঙ্খধ্বনি যতদূর যাইবে,ততদূর তোমার শিষ্য শিখগণ রক্ষা পাইবে। বাকি অংশ নষ্ট হইবে—বাজার ময়দানে পরিণত হইবে। তদনুসারে দয়ালপুরী নিজভবনে গিয়া শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন।

ক্রমে এই সংবাদ সরহিন্দের সুবা উজিদার্খাঁর কর্ণগোচর হইল। উজিদার্খাঁ এই সংবাদ পাইয়া, সমীরের উপর পরওয়ানা জারি করিলেন যে, তুমি যখন শিখ-গুরু গোবিন্দকে নিজভবনে রাখিয়াছ,তখন এ কার্য্যের সন্তোষজনক কৈফিয়ত না দিতে পারিলে, তোমাকে রাজদ্রোহী বিবেচনা করা হইবে এবং তুমি দণ্ড পাইবে। একথা গুরুগোবিন্দকে জানান হইলে, তিনি সমীরকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি সুবার সম্মানার্থ উপঢৌকন পাঠাইয়া জানাও আমি গুরুকে গৃহে আনি নাই—'তিনি যদৃচ্ছাক্রমে বচরণকরিতেছেন।" এই পরামর্শ দিবার সময় গুরু দক্ষিণ হস্তস্থিত চুলকনাগুলি তরবারী দ্বারা চুলকাইতে ছিলেন! তাহা দেখিয়া গুরুর অনুচর মানসিং বলিলেন, "গুরু পাঠানদিগের জড় উখড়াইতেছেন। কি সামান্য সুবার কথা বলিতেছ? অতঃপর বাদশা আরঙ্গজেব শ্রীগুরুর জাফরনামা (তীব্র পারসীপত্র) দ্বারা অস্থির হইবেন।" জাফরনামাতে

"ওয়া গুরুজীকা ফতে" শব্দগুলি অগ্রে ও পশ্চাতে লেখা ছিল; এবং বলা হইয়াছিল যে,আরঙ্গজেব নিজ ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য পিতাকে কারারুদ্ধ ও ভ্রাতাকে ছলনায় নিহত করিয়াছেন; ঐ সকল অপকর্ম্মের জন্য শ্রীভগবানের নিকট শ্রীগুরু আবেদন করিয়াছেন; এক্ষণে বাদশাহ কৈফিয়ত দিতে প্রস্তুত হউন;—জাফরনামা এইরূপ তীব্র ভাবে পারসী-ভাষায় লিখিত। মানসিং এইরূপ ভবিষ্যৎ বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন।

তৎপরে গুরু ঐরূপ কয়েকখানি পত্র (জাফরনামা) লিখিয়া অনুচর ধরম সিংহকে উহা লইয়া দক্ষিণদেশে যাইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ধরমসিং নীলবস্ত্র সঙ্গে লইয়া দিল্লী, আগ্রা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থান হইয়া আহমদাবাদে গিয়া পৌছিলেন। তখন সম্রাট্ আরঙ্গজেবের ছাউনি বা প্রধান আড্ডা আহমদাবাদে। ধরমসিং যে নীলবস্ত্র সঙ্গে লইয়া ছিলেন, তাহা কখন কখন পরিয়া অপর শিখদিগকে "উচকাপীর" রূপ দেখাইতে ছিলেন এবং শ্রীগুরু ধর্ম্মের জন্য এবং স্বজাতির রক্ষার জন্য কতকষ্ট সহ্য করিতেছেন, তাহা আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি যে সকল স্থান দিয়া গিয়াছিলেন, তথাকার শিখদিগকে জানাইয়া ছিলেন। ধরমসিং আগ্রা হইয়া দক্ষিণযাত্রা করিলে, গুরু অপর অনুচর দয়াসিংকেও তদ্রূপ অন্যান্য পথ দিয়া দক্ষিণে পাঠাইলেন। ধরমসিং ও দয়াসিংহের সহিত অপর শিখও গিয়াছিল। এইরূপে শিখসমাজে গুরুগোবিন্দ সিংহের বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা জানাইতে জানাইতে সকলেই আহমদাবাদে পৌঁছিলেন।

শ্রীগুরু যেন সমীরকে সাহস দিবার জন্যই কয়েক দিন দীনাগ্রামে থাকিয়া, তৎপরে দক্ষিণযাত্রা করিলেন। এই সময় জেঠাসিং নামক জনৈক ভক্ত শিখ আসিয়া, শ্রীগুরুর সাক্ষাৎলাভ করিল এবং মহারাজ পাতিয়ালা, মহারাজ নাভা প্রভৃতি বড় বড় রাজগণ যে বংশোদ্ভূত, সেই

বৃহৎ-বংশীয় রয়রাড় জাতির লোকেরা আসিয়া শ্রীগুরুর চাকরের কর্ম্ম করিতে লাগিল। শ্রীগুরু দীনাগ্রামের নাম লোহাগড় রাখিয়া ছিলেন এবং ঐ গ্রাম ত্যাগ করিবার সময় সমীরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন যে, তোমার বংশে লোকহিতার্থে সুরবীর জন্মিবে।

ছদ্ম পৰ্ব্ব।

——:০:——

চতুর্থ পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর নানাস্থানে ভ্রমণ ও সোডীবংশীয় কৌল মিলন।

গুরুগোবিন্দ দীনাগ্রাম ত্যাগ করিয়া কিছু দূর গিয়া একটি গ্রামের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ গ্রামের নাম কি?' উত্তর "রোথালা" গ্রাম। ("রোথালা" শব্দের অর্থ "রুক্ষ")। তাহাতে গুরু-গোবিন্দ বলিলেন, না, ইহার নাম 'রাখওয়ালা' থাকা উচিত ("রাখওয়ালা" অর্থ "রক্ষাকরণ ক্ষম")। তদবধি ঐ গ্রামকে লোকেও উহাকে "রাখওয়ালা" বলে। গুরু যখন এইরূপে চলিতেছেন, শিখগণ সঙ্গে আসিতেছে, আবার কেহ বা সঙ্গ ত্যাগও করিতেছে, কেহ বা গুড় প্রভৃতি দ্রব্য গুরুকে উপঢৌকন দিতেছে। জালাল-নিবাসী একজন শিখ একটি বর্ষা আনিয়া গুরুকে দিলে, গুরু আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,— "বর্ষাদাতার জয়"। সেই জয়ধ্বনি অন্যান্য শিখগণের মুখে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। গুরু এই সময় দেখিলেন, শিখেরা পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতেছে, হাসিতেছে, খেলিতেছে—তখন বলিলেন, এই স্থানের নাম "গুরুসর" রহিল।

এইরূপে গুরু ভগতা গ্রামে পৌছিলেন। "সূর্য্যপ্রকাশে" এস্থলে ভূত কর্তৃক বিবৃত বলিয়া অনেক কথার উল্লেখ আছে। পিশাচ-সিদ্ধ কয়েক জন ভক্ত হইতে এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। গুরু-

গোবিন্দ তন্মধ্যে "ভক্তো" নামক ভক্তের পৌত্রের সহিত নিকটস্থ অরণ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তথায় গুরু একটি "তিতির পক্ষী" দেখাইয়া বলিলেন, উহার একটি চক্ষু অন্ধ। ভক্তের পৌত্রেরা ঐ পক্ষীটিকে ধরিয়া দেখে, প্রকৃতই উহার এক চক্ষু কাণা; তাহাতে তাহারা বিস্মিত হয় এবং গুরুর প্রতি উহাদের বিশেষ ভক্তি হয়। অতঃপর পক্ষীটিকে মুক্তি দান করা হয়।

এই সময়ে এক শিখ নিজ শিশুপুত্র সহিত কিছু সিদ্ধ ছোলা (ঘুঘুনি) লইয়া আসিয়া, গুরুকে ঐ ছোলা ভেট দেয়। গুরু ঐ শিশু-পুত্রটিকে আদর করিয়া তাহার নাম কুঙ্গনিয়া সিং রাখিয়া ছিলেন। গুরু তিন দিন ভক্তা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

ভক্তা গ্রাম ত্যাগ করিয়া গুরু বন্দর গ্রামে পৌছিলেন। গুরু যে গ্রামেই যাইতেন, গ্রামের নামের ব্যুৎপত্তি ও পূর্ব্ব ইতিহাস যতটুকু পাওয়া যায়, তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেন। বন্দর (বানর) গ্রামের নাম শুনিয়াই হাস্যরসের উদ্দীপনা হইল। বান্দর গোত্রীয় লোক কর্ত্তৃক এই গ্রাম স্থাপিত হইয়াছিল।

তৎপরে গুরু বনগাদি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। কপুর সিংহের ভ্রাতা এই গ্রামে বাস করিত। গুরুগোবিন্দকে দেখিয়া, কপুরের ভ্রাতার মনে হইয়াছিল যে, তিনি তাহার বিরোধী ভ্রাতার পক্ষীয়। পরে প্রকৃত তথ্য বুঝিতে পারিয়া তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা হইয়াছিল। কপুরের বিষয় পরে বর্ণিত হইবে।

তৎপরে গুরুগোবিন্দ বহবল গ্রামে পৌঁছিলেন। তথায় অবস্থাপন্ন লোক কেহ ছিল না। গুরুর সঙ্গে অনেক শিখ; কে ইহাদের আহার দিবে? গ্রামবাসিগণ স্থির করিল যে, প্রত্যেকে অবস্থানুসারে এক বা দুইজনকে নিমন্ত্রণ করিবে। তন্মধ্যে একজন বিশেষ দরিদ্র—তাহার

লোটা (ঘটি) ও কম্বল মাত্র সম্বল। কিন্তু তাহার একজন শিখকে সেবা দিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল। সে লোটা কম্বল বন্ধক দিয়া ময়লাগর সিংহের সেবা করিল। তৎপর দিন কে কিরূপ সেবা পাইয়াছে, গুরুগোবিন্দ সকলের নিকট সংবাদ লইলেন। তন্মধ্যে দরিদ্রের অতিথি ময়লাগর সিং বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলে, গুরু সকলকেই ময়লাগর সিংহের ন্যায় সন্তোষ সাধন করিতে উপদেশ দিলেন এবং ঐ দরিদ্রকে আশীর্ব্বাদ দিলেন।

গুরুগোবিন্দ তৎপরে কপুরকোট সহরে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে মানসিং ও অন্যান্য শিখগণ ছিল। এই স্থানেই কপুর রাজের কাছারী। গুরু দেখিলেন, কপুরের দুর্গটি বেশ; উহা যদি ব্যবহার করিতে পাওয়া যায়, তবে শত্রুবিমর্দ্দন করা সহজ হয়। গুরু এক খাটিয়ায় বসিলেন। অপর খাটিয়ায় শস্ত্রসমূহ রক্ষিত হইল। ভক্তগণের মধ্যে একজন গুরুকে, অপর জন অস্ত্র-সমূহকে চামর ব্যজন করিতে লাগিল। এমন সময় কপুরসিং স্বয়ং নানা উপঢৌকন—খাদ্যাদি ঘোড়া প্রভৃতি—লইয়া আসিলেন। গুরুকে অভিবাদন করিবার পর সেখানে শিকার খেলা কিরূপ চলে এবং শিকারের দ্রব্য কি আছে ইত্যাদি প্রশ্নে কপুর বলিলেন, শিকারের উত্তম স্থান আছে এবং শিকারের জন্য কুকুর শিক্‌রে পাখী প্রভৃতি উত্তম উত্তম বস্তু আছে। কপুর যখন গুরুর নিকট উপস্থিত হয়েন, সেই সময়ে তাঁহার ও সমভিব্যাহারিগণের চলনে অত্যন্ত ধূলা উড়িতে ছিল; ময়লাগড়সিং সেই কথা উল্লেখ করায় কপুরের মনে ক্রোধ জন্মিয়াছিল; এজন্য সে অহঙ্কৃত ভাবেই গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। অস্ত্রসমূহ খাটিয়ায় রক্ষিত হইয়া পূজিত হইতেছে দেখিয়া, কপুর শিকার সম্বন্ধীয় দুই একটি কথার উত্তর দিয়াই 'অস্ত্রসমূহের ওরূপ পূজা কেন,' এই ভাবের কথা বলায়, গুরুগোবিন্দ

বলিলেন,—'এই অস্ত্রগণের সাহায্যেই আমরা শত্রুগণ হইতে আত্মরক্ষা করি, শত্রুগণকে নিহত করি—এমন কি যদি তোমার এই দুর্গের সাহায্য পাই. তাহা হইলে, তুর্কগণকে বিতাড়িত করিতে পারি।' কপুর একজন তুর্কের গোঁড়া। সে এইবাক্য শুনিয়া গুরুকে বলে,—'আপনি বলেন কি? এ রাজদ্রোহী বাক্য আমার সাক্ষাতে বলিবেন না; এমন কি আমার ভয় হয়. আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, ইহা বাদশাহের লোক জানিতে পারিলে,আমার সমস্ত ধন দৌলত সব যাইবে, আমাকেও প্রাণে মারিবে।' এইরূপ কথায় গুরু কপুরকে অভিসম্পাত করিয়া বলেন, 'তুমি তুর্ক কর্ত্তৃক নিহত হইবে, রণে মরিবে না, তুর্ক তোমায় ফাঁসি দিবে।' তখন ভীরু কপুর আর অন্য কথা না বলিয়া দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল।

এ দিকে, দীনাগ্রামে গুরুর অবস্থান কালে সরহিন্দের সুবার নিকট সমীরের যে কৈফিয়ত পত্র যায়, তদনুসারে সুবা প্রথমে গুরুর বিরুদ্ধে হাজার হাজার সৈন্য পাঠাইবেন, মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে স্থির করিলেন যে, চামকোর যুদ্ধে গুরুর যে বিক্রম দেখা গিয়াছে, তাহাতে যুদ্ধ সজ্জায় যাওয়া অপেক্ষা গুরুকে এখানে ধরিয়া আনাই শ্রেয়ঃ। এই পরামর্শ স্থির করিতে কালবিলম্ব হওয়ায়, সুবার লোক আসিয়া দেখিল যে, গুরু দীনাগ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তখন গুরুর সন্ধান করিয়া ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইল।

এ দিকে, গুরু কপুরের ব্যবহারে অসন্তুষ্টচিত্তে তাহার গ্রামত্যাগ করিয়া, ঢেল্লুগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন এস্থানে সোডীবংশীয় গুরুকুলোদ্ভবগণ বাস করিতে ছিলেন। পৃথ্বীবংশীয় বৃদ্ধ কৌল; তাহার চারিপুত্র (১) সদানন্দ (২) হরানন্দ (৩) অমুকরায় ও (৪) বনমালী ; বনমালীর পুত্র অভয়রাম : অভয়রামের চারি পুত্র (১) শ্রীরাম, (২) প্রজাপৎ (৩) রাম কোয়ার ও (৪) যশপত। এই সকল সোডী-

বংশীয়গণ ও গোষ্ঠীবর্গ গুরুগোবিন্দের শুভাগমন শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। অভয়রামের পুত্র শ্রীরাম তখন শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন। শ্রীগুরুর শুভাগমন শুনিয়া তাঁহার এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, শ্রাদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত অবস্থায় হস্তস্থিত কুশাঙ্গুরীয় ত্যাগ না করিয়াই তিনি শ্রীগুরুর দর্শনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ তাঁহার হস্তস্থিত কুশাঙ্গুরীয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন সময় একি? তাহাতে তিনি যে ভাবে শ্রাদ্ধ-কার্য্য হইতে আসিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। তাহাতে গুরু বলিলেন—মুক্তপুরুষগণের উদ্দেশে একার্য্য কেন? তাহাতে শ্রীরাম বলিলেন,—শ্রীচাঁদ মাতৃ-আজ্ঞায় বাবা নানকের শ্রাদ্ধ করিয়া ছিলেন; আমি সেই মহাজন পদাঙ্কুর ধরিয়া চলিয়াছি। শ্রীরামের এই কথায় গুরু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তৎপরে বৃদ্ধ কৌল আসিয়া শ্রীগুরুকে অভিবাদন করিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে কপুরের উপর ফাঁসীর অভিসম্পাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন,—'কপুরের মূল আমাতে, এজন্য আমাকে অগ্রে নষ্ট না করিলে কপুরকে নষ্ট করা যায় না।' ইহাতে গুরু বলিলেন,—তবে তাহাই হইবে। এই কথায় কৌল দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। তখনও গুরু নীল বস্ত্র পরিয়াছিলেন। কিছু পরে কৌল পুনরায় আসিয়া গুরুকে শ্বেতবস্ত্র দিলেন। গুরু সেই শ্বেতবস্ত্র পরিয়া নীলবস্ত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং সম্মুখে অগ্নি জ্বালাইলেন। ছিন্ন নীলবস্ত্রের টুকরা একে একে অগ্নিতে ফেলিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন :—

"নীলবস্ত্রনে কাপড়ে ফাড়ে তুর্কপাঠানী আমল গিয়া, (অর্থাৎ নীলবস্ত্র ছিন্ন করায় তুর্কপাঠানের রাজত্ব গেল, ইহাই সূচিত হইতেছে)।

ইহাতে কৌল বলিলেন,—'গুরু আপনি ও কি কথা বলিতেছেন? আপনার কি মনে নাই আদি গুরু নানক কি বলিয়াছিলেন? আদি গ্রন্থে

কি লিখিত আছে?' আদিগ্রন্থে লেখা আছে,—"নীল বস্ত্রনে কাপড়ে পহরে তুর্ক পাঠানী আমলকিয়া" অর্থাৎ নীলবস্ত্রের পরিধানে তুর্কপাঠানের রাজত্ব সূচিত হইল। বৃদ্ধ কৌল আরও বলিলেন,—আপনার কি মনে নাই রামরায় গুরুবাণী উল্টাইয়া ছিলেন বলিয়া গুরুগদি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন?' অষ্টমগুরু হরকিষণের অভিষেক উপলক্ষে আমরা এ কথা পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। যাহা হউক এক্ষণে কৌলের এই কথা শুনিয়া গুরুগোবিন্দ বলিলেন,—'চাটুকার রামরায় বাদশাহের সন্তোষের জন্য গুরুবাণী উল্টাইয়াছিলেন, আর আমি,

"চার পুত দিয়ে ইস্ কাজু।
কৌন গেনে সব সদন সমাজু॥"

অর্থাৎ এই কার্য্যে চারিপুত্র (বলি) দিয়াছি; ইহার মর্ম্ম কে জানে—গুরু নানকের বর ও শাপ রক্ষা করিয়াছি। আরও বলিলেন আনন্দপুরের আনন্দ ত্যাগ করিয়াছি, খালসা সৃষ্টি করিয়াছি, আমার চারি পুত্র বলি দেওয়ায়, এক্ষণে সাতজন মহাপুরুষ-হত্যা হইয়াছে; তবে কেন একার্য্যে গুরুনানকের বাণী পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইব না।

গুরুবংশীয়গণ সাধারণ শিখ অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিক শক্তিসম্পন্ন মনে করেন; এজন্য বৃদ্ধ কৌল মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার শক্তিতে তাঁহার প্রিয় কপুর রক্ষিত হইবে। এক্ষণে বুঝিলেন, ত্যাগ স্বীকারে ও গুরুপদে থাকায় গুরুগোবিন্দ তাঁহার অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন। তখন ওবিষয়ে তর্কাদি ত্যাগ করিয়া তিনি গুরুর আতিথ্য কার্য্যে মনোযোগী হইলেন।

ছদ্ম পর্ব্ব।

—— *:——

পঞ্চম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর নানাস্থানে ভ্রমণ ও ক্রমে যুদ্ধের উপক্রম।

ক্রমে নিজের সঙ্গে অনেক দ্রব্যাদি যুটিল দেখিয়া, গুরুগোবিন্দ তাহার অধিকাংশ উক্ত কৌলের নিকট রাখিয়া, ঢেলু গ্রাম ত্যাগ করিয়া ছিলেন। পথে গ্রাম দেখিতে দেখিতে সেগুলির নামাদি জিজ্ঞাসা করেন। এইরূপে কোন স্থানে একব্যক্তি বলিল, এখানে নিতান্ত অল্প-সংখ্যক লোকের বাস; এগ্রামের নাম আর কি বলিব, এ সামান্য গ্রাম। তাহাতে গুরু বলিলেন, সামান্য বলিও না—আজ সামান্য বলিতেছ, এখানে এমন এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে, যদ্দ্বারা এই গ্রামই এ দেশের শ্রেষ্ঠত্ব পাইতে পারে। যাহা হউক, এইরূপে চলিতে চলিতে কোঠে ও মুলুক গ্রামের মধ্যে প্রান্তরে গিয়া তাঁবু ফেলাইলেন। সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত হইলে, পর দিন প্রাতঃকালে মুণ্ডিত মস্তক দিওয়ানা নামক এক ব্যক্তি গুরু দর্শনের জন্য তাঁবু মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিল। দ্বাররক্ষক তাহাতে বাধা দেওয়ায় ক্রমে মারামারি হইল এবং আগন্তুকের দেহে এরূপ আঘাত লাগিল যে, তৎপরেই (গুরু দর্শনের পর, গুরুর নিকট মুক্তি বর পাইয়াই) তাহার মৃত্যু হইল।

তৎপরে দিওয়ানার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া সদলে গুরু তথা হইতে জেতোসহরে গিয়া সরোবরতীরে তাঁবু ফেলিলেন। গ্রামের লোকে মহিষ

দুগ্ধ দিয়া সদল গুরুর আতিথ্য রক্ষা করিয়াছিল। এ সময় মধ্যে মধ্যে লোক মুখে শুনা যাইতে লাগিল সরহিন্দের সুবা উজিদার্খা গুরুকে ধরিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইতেছে। এ দিকে পূর্ব্বোক্ত কপুরসিং ঘোড়ায় চড়িয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং গুরুকে প্রণাম করিয়া বলিল,—তুর্কের (মুসলমানের) বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে যেমন ভয় হইতেছে, তেমনি গুরুর মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে মনে কষ্ট পাইতেছি। তখন গুরু তাহাকে উৎসাহিত করিয়া, এক ঢাল ও এক তরবারি দিয়া বিদায় করিলেন। গুরু একথাও বলিয়া দিলেন, এখন তুর্ক আর সে তুর্ক নাই, এখন তুর্ক কুত্তা (কুকুর) হইয়াছে। কপুরসিং চলিয়া যাওয়ার পরই এক শিখদূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, গুরুর বিরুদ্ধে সুবা উজিদার্খার সৈন্যদল আসিতেছে। তখন গুরু বলিলেন, এ সংবাদ কপুরকে দাও। তদুত্তরে কপুরসিং বলিয়া পাঠাইল, গুরুর ছাউনি ঐ স্থান হইতে উঠাইয়া উহা অপেক্ষা উচ্চতরস্থান রামিয়ানায় যাইতে বল। এ স্থানে থাকিলে বৃথা লোকক্ষয় হইবে।

তদনুসারে গুরু রামিয়ানা অভিমুখে যাত্রা করিলেন ; পথিমধ্যে শিখেরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া তুর্ক বাহিনীর সংবাদ দিতেছে। পথিমধ্যে একব্যক্তি ডেলাফল (বন্য ফলসা বা ছোট কুলের ন্যায় ফল) তুলিতেছে। গুরু তাহাকে বলিলেন,—ফলগুলা ফেলিয়া দাও—সে সামান্য কতকগুলি ফেলিয়া দিল। গুরু সকল ফলগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতে বলিলেন ; বিশেষ করিয়া বলায় সে এক চতুর্থাংশ রাখিয়া অবশিষ্টগুলি ছড়াইয়া ফেলিল। তখন গুরু বলিলেন,—এখানে বহু শস্য হইবে, তবে সকলগুলি ফেলিলে, যোল আনা হইত। এক্ষণে বার আনা রকম হইবে। শিখেরা বলেন, অদ্যাপি ঐ স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য হয়, অন্যত্র সেরূপ হয় না। এ সময় পথি মধ্যে জনৈক বিড়জ জাঠের সহিত এক শিখের দেখা হইল।

শিখ ঐ জাঠকে বলে, সুবা উজিদাখাঁর সৈন্য এই দিকে আসিতেছে; তাহারা যদি জিজ্ঞাসা করে, যে শ্রীগুরু কোন দিকে গেলেন বলিতে পার? তাহা হইলে বলিও না। বিড়ঙ্গ জাঠ বলিল, কেন বলিব না? না বলিলে, হয়ত আমায় হত্যা করিবে এবং বলিলে হয়ত পুরস্কৃত হইব। শিখ তথাপি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল; কিন্তু ঐ জাঠ কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। এইরূপ অনেকস্থলেই হইতেছে, তবে দেশের লোকের মনোভাব বুঝাইবার জন্য "সূর্য্যপ্রকাশ" দৃষ্টান্তস্বরূপ এই শিখ ও বিড়ঙ্গ জাঠ সংবাদটীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময় গুরুভক্ত রূপা শ্রীগুরু জন্য গুড় লইয়া যাইতেছিল; তাহার সহিত ঐ বিড়ঙ্গজাঠের দেখা হয়। সে রূপাকেও ঐরূপ বলায়, রূপা দুঃখিত হইয়া বলে,—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ত্যাগী গুরুর প্রতি তুমি এরূপ ব্যবহার করিলে নিজেই নষ্ট হইবে।

এই সময়ে অমৃত সহর অঞ্চলের শিখেরা সংবাদ পাইল যে, শ্রীগুরু ঐ অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; ইহাতে শিখেরা আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিল যে, গুরু স্বধর্ম্মরক্ষার্থে পুত্রপরিবার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তথাপি সে চেষ্টার এখনও নিবৃত্তি নাই; আর আমরা দিব্য ভোগ বিলাসে রহিয়াছি; তাঁহাকে সামান্য সাহায্যও করিতেছি না! শিখদিগের মনের ভাব এইরূপ হওয়ায় তাহারা পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, আইস আমরা গিয়া শ্রীগুরুর সাহায্যে নিযুক্ত হই; অন্ততঃ দুই তিন শত শিখ অবিলম্বে গুরুর সাহায্যার্থে প্রেরিত হউক। কেহ বলিল, শ্রীগুরু ত শ্রীমুখে বলিয়াছেন, "গুরুর খালসা এবং খালসার গুরু" আইস আমরা মধ্যস্থ হইয়া আপাততঃ বাদশাহের সহিত শ্রীগুরুর মিলন করাইয়া দিই,—এই সকল পরামর্শ এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহও চলিতে লাগিল।

ক্রমে অমৃত সহরের শিখেরা হরিকাপত্তন নামক স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর

হইল; গুরুও ক্রমে রামিয়ানা অতিক্রম করিয়া অরণ্য মধ্যে চলিয়াছেন, এমন সময় বেড়াড়-গোত্রীয় সপুত্র দানসিং অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়া শ্রীগুরুর সহিত মিলিত হইল। সকলেই বলিতেছিল যে সুবার সৈন্য ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। শ্রীগুরু অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন, তৎপরে দান সিংহের পুত্র ও তৎপশ্চাতে গুরুর অনুচরবর্গ ও দানসিং সকলেই অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছেন। সুবার সৈন্য আসিতেছে,—দ্রুতবেগে চলুন বলিয়া দান সিংহের পুত্র গুরুকে যতই তাগাদা করেন গুরুর চলন যেন ততই মৃদু হইতেছে! ক্রমে দান সিংহের পুত্র ব্যস্ত হইয়া গুরুর অশ্বকে পশ্চাৎ হইতে কশাঘাত করে! তখন গুরু বলিয়া উঠেন,—'তুমি এত ব্যস্ত; অতএব নিঃসন্তান হইবে।' গুরুর এই বচন দানসিংহের কর্ণগোচর হওয়াতে তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল এবং সে আস্তেব্যস্তে গুরুর নিকটে আসিয়া বহু অনুনয় বিনয় করিয়া বালকের উপর সদয় হইবার জন্য বলিতে লাগিল। তৎপরে গুরুর শান্তভাব দেখিয়া বলিল,—শিকার পাইলে, মহাবলশালী ব্যাঘ্রাদি মুখব্যাদান করিয়া কামড়ায়, আবার সেই মুখ দিয়াই আপন শাবককে যখন ধরে, তাহাতে দাঁত লাগে না; আশা করি আপনিও তদ্রূপ এই বালককে দাঁত লাগিতে দিবেন না।" 'তাহাই হইবে,' বলিয়া গুরু তৃষ্ণায় জল চাহিলেন।

'কাহার নিকট জল থাকে ত গুরুকে একটু জল দাও, কারণ নিকটে কোন জলাশয় নাই'—এই কথা ক্রমে সকলেরই মুখে বাহির হইতে লাগিল। একজনের নিকট ছাগ চর্ম্মের মসকে অল্প জল ছিল; কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল। গুরু যেন ইহা জানিতে পারিয়াই পুনঃপুনঃ জল চাহিতে লাগিলেন। ক্রমে গুরু বলিলেন,—কাহার নিকট জল থাকে ত মূল্য দিয়া জল লওয়া হইবে। তখন জলবাহী ব্যক্তি বলিল, আমার নিকট অল্প জল আছে। গুরু মূল্য দিয়া তাহার নিকট হইতে একঘটী

জল লইয়া, এক ঢোক মাত্র পান করিয়া অবশিষ্ট জল 'ময়লা' বলিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় অন্য জল চাহিলেন!

এইরূপে চলিতে চলিতে সদল গুরু মদ্রদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন অমৃত সহর অঞ্চলের কয়েক জন শিখ আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ "বে-দাওয়া" লিখিয়া দিয়া আনন্দপুর হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। এই "বে-দাওয়া" লিখনের সময় আনন্দপুরে কি বিপদ, তাহা পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে। এই সকল শিখ এখন আসিয়া প্রথমে গুরুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গুরু নীরব—গম্ভীর। গুরু অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ক্রমে তাহারা বলিতে লাগিল, এখন আর প্রবল প্রতাপ সম্রাটের সঙ্গে বিবাদ না করিয়া মিলন করা যাউক। এইরূপ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরু বলিলেন,—' তোমাদের ইচ্ছা হয়, তোমরা 'শিখ নহি' এই কথা লিখিয়া দিয়া চলিয়া যাইতে পার। যখন প্রবলপ্রতাপ রাজস্ব সচিব চণ্ডুশার কন্যার সহিত গুরুপুত্রের বিবাহের কথা হয়, তাহাতে গুরু শিখদিগের কথা অনুমোদন করিয়াছিলেন; যখন গুরু তেগবাহাদুর সম্রাটের কর-কবলিত হইয়াছিলেন, তখন গুরু হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থে শিখদিগের কথা রক্ষা করিয়া নিজ মস্তক দিয়াছিলেন, আর আজ কিনা তোমরা ভীরুর ন্যায় সম্রাটের সহিত মিলন বাঞ্ছা করিতেছ—ছি!' তখন শাপভয়ে আগন্তুক শিখগণ পশ্চাৎপদ হইল; প্রায়:চল্লিশজন "শিখ নহি" লিখিয়াছিল। শ্রীগুরু সেই লিখন পকেটস্থ করিয়া পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলেই 'ঐ শত্রু পক্ষ আসিতেছে' বলিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিল।

"বেদাওয়া" শিখগণ শ্রীগুরুর নিকট হইতে বিদায় হইয়াই অনুতাপাগ্নিতে পতিত হইল। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, আমরা এ কি করিলাম—কতকাল ধরিয়া শ্রীগুরুর আশ্রয়ে ছিলাম, আর আজ এই

বিপদের দিনে শ্রীগুরুকে ত্যাগ করিয়া বসিলাম। তখন তাহারা কিরূপে পুনরায় 'দাওয়া' পাইবে এই বিষয় আলোচনা করিতে করিতে স্থির করিল—'এই সুযোগে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেওয়াই স্থির—একদিন ত মরিতেই হইবে।'

এ দিকে, "ঐ শত্রু আসিতেছে—" "সত্বরে অদূরের উচ্চভূমি অধিকার কর—উহার নিকটে যে জলাশয় আছে তাহা অধিকার কর" ইত্যাদি শব্দ গুরুর নিকটস্থ দানসিং প্রভৃতি শিখগণ বলিতে লাগিল। ঐ জলাশয়ের নাম "খেদরানা তালাও।" গুরু ক্রমে খেদরানা তালাও অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন ; মধ্যে মধ্যে ধনুকে টঙ্কার দিতে লাগিলেন।

ছদ্ম পর্ব্ব।

—•—

ষষ্ঠ পর্ব্বাধ্যায়।

মুক্তেসর বা খেদরানা তালাও যুদ্ধ।

'বেদাওয়া' শিখগণ অনেকে মদ্রদেশবাসী। তাহারা সত্বরেই কতকগুলি বন্দুক তোপ সংগ্রহ করিয়া ফেলিল এবং স্থির করিল, গুরু যখন আমাদিগকে ত্যাগ করিলেন, তখন আমরা গুরুর সন্নিকটে যাইব না। শত্রুপক্ষ ও গুরুপক্ষের মধ্যে কতকগুলি কুলগাছ ও অন্যান্য গাছ ছিল। সেই গাছগুলিকে উহারা বড় বড় কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ফেলিল, যেন দূর হইতে অনেক তাঁবু বলিয়া মনে হয় ও মধ্যে মধ্যে তোপধ্বনি করিতে লাগিল।

ওদিকে সুবা উজিদাখাঁর সৈন্যগণ ক্রমে কপুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া সন্ধান পাইল যে, গুরু কোন্ পথ দিয়া কি ভাবে চলিয়াছেন এবং বুঝিল যে, এতক্ষণ রামিয়ানায় পৌছিয়াছেন। অথচ দূর হইতে বহু সৈন্যের ছাউনি দেখায় তাহাদের বিস্ময় উপস্থিত হইল।

গুরু খেদরানাতালাও পার হইয়া যে উচ্চ ভূমিতে গিয়া উঠিলেন, তাহার নাম "টিবি সাহেব"। ক্রমে উভয় পক্ষের বন্দুক তোপ ও ধনুষ্টঙ্কারে এবং লোকের কোলাহলে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। "বেদাওয়া" শিখগণ তখন একবারে যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাহারা স্থির করিয়াছিল যে, যদি যুদ্ধে জয় হয়, তবে তাহারা গুরুর কৃপা পাইবে; আর যদি হত হয়, তবে বীরবাঞ্ছিত স্বর্গে যাইবে। তাহারা একবারে যেন মৃত্যুকে জয়

করিয়া এরূপ উন্মত্ত ভাবে মুসলমান সৈন্যকে আক্রমণ করিল যে, মুসলমান সৈন্যমধ্যে 'ভ্যাবাচাকা' লাগিয়া গেল। "বেদাওয়া" শিখগণ যখন সাত জন মাত্র নিহত হইল, তখন মুসলমান সৈন্য বহুশত মরিল।

সুবা উজিদাখাঁকে কেহ কেহ বলিতে লাগিল, প্রভু—গুরুর সৈন্য যে বিষম দেখিতেছি ; অদূরে তাঁবু হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে যে কত সৈন্য গুরু আনিয়াছেন, তাহার ত ইয়ত্তা হইতেছে না ; সম্মুখে যাহারা লড়িতেছে, তাহারা ত অসংখ্য মরিতেছে, তাহার উপর দূর উচ্চভূমি হইতে যে তীর গোলাগুলি আসিতেছে, তাহাতেও আমাদের দলই মরিতেছে দেখিতেছি—এ গুরুর বিচিত্রকাণ্ড—এ জন্য গুরুর সঙ্গে আপাততঃ সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করা হউক। উজিদাখাঁ নিজ সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন,— সংবাদ পাইয়াছি, ও পক্ষে অধিক লোক নাই।'

কিন্তু ক্রমে যখন দেখা গেল, জন এগার শিখ উজিদাখাঁর সম্মুখেই আসিয়া অসংখ্য মুসলমান সৈন্য মারিতেছে,অথচ উজিদাখাঁ নিজে তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেছেন না ; তখন মুসলমান সৈন্য হইতে উক্তরূপ নৈরাশ্য ব্যঞ্জক কথা শুনা যাইতে লাগিল। তখন "বেদাওয়া" শিখ তেরটী মাত্র আছে। এইরূপে তুমুল সংগ্রাম চলিতে চলিতে ক্রমে সব নীরব হইয়া আসিল। দেখা গেল,—"বেদাওয়া" শিখ প্রায় সমস্তই নিঃশেষিত হইয়াছে এবং সুবার সৈন্য যে কত নিহত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

মুসলমান সৈন্যগণ শিখগণকে মারিতে মারিতে যাঁহাকে শেষে মারিয়াছিল, দেখা গেল যে, তিনি পুরুষ নহেন, রমণী—নাম মায়ী-ভাগো। ইঁহারই পরামর্শে ও উত্তেজনায় "বেদাওয়া" শিখগণ রণে উন্মত্ত হইয়া, পুনরায় গুরুগোবিন্দের প্রিয়পাত্র হইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। একজন মুসলমান সৈন্য ইঁহাকে বর্ষা মারে। ঐ সময়ে প্রায়

সওয়াক্রোশ দূর হইতে গুরু এরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, তাহাতেই মুসলমানের অনেক সৈন্য মারা যায়। কিন্তু কোন্ দিক হইতে সে সকল তীর আসিয়াছিল, তাহা সুবা পক্ষ বুঝিতে পারে নাই। সম্মুখস্থ শিখগণ সমস্ত নিহত হওয়ায় এবং দূরের শিখ অদৃশ্য থাকায় উজিদার্খাঁ স্থির করিলেন, গুরুগোবিন্দও ঐ সঙ্গে নিহত হইয়াছেন।

এক্ষণে সুবা উজিদার্খাঁ কপুরকে বলিলেন, তোমার এক্ষণে দুইটী কার্য্য আছে—প্রথমে গুরুর দেহ খুঁজিয়া বাহির করা; দ্বিতীয় সৈন্যগণ জল বিনা মারা যাইতেছে, অতএব জল সংগ্রহ করা। কপুর বলিল,—জল নিকটে নাই যদি অগ্রসর হয়েন, তবে তিন ক্রোশ দূরে, আর পশ্চাৎ দিকে গেলে প্রায় দশক্রোশ দূরে। অধিকাংশ সৈন্য পশ্চাৎ দিকে যাইতে ইচ্ছা করায় সেই দিকে যাইতেই অনুমতি করা হইল। এই সময় উজিদার্খাঁ, গুরুগোবিন্দকে নিহত করিয়াছি মনে করিয়া,পুনঃপুনঃ আপনার বাহাদুরী প্রকাশ করিতে লাগিল। পাহাড়ীরাজগণের সাহায্যে নয় লক্ষ সৈন্যে যাহার কিছু করিতে পারি নাই, আজ তিনি আমার দুই লক্ষের অনধিক সৈন্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন; গুরুগোবিন্দের ন্যায় প্রতাপ-শালী বাদশাহের রিপু আর নাই; আজ তাহাকে রণে শায়িত করিয়াছি; ইহাতে বাদশাহের রাজত্ব শান্ত হইল; বাদশাহ নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন—আমায় পুরস্কৃত করিবেন। এক্ষণে এই সকল নিহত মুসলমান সৈন্যগণকে মাটি দেওয়ার যোগাড় কর।'—কপুর সে কার্য্যের তখন সুবিধা নাই দেখিয়া, উজিদার আত্মপ্রশংসায় যোগ দিয়া যেন ভুলাইয়া সমরাঙ্গন হইতে তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেলেন।

গুরুগোবিন্দ এতক্ষণ প্রচ্ছন্ন ছিলেন। এক্ষণে উজিদার্খাঁ ও কপুরসিং উভয়ে চলিয়া গিয়াছে; মুসলমান পক্ষেরও আর কেহ নাই। তখন পূর্ব্বোক্ত বেরাড় গোত্রীয় শিখকে সঙ্গে করিয়া সমরাঙ্গনে আসিলেন।

রণস্থলে বিচরণ করিয়া, একে একে প্রত্যেক মৃত শিখের নিকটে গিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া পিতার ন্যায় আদর যত্ন করিয়া তাহার গুণ বর্ণন করিয়া অপর রণশায়িত শিখের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহাসিং নামে এক জনের তখনও প্রাণ আছে দেখিয়া বলিলেন—'এখন তোমার কি আবশ্যক বল।' মহাসিং বলিল,— আমাদের "বেদাওয়া" নষ্ট করুন। গুরু তখন পকেট হইতে "শিখনহি" লিখনটী বাহির করিয়া নষ্ট করিলেন এবং মহাসিংকে আরও কিছু প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন মহাসিং মদ্রদেশের "সঙ্গত" না নষ্ট হয়, উহাতে গুরুর কৃপা থাকে, এই প্রার্থনা করিতে করিতে মহানিদ্রায় মগ্ন হইলেন। মহাসিং নিজের জন্য কিছুই চাহিলেন না। তখন গুরু বেরাড় গোত্রীয় শিখকে বলিলেন—'যে খালসা মধ্যে এমন মহাপ্রাণ রহিয়াছে, এ খালসা সহজে নষ্ট হইবে না; এক্ষণে এই সকল মহাপ্রাণ শিখগণের দেহের সৎকার করিবার উদ্‌যোগ কর। একটী ভক্তপ্রাণ এরূপে গেলে কীর্ত্তিস্তম্ভ উঠান হয়—সে স্থান পবিত্র হয়। এখানে এতগুলি মহাপ্রাণ যুদ্ধে নিহত হইল—এস্থলের নাম লোকে 'খেদরানা তালাও"বলে, অতঃপর ইহার নাম "মুক্তসর" হইল; এ স্থানের জলাশয়ে যে স্নান করিবে, সেই মুক্ত হইবে।'

ছদ্ম পর্ব্ব।

—•—

সপ্তম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর নানাস্থানে ভ্রমণ ও ডোগরাজাতিকে আশীর্ব্বাদ।

যখন মহাপ্রাণ শিখদিগের চিতা জ্বলিয়া প্রায় নির্ব্বাপিত হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একজন শিখ আসিয়া বলিল,—'সমরাঙ্গণের পার্শ্বে বনের ধারে একটী শিখ রমণী পড়িয়া আছে; উহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন; বোধ হয় যুদ্ধ করিতে করিতে অস্ত্রাঘাত খাইয়া পড়িয়া আছে; উহার নাম মায়ী ভাগো।' গুরুগোবিন্দ তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে গিয়া দেখিলেন,—তখনও মায়ীভাগো জীবিতা রহিয়াছেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন। গুরু বলিলেন—'মায়ী! সন্তান প্রাপ্তি প্রার্থনা করিতে আসিয়া এখানে এই পুত্রের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলে।' মায়ীভাগো শুনিয়া ছিলেন, যে গুরুর বরে পুত্র লাভ হয়; তিনি পুত্রলাভ কামনাতেই গুরু দর্শনে আসিতেছিলেন; "বেদাওয়া" শিখের সহিত পথে দেখা হইলে, ইনি তাহাদের উৎসাহিত করিয়াছিলেন। অবশেষে স্বয়ং রণ-স্থলেও নামিয়াছিলেন। শ্রীগুরুর প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—আর আমার পুত্রলাভে বাঞ্ছা নাই. এক্ষণে শ্রীগুরুর চরণে স্থান প্রার্থনা করি। মায়ীভাগো শ্রীগুরুর সঙ্গ লইলেন। ক্রমে অন্যান্য শিখগণ আসিয়া মিলিত হইলেন।

ক্রমে সদল গুরু বনের পার্শ্ব দিয়া সারাগ্রামে এক জলাশয়ের নিকট গিয়া তাঁবু গাড়াইলেন। পথিমধ্যে এক সাধুর আশ্রম ছিল। সাধু

সংবাদ পাইলেন যে, শিখ গুরুগোবিন্দসিং যাইতেছেন। তিনি গুরু-গোবিন্দের বয়ঃক্রম ত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসরের মধ্যে শুনিয়া কিছু অহঙ্কার বা অগ্রাহ্য ভাব প্রকাশ করেন। সে কথা গুরুগোবিন্দের শিবিরে উত্থিত হইলে, গুরু বলেন,'সাধুটী খুব জাপক প্রাণায়ামপটু– সেই বলে তাঁহার বয়স ৫১২০ বৎসর এবং সেই জন্য বয়সের অহঙ্কার উঁহার আছে। এই কথা সাধুর আশ্রমে উঠিলে, তিনি তখন গুরুগোবিন্দের অবতার হওয়া স্বীকার করিয়া, গুরু দর্শনে আসিয়াছিলেন।

তৎপরে গুরু বিরাড় (মূঢ় বা গোঁয়ার) শিখদিগের সহিত অশ্বারোহণে জঙ্গল পথে চলিতে চলিতে নওথেহাগ্রামে আসিলেন। তথাকার পঞ্চায়েতগণ আসিয়া গুরুগোবিন্দের চরণ বন্দনা করিয়া বলিল,—আপনি যদিও ধীরভাবে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছেন, কিন্তু আপনি বাদশাহের শত্রু বলিয়া খ্যাত; অতএব আপনি এ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করুন; নতুবা বাদশাহের হুকুমে আমাদের গ্রাম উজাড় হইবে; সকলকে প্রাণে মরিতে হইবে। গুরু পঞ্চায়েতের এই ভীতিব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া তাহাদের সন্তোষার্থে সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গ্রামান্তরে চলিলেন।

ক্রমে গুরু ফতেসমুগ্রাম পার হইয়া হরিকাগ্রামে আসিয়া পৌছিলেন। হরিকাগ্রামবাসিগণ আসিয়া গুরুকে এক লুঙ্গী ও এক খেশ উপঢৌকন দিলেন। গোবিন্দ উহা পাইয়া দাতার প্রীত্যর্থে তখনই উহা পরিধান করিলেন। কচ্ছের (ছোট ইজেরের) উপরে অপর বস্ত্র পরিধান শিখপন্থ অনুসারে অবিধি কর্ম্ম অনেকে মনে করেন। মানসিং উহা উপলক্ষ করিয়া রহস্যছলে গুরুকে বলিলেন,—আপনি কচ্ছের উপর অপর বস্ত্র পরিধান করায় দণ্ডনীয় হইলেন। গুরুও তদুত্তরে বলিলেন,— "যয়সা দেশ ঐসা ভেশ" অর্থাৎ যেমন দেশ (দেশাচার) তেমনি বেশ। হরিকা গ্রামবাসিগণ গোঁয়ার প্রকৃতিক লোক; তাহারা গুরুকে বলিল,

আপনি এখানে অবস্থান করুন, আমরা বাদশাহকে ভয় করি না। এখানে আপনার শত্রুভয় নাই জানিবেন। ইহাতে গুরু সন্তুষ্ট হইয়া সে দিন তথায় অবস্থান করিলেন। সন্ধ্যার পর আহারান্তে বলিলেন,—আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি, তোমরা সাবধান হইয়া পাহারা দাও। হরিকাবাসিগণ ভাং (সিদ্ধি) সেবী। তাহারা নিকটস্থ গ্রামবাসী ডোগরা জাতীয় লোককে পাহারায় রাখিয়া নিজ নিজ ভবনে চলিয়া গেল। গুরু প্রহরেক রাত্রিতে উঠিয়া পাহারায় কে আছে সন্ধান লইয়া জানিলেন, হরিকা গ্রামবাসিগণ চলিয়া গিয়াছে তৎস্থলে ডোগরাগণ পাহারায় আছে। এইরূপে বারত্রয় সন্ধান লইয়া যখন জানিলেন, ডোগরাগণই পাহারায় আছে, তখন তাহাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ দিলেন :

"বসদেরাহা তীর এসনেই।
নই চোদরদা তোমকে দেই॥
নয়কে তীর তীর দেশা।
হোয় তোহারো দেশ অশেষা॥"

অর্থাৎ তোমরা এই স্থানে বসতি করিতে থাক। নূতন চৌধুরী (অধ্যক্ষ) পদ তোমাদের হইবে। তোমরা এই (রাভী) নদী তীরে তীরে বহুদূর পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া বসতি করিবে। তোমাদের বংশধরেরা প্রবল হইবে। শিখেরা বলেন,—শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে এই ডোগরা জাতীয়গণ অদ্যাপি প্রবল রহিয়াছেন এবং বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগে বিশেষ খ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিতেছেন।

তৎপরে গুরুগোবিন্দ একটী জঙ্গল পার হইয়া এক কুলগাছের তলায় রাত্রি অতিবাহিত করেন। ইহার নিকটেই উজিদাপুরা গ্রাম। উজিদাপুরা গ্রামবাসিগণ আসিয়া গুরুকে যথোচিত সম্মান দেখাইয়া বলিল,—অদূরে কসুর নামক স্থানে বাদশাহের ছাউনি পড়িয়াছে; অতএব

এস্থানে আপনার অবস্থান কুশলজনক নহে। তাহাতে গুরু বলেন,—সেজন্য ভয় নাই, আমি বাদশাহের তেজ হরণ করিয়াছি।

এমন সময় গুরু একটী তিতির পক্ষী দেখিতে পাইয়া আপন বাজপক্ষী তাহার বিরুদ্ধে ছাড়িয়া দেন। বাজ তিতিরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে, তাহাকে আক্রমণ করিল না; নিকটে গিয়া তাহারা পরস্পরে শব্দ করিতে লাগিল। তখন গুরু তিতিরের বিরুদ্ধে কুকুর প্রেরণ করিলেন। এই সময় দান সিং জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাজ তিতিরকে আক্রমণ করিল না কেন? তাহাতে গুরু বলিলেন,—তিতির পূর্ব্বজন্মে একজন জাঠ ছিল এবং বাজ একজন বেণিয়া ছিল। তিতির উহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল; বাজ এক্ষণে উহার দাবী করিতেছে। তিতির বলিতেছে,—আমি গুরুকে জামিন দিয়াছি। জামিনদার হইয়া অধমর্ণকে উত্তমর্ণের হস্তে দিলাম। এই বলিয়া তিতিরকে ধরিয়া বাজের মুখে অর্পণ করিলেন। 'সূর্য্যপ্রকাশ' গ্রন্থকার বলিতেছেন,—এই সময় গুরু যে স্থানে তাঁবু গাড়িয়া ছিলেন, সেই তাঁবুর খোঁটাগুলি ক্রমে জল পাইয়া সজীব হইয়াছে, দেখা যায়; সেগুলি জণ্ডিকা (বা জণ্ড) বৃক্ষের ডাল ছিল; এক্ষণে সেগুলি বড় গাছ হইয়াছে এবং বর্ত্তমান আছে।

তৎপরে গুরু অশ্বারোহণে বিরাড় শিখ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে পুনরায় মুক্তসর হইয়া রূপনা গ্রামে আসিয়া তাঁবু গাড়িয়াছিলেন এবং ভাং (সিদ্ধি) ও আফিং সেবন করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। গুরু যে ভাং ও আফিং সেবন করিতেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে কোথাও উল্লেখ দেখা যায় নাই। বোধ হয়, শারীরিক কোন অসুস্থতানিবন্ধন ঐ দ্রব্য ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এ স্থলে গুরু একটী ঘোগড় পক্ষী শিকার করেন; তাহাতে অনুচর শিখগণের মধ্যে একজন বলেন,—ঘোগড় পক্ষীর মাংস ত কেহ খায় না, তবে কেন বৃথা উহাকে নিহত করিলেন? তাহাতে গুরু বলেন,—বহু

পূর্ব্ব জন্মে ঐ পক্ষীটা রাজা ছিল। বহু তপস্যায় তবে রাজা হওয়া যায়। এ রাজা হইয়া পদগর্ব্বে প্রজার এক যুবতী কন্যার রূপে মোহিত হইয়া অযথা ব্যবহারের চেষ্টা করে; তাহাতে সেই সতী যুবতী আত্মহত্যার সময় শাপ দিয়াছিল। তদনুসারে ইহার শতবার ঘোগড় দেহ ধারণ হইয়াছে।

ছদ্ম পর্ব্ব

—০—

অষ্টম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর নানাস্থানে ভ্রমণ ও বিরাড় শিখগণ।

তৎপরে গুরু থেড়ি গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন। তথায় গোরক্ষনাথের সেবক এক সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সাধু গুরুর নিকট কোন 'কেরামত (যাদু বিদ্যা বা অদ্ভুত বিদ্যা) দেখিতে চাহিলেন। গুরু কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ধনুকে তীর যোজনা করিয়া সেই তীর মাটীতে ঠেকাইতেই সাধু গুরুকে প্রণাম করিয়া গুরুর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিল। তখন গুরু সাধুকে সঙ্গে করিয়া দিল্লী লাহোর প্রভৃতি নানাস্থানে যাইতে চাহিলেন। সাধু তাহাতে সম্মত হইলেন না, সেই স্থানেই থাকিতে চাহিলেন।

এই সময় গুরু সম্মুখস্থ এক মুসলমানের নির্ম্মিত কবরের উপর বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত মঠাদি দেখিয়া প্রশংসা করিলেন। তাহাতে মান সিং গুরুর পূর্ব্ববাণী "গোর মড়ি মঠ ভুল না মানো" অর্থাৎ ভুলেও গোর মড়ি মঠ মানিও না" উল্লেখ করিয়া গুরুকে "তনখাইয়া" (অর্থদণ্ড) করিলেন। ইহাতে গুরু সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন,—ইহারাই প্রকৃত শিখ; শাস্ত্রানুসারে আমার ত্রুটি হইলেও ইহারা আমাকে দণ্ড করিতে ত্রুটি করে না। এইরূপ কথা বলিয়া শত মুদ্রা অর্থ দণ্ড দিয়াছিলেন।

সে দিন রাত্রিতে গুরু বাসর গ্রামে থাকিয়া তৎপরদিন তথা হইতে

ছয় ক্রোশ দূরে ভুন্দড় গ্রামে গিয়া তাঁবু গাড়িলেন। এই গ্রামের প্রধানের নাম ভুন্দড়। ভুন্দড় স্বয়ং আসিয়া গুরুকে পাঁচ টাকা, একখানি বস্ত্র ও কিছু মিষ্টান্ন দিয়া প্রণাম করিয়াছিল।

তৎপরে সদল গুরু বহড়ী গ্রাম হইয়া চিরণীগ্রামে আসিয়া এক ফলহ বৃক্ষে তিনটী কাক দেখিলেন। উহার মধ্যে একটী কাক শিখ-দিগকে দেখিয়া শব্দ করিতে লাগিল এবং যেন উহাদিগকে কামড়াইতে আসিতে লাগিল। তখন ধরম সিং বৃক্ষের নীচে দাঁড়াইল এবং পরম সিং বৃক্ষের উপরে উঠিয়া ঐ উদ্ধত কাকটী ধরিল। তখন গুরু বলিলেন, —এই কাকটা পূর্ব্ব জন্মে আমার পাচক ছিল। আমাকে খাওয়াইতে উহার বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু শিখদিগকে খাইতে দিতে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিত ও কটুকাটব্য কথা বলিত। এক্ষণে আমার হস্তে নিহত হইয়া উহার পরমগতি লাভ হইল।

এইরূপ কথোপকথনে গুরু সদলে পূর্ব্বদিকে চলিতে লাগিলেন। পথে এক ভীষণ সর্প দেখিয়া তাহাকে তীর দ্বারা নিহত করিলেন এবং বলিলেন,—এই সর্পটা পূর্ব্ব জন্মে আমার এক মসন্দ (নায়েব) ছিল; গুরুর নামে যাহা আদায় উসুল করিত, তাহা প্রায় জমা দিত না এবং অহঙ্কারে নমস্কার করিত না; সেই পাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সদল গুরু এইরূপে চলিতে চলিতে "গুরুসরে" পৌঁছিলে জনৈক শোডী বংশীয় শিখ গুরু দর্শন করিতে আসিয়া গুরুকে দুধ, চা, ঘোড়ার ঘাস প্রভৃতি দিয়াছিল।

তথা হইতে সদল গুরু ছেটিয়ানে আসিয়া রাত্রি কাটাইয়া টিবাগ্রামে আসিলেন। এস্থলে বিরাড় (মূঢ় বা গোঁয়ার) শিখগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, আমরা মাসাধিককাল শ্রীগুরুর সঙ্গে ঘুরিতেছি, এক্ষণে মাহিয়ানা (তঙ্খা) না পাইলে আর চলে না। তাহাতে অপর শিখেরা

বলিতে লাগিলেন,—গুরুর হাতে এখন টাকা নাই; কেহ বলিল,—সাবোগ্রামে গেলে অনেকে টাকা দিবে, সেই সময় বলিও; কেহ বা বলিল,—শ্রীগুরুর সেবায় আবার টাকা লওয়া কেন? কেহ বলিল,—শ্রীগুরুর অভাব কি? ইত্যাদি। তাহাতে বিরাড় শিখগণ বলিতে লাগিল,—আমরা আর অধিকদূর যাইব না, আমাদের এলাকা এই পর্য্যন্ত। গুরু এ সকল কথা জানিতে পারিলেন। দান সিং বিরাড় শিখগণকে বলিলেন,—মাহিনা চাহিও না; যদি একান্তই চাও, তবে বিশেষ মিনতি করিয়া চাহিবে। এমন সময় ডল্লা নামে জনৈক আঢ্য গুরু সেবক আসিয়া শ্রীগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেল।

যাহাহউক, বিরাড় (মূঢ়) শিখগণ অর্থের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া, গুরুর অশ্বের বাগডোর ধরিয়া ঘোড়া থামাইয়া বলিল,—আমাদের বেতন না দিলে আমরা ছাড়িব না। গুরু বলিলেন,—এখন অর্থ নাই; অতঃপর যে স্থানে যাইতেছি, সে স্থানে গেলে, অর্থ পাওয়া যাইবে, তখন দিব; তোমরা আপনাদের মধ্যে মিলিত হইয়া বিচার করিয়া দেখ, প্রেম লইবে? কি ধন লইবে। তাহারা বলিল,—উহা আমরা দেখিয়াছি, ধন না হইলে সংসার চলে না; পরিবার কুটুম্ব পালন কয়া যায় না। এইরূপে তাহারা অর্থের জন্য ব্যস্ত করিতে লাগিল। তখন গুরু ধনুকে তীর যোজনা করিয়া, সেই তীর আকাশ পথে উৎক্ষেপ করিলেন। তখন বৃষ্টি হইতে লাগিল; তৎসঙ্গে করকা (শিল) পড়িতে লাগিল। দানসিং প্রভৃতি শিখগণ গুরুকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার উপর ও তাঁহার অশ্বের উপর কম্বল চড়াইয়া দিল। ইহাতে বিরাড় (মূঢ়) শিখগণ পলায়ন করিল। শ্রীগুরু তাহাদিগকে পলায়ন করিতে নিবারণ করিতে লাগিলেন, তাহারা তাহা শুনিল না। কিছুক্ষণ পরে শিলাবৃষ্টি বন্ধ হইলে, কয়েকটা অশ্বতর পৃষ্ঠে বহু ধন লইয়া এক শিখ আসিল। কেহ কেহ বলিল,—

কাহার মানস পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া এই ধন আসিল। যে শিখ ধন লইয়া আসিয়াছিল, সে বলে, ইহা কুবের পাঠাইয়া দিয়াছেন। 'ঘোষ পাড়ার' একমুনেদিগের বা কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যেও এরূপ কথা শুনা যায়। ঐ দলের খ্যাতনামা দুর্গাদাস বাবুর নিকট শুনা গিয়াছে যে, কোন সময় কন্যাদায় গ্রস্ত এক ব্রাহ্মণ পাঁচ শত টাকার জন্য কর্ত্তার নিকট জানায়। কর্ত্তা সেই আবেদন পাইয়া ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করিতে বলেন। ব্রাহ্মণ কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া ক্রমে বড় ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং ক্রমে কর্ত্তাকে কটুকাটব্য বলিতে থাকে! তখন কর্ত্তার হুকুমে সেই ব্রাহ্মণের বুকে পাথর চাপাইয়া তাহাকে রৌদ্রে রাখা হয়। এমন সময় কর্ত্তার জনৈক শিষ্যের মানস পূর্ণ হওয়ায় সে পাঁচ শত টাকার তোড়া আনিয়া দিলে, সেই ব্রাহ্মণকে ঐ টাকা দিয়া ঠাণ্ডা করা হয়। যাহা হউক, গুরু গোবিন্দ তখন উক্ত বিরাড় (মূঢ়) শিখগণকে ডাকাইয়া তাহাদের দাবী পূর্ণ করিয়া গৃহে গমন করিতে বলেন। "সূর্য্য প্রকাশ" গ্রন্থকার বলেন, তখন বিরাড় শিখ নিতান্ত অল্প ছিল না; তাহারা পাঁচ শত অশ্বারোহী ও নয় শত পদাতিক ছিল।

অতঃপর বিরাড় শিখগণের দাবী পূর্ণ হইলে, তাহারা আনন্দিত হইয়া বলিল, এ অর্থ আমরা গৃহে পাঠাইয়া দিতেছি; যদি শ্রীগুরুর অনুমতি হয়, তবে আমরা গুরুর সঙ্গে থাকি; কিন্তু সে জন্য যত টাকা পাইয়াছি, তাহার দ্বিগুণ দিতে হইবে। বিরাড় শিখগণকে দ্বিগুণ অর্থ দিয়াই সঙ্গে রাখা হইল। এই কার্য্যে দান সিং বিরাড় শিখগণের হইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিল; সেজন্য গুরু তাহাকেও তাহার দাবী লইতে বলিলেন। তদুত্তরে দান সিং বলেন,—"আমি উহাদের ন্যায় ধন চাহিনা—প্রেম চাই; আর মালবদেশের শিখদিগের প্রতি শ্রীগুরুর কৃপা থাকে, ইহাই প্রার্থনা করি।" "মুক্তসর" যুদ্ধে নিহত মহাসিংহের ন্যায় দান সিং

নিজের জন্য কিছুই চাহিল না। গুরুগোবিন্দ দান সিংহের এই প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—তুমি কেশ রাখ এবং অমৃত ছকো (পানকর) অর্থাৎ রীতিমত খালসা হও। তাহাতে দান সিং বলিল,—কেশ ধারণ আমার অভ্যাস নাই; এক্ষণে কেশ ধারণ করিয়া পীড়িত হইলে, কে আমার সেবা করিবে। গুরু বলিলেন,—পীড়িত হইবে না; আবশ্যক হইলে সেবারও ব্যবস্থা হইবে। কেশ ধারণ করিলে, তোমায় যথাসময়ে চিনিতে পারিব। :দান সিং বলিলেন,—কৃপা থাকিলে যথা সময়ে চিনিতে পারিবেন। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর দান সিং কেশ রাখিয়া এবং অমৃত পান করিয়া রীতিমত খালসা হইলেন।

যে ধন আসিয়াছিল, তাহা যথাযথ সকলকে দিয়া অবশিষ্ট ধন মৃত্তিকায় বিশেষরূপে প্রোথিত করা হইল এবং সেই স্থানের নাম "গুপ্তসর" রাখা হইল। একজন শিখ এই সময়ে বলেন,—বিরাড় শিখের প্রেম নাই, উহারা ধনের বিশেষ প্রয়াসী। তাহাতে শ্রীগুরু বিরাড় শিখগণকে খালসার প্রজা হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

ছদ্ম পর্ব।

নবম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর নানাস্থানে ভ্রমণ, সেবক ডল্লা প্রসঙ্গ ও শ্রীগুরুর পত্নীদ্বয় সহ মিলন।

"গুরুসরে" অবস্থান কালে, বৈমী নামে এক ফকির (মুসলমান) আসিয়া গুরুকে ঘৃত, ময়দা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমি নানা সম্প্রদায় ও ধর্ম্ম মতবাদ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি কিন্তু শিখধর্ম্ম আমাকে বড় ভাল লাগে; ইহাতে কেশ রাখা হয়—এ নিয়ম বড় ভাল। এইরূপে গুরুগোবিন্দকে বিনয় সহকারে প্রার্থনা জানাইলে, তাহাকে শিখ সম্প্রদায় ভুক্ত করা হইল। মান সিং অমৃত প্রস্তুত করিলেন এবং অতঃপর তাহার নাম রাখা হইল, আজমীর সিং।

গুরুগোবিন্দ সে রাত্রিতে গুপ্তসরে থাকিয়া, পরদিন সাহেবচান্দ গ্রাম হইয়া 'ভাই কাকোট' সহরে পৌঁছিলেন। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে সায়ংকালে শ্রীগুরুর ভাং (সিদ্ধি) সেবনের ব্যবস্থা দেখা যায়। এস্থলে রঙ্গি সিং ও তাহার ভ্রাতা ঘুমি সিং আসিয়া মিলিত হইল এবং রঙ্গি বেণিয়া শিখ, উপস্থিত সকল শিখের সেবার ভার লইবার প্রার্থনা জানাইল। তদনুসারে "ওয়া গুরু" মন্ত্র পাঠ ও কড়া প্রসাদ (মোহনভোগ) প্রস্তুত করাইয়া সকল শিখকে খাওয়ান হইল।

পরদিন প্রভাতে গুরু অশ্বারোহণে যাত্রা করিয়া সুনিয়ার গ্রাম, রোহেলা গ্রাম ও মব্বিহে গ্রাম অতিক্রম করিয়া বাজক গ্রামে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে গোদুগ্ধ পাওয়া গেল। কিন্তু একজন শিখ গোদুগ্ধ পানে আপত্তি করায় তাহাকে মহিষদুগ্ধ দেওয়া হইল। এখানে কোদাসুখু মোহন্ত বাস করিত। "মুক্তসর" যুদ্ধের পূর্ব্বে শিখপক্ষ হইতে দিওয়ানা নামক এক ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে এই মোহন্তের গুরুগোবিন্দের উপর বৈরভাব ছিল। সে পঞ্চাশজন মাত্র লোক সংগ্রহ করিয়া গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার মানস করিল; কিন্তু লোকগুলা গুরুগোবিন্দের প্রতাপ স্মরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সরিয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে সুখু ও বুদ্ধু নামক দুইজন আসিয়া শ্রীগুরুকে প্রণাম করিলে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সারঙ্গীবাজনা সহিত একটী গান শুনাও। তদনুসারে তাহারা গাহিল :—

"কাচা কোঠা বসদা জানি।
সদা না মাপে নিৎ নহি যুয়ানী।
চলনা আগে হোয় নোয়ানী॥"

অর্থাৎ এ (আত্মা) কাঁচা কোঠায় বাস করিতেছেন; দেহ থাকিবে না, মাতা পিতা চিরদিনের নয়, যৌবনও থাকিবে না; আগে যাইতে হইবে ও হিসাব দিতে হইবে। গানটী গুরুর বড়ই ভাল লাগিল। তিনি উহা বারত্রয় গাওয়াইলেন। পরে সুখু ও বুদ্ধু গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া নাচিতে লাগিল; সুখু প্রেমে চৈতন্য হারাইল। গুরুর আজ্ঞায় সুখুকে স্নান করানতে তাহার বাহ্য চৈতন্য হইল। তখন গুরু উহাদিগকে একটী অর্থপূর্ণ থলে দিয়া বলিলেন,—ইহা পবিত্র ভাবে রাখিও।

তৎপরে গুরু বাজক গ্রাম হইতে যসীগ্রামে চলিলেন। এস্থানের সেবকগণ অন্যান্য ভেটের সহিত গুড়ই অধিক দিয়াছিল। এমন কি,

একজন লবানা শিখ ৩০ মন গুড় দিয়াছিল। শ্রীগুরু ইহাতে আনন্দ করিয়া "যসা আয় চলে, গুড়খায় চলে" বলিয়াছিলেন এবং সে দিন "যে যতপার গুড় খাও, আজ অন্য দ্রব্য খাইয়া কার্য্য নাই" এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ স্থানে কয়েকদিন থাকিয়া গুরু পাক্কে গ্রামে গমন করেন। এখানে যস্ত বৃক্ষের ডালে ঘোড়া বাঁধিবার খোঁটা করা হইয়াছিল। "সূর্য্যপ্রকাশ" গ্রন্থকার বলেন,—সেই ডাল বৃক্ষে পরিণত হইয়া এখনও বর্ত্তমান আছে। পরে গুরু সাবোকাতেলবণ্ডী" * গ্রামের নিকট দিয়া চলিলেন।

সাবো সহরের জমিদার—শ্রীগুরুর সেবক ডল্লা টিবা নামক গ্রামে শ্রীগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। ডল্লা তিনশত অনুচর সঙ্গে করিয়া আসিয়া এবার শ্রীগুরুকে দর্শন করিয়া তাহার ভবনে যাইতে অনুরোধ করিল। গুরু সেদিন সেস্থানেই (ময়দানে) তাঁবু গাড়িয়া রহিলেন। এস্থানে অনেক শিখ সমাগত হইয়া রীতিমত সভা হইলে, তথায় আত্মগৌরব প্রকাশার্থ ডল্লা বলিল,—তাহাকে যুদ্ধের সংবাদ দিলে, সে স্বয়ং লোক লস্কর লইয়া গিয়া যুদ্ধে সহায় হইত। গুরু বলিলেন, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে; গত বিষয়ের ওরূপ আন্দোলনে আবশ্যক কি? কিন্তু ডল্লা তথাপি অহঙ্কার প্রকাশ করিতে লাগিল। ঐসময়ে লাহোর হইতে কয়েক জন উত্তম কারিকর শিখ কয়েকটা অস্ত্র লইয়া আসিল। ইহাতে গুরু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া একখানি সুন্দর তরবারি লইয়া ঘুরাইতে ফিরাইতে লাগিলেন, এবং ডল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আইস, তুমি বা তোমার কোন্ বীর এই তরবারীতে মস্তক

* পঞ্জাব অঞ্চলে তেলবণ্ডা নামে কয়েকটী গ্রাম আছে। তাহার মধ্যে একটী বাবা নানকের জন্মস্থান। সেটী হইতে ভিন্ন করিবার জন্য এটীর নাম লোকে সাবোকা তেলবণ্ডী বলিত। এক্ষণে ইহাকেই "দমদমা" বলে।

দিবে, আইস।" তখন ডল্লা নতশির হইয়া বসিয়া রহিল। সভার বাহিরে দুইজন নীচ (চুড়া) জাতীয় লোক দণ্ডায়মান ছিল। গুরু উহাদিগকে ডাকিলেন। উহারা শ্রীগুরুর তরবারীতে মাথাদিবার জন্য আহ্বান শুনিয়া অগ্রে যাইতে ব্যগ্র হইল। একজন বলিল,—'আমায় ডাকিলেন' অপর জন বলিল—'না, আমায় ডাকিতেছেন।' এইরূপে উভয়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন গুরু ডল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দেখ, তুমি গর্ব্ব করিতেছিলে; কিন্তু তুমি বা তোমার কোন লোক যে তরবারীতে মস্তক দিতে আসিলে না, তাহাতে এই দুই নীচজাতীয় লোক কেমন উৎসাহিত হইয়াছে—ইহারাই প্রকৃত বীর।" শ্রীগুরু এইরূপে ডল্লার দর্প চূর্ণ করিলেন।

পর দিন ডল্লার অনুরোধে সাবো সহরে প্রবেশ করিয়া শ্রীগুরু ডল্লার প্রাসাদের পার্শ্বস্থ ময়দানে তাঁবু গাড়িলেন। ডল্লা রসদ যোগাইতে লাগিলেন। এই স্থানে পাঁচদিন থাকা হইল। এই সময় গুরুপত্নীদ্বয় (মাতা সুন্দরীজী ও মাতা সাহেব দেয়ী) আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহারা বিভিন্ন শিখের ভবনে দুই দশ দিন করিয়া এতদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন,—গুরুর এই পত্নীদ্বয় আনন্দপুর হইতে ক্রমে ক্রমে দিল্লীতে গিয়াছিলেন এবং তথায় গুরুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু দমদমায় অবস্থান কালেও যে গুরুপত্নীদ্বয় সঙ্গে ছিলেন—তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন—গুরু দিল্লীতে অবস্থান কালে পত্নীদ্বয়ের সংবাদ পাইয়াছিলেন মাত্র—সাক্ষাৎ হয় নাই। এক্ষণে তাঁহারা শ্রীগুরুপদপ্রান্তে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; উভয়ে পুত্রশোকে অধীরা হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীগুরু জ্ঞান বৈরাগ্যপূর্ণ বাক্যে তাঁহাদের কতকটা সান্ত্বনা করিলেন এবং বলিলেন,—যাহারা স্বধর্ম্মরক্ষার্থে সম্মুখ সমরে পড়িয়া স্বর্গে গিয়াছে, তাহাদের জন্ত

শোক করিতে নাই; তাহারা জনম মরণ ক্লেশ চিরকালের জন্য অতিক্রম করিয়াছে।

বাহিরে পাঁচ দিনের সৎকারের পর ডল্লা গুরুকে এবং গুরুপত্নীদ্বয়কে নিজ ভবনে লইয়া গিয়া সেবা করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে শ্রীগুরুকে শত মুদ্রা ও এক ঘোড়া এবং পত্নীদ্বয়কে পঞ্চাশ পঞ্চাশ মুদ্রা ও এক এক বস্ত্র দক্ষিণা দিয়া সংবর্দ্ধনা করিয়া ছিলেন।

ছদ্ম পর্ব্ব

—:*:—

দশম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর দমদমায় অবস্থানের ব্যবস্থা।

এইরূপে কয়েকদিন সাবো সহরে থাকিয়া গুরুগোবিন্দ পুনরায় তেলবণ্ডীর নিকট গিয়া তাঁবু গাড়িলেন এবং তথায় গিয়া যেন বহুদিনের পর "দম" লইলেন অর্থাৎ অঙ্গ হইতে অস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া, বিশ্রাম লইবার ভাব প্রকাশ করিলেন। তদবধি এস্থানের নাম "দমদমা" হইয়াছে। এ স্থানে বহু ভক্ত আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। কথিত আছে যে, এই স্থানে বসিয়াই শ্রীগুরু "বিচিত্র নাটক" লিখিয়াছিলেন। এস্থানে অবস্থান কালে নিকটস্থ জঙ্গলে মৃগয়া করিতে যাইতেন; সঙ্গে কয়েকজন অনুচর যাইত। একদিন অনেকক্ষণ শিকার মিলে নাই; তাহাতে গুরু অনুচরবর্গকে বলেন,—বোধ হয় শিখদিগের অঙ্গে যে পাঁচ কক্ক (অর্থাৎ কেশ, কৃপাণ, কঙ্গা, কাছ এবং কড়া) ধারণের ব্যবস্থা আছে, তোমাদের মধ্যে কেহ সে বিষয়ে ত্রুটি করিয়াছ। দেখা গেল, একজন কঙ্গা (চিরুণী) লয় নাই। সে বলিল,—শ্রীগুরুর মৃগয়ায় আসিবার সময়, সঙ্গে আসার তাড়াতাড়িতে কঙ্গা ধারণ করিতে ভুল হইয়াছে। তখন তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়ার পর শিকার মিলিয়াছিল।

মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিলে, নানা ভক্ত আসিয়া মিলিত। একদিন অমৃত সহরের নিকটবর্ত্তী চাব্বা-নিবাসিনী বাচায়ন গোত্রীয়া এক রমণী পুত্রবর-প্রার্থিনী হইয়া শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে আসিয়াছিল। গুরু তাহাকে

গুরুগোবিন্দের মৃগয়া যাত্রা।

(৫৪৫ পৃঃ)

নানা সৎকথার উপদেশ দিয়া বলেন,—"তোমার ভাগ্যে পুত্র নাই।" তখন সে কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছু সময় কাটিয়া গেল, পরে গুরু যখন পুনরায় মৃগয়ায় যাইবেন বলিয়া অশ্বারোহণ করিয়াছেন, তখন সে গুরুর শ্রীচরণ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং বলিল "পুত্রবাঞ্ছা করিয়া দেড়শত ক্রোশ বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছি, আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন!" তখন গুরু নিকটস্থ এক শিখকে দোয়াত, কলম, কাগজ আনিতে বলিলেন। জনৈক শিখ তাহা আনিয়া দিলে অশ্ব-পৃষ্ঠে বসিয়াই গুরু লিখিয়া দিলেন, "এক পুত্র হইবে।" গুরুর লিখিবার সময় ঘোড়ার নড়নে গুরুমুখী একটী 'সাতে'র মত হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে ঐ শিখ বলিল,—প্রভু! আপনি একটী পুত্রের কথা বলিতে-ছিলেন, এ যে সাতটী হইল। গুরু বলিলেন—তাহাই হইবে। "সূর্য্য-প্রকাশ" বলেন পরে ঐ রমণীর সাতপুত্র হইয়াছিল।

পরে একদিন মোড়ো গ্রামবাসী ভীমের পুত্র ডালপাৎ নামে জনৈক শিখ আসিয়া গুরুকে দধি দিয়াছিল। গুরু তাহার সৌজন্যে তুষ্ট হইয়া তাহার মস্তকে এক পাগ দিয়াছিলেন। মূঢ় ডালপাৎ গুরুদত্ত পাগের মাহাত্ম্য না বুঝিয়া, পরে ডোম-জাতীয় এক বাদ্যকরকে ঐ পাগ দিয়াছিল।

অপর একদিন পুপে গ্রামবাসী ভাই ভক্তুর পৌত্র দয়াল দাস আসিয়া শ্রীগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করে; গুরু তাহাকে "খালসা" হইতে উপদেশ দেন। দয়াল দাস বলে,—আমিত পুরুষানুক্রমে শিখ আছি, আবার নূতন কি হইব? গুরু বলেন,—সংস্কার দ্বারা খালসা হইলে, তোমার হৃদয়ে বল বাড়িবে, তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে, তোমার ফকিরের ন্যায় দয়াল দাস নাম বদলাইয়া দয়াল সিং নাম হইবে, এবং সিংহের ন্যায় তোমার প্রতাপ হইবে। দয়াল কিছুতেই রাজী হইল না। তখন গুরু বলিলেন,—

এখন "খালসা" হইলে না, কিন্তু ক্রমে যখন সামান্য চুড়ে (নীচ) জাতিরাও ইহাতে প্রবেশ করিবে, তখন ইহাতে প্রবেশের জন্য লালায়িত হইবে। এস্থলে দয়াল দাসের সম্পর্কীয় অনেকের কথা সূর্য্যপ্রকাশে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ভাই ভক্তুর বংশীয়দিগের গুরুবংশের প্রতি এবং শিখ ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায়।

এই সময়ে রাম সিং নামক জনৈক শিখকে গুরু বলেন,—তোমার বাড়ী এস্থল হইতে ত বহুদূর নয়—আমি একদিন তোমার বাড়ীতে যাইব। তাহাতে রামসিং বলিয়াছিল—"এখন বড় গরম, গ্রীষ্ম একটু কমিলে যাইবেন।" রামসিং গোদরিয়া নামক একজনকে লইয়া গিয়া ঘাস কাটান, বাজার আনান, মসলা পেসা প্রভৃতি কর্ম্ম করায়। গোদরিয়া কতকটা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত জড়ভরতের ন্যায়; সে যখন যে কার্য্যই করুক না কেন, হস্তদ্বারা কর্ম্ম করে এবং মুখে (অন্তরে) ভগবানের নাম জপ করে। কোন সময়ে ভক্তুপুত্র জীবন গোদরিয়ার দ্বারায় কর্ম্ম করায় এবং তাহার কার্য্যের ত্রুটি ধরিয়া তাহাকে লাথি মারে; তাহার পরই জীবন পেট ফুলিয়া মরে। অপর একদিন গোদরিয়া সাংসারিক কার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষেত্রে সরিষা তুলিতেছিল। কিন্তু সে সময় সরিষা গাছের সঙ্গে সকল আগাছা আছে তাহা তুলিতে বলায় সে আগাছা না বুঝিয়া সরিষা গাছই তুলিয়া ফেলে। এ সময় এক সাধু আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন—"গোদরিয়া কি করিতেছ? তাহাতে সে উত্তর করে,—"সংসার ক্ষেত্রের জড় উখড়াইতেছি।" ইহার পর গোদরিয়ার তিন পুত্র মারা যায়। যাহা হউক, শ্রীগুরু গোদরিয়ার গুণ জানিতেন বলিয়া তাহাকে ডাকাইয়া কিছুদিন নিজ সঙ্গে রাখেন এবং বলেন,—পুরুষের মধ্যে গোদরিয়ার ন্যায় ত্যাগী পুরুষ এবং রমণীর মধ্যে মায়ীভাগোর ন্যায় ত্যাগী রমণী এখন সংসারে আর নাই; ইহাদের উভয়েরই পরমহংসের

লক্ষণ সমস্ত আছে। মায়ীভাগোর বস্ত্র পরিধানেরও আবশ্যকতা ছিল না; কিন্তু "লোকালয়ে থাকিতে হইলে, লোকহিতার্থে কাপড় পরা আবশ্যক—শ্রীগুরুর এইরূপ উপদেশেই তিনি কাপড় পরিতেন। গোদরিয়া সম্বন্ধেও ঐরূপ উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ ভক্ত সমাগমে ও মৃগয়া প্রভৃতিতে দিন যাপন হইতেছে, এমন সময় একদিন সেবক ডল্লা আসিয়া জানাইল যে, সরহিন্দের সুবা উজিদাখাঁর নিকট হইতে পরওয়ানা আসিয়াছে যে, বিগত (মুক্তসর) যুদ্ধে গুরুগোবিন্দ মারা গিয়াছেন, জানা ছিল; এখন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গুরু জীবিত আছেন এবং তোমার নিকট রহিয়াছেন; অতএব, তুমি সত্বরে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসিবে; নতুবা তোমায় সমুচিত দণ্ড দেওয়া হইবে। ডল্লা এই পরওয়ানার উত্তরে জানাইয়াছিলেন—"শ্রীগুরুতে আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি; এক্ষণে গুরুই আমার প্রাণ; অতএব আমি তাঁহাকে ধরিয়া তোমার হস্তে দিতে পারি না।" সুবা উজিদা খাঁ সামান্য জমিদার ডল্লার এই পত্র প্রাপ্তে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

ছদ্ম পর্ব্ব।

একাদশ পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর বঠাণ্ডায় গমন। কানাদেও বিতাড়ন। দমদমায় প্রত্যাবর্ত্তন।

সেবক ডল্লা উজিদাখাঁর সংবাদ দিয়া চলিয়া গেলে, গুরুগোবিন্দ ইতি-কর্ত্তব্যতা স্থির করিলেন। দুই একদিন পরে পুনরায় ডল্লা আসিলে, গুরু বলিলেন,—অতঃপর আর এ স্থানে থাকা উচিত নয়; এস্থানে থাকিলে শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিলে বৃথা অনেক গৃহস্থ মারা যাইবে; অতএব একটা যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান দেখিয়া অগ্রসর হওয়া যাউক; বোধ হয়,—বঠাণ্ডা নামক স্থান উহার উপযুক্ত হইবে। ডল্লা বলিলেন,—সে স্থান ভাল নয়; সে স্থানে জল পাওয়া কঠিন।

ইহার পর গুরু চক্রগ্রামে রাম সিং নামক শিখের ভবনে গমন করিলেন। গুরু আসিতেছেন দেখিয়া, রাম সিং তাড়াতাড়ি একটা স্থান পরিষ্কার করাইয়া জল ছিটাইয়া কতকটা বাসযোগ্য করিল। গুরু বলিলেন,—এ স্থানটা বড় গরম; পাঁওটা গ্রামটী যমুনাতটে, আমার বড় পছন্দ হইয়াছিল, সেরূপ স্থান আর পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে রাম সিং রন্ধনাদি করাইয়া গুরু ও গুরুপত্নীদ্বয়কে আহার করিতে দিলেন এবং তাঁহাদের ভোজনের পর গুরুর প্রসাদ রাম সিং লইল এবং গুরুপত্নী সুন্দরীজীর প্রসাদ রাম সিংহের পত্নী লইল। গুরু পত্নী সাহেব দেয়ীর প্রসাদ কাহাকেও না দিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল।

শিখ সংস্কারের সময় এই মাতা সাহেব দেয়ী শিখদিগের মাতা হয়েন, একথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। যাহা হউক, মাতা সাহেব দেয়ীর প্রসাদ ফেলিয়া দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসায় রামসিং কহিল, এই মাতার "গোদকেনালা" উৎসব (বৌভাত বা পাকস্পর্শ উৎসব) হওয়ার বিষয় আমাদিগকে এখনও জানান হয় নাই। তখন গুরু ও অন্যান্য শিখগণ নীরব হইলেন। রামসিং গুরুকে এক ঘোড়া ও একশত মুদ্রা দক্ষিণা দিয়াছিল।

যখন রাম সিংহের বাড়ীতে শ্রীগুরুর শুভাগমন উৎসব চলিতেছে, সেই সময় পূর্ব্বোক্ত দয়াল দাস আসিয়া রাম সিংহের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিয়া যায় যে, তথা হইতে শ্রীগুরুকে সে তাহার বাড়ীতে লইয়া যাইবে এবং তদনুসারে আহারাদির দ্রব্য প্রস্তুত করায়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে দয়াল দাস আসিলে, গুরু তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিলেন না। গুরু রাম সিংহের ভবন হইতে বঠাণ্ডার দিকে অগ্রসর হইলেন; দয়াল দাসের উদ্দেশ্য ছিল যে, ঐ পথে যাইতে তাহার ভবনে লইয়া যাইবে। গুরু রাম সিংহের ভবন হইতে বাহির হইয়া পথি-মধ্যে দেখিতে পাইলেন, এক বৃদ্ধা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। একখানি উত্তম বস্ত্র তাহার হাতে লুকাইত ভাবে রাখিয়াছে এবং সে রাম সিংহের বাড়ীতে যাইবে না মনে করিয়া তথায় দাঁড়াইয়া আছে। রাম সিংহেরও ইচ্ছা নয় যে গুরু ঐ বৃদ্ধার সহিত দেখা করেন। কিন্তু গুরু রাম সিংহের ইচ্ছা উপেক্ষা করিয়া ঐ বৃদ্ধার দিকে অগ্রসর হইয়া উঁহার প্রদত্ত (খেশ) বস্ত্র ও প্রণাম গ্রহণ করিলেন এবং দয়াল দাসের সরিক 'ভক্তু তক্তুর' ভবনের বহির্দ্দেশে একটী বালককে আদর করিয়া নিজ গন্তব্য পথে চলিলেন। দয়াল দাস তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও গুরু তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ভাগুগ্রাম হইয়া বঠাণ্ডায়

চলিলেন। দয়াল দাস শ্রীগুরুর জন্য যে ভোগ প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা লইয়া বঠাণ্ডায় উপস্থিত হইলে, গুরু সে ভোগ ফেরত দিয়াছিলেন।

এমন সময় একটি বালিকা আসিয়া গুরুকে কানাদেও নামক উপ-দেবতার (বা পিশাচের) অত্যাচারের কথা নিবেদন করিল। কানাদেও তদঞ্চলের, লোককে বিশেষ কষ্ট দিতেছে, লোকের খাবার দ্রব্য নষ্ট করিতেছে এই সকল কথা জানাইল। তখন শ্রীগুরু স্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে তদ্‌বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারাও কানাদেওয়ের অত্যাচারের কথা জানাইলেন এবং বলিলেন যে, আমরাও তাহাকে এস্থান ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছি ; কিন্তু সে হস্তীর বলিদান চায়, অভাবে সবল মহিষ বলিদান! পূর্ব্বে মহীপ নামে এক রাজা এদেশে ছিলেন, তাঁহার সময় হইতে কানাদেও বড় প্রতাপশালী হইয়াছে! এই সকল কথা শুনিয়া, গুরু শিখদিগকে বলিলেন, সত্বরে হস্তী সংগ্রহ করা কঠিন, অতএব তোমরা একটী সবল মহিষ সংগ্রহ কর। তখন শিখেরা মহিষের অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং অদূরে বজ্জের নামক এক জমীদারের নিকট জানাইল। বজ্জের একটা সবল ক্ষিপ্ত মহিষ দেখাইয়া দিল এবং শিখেরা সেটাকেই ধরিয়া আনিল। এই মহিষ ধরা উপলক্ষে লোকে গুরুর প্রতাপ স্বীকার করিতে লাগিল। কানাদেও সমক্ষে গুরুর আদেশে ময়লাগড় সিং কর্ত্তৃক ঐ মহিষ এককোপে বলিদান হইল বটে, কিন্তু মহিষের মুণ্ড ভূমিসাৎ হইলেও মহিষটা দাঁড়াইয়া রহিল! তখন গুরুর আদেশে পরমহংস-কল্প গোদরিয়া মহিষটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। কানাদেও বলিদানে তুষ্ট হইয়া গুরুকে বলিল,—"পূর্ব্বে আমি গোবিন্দোয়ালে ছিলাম ; গুরু অঙ্গদ আমায় রক্ষা করিয়া-ছিলেন ; তৎপরে গুরু অমর দাস কর্ত্তৃক আমি এখানে প্রেরিত হই ; শতবর্ষের অধিক কাল আমি এখানে বাস করিতেছি ; এক্ষণে কোথায়

যাইব ?” তাহাতে গুরু বলিলেন,—“তুমি সমহিন্দ সহরে যাও; সে স্থান নষ্ট হইবার কথা আছে; সুতরাং সেখানে গেলে কোন ক্ষতি নাই।”

গুরুগোবিন্দ দেখিলেন, বঠাণ্ডা স্থানটি যুদ্ধ কার্য্যের পক্ষে সুবিধা-জনক নহে। যে জল পাওয়া যায়, তাহা ব্যবহারোপযোগী নয়।

যাহাহউক, সেদিন রাত্রিতে বঠাণ্ডায় অবস্থান করিলেন, গভীর রজনীতে জনৈক গায়কের মধুর গীত শুনিতে পাইলেন। পঞ্জাব অঞ্চলে পুন্নু ও শশীর স্বপ্নে প্রেম মিলনের গল্প প্রসিদ্ধ আছে; তাহাতে পুন্নু জনৈক রাজপুত্র এবং শশী এক রাজকুমারী হইলেও শশী জনৈক রজক কর্তৃক পালিতা; এজন্য শশী রজক-কুমারী বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকায় তাহাদের বিবাহ হয় নাই; তদুপলক্ষে ঐ প্রেম সঙ্গীত। পরদিন গুরু সভায় বসিয়া ঐ গায়কের অনুসন্ধান করিয়া ডাকাইলেন। গায়ককে পুনরায় গান করিতে বলায়, সে মহাপুরুষের সাক্ষাতে গান করিতে সঙ্কুচিত হইল। পরে তাহাকে অন্তরালে রাখিয়া গান করিতে বলায় সে গান করিল কিন্তু পূর্ব্ব রাত্রির ন্যায় গানে তেমন রস আসিল না। তথাপি গুরু গায়ককে অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। এতদুপলক্ষে জনৈক শিখ প্রেমের প্রতি তুচ্ছভাব প্রকাশ করিলে, গুরু প্রেম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। জগতে যত শক্তি আছে তাহার মধ্যে প্রেমের বলই যে সর্ব্বপ্রধান, গুরু ইহাই প্রকাশ করিলেন :—

“বিগর প্রেম ফোকট্ সব যতন।
প্রেম সো কর্ম্ম সভমে রতন॥

অর্থাৎ—বিনা প্রেমে যে কর্ম্ম কর সে সব বৃথা; প্রেমে সকল কর্ম্মেই রত্নলাভ করা যায়।

তখন জনৈক বিরাড় (মূঢ়) শিখ বিনয়পাল নামক রাজার মৃগয়ায়

গিয়া বৃকের (নেকড়ে বাঘের) সহিত ছাগ শিশুর যুদ্ধের অদ্ভুত গল্প বলিয়াছিল।

তৎপরে সভাভঙ্গ করিয়া গুরু অশ্বারোহণে সমীগ্রাম হইয়া পুনরায় দমদমায় ফিরিয়া আসিলেন। তখন সেবক ডল্লা, রাম সিং এবং দয়াল দাস আসিলেন। ডল্লা ও রাম সিংহের অনুরোধে গুরু দয়াল দাসের প্রতি দয়া করিয়া, উক্ত ভোগ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। "এতদিনে উহাতে পোকা হইয়াছে" বলিয়া দয়াল দাস নূতন ভোগ প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিল। গুরু বলিলেন,—না, উহা উত্তম আছে; লইয়া আইস দেখি। তখন ঐ ভোগ আনিলে গুরু কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তখন শিখদিগের মধ্যে সেই (চুড়া) প্রসাদ * পাইবার জন্য হুড়া হুড়ি পড়িয়া গেল এবং উপস্থিত সকলে সেই প্রসাদ গ্রহণ করায় সত্বরেই উহা ফুরাইয়া গেল। তৎপরে অপর পাঁচ জন শিখ আসিয়া প্রসাদ প্রার্থনা করিলে, গুরু বলিলেন,—অত্র প্রসাদের ভার দয়াল দাসের; অতএব এই পাঁচজনকে দয়াল দাসকে দেখাইয়া দাও। তখন দয়াল দাস তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া বলিল,—আর প্রসাদ নাই; তোমরা আমার হস্তের এই স্বর্ণের অঙ্গুরীয় লইয়া যাও' এবং ইহা লইয়া বাজার হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ভোজন কর কিন্তু একথা শ্রীগুরুকে জানাইওনা। দয়াল দাস এই ভোজন উপলক্ষে গুরুকে একটী ঘোড়া ও এক যোড়া শাল দক্ষিণা দিয়াছিল।

অপর একদিন গুরুগোবিন্দ সেবক ডল্লাকে সঙ্গে করিয়া মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। গুরু একটী সরথর (মৃগ বিশেষ) শিকার করেন। জনৈক শিখ জিজ্ঞাসা করিল, গুরু কেন সরথর মরিলেন? তাহাতে গুরু

---

* প্রসাদ দুই প্রকার (১) গুরুকে নিবেদন করিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহাই প্রসাদ (২) গুরু ভোজন করিয়া যাহা অবশিষ্ট রাখেন বা পাওয়া যায় উহা চুড়া প্রসাদ।

বলেন,—পূর্ব্বজন্মে ইহার মানব দেহ ছিল, তখন পরধন হরণ করিত, যাহারা পরধন হরণ করে, তাহারা প্রায় এইরূপ মৃগ ছাগাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, সে দিন এইরূপ শিকার করিতে করিতে উঁহারা দমদমা হইতে এতদূরে আসিয়াছিলেন যে, সেই বনভূমিতে তাঁহাদেব রাত্রি হইয়া গেল। সকলে বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন। অধিক রাত্রিতে সহচর-দিগের মধ্যে অনেকে ক্ষুধায় কাতর হইল। তখন গুরু বলিলেন,—ঐ কিকর বৃক্ষটী নাড়া দাও। তখন ঐ বৃক্ষটী নাড়া দিতে দিতে কয়েকটী লাড্ প্রভৃতি খাদ্য পড়িল এবং নিতান্ত ক্ষুধার্ত্তেরা উহা খাইল। পরদিন প্রভাতে সকলে দমদমায় ফিরিয়া আসিলে, সেবক জল্লা গুরুকে জিজ্ঞাসা করিল,—গত রাত্রিতে যে স্থানে বাস করাগিয়াছিল, সে স্থানের লোক অত্যন্ত দুঃখ কষ্টে আছে বলিয়া বোধ হইল। গুরু বলিলেন,—বিনা ধর্ম্ম-চর্চ্চায় সুখ বা প্রীতি কোথায় পাইবে?

ছদ্ম পর্ব্ব।

দ্বাদশ পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর দমদমায় অবস্থান। মালব দেশের নানা কথা। ডল্লার শিখ সংস্কার।

গুরু গোবিন্দের দমদমায় অবস্থান কালে তদঞ্চলে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। ডল্লাপ্রমুখ অন্যান্য শিখগণ শ্রীগুরুকে লোকের কষ্ট জ্ঞাপন করিতে এবং যাহাতে বৃষ্টি হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করিতে থাকে। লোকের কষ্ট বর্ণনায় শ্রীগুরু গম্ভীরভাবে থাকিয়া একদিন ডল্লার প্রতি কোপ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, এজন্য বারবার ইন্দ্রকে জানাইয়া যদি বৃষ্টি হইল না, তবে উঁহার প্রতি অত্যাচার কর। তাহাতে ডল্লা ইন্দ্রকে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল, উৎকণ্ঠায় একদিন জুতা উৎক্ষেপ করিল। সমবেত দারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশের ফলেই হউক বা শ্রীগুরুর কৃপাতেই হউক, কয়েকবার বৃষ্টি হইল। শ্রীগুরুর জয়ধ্বনি হইতে লাগিল।

এসময়ে শ্রীগুরু যেরূপ নিয়মিত ভাবে মৃগয়ায় যাইতেন, তদ্রূপ শিখগণকে লইয়া দরবারেও বসিতেন। দরবারে বসিয়া নানা প্রসঙ্গ হইত; লোক-চরিত্রেও সমালোচনা হইত। শ্রীগুরু বলিয়াছিলেন, মালবদেশের লোকেরা দয়ালু; ইহাদের 'শিখিভাব' (শিখদিগের যে সকল গুণ থাকা উচিত) অনেকটা আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহারা মিথ্যাবাদী; ইহাদের আকাঙ্ক্ষাও বিলক্ষণ আছে।

ইহার মধ্যে এক সময়ে জ্বর হইয়া অনেক লোক মারাগিয়াছিল। এই মহামারী উপলক্ষে গুরুগোবিন্দ সকলকে বলেন,—গুরুমত গ্রহণ কর,

কেশ রাখ; অনেকের বিশ্বাস, যে ইহাতেই সে বার মহামারী নিবারিত হয় এবং 'খালসাপন্থ', অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হয়।

সরহিন্দের সুবা উজিদার্খা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি ডল্লাকে গুরুর পক্ষপাতী দেখিয়া, তাহাকে গুরুর বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য আবার পত্র লিখিলেন,—"তুমি জান গুরুগোবিন্দ বাদশাহের শত্রু; তথাপি তুমি তাহাকে রক্ষা করিতেছ; ইহার প্রতিফল শীঘ্রই পাইবে।" ডল্লাও উত্তর দিতে লাগিলেন—শ্রীগুরুর কৃপায় ও সকল ভয়ে আমি ভীত নহি। ডল্লা যে সুবার সহিত পত্র দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেছেন, তাহা অপর শিখেরা শ্রীগুরুর কাছে জানাইতে লাগিলেন। একদিন ডল্লা স্বয়ংও ঐ কথা শ্রীগুরুর নিকট উত্থাপন করিলে তিনি বলিলেন,— বিরাড় (মূঢ়) শিখগণকে তুষ্ট রাখ এবং সকলে যেমন দৈনিক বেতন লইয়া থাকে, তুমিও সেইরূপ লও।

ডল্লা বলিল আমার অভাব নাই; কিন্তু এক্ষণে আবার বৃষ্টির অভাবে লোকে বড় কষ্ট পাইতেছে। তাহারা বার বার এইরূপ বৃষ্টির প্রার্থনায় ক্রমে অতিবৃষ্টি হইতে লাগিল? পরে শ্রীগুরুর কৃপায় অতিবৃষ্টিও নিবারিত হইয়াছিল।

এখন গুরুগোবিন্দের ধন জনের অভাব নাই। প্রত্যহ চারিদিক হইতে নানা প্রকার ভেট ও অর্থ আসিতেছে এবং লোকও এত হইয়াছে যে, প্রতি প্রহরে দশজন করিয়া শিখ শ্রীগুরুর পাহারায় থাকে। এক রাত্রিতে গুরুগোবিন্দের বাসস্থানের অদূরে নাচ তামাসা হয়, পাহারার সকলেই মনে করিয়াছিল—দশ জনের মধ্যে দুই একজন পাহারায় অনুপস্থিত হইলে কোন ক্ষতি হইবে না। প্রত্যেকেই এইরূপ মনে করিয়া সকলেই অনুপস্থিত হইয়া পড়ে এবং তদুপলক্ষে তাহারা দণ্ডিত হইয়াছিল।

একদিন ঝুলানসিং নামক জনৈক বাদ্যকর বাদ্য শুনাইতে আইসে। তখন গুরু মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। সে মাতা সুন্দরীকে বাদ্য শুনাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় গুরু ফিরিয়া আসিলেন; বাদ্যকরের ধরণ ধারণ দেখিয়া গুরু বিরক্ত হয়েন; তাহাতে তাহার মনে ঘোর অভিমান হয় এবং তাহার এরূপ ঘুরিয়া বেড়ান একেবারে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আপনার একটী পা কাটিয়া ফেলে! কিছুদিন পরে পুনরায় শ্রীগুরুর সহিত দেখা হইলে, শ্রীগুরু বলেন,—ইন্দ্রিয় বধ করায় কোন ফল নাই; মনকে বশ কর। এই উপলক্ষে তাহাকে জপ তপ অভ্যাস করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

একদিন জনৈক শিখ আসিয়া সংবাদ দিল যে, লাহোর অঞ্চল হইতে শিখদল (সঙ্গত) আসিতেছিল, কিন্তু লাহোরের সুবার হুকুমে একদল তুর্ক আসিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ভাগাইয়াছে। অপর একজন শিখ আসিয়া বলিল,—সরহিন্দ হইতে যে শিখদল আসিতেছিল সরহিন্দের সুবার হুকুমে তাহাদিগকেও মারিয়া ভাগাইয়াছে। গুরুগোবিন্দ বলিলেন,—"তুর্কদল আসিতেছিল, শিখের নিকট মার খাইয়া পলাইয়াছে, ইহাই বরং সম্ভব; মার খাইয়া পলাইবে, এশিক্ষা শিখের নয়—তাহারা হয় মারিবে, নয় মরিবে। গুরু নানক হইতে নবম গুরু পর্য্যন্ত জপমালা ঘুরাণ, শিখের ব্যবস্থা ছিল। বর্ত্তমান দশম গুরু চণ্ডীপূজা করিয়া শিখদিগকে সিংহ করিয়াছেন। ৺ভগবতীর আজ্ঞায় তরবারী ঘুরাইয়া আত্মরক্ষা ও শত্রুনিধনই উহাদের কার্য্য।"

সেবক ডল্লা এই সুযোগে আপন গৌরব প্রকাশের অবসর পাইল; অনুচরবর্গকে লাঠি ও অস্ত্রাদি লইতে হুকুম দিল। বিরাড় শিখগণ সম্বন্ধে বলিল,—উহারা আমার হুকুমের বাহিরে—উহারা শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ আজ্ঞাপালক। এইরূপে উপস্থিত শিখগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে বলিল

এবং পরস্পর যুদ্ধের অভিনয় করিয়া উৎসাহিত থাকিতে ব্যবস্থা করিল। শ্রীগুরু দমদমা হইতে মাড়ো রাস্তার ধারে টালি নামক এক প্রকার ঘাসের উপর উচ্চ স্থানে বসিয়া এই সকল যুদ্ধাভিনয় দেখিতে লাগিলেন। যে স্থানে শ্রীগুরু বসিয়া এই অভিনয় কার্য্য দেখিয়াছিলেন, তাহাকে "টালা সাহেব" বলে। ইহাও শিখদিগের একটী তীর্থ—গুরুদোয়ারা অর্থাৎ মন্দির কথিত আছে যে, এইরূপে দশম গুরু গোবিন্দ সিং কর্ত্তৃক ৩৬০টী গুরু-দোয়ারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গুরু এই যুদ্ধের অভিনয় দেখিবার সময় অনেক কড়া প্রসাদ (মোহন ভোগ) প্রস্তুত করাইয়া, শিখদিগকে লুণ্ঠন করিতে হুকুম দিলেন। কিন্তু শিখেরা উহা লুণ্ঠন করিল না। তাহারা বলিল,—"উহা প্রসাদ, উহা গুরু কৃপা করিয়া দিলে, তবে লইব। হৃদয়ে সন্তোষ রাখিতে হইবে ইহাই শ্রীগুরুর আদেশ।" ইহাতে গুরু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এতদুপলক্ষে গুরু বহুপরিমাণে "অমৃত" প্রস্তুত করাইয়া, তথাকার জলাশয়ে ফেলাইতে বলিলেন। এই সঙ্গে কতকগুলি নূতন কলম (লেখনী) প্রস্তুত করাইয়া, তাহাও জলাশয়ে নিক্ষেপ করাইলেন; এবং বলিলেন ৺কাশীধামে যেমন স্থূলবুদ্ধি লোক গিয়া পণ্ডিত হয়, তদ্রূপ এস্থানে আসিয়া সামান্য শিখও সিংহের ন্যায় প্রতাপশালী হইবে।

এই সময় গুরু কোন দিন "গুরুসীর" কোন দিন "যণ্ড সাহেব" প্রভৃতি স্থানে গিয়া শিখদিগের যুদ্ধাভিনয় দেখিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে শ্রীগুরু শিখদিগকে বহু পুরস্কার দিয়াছিলেন।

এ সময় গুরুগোবিন্দের অর্থ রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র সিন্দুক, বাক্স, বা লোহার সিন্দুক ছিল না। যে কেহ অর্থ-দিয়া প্রণাম করিলে, তাহা শ্রীগুরুর বিছানার বা বালিশের নিম্নে থাকিত এবং তিনি তথা হইতে লইয়া যাহাকে যাহা দিবার, তাহা দিতেন—সঞ্চয় থাকিত না। এই

জন্য কতকগুলি বিরাড় (মূঢ়) শিখ মনে করিত যে, শ্রীগুরুর বিছানার নিম্নে অনেক অর্থ প্রোথিত করা আছে। এইরূপ মনে করিয়া কয়েকজন বিরাড় শিখ, শ্রীগুরু তাঁহার বিছানা (বা আসন) ত্যাগ করিলে, একদিন খনন করিয়া দেখিয়াছিল। পরে, কিছু না পাইয়া লজ্জিত হইয়াছিল।

এই সময়ে এক রাত্রিতে গুরু বিশ্রাম করিলে, সেবক ডল্লা তাঁহার পাহারায় রহিল। কিছুক্ষণ পরে গুরু উঠিয়া দেখিলেন,—ডল্লা তাঁহার পাহারায় রহিয়াছে। গুরু ডল্লাকে বলিলেন—'পাহারা দিবার অন্য লোক আছে, তুমি গিয়া শয়ন কর।' ডল্লা বলিল,—'আপনি বিশ্রাম করুন।' এইরূপে রাত্রি শেষ হইলে, গুরু দেখিলেন, ডল্লা তখনও পাহারায় রহিয়াছেন এবং গুরুমন্ত্র জপ করিতেছেন। তখন গুরু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—তুমি কি প্রার্থনা কর, বল। ডল্লা বলিল,—আমি শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে স্থান পাই, আর কিছু চাই না। গুরু বলিলেন,—তুমি "অমৃত" পান কর। ডল্লা বলিলেন,—শ্রীগুরু প্রসাদই "অমৃত"। তখন গুরু সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন,—তথাপি তুমি নিয়মিত খালসা হও। তখন তাহার নিয়মিত সংস্কারের ব্যবস্থা হইল এবং ডল্লার সহিত আরও একশত জন অনুচর খালসা হইল। এতদুপলক্ষে অনেক কড়া প্রসাদ ও অমৃত প্রস্তুত করান হইয়াছিল। যে পাথরের খোলায় ভাং (সিদ্ধি) পেষিত হয়, তাহাকে ও অঞ্চলে সুনেরী বলে। সেই সুনেরী করিয়া অমৃত প্রস্তুত হইয়াছিল। এই অবধি সেবক ডল্লা, ডল্লাসিং নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে শ্রীগুরু ডল্লাসিংকে একখানি উৎকৃষ্ট ঢাল, একখানি উৎকৃষ্ট তরবারী ও নিজ হস্তের প্রায় দুই সহস্র মুদ্রার একগাছি সুবর্ণ কঙ্কণ দিয়াছিলেন।

তৎপরে ডল্লা সিং শ্রীগুরুকে কহিল,—আমাকে যুদ্ধকৌশলাদি শিক্ষা প্রদান করুন। আমি না হয় একদল তুর্ককে আক্রমণ করি এবং তাহা-

দের সহিত যুদ্ধে আমার কোন ত্রুটি হয় ত আপনার সাক্ষাতে তাহা ঠিক করিয়া লইব; তুর্কেরা যুদ্ধে আমার কিছু করিতে পারিবে না; কিন্তু শ্রীগুরুর নিকটে আমার অনেক শিক্ষণীয় আছে, তাহার শিক্ষা হইবে। এইরূপে শ্রীগুরুর নিকটে আপনার দীনত্ব প্রকাশ ও সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণকে উৎসাহিত করা এবং আপনাকে উদ্‌যোগী রাখা দেখিয়া গুরুগোবিন্দ ডল্লা সিংকে প্রশংসা করিলেন।

ছদ্ম পর্ব্ব ।

—•—

ত্রয়োদশ পর্ব্বাধ্যায় ।

নাভা, পাতিয়ালা প্রভৃতি শিখরাজ্যের উৎপত্তি ।

কপুরের শেষ দশা ।

গুরু একদিন সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় রামা ও তিলোকা নামে দুইজন শিখ আটা, দাইল, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য শকটে করিয়া লইয়া আসিয় শ্রীগুরুকে উপঢৌকন দিয়া প্রণাম করিলেন। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন,—এত দ্রব্য তোমরা কিরূপে আনিলে ? তাঁহারা বলিলেন,- কিছু আমাদের ঘরে ছিল, কিছু আমাদের আত্মীয় স্বজনগণ (শ্রীগুরুর নিকট আসিতেছি শুনিয়া) দিয়াছে। তখন সভাস্থ একজন শিখ বলিল,—'এই দুই মহাত্মা নিতান্ত সামান্য নহেন ; গুরুপুত্রদ্বয় (অজিৎ সিং ও জোরাবর সিং) যখন সম্মুখ সমরে (চমকোর যুদ্ধে) পড়িয়াছিলেন, তখন ইঁহারাই আলুলায়িত কেশে পাগলের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের দেহ সমরাঙ্গন হইতে উঠাইয়া আনিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সৎকারাদি করিয়াছিলেন।' গুরু বলিলেন,—'তোমরা আমার জন্য এত করিয়াছ, আমি তোমাদের কি দিয়া সন্তুষ্ট করিব ?— কি বর দিব, বল ?' তাহাতে রামা ও তিলোকা বলিলেন,—তুর্কের বিষম অত্যাচার ; আমাদের একটু দাঁড়াইবার স্থান নাই। যেখানেই বাস করিয়া ক্ষেত্রে কিছু উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করি, সেই খানেই তুর্ক আসিয়া বাধা দেয় এবং উৎপন্ন দ্রব্য লুণ্ঠন করে।

ইহাতে শ্রীগুরু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, অতঃপর তুর্ক আর তোমাদের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারিবে না। তোমাদের বাসস্থানের মূল দৃঢ় হইল—উহা পাতালস্পর্শী হইয়াছে। অতঃপর পুরুষানুক্রমে দিল্লী লাহোর মধ্যে বিস্তৃত রাজ্য চিরদিন সুখে ভোগ করিতে থাক। ইঁহারাই বর্ত্তমান নাভা ও পাতিয়ালা-রাজের আদি পুরুষ। শ্রীগুরুর সেই আশীর্ব্বাদেই এত বিষম পরিবর্ত্তনের মধ্যে অদ্যাপি ইঁহাদের রাজ্য অটুট রহিয়াছে! এই-রূপ আশীর্ব্বাদের সহিত শ্রীগুরু দুইজনকে দুই শিরোপা (পাগড়ী) দিলেন।

অল্প দিনেই শিখ-সমাজে এই কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তখন, কালাদেওকে বঠাণ্ডা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য যে জমিদার মহিষ দিয়াছিল, সেই বজ্জের, কতকগুলি স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্যের সহিত গুরুকে উপঢৌকন দিয়া প্রণাম করিল এবং রামা ও তিলোকাকে শ্রীগুরু যেরূপ দয়া করিয়াছেন, সেইরূপ দয়া প্রার্থনা করিল। গুরু তখন আফিং ও সিদ্ধি সেবন করিয়া এক উচ্চাসনে বসিয়া ছিলেন। অদূরে ক্ষেত্রে কোথাও গরুর পাল চরিতেছে, কোথাও ইক্ষু, বাজারি, প্রভৃতি শস্য শোভা পাইতেছে। এ সময় গুরু যেভাবে বসিয়াছিলেন, তাহাতে কেহ কেহ মনে করিয়াছিল, শ্রীগুরুর আফিং সিদ্ধির প্রভাবে যেন একটু নেশার আমেজে আছেন। কিন্তু বজ্জেরের সহিত যেরূপ কথা হইতে লাগিল, তাহাতে উহার শ্রীগুরুর প্রতি কিরূপ বিশ্বাস, তাহাই পরীক্ষা করা যেন উদ্দেশ্য ছিল। গুরু বজ্জেরকে বলিলেন,—তোমার যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট। ইহাতে বজ্জের পূর্ব্বের অপরাধ স্মরণ করিয়া বলিল,—অবশ্য আমি এক সময়ে শ্রীগুরুর প্রভাব বুঝিতে পারি নাই; সে জন্য বিদ্রূপ ছলে ক্ষিপ্ত মহিষটা দিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ মহিষ ধৃত হওয়া অবধি আমি শ্রীগুরুর প্রভাব বেশ বুঝিয়াছি। গুরু বলিলেন,—তোমারও রাজ্য তুর্ক লইবে না; তুর্ক আর উৎপাত করিবে না।

সুযোগ বুঝিয়া ডল্লা সিংও আপন অংশ শ্রীগুরুর দ্বারা ঠিক করিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। গুরু অদূরে (উলু) ঘাস দেখাইয়া বলিলেন,—বেশ ইক্ষু হইয়াছে। ডল্লা বলিল,—উহা ইক্ষু নয় ঘাস। শিখদের বিশ্বাস এই যে, যদি ডল্লা ইক্ষু বলিয়াই দেখিতে পাইত, নিজের চক্ষের অপেক্ষা শ্রীগুরুর কথাতে বিশ্বাস অধিক হইত, তাহা হইলে উহার বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইত। যাহা হউক, গুরু বলিলেন,—অতঃপর আর তোমার তুর্কের ভয় নাই; কিন্তু তোমায় রাজকর দিতে হইবে। এক্ষণে তুর্ক নাশ হইয়াছে; অতঃপর খালসা রাজ্য করিবে। তোমার এখানে গম বাজরি প্রভৃতি শস্য হইবে, কিন্তু কিছুদিন পরে হইবে। "ডল্লা দিন পাকে হোগা।"

অপর একদিন সভায় কপূরের প্রসঙ্গ উত্থিত হইল। "মুক্তেসর" যুদ্ধের পূর্ব্বে গুরুগোবিন্দ যখন কোট কপূরা সহরে গিয়াছিলেন, তখন কপূরের তুর্কের প্রতি গোঁড়ামি শুনিয়া—তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। এক্ষণে একজন শিখ বলিল,—কপূর মারা গিয়াছে। ডল্লা সিং বলিল, সে কিরূপে মারা গেল, তাহার বৃত্তান্ত বল। শিখ বলিল, কপূর-কোট ও ঢেলু গ্রামের নিকট ডেলুই মেলা হয়। সেই মেলায় কপূর ও সোডী বংশীয় সাহেব কৌল এক মণ্ডিতে (খাটিয়ায়) বসিয়া মদ্যপান করিতে ছিল। উহাদের পূর্ব্বে বৈরীভাব ছিল, কিন্তু পরে মিলন হয়। এক্ষণে মাতাল অবস্থায় পুনরায় সেই শত্রুভাব জাগিয়া উঠিলে পরস্পর গালাগালি ক্রমে মারামারিতে পরিণত হয়। তখন রব উঠিল—"সাহেব কৌল মেলা বিগড়া।" ইহা শুনিয়া সোডী বংশীয় অভয়রাম, শ্রীরাম প্রভৃতি মারামারি থামাইতে আইসেন। এই উপলক্ষে শ্রীরাম ও উহার এক ভাই (গৌরা) মারা পড়ে। ইহাতে অভয়রাম বলেন,—কপূরের উপর দশম গুরুর যে অভিসম্পাত আছে, তাহাই হইবে; অধিকন্তু

কপুর তৃষ্ণার জলটুকু পর্য্যন্ত পাইবে না। এতদুপলক্ষে স্থানীয় নবাব (শাসনকর্ত্তা) ইস্‌গা খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইলে, কপুর বড় বড় ঘাসের অন্তরালে লুক্কায়িত হয়। তখন তাহাকে বাহির করিয়া "কপুরা না কতুয়া" প্রভৃতি গালি দিতে দিতে বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পথিমধ্যে এক পাঠান ইস্‌গা খাঁকে কপুরের দৌরাত্ম্যের কথা জানাইয়া বলে,—উহাকে ছাড়িও না,—ফাঁসি দাও। এইরূপে কপুরের ফাঁসি হইয়াছে; ফাঁসির পূর্ব্বে সে স্নান এবং জলপান করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে কিঞ্চিন্মাত্র তৃষ্ণার জলও দেওয়া হয় নাই।

শ্রীগুরুর অভিসম্পাতে সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস! অভয় রাম একবারে দুইটী শোক পাইয়াছে, এই সকল কথা হইতে লাগিল। এমন সময় আকাশে মেঘ গর্জ্জন হইল। গুরুগোবিন্দ যেন ও সকল কথার নিবৃত্তি ইচ্ছা করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—বল দেখি এই ধরিত্রী কাহার উপর আছেন? তাহাতে কেহ বলিল,—শেষ নাগের উপর; কেহ বলিল,—গরুর সিংয়ের উপর; কেহ বলিল—কূর্ম্মের উপর ইত্যাদি। তখন গুরু বলিলেন,—তবে ঐ সকল কাহার উপর আছে? এবার আর কেহ উত্তর দিতে পারিল না। গুরু কহিলেন,—সচ্ (সত্য)। সকলই সচ্ (সত্য) আশ্রয় করিয়া আছে। সকলেই সেই সচের (সত্যের) আশ্রয় লও।

ছদ্ম পর্ব্ব।

—•—

চতুর্দ্দশ পর্ব্বাধ্যায়।

দক্ষিণ হইতে দয়া সিং ও ধরম সিংহের সংবাদ।

একদিন গুরুগোবিন্দের স্মরণ হইল যে বহুদিন হইল, দয়া সিং ও ধরম সিংকে দক্ষিণে পাঠান হইয়াছে, অদ্যাপি তাহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এমন সময় দক্ষিণ হইতে দয়াসিংহের পত্র আসিল। তাহাতে তিনি শ্রীগুরুকে পুনঃপুনঃ নমস্কার জানাইয়া লিখিয়াছেন,—এতদিন ধরিয়া বহুচেষ্টা করিয়াও বাদশাহ আরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। আমরা যেরূপেই চেষ্টা করি বাদশাহের কর্ম্মচারিগণ বাধা দিয়া তাঁহার সাক্ষাতে যাইতে দেয় না। এক্ষণে আপনি যদি দয়া করিয়া আপনার কর্ম্ম আপনি করেন,—দেখা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তবেই হইতে পারে। ধরম সিংও অপর পথ দিয়া এখানে পৌছিয়াছেন, কিন্তু তিনিও বাদশাহের সহিত দেখা করিবার উপায় করিতে পারেন নাই।

শ্রীগুরু উত্তর লিখিলেন,—তোমার পত্র পাঠ করিয়াছি। উহার এই উত্তর পাঠ কর। এই উত্তর পাঠ করিতে করিতেই বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় হইবে। তিনি তোমাদের ডাকাইয়া সাক্ষাৎ করিবেন।”

শ্রীগুরুর এই পত্র দয়াসিংহের নিকট রাত্রিকালে পৌছিল। এস্থলে শিখদিগের বিশ্বাসমত যে বিবরণ “সূর্য্য প্রকাশে” লিখিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপতঃ এই :—

সম্রাট আরঙ্গজেব প্রত্যহ ভারত হইতে মক্কায় গিয়া নোয়াজ (নমাজ) করিয়া আসিতেন। বিনা সাধনায় সম্রাট হওয়া যায় না; শিখেরা মনে করেন, সম্রাট আরঙ্গজেব মহাদেবের অংশসম্ভূত ছিলেন। যে দিন দয়াসিংহের নিকট গুরুগোবিন্দের পত্র পৌঁছায়, সেই রাত্রিতে শ্রীগুরুও যোগবলে অশ্বপৃষ্ঠে মক্কায় গিয়াছিলেন। শ্রীগুরু তথায় গিয়া দেখিলেন যে, সম্রাট নোয়াজ শেষ করিয়া মধ্য মসজিদ হইতে বাহির হইয়া, তথাকার মহাত্মা সভায় যাইতে উদ্যত। সম্রাট সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে গুরুকে দেখিয়াও কথা কহিলেন না। গুরু তীব্র কটাক্ষ করিলে, আরঙ্গজেব ভীত হইলেন এবং তাঁহার মহাত্মা সভায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আকাশবাণী হইল :—

"রে বন্দে মৎ মন্দাজান।
মৎ কর সুরৎকে গুমান॥
হাম যো গুরু সো গুরু হাম হায়।
তু বান্দা কিম্ হোয়ৎ সম হায়॥
মৎ বরাবরি কর মৎ মন্দে।
এতো ঘের রঞ্জ তু বন্দে॥

অর্থাৎ রে মন্দমতি, আপন মন্দজানিও, শরীরের অহংকার করিস্ না। আমি যে গুরু, সে গুরু আমি। তুই দাস, কিরূপে সমান হ'স্। সমান সমান মনে করিস্ না। রহদাস, তোকে এই কিঞ্চিৎ বলিলাম।

যাহাহউক ইহাতে ইহাদের উভয়ের পরিচয় হইল। শ্রীগুরু বলিলেন, —"আমার লোক তোমার সহিত দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে; তাহাদের সহিত দেখা করিবে। তোমার তেজ আর অধিক দিন থাকিবে না।" এই কথার পর উভয়েই স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে সম্রাট আরঙ্গজেব স্নানাদি সমাপন করিয়া প্রধান অমাত্যকে ডাকাইয়া শিখ গুরুগোবিন্দ সিংহের লোক কে আসিয়াছে তাহার সন্ধান লইয়া ডাকাইলেন। ধরম সিংকে অগ্রে করিয়া দয়া সিং সম্রাটের কক্ষে প্রবেশ করিয়া, যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সম্রাট যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং শ্রীগুরু তদুত্তরে যে হুকুম নামা বা জাফর নামা লিখিয়াছিলেন, সেই উভয় পত্রই সম্রাটকে দিলেন। শ্রীগুরু সম্রাটকে যে পত্র দিয়াছিলেন, উহার প্রথমেই "ওয়া গুরুজীকা ফতে" (অর্থাৎ শ্রীগুরুর জয়) শব্দ পাঠ করিতে হইল! এই পত্র পারসী ভাষায় লিখিত। সম্রাট স্বয়ং উহা পাঠ করিয়া দুই এক জন অমাত্যকেও উহা দেখিতে দিলেন।

সম্রাটের প্রশ্নের উত্তরে দয়া সিং বলিলেন,—আমরা মদ্র দেশ হইতে আসিয়াছি। তৎপরে সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন,—শ্রীগুরু এক্ষণে কোথায় আছেন। দয়া সিং বলিলেন,—গুরু সর্ব্বব্যাপী, স্মরণ মাত্রে তাঁহাকে সর্ব্বত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন সম্রাট বলিলেন,—তোমার গুরু অনেক আজমৎ (অদ্ভুত বিদ্যা) জানেন, তোমরা কিছু জান ত দেখাও। এই সময় সম্রাট নিজের একটী কুকুরকে ডাকিলেন। কুকুরটা বেশ বড়, উহার মুখটা ছুঁচাল, উহাকে দেখিয়া শিকারী বলিয়া বোধ হইল। তখন দয়া সিং বলিলেন,—শুনুন, কুকুরটা বলিতেছে, "তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার মত ছিলে, এবার সুন্দর শরীর লইয়া এত অহঙ্কার করিতেছ কেন? এরূপ করিলে পুনরায় কুকুর হইবে।"

তৎপরে সম্রাট বলিলেন,—তোমাদের গুরু বড় তাড়াতাড়ি খালসা পন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তদুত্তরে দয়া সিং বলিলেন,—আপনি ত বড় তাড়াতাড়ি হিন্দুকে নষ্ট করিতেছেন। সম্রাট পুনরায় বলেন,—সত্বরে হিন্দু নষ্ট হইয়া সব এক হয়, ইহাই আমার কার্য্য। তদুত্তরে দয়া সিং পুনরায়

বলেন,—শ্রীগুরু সকলকে রক্ষা করিয়া তিন (অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান ও খালসা) করিয়াছেন। বলিতে কি, ভগবান্ গীতায় যে বলিয়াছেন :—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

অর্থাৎ হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই; সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ (প্রকাশিত) হই। ইহাতে তিনিই সকলকে রক্ষা করিতেছেন।

তৎপরে সম্রাট জিজ্ঞাসা করেন,—তোমাদের গুরু এখন কি করিতেছেন? দয়া সিং বলেন,—শ্রীগুরু এক্ষণে শস্ত্র সকল একত্র করিতেছেন, সেই জন্য আপনার নিকট যে অস্ত্র আছে, উহা লইবার জন্য আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন। তখন সম্রাট আরঙ্গজেব "কপিরা" নামক শস্ত্র (তরবারী) খানি তৎসহ অপরাপর দ্রব্য দয়া সিং দ্বারা শ্রীগুরুকে পাঠাইয়া দিলেন এবং সাম্রাজ্যের সুবা ও নবাবগণের প্রতি পরওয়ানা জারি করেন যে, অতঃপর শিখ গুরুগোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে কেহ অস্ত্র ধারণ করিবে না। শস্ত্র দানের পর হইতে সম্রাটের শরীরে যে রোগ প্রবেশ করে, তাহাতেই সম্রাটের মৃত্যু হয়।

অতঃপর দয়া সিং ও ধরম সিং গুরু দর্শনার্থে দমদমা যাত্রা করেন। আসিবার সময় যেমন দুইজনে দুই পথে আসিয়াছিলেন, যাইবার সময়ও দুইজনে দুইপথে চলিলেন।

দক্ষিণ-যাত্রা পর্ব্ব।

—•—

প্রথম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর দক্ষিণ যাত্রা।

দক্ষিণ হইতে ধরম সিং আসিয়া পৌঁছিলে, এবং শ্রীগুরুকে যথাবিহিত নমস্কারাদি করিলে, গুরু বলিলেন,—আমি দক্ষিণে যাইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি। ধরম সিং সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তার বিবরণ শ্রীগুরুকে জানাইলেন।

এতদিন উপস্থিত শিখগণ, শ্রীগুরুর সহিত আনন্দে দিন কাটাইতে ছিলেন। এক্ষণে দক্ষিণযাত্রার কথায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গুরু বলিলেন,—ডল্লা তুমি দিল্লীতে রাজত্ব কর। ডল্লা বলিল,—আমি আপনার পদপ্রান্তে বড় সুখে আছি; রাজত্বের আর প্রয়োজন কি? আপনি এখানে থাকুন, ইহাই আমরা চাই। গুরু রাম সিংয়ের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, ইহাই সকলে জানিত। গুরুর দক্ষিণ যাইবার উদ্‌যোগে রাম সিং দুঃখিত হইল। রাম সিংয়ের ভ্রাতা ফতে সিং গুরুর সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। বিরাড় শিখগণের দক্ষিণ যাইতে অনিচ্ছা হইলেও গুরু সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া, প্রায় সকলেই যাইতে মৌখিক ইচ্ছা প্রকাশ করিল। শ্রীগুরু বলিলেন,—যাহার ইচ্ছা হয় সে চল, অনিচ্ছায় যাইবার প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেহ বা বলিল,—সম্রাট নিজের বাপ ও ভাইকে মারিয়াছে, তাহার নিকট গিয়া কি হইবে? কেহ বলিল,—দক্ষিণে গেলে

পুনরায় যুদ্ধ অনিবার্য্য ; কেহ বলিল,—আমি সংসারে একাকী ; আমি না থাকিলে কৃষিকার্য্য একবারে বন্ধ যাইবে ; কেহ বা বলিল,—সম্রাট এক্ষণে গুরুকে শ্রদ্ধা দেখাইতেছেন ; নিকটে গেলে হয় ত অবজ্ঞা করিবেন। শ্রীগুরু বলিলেন,—ও সকল চিন্তা আমার নাই। আমি এক মাত্র অকাল পুরুষে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি; তোমরা কেহ না যাও, দক্ষিণে গিয়া আবার আমি তোমাদের ন্যায় শিখ দল প্রস্তুত করিব এবং তাহাতেই আনন্দ চলিবে ; তুর্ক আমার কিছুই করিতে পারিবে না ; অতঃপর খালসা রাজ্য হইবে ; বাবর, আকবর, জাহাঙ্গীর প্রভৃতি বড় বড় সম্রাটগণ গিয়াছেন— আরঙ্গজেবও যাইবেন,—ইহা স্থির। আমি দক্ষিণে যাইব ; তোমরা ভয় পাও, যাইও না। তখন রাম সিং বলিল,—ফতে সিংকে রাখিয়া আমি যাইব ; ডল্লা সিংও যাইতে চাহিল।

ইহার পর শ্রীগুরু বলিলেন, - আরঙ্গজেবের পত্নীবিয়োগের পর ডল্লার যে কন্যা হইয়াছে, ঐটী সেই আরঙ্গজেব পত্নী—সম্রাজ্ঞী জানিবে ; সম্রাজ্ঞীর হৃদয়ে গুরুভক্তি ছিল ; ঐ কন্যাটীও গুরুভক্তি দেখায়— গুরুর চূড়া-প্রসাদ গ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়—সঙ্গেও যাইতে চায়। এই কথা আলোচনা হইতে হইতে অভয়রাম যে পুত্রশোক পাইয়াছে, গুরু তাহার উল্লেখ করিয়া তাহাকে ডাকাইলেন ; এবং নানা সৎকথায় তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন। অভয়রামের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে গুরু হররায় বলিয়াছিলেন,—"গুরু নানক জাহাজ ফাট গেয়ো" (অর্থাৎ গুরু নানক যে শিখ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, উহাকে জাহাজ স্বরূপ উল্লেখ করিয়া, উহা ভাঙ্গিতে বসিয়াছে), সেই কথার উল্লেখ করিয়া গুরুগোবিন্দ বলিলেন :—

"ফটে হে জাহাজ একেএ করেঙ্গে।
মিল মিল সরধা করায় তরঙ্গে.॥"

অর্থাৎ ভগ্ন জাহাজ আবার একত্র করিব এবং সকলে মিলিয়া আবার শ্রদ্ধার তরঙ্গ উঠাইব।

এই সময়ে পুঞ্জ দিওয়ানে নামক জনৈক শিখ শ্রীগুরুর দক্ষিণ যাত্রার সংবাদ পাইয়া, আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার কথায় জানা গেল, বিরাড় শিখগণ যদিও গুরুর সহিত এক্ষণে যায়, কিন্তু পথ হইতে পলাইয়া আসিবে।

কিছু পরে ডল্লা সিং বলিল,—"আমি যাইব বটে, কিন্তু শ্রীগুরু যেরূপ বলিলেন, তাহাতে এখানে আমি না থাকিলে কে গ্রামাদি বসাইবে?" শ্রীগুরু ডল্লার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন,—তোমার ও দেহ চিরস্থায়ী নয় জানিও। রাম সিংও ডল্লার ন্যায় ভাব প্রকাশ করিলে, উহাকেও গুরু ঐরূপ উত্তর দিলেন।

কয়েকদিন এইরূপ দক্ষিণ-যাত্রার আলোচনার পর একদিন প্রভাতে শ্রীগুরু স্নানাদি করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষিণ-যাত্রা করিলেন। সঙ্গে ডল্লা সিং ও রাম সিং এবং তাঁহাদের অনুচরবর্গ এবং কয়েক জন বিরাড় শিখ চলিল। প্রথম দিনেই তাঁহারা মারওয়ার প্রদেশেস্থ ঝোড়ড়ি গ্রাম ও চণ্ডে গ্রাম পার হইয়া সর্ষা গ্রামে পৌছিলেন। তথায় গুরুভক্ত ধরম সিং ও পরম সিং আসিয়া শ্রীগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাম সিংয়ের ভ্রাতা ফতে সিংকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে বলা হইলে, সে তথা হইতে ফিরিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে শ্রীগুরুর নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই ডল্লা সিং শ্রীগুরুর পদতলে একখানি খণ্ডা (ছোট তরবারী) ও নিজ হাতকড়া রাখিয়া গুরুকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কয়েকজন বিরাড় শিখ ও একজন সোডী বংশীয় শিখকে সমভিব্যাহারে লইয়া সরিয়া পড়িল। নিদ্রাভঙ্গের পর এই সংবাদ জানিতে পারিয়া গুরু বলিলেন :—

"কহে গুরু মঝায়ল নহি মাড়ে।
দেশ মালওয়ে কে তোয় লাড়ে॥"

অর্থাৎ কেবল মাঝাগ্রামবাসীরাই পলাতক হয় না, উহারা মালবদেশবাসীদের জামাই হইবার যোগ্য। মাঝাবাসিগণ আনন্দপুর হইতে পলায়নপর হইয়াছিল। এক্ষণে মালব দেশের লোকেরা সেইরূপ করায় মাঝাবাসীদের জামাই হইবার উপযুক্ত বলিলেন। শিখেরা বলেন,— অদ্যাপি দেখা যায়, শ্রীগুরুর এই বাণী অনুসারে মালবদেশবাসীদেরই প্রায় মাঝাগ্রামে বিবাহ হইয়া থাকে।

তৎপরে গুরুগোবিন্দ অশ্বারোহণে নহর নগরের নিকটে আসিয়া ঐ নগরবাসী কিষণলাল নামক জনৈক জ্যোতিষীকে ডাকাইয়া, তাঁহাকে এই আহ্বানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, জ্যোতিষী বলিয়াছিলেন,— আপনি সম্রাটের উদ্দেশে যাইতেছেন, কিন্তু আপনি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিবেন এবং সম্রাটের পুত্র আপনার প্রিয় হইবেন। জ্যোতিষীর এই কথায় গুরু তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া বলিলেন — ক্রমেই তোমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবে এবং তুমি ঘরে বসিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জন করিবে। 'সূর্য্যপ্রকাশ' গ্রন্থকার বলেন, যে কিষণলাল জ্যোতিষী প্রথমে শ্রীগুরুর বাক্যে নির্ভর করেন নাই বলিয়া দিন কতক প্রবাসে গিয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন; পরে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইলে, তিনি ঘরে বসিয়া সচ্ছন্দে দিন যাপন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, শ্রীগুরু তাঁহাকে দক্ষিণাদানে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন —গুরুগোবিন্দ দমদমা হইতে আনন্দপুর গিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে সম্রাটের আমন্ত্রণে সরহিন্দ হইয়া দক্ষিণে গিয়াছিলেন। এই সময়ে গুরু সরহিন্দের নাম "গুরুমার" রাখিয়াছিলেন। সে কথা কিন্তু 'সূর্য্যপ্রকাশে' প্রকাশ পায় নাই।

দক্ষিণযাত্রা পর্ব্ব।

—:•:—

দ্বিতীয় পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর দক্ষিণ যাইবার পথে নানা কথা। পুষ্করতীর্থ দর্শন। দাদুমিলন।

গুরুগোবিন্দ নহর নগরের যে অংশে ছিলেন, তাহাকে ছিন্‌তালাই বলে। তথা হইতে এক দিন নগর দর্শনে গিয়াছিলেন; সঙ্গে শিখগণ ছিল। নগরের চকে, অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে গুরু দাঁড়াইয়া নগরটী দেখিতেছেন, এমন সময় একটী কবুতর (পায়রা) উড়িয়া আসিয়া হঠাৎ শিখদিগের পায়ে পড়ে। সোরাহিদাস নামক জনৈক শিখের পা লাগিয়া কবুতরটী পঞ্চত্ব পায়। তাহাতে নগরবাসিগণ গোল করিতে থাকে। শ্রীগুরু বলিলেন,—এমন কত মরে, উহার জন্য এত গোল কেন? তাহাতে নাগরিকেরা আরও বিরক্তিভাব ধারণ করাতে গুরু বলিলেন,—ওরূপ রাগ করিতেছ কেন? যে জন্মিয়াছে সেই মরিবে—ঐ পায়রাগুলিও মরিবে। তিনি এই কথা বলিবামাত্র নিকটস্থ পায়রার ঝাঁকটী শিখদিগের দলে পড়িল এবং দেখা গেল সকল গুলিই মরিল। তখন নাগরিকেরা শ্রীগুরুর পদতলে পড়িল এবং উহাদিগকে বাঁচাইয়া দিবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। বার বার এই প্রার্থনা করিলে কবুতর গুলি বাঁচিয়া উঠিল এবং আপন ইচ্ছাক্রমে ঘুরিতে ফিরিতে উড়িতে লাগিল। শ্রীগুরু এ সময় বলিলেন,—এমন নগর, এখানে অনেক আঢ্য ব্যক্তিও রহিয়াছেন,

এখানে খালসা-পন্থ চলিলে ভাল হয়; কিন্তু লোকের সে ভাব দেখিতেছি না; এ স্থল লুণ্ঠিত হইবে। "সূর্য্যপ্রকাশ" গ্রন্থকার বলেন,—তদনুসারে সম্বৎ ১৮১১ (১৭৫৪ খৃঃ অব্দে) এই নগর লুণ্ঠিত হইয়াছিল। এস্থানের জল খারা (বিস্বাদ, তীব্র); স্থানটী অস্বাস্থ্যকর।

তৎপরে তিনদিনের পর গুরুগোবিন্দ নহর-নগর ত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণে আটক্রোশ দূরে পাঁৎয়ানগরে গিয়া রাত্রিযাপন করেন। এই সময়ে অনুচর ধরমসিং ও পরমসিং দুইভাই শ্রীগুরুর শয্যার জন্য নিত্য নূতন মঞ্চ (খাটিয়া) প্রস্তুত করিয়া দিত। তৎপর দিন গুরু সাতক্রোশ দূরে সোহেবা নগরে গিয়া রাত্রিযাপন করেন। এখন অস্ত্র বহিবার ভার পরমসিংহের উপর অর্পিত হইল। পরমসিং উহা মস্তকে করিয়া পদব্রজে যাইত; ইহাতে গুরু বলেন,—পরমসিং তুমি অস্ত্রগুলি অঙ্গে লইয়া অশ্ব পৃষ্ঠে চল। তখন পরমসিং বলিল,—প্রভু, তাহাতে যদি শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে না পারি! এই উত্তরে গুরু বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে দেখা গেল যে, কতকগুলি জণ্ড বৃক্ষের বন রহিয়াছে; কেবল একটীমাত্র পিপুল অশ্বত্থ) বৃক্ষ একটী জণ্ড বৃক্ষকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। গুরু ঐ বৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—যখন ঐ (অশ্বত্থ) বৃক্ষ বৃদ্ধি পাইয়া এই সমস্ত বৃক্ষগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইবে, তখন দেখিবে, এতদ্দেশ খালসায় পূর্ণ হইয়াছে।

শ্রীগুরু অশ্বপৃষ্ঠে সর্ব্বাগ্রে ছিলেন, তৎপশ্চাতে রামসিং। কিন্তু তিনি ক্রমে পিছাইয়া সরিয়া পড়িলেন। রামসিং ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতেছে দেখিয়া, গুরু তাহাকে নিকটে ডাকিতে বলিলেন; সে আসিল না; বলিল,—আমি আর শ্রীগুরুর সাক্ষাতে যাইব না—আমি ঘরে ফিরিয়া না গেলে সংসারের বড় ক্ষতি হইবে। গুরু পুনরায় ডাকাইলেন এবং বলিলেন—উহার ঘোড়ার সম্মুখে রুমাল ফেলিয়া দিয়া বাধা দিয়া ডাকিয়া আন।

তথাপি রামসিং ফিরিল না. সংসারের মায়া তাহাকে সবলে সংসারে ফিরাইয়া লইয়া গেল। 'তখন শ্রীগুরু কহিলেন, কেন ইহারা এমন করিল! ইহারা আমায় ছাড়িয়া গেল; কিন্তু ধর্ম্মরাজ যম ত ছাড়িবে না। উহারা যে 'সংসার' 'সংসার' করিয়া ব্যাকুল হইয়া গেল, তখন ঐ সংসার কিরূপে দেখিবে, তাহা একবারও ভাবিল না! "সূর্য্যপ্রকাশ"বলেন যে,—রামসিং ঘরে গিয়া পাগল হইল এবং একমাস মধ্যে দেহত্যাগ করিল। ফতেসিং ঘরে গিয়া হঠাৎ গৃহের দ্বারে মাথায় আঘাত পাইয়া পড়িয়া মারা গেল; ভল্লাসিংও ঘরে গিয়া পীড়িত হইল এবং অল্প দিনেরই মধ্যেই এক পুত্র, দুই পৌত্র ও নিজে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

গুরু সেদিন মধুসিঙ্গানে নামক স্থানের একটি গ্রামে দশ ক্রোশ দূরে অবস্থান করিলেন। সেই গ্রাম নগর হইতে বহুদূর। 'পরমসিং শ্রীগুরুর জন্য সে রাত্রির মণ্ড (খাটিয়া) কিরূপে প্রস্তুত করিবে দেখা যাউক—' শিখদিগের মধ্যে এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় পরমসিং একটী মঞ্চ (মাচা) প্রস্তুত করিয়া দিলে, ইহাতে শ্রীগুরু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—পরমসিং তোমার কার্য্য পূর্ণ হইয়াছে, তুমি ঘরে যাও। অনন্তর আশীর্ব্বাদ করিলেন "তুমি বিনা অস্ত্রে জয়লাভ করিবে।"

"সূর্য্যপ্রকাশের" মতে তৎপরে শ্রীগুরু পুষ্করতীর্থে পৌঁছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন,—সম্রাট আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর এবং বাহাদুর শার সহিত সখ্যতা হইলে, যখন গুরু গোদাবরী দর্শনে যান, সেই সময়ে পুষ্কর-তীর্থে আসিয়াছিলেন। চৈতননামা জনৈক ব্রাহ্মণ আসিয়া পুষ্করে পাণ্ডার কার্য্য করিয়াছিল। গুরুগোবিন্দ শুনিলেন, যে গুরু নানক এখানে আসিয়া স্নান-দানাদি করিয়াছিলেন এবং গোরখনাথ গোপীচাঁদ প্রভৃতি সিদ্ধগণ আসিয়া গুরুনানকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত হিন্দু শাস্ত্রানুসারে

পুষ্করতীর্থ কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল—ব্রহ্মা এখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন ইত্যাদি কথাও গুরুগোবিন্দ শুনিলেন একদা চৈতন ব্রাহ্মণ শিখদিগকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই কেশধারী লোকগুলি হিন্দু না মুসলমান? গুরুগোবিন্দ বলিলেন,—ইহারা "খালসা"। এই উপলক্ষে তিনি তাহাকে খালসা পন্থের বিবরণ শুনাইয়া ছিলেন।

ক্রমে সহচরগণের সহিত গুরু পুষ্করতীর্থ হইতে পুরনারায়ণ গমন করিলেন। এস্থানে দাদু পন্থাদিগের প্রধান আড্ডা। গুরু গ্রামের এক প্রান্তভাগে স্থান লইলেন। শিখেরা শ্রীগুরুর শুভাগমনবার্ত্তা দাদুকে জানাইল এবং কহিল ইনি শিখদিগের দশম গুরুগোবিন্দ সিং; ইহাঁর রাজধানী আনন্দপুর। প্রসঙ্গ ক্রমে তাহারা আনন্দপুর, চমকোর প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধ এবং গুরুকুমারদিগের দেহত্যাগাদি বর্ণন করিল। শিখেরা দেখিলেন. দাদুরস্থানে অনেক শান্ত সেবক রহিয়াছে।

পরে দাদু মোহন্ত সঙ্গে শ্রীগুরুকে দেখিতে আসিলেন। গুরু দাদুকে বিশেষ যত্ন খাতির করিলেন। দাদু গুরুকুমারদিগের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া গুরুর প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেন। তাহাতে গুরু বলিলেন,—সংসারী হইলে "দাওয়া" অর্থাৎ আমার বলিয়া দাবা করিতে হয় এবং সময় অনুসারে তদনুরূপ কার্য্যও করিতে হয়। তৎপরে দাদু কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—কেহ ইট মারিলেও মাথা পাতিয়া লইতে হয়। তখন—

দাদু সমা বিচারকে কল্‌কা কিজে ভায়।
যে কোই মারে ইটে তিস পাথর হানে রসায়॥

অর্থাৎ দাদুর সহিত বিচারকালে গুরু বলিলেন,—যদি কেহ ইটের টুকরা মারে, তাহাকে পাথর মার অর্থাৎ গুরু সংক্ষেপে বলিলেন,—এক্ষণে কলিকাল, সহজেই দুষ্টের বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এক্ষণে

ইট মরিলে পাথর মারিতে হয়; নতুবা দুষ্টের দমন ও সাধুরক্ষা হওয়া কঠিন। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, দাদু গুরুকে সদলে আমন্ত্রণ করিয়া ভাণ্ডারা (ভোজ) দিতে চাহিলেন। বোধ হয়, দাদু পন্থীরা মাংস খায় কিনা জানিবার জন্য গুরু বলিলেন,—আমার সঙ্গে বাজ কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী জীব আছে। দাদু বলিলেন,—আজ না হয় তাহারা সাধুসঙ্গে জোয়ার বাজরা প্রভৃতি শস্যেই উদর-পূরণ করিবে। তৎপরে সহচরগণসহ গুরু দাদুর স্থানে গমন করিয়া, তাঁহার মন্দিরে প্রণামাদি করিয়া, তদীয় আতিথ্য স্বীকার করে। অনুচরসহ গুরুর ভোজন হইয়া গেলে, জায়েৎ নামক জনৈক সাধু গুরুর বাজপক্ষীকে অন্ন আনিয়া দিয়া বিনয় সহকারে বলিল,—আজ তোমার খাবার জন্য মাংস নাই; আজ সাধুসঙ্গে অন্ন খাও। বাজ সে দিন সাধুদত্ত অন্ন খাইয়া ছিল।

তৎপরে সদল গুরু নিজ আড্ডায় ফিরিয়া আসিলে জনৈক শিখ সহাস্য বদনে বলিল,—গুরু যখন দাদুর মন্দিরে গিয়া প্রণামাদি করিয়াছেন, তখন উনি শিখপন্থ অনুসারে "তন্খাইয়া" (অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয়) হইয়াছেন। গুরুও সহাস্যবদনে বলিলেন,—দণ্ডের পরিমাণ নির্ণয় হউক। তখন, একজন বলিলেন,—পাঁচ হাজার মুদ্রা; অপর একজন বলিলেন উহা অত্যন্ত অধিক হয়,—পাঁচশত মুদ্রা ঠিক; কেহ বা বলিলেন, গুরুর অভাব কি—পাঁচ লক্ষ মুদ্রা হইতে পারে। অবশেষে ১২৫৲ শওয়া শত মুদ্রা স্থির হইল। শিখেরা এই টাকা লইয়া বলিল,—এক্ষণে আমাদের গুরুর একটী তাঁবুর অভাব হইয়াছে। তখন এই টাকায় শ্রীগুরুর জন্য একটী তাঁবু প্রস্তুত করান হইল।

দক্ষিণযাত্রা পর্ব্ব।

—(:*:)—

তৃতীয় পর্ব্বাধ্যায়।

বঘোর হাঙ্গামা বা যুদ্ধ। সম্রাট আরঙ্গজেবের মৃত্যু সংবাদ।

বাহাতুর সার সহিত মিলন।

তৎপর দিন সদলে গুরু লালিনগরে ও তাহার পরদিন মঘরন্দা পুরীতে আসিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। এই তুইটী স্থান বহুদূরে দূরে অব-স্থিত। সেজন্য অনুচর শিখগণ শ্রীগুরুকে অনুরোধ করিয়া জানায় যে, এরূপ দূর দূর স্থানে যাইয়া রাত্রি কাটাইলে. অনেকে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তদনুসারে গুরু তৎপরদিন কুলায়ৎনামক অদূরবর্ত্তী নগরে গিয়া বারদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এ প্রদেশের এই অঞ্চলটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া গুরুর বড় আনন্দ হইয়াছিল। এখনাকার কূপ-তড়াগাদি সুন্দর; মধ্যে মধ্যে পাহাড়ও আছে; বৃক্ষ লতাদি বেশ হরিদ্বর্ণ ও ফলভরা।

এতদিন কোন স্থানে গিয়া গুরুগোবিন্দ সিং আসিয়াছেন শুনিলে, লোকে প্রায় ভেটাদি লইয়া আসিয়া গুরুকে প্রণাম ও খাতির যত্ন করিতেছিল। এঅঞ্চলে শিখ সংখ্যা অল্প; সুতরাং অনেক স্থলে আর খাতির যত্ন হয় না। কোথাও কোথাও শিখদিগকে প্রায় লুণ্ঠন করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

পথিমধ্যে দক্ষিণ হইতে দয়াসিং আসিয়া মিলিত হইলেন। বহুদিনের পর দয়াসিং শ্রীগুরুকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিতে পাইলেন; তাঁহার

নয়ন হইতে আনন্দবারি বিগলিত হইতে লাগিল। গুরু দয়া সিংয়ের নিকট বাদশাহ সম্মিলনের সংবাদ শুনিতে লাগিলেন। সম্রাট যে সকল দ্রব্য দিয়াছিলেন, তাহা দয়াসিংয়ের সহিত বাহকের মস্তকে ছিল; এক্ষণে সে সকল শ্রীগুরুকে দেওয়া হইল। দয়াসিং বলিলেন,—সম্রাট যে গুর্জ্জ (মুদ্গর বিশেষ) দিয়াছেন—উহা ভ্রমক্রমে, দিল্লীতে গুর্জ্জাদারের নিকট রহিয়াগিয়াছে। শ্রীগুরু কপিরা নামক অস্ত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু বলিলেন, আরঙ্গজেব আর অধিক দিন বাঁচিবেক না।

তৎপরে সদলে গুরু বঘোর নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন কথিত আছে, এখানে ভীমকর্ত্তৃক কীচক বধ হইয়াছিল। এখানে পৌঁছিয়া স্থানীয় লোকের কোনরূপ সাহায্য না পাওয়ায় শিখেরা দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করে। তাহাতে গুরু প্রথমে স্থানীয় সুবার নিকট ধরম সিংকে পাঠাইয়া দিয়া মিষ্ট কথায় শান্তি স্থাপন করেন। কিন্তু এই শান্তির ভাব স্থায়ী হয় নাই।

যাহাহউক, এখানে জনৈক শিখের নিকট সংবাদ পাওয়া গেল যে, সম্রাট আরঙ্গজেব ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; এবং তাঁহার পুত্র তারা আজম সম্রাট হইবেন (খৃঃ অব্দঃ ১৭০৮)। এই সংবাদে গুরু গোবিন্দ বলিলেন,—এই নূতন সম্রাটও যে ভাল হইবেন, এরূপ আশা দেখিতেছি না। ঐতিহাসিকেরা তারা আজমের নাম আজিজ বলিয়াছেন।

পরে গুরু ভীমকর্ত্তৃক কীচকবধের স্থান দর্শন করিয়া আসিয়া শুনিলেন, তাঁহার উটদল চরিতে গিয়া জনৈক আঢ্য ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই উপলক্ষে উটপালকগণের সহিত বাগানের মালিগণের গালাগালি ও মারামারি হইয়াছে। ক্রমে এই কথা বঘোর নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে এবং নাগরিকেরা শিখ দেখিলেই মারিতে আরম্ভ করে। ক্রমে

নগরবাসীর সহিত শিখদিগের বঘোর নগরের বাহিরে ও বাজারে দুই দিন ধরিয়া রীতিমত যুদ্ধ হইতে থাকে। গুরু নগরের দ্বারে আসিয়া পরম সিংকে হুকুম দিলেন, নগরের রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে শিখ রাখিয়া শত্রু পক্ষকে আক্রমণ কর। এইরূপ করিতে করিতে যতন সিং নামক জনৈক শিখ আসিয়া সংবাদ দিল, পুঞ্জ সিং নামক জনৈক শিখ নিহত হইয়াছে। ইতিমধ্যে শিখেরা নগরের প্রান্তভাগের পাহাড় অধিকার করিতেছিল। তখন গুরু হুকুম দিলেন,—পাহাড়ের উপর হইতে নগরের উপর তোপ চালাও। দুইটা তোপ চালাইতে নগরের সুজনেরা যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য শ্বেত কাপড় উড়াইয়া ইঙ্গিত করিলেন। তাহাতে গোলা চালান বন্ধ হইল। কিন্তু বঘোর নগরের যে অংশকে গড় নগর বলে, সে অংশে তখনও যুদ্ধ বন্ধ হয় নাই। গুরু ও ধরম সিং সেই অংশে গিয়া দেখিলেন, স্থানীয় রাজা বঘোর রায় স্বয়ং সেই স্থানে যুদ্ধ করিতেছেন সুতরাং ধরম সিংও তীর চালাইলেন; সেই তীরে বঘোর রায়ের পার্শ্বস্থ অশ্বারোহী নিহত হইল। তাহাতে শত্রুপক্ষ নিরস্ত হইল; শিখেরাও সরিয়া পড়িল।

এইরূপে বঘোর যুদ্ধের অবসানে সদল গুরু সে স্থান ত্যাগ করিলেন। কিছু দূরে গিয়া গুরুর তাঁবু গাড়া হইল। গুরু বলিলেন,—দিল্লীর বাদসাহ ত শত্রু আছেনই,—আবার এই এক নূতন শত্রু হইল। এইরূপে কথা বার্ত্তায় বিশ্রাম হইতেছে, এমন সময় সম্রাট পুত্র (মুয়াজেম) বাহাদুর সার প্রেরিত লোক আসিল।

সম্রাট আরঙ্গজেবের পুত্র বাহাদুরসা বাল্ক বোখারায় ছিলেন। তিনি পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া দিল্লী যাইতে ছিলেন। পথি-মধ্যে শুনিলেন, পিতার মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি আত্মীয় বন্ধুগণকে বলেন,—এখন আমি বাহিরে থাকায় পিতার মৃত্যুতে যদি ভাই (তারা আজম বা আজিজ) দিল্লীর

সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকেন, ত কি করিব? তাহার হাতে এখন বাইশলক্ষ সেনা; আমার সঙ্গে যে মুষ্টিমেয় সেনা আছে, ইহা লইয়া তাহার সম্মুখীন কিরূপে হইব? এমন সময় কোন ত্যাগী মহাত্মার সহায়তা পাইলে সকল দিক রক্ষা হয়। বাহাদুর সার আত্মীয় বন্ধুর মধ্যে নন্দলাল নামক জনৈক অমাত্য বলিল,—শুনিতেছি, শিখ গুরুগোবিন্দ সিং এক্ষণে রাজপুতানায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন; তাঁহার সহায়তা পাইলে, প্রভুর কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে; তিনি ত্যাগী পুরুষ, প্রকৃত বীর এবং বাঙ্‌নিষ্ঠ। এইরূপ প্রশংসাবাদের সহিত গুরুগোবিন্দের কথা শুনিয়া বাহাদুরসা নন্দলালকে তাঁহার নিকট পাঠাইতে চাহিলেন। নন্দলাল বলিলেন,—গুরু যেরূপ লোক, তাহাতে তাঁহার কথা মানিয়া চলিলে অবশ্যই কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ইহার পর বাহাদুরসা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এবং হাকম্‌রায়কে সঙ্গে করিয়া নন্দলাল বঘোরের নিকটে গিয়া গুরুগোবিন্দ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন,—ভ্রাতার হস্ত হইতে বাহাদুর সাকে রক্ষা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে সাহায্য করিলে, তিনি পরম উপকৃত হইবেন।” শ্রীগুরু বলিলেন,—বাহাদুরসার প্রস্তাবে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। আমার যাহা আবশ্যক, তাহা পরে জানাইব; কিন্তু উহাঁর পিতা আরঙ্গজেব যেরূপ মিথ্যাবাদী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পুত্র বাহাদুর সা যে সেরূপ হইবেন না, এ কথা কে বলিতে পারে? যাহাহউক, এ বিষয়ে বাহাদুর সাকে একখানি পত্র লিখিতে বলিবে, তিনি এক্ষণে যেরূপ ভাব দেখাইতেছেন, পরে এইভাব বজায় রাখিবেন এই কথামাত্র লিখিয়া দিবেন। তাহা হইলে আমি উহাঁর বৈরনির্য্যাতন করিব। তবে তাঁহাকে এজন্য যুদ্ধ করিতে হইবে। যাহাহউক, আমি সাহায্য করিয়া তাঁহার

ভাইকে মারিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইব ; পরে অন্যায় করিলে, এবং এখনকার ভাব তখন না থাকিলে, উঁহাকেও নিশ্চয় মরিতে হইবে জানিবে।”

নন্দলাল পুনরায় বলিলেন,—বাহাদুর সা বলিয়াছেন, যে, তাঁহার সঙ্গে সৈন্য প্রায় নাই বলিলেও চলে। তাহাতে গুরু বলিলেন,—সেজন্য কোন চিন্তা নাই। “শ্রদ্ধা ধরো ভ্রম কো ত্যাগো”। গুরু ধরম সিংকে বলিলেন,—তুমি পাঁচজন শিখ এবং বাহাদুর সার লোক সঙ্গে করিয়া অগ্রসর হও। আমি প্রস্তুত আছি জানিবে, স্মরণ মাত্রে উপস্থিত হইব।

দক্ষিণযাত্রা পর্ব্ব

—:•:—

চতুর্থ পর্ব্বাধ্যায়

বাহাদুর সার সহিত তদীয় ভ্রাতা আজমের যুদ্ধ।

শ্রীগুরুর দিল্লী প্রবেশ।

তখন, গুরুর উপদেশ মত বাহাদুর সা সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাহাদুর সার ভ্রাতা তারা-আজমও এসকল সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে গুরুগোবিন্দও দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। উভয় ভ্রাতার সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইবা মাত্র যুদ্ধ বাধিল। বাহাদুর সা ধরম সিংকে সঙ্গে করিয়া হস্তীর উপর বসিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দেখিলেন ভ্রাতার অগণ্য সৈন্য। তখন শ্রীগুরুর বাক্যে নির্ভর ভিন্ন আর কিছুই নাই; অগত্যা তাহার 'গুরু ধ্যান' 'গুরুজ্ঞান' ভাব হইয়া দাঁড়াইল। প্রথম দিনের যুদ্ধে কিছুই স্থির হইল না। সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলেন,—যুদ্ধও বন্ধ হইল। বাহাদুর সার মনে হইল, বোধ হয় শ্রীগুরু কি চাহেন, তাহা স্থির না হওয়ায় তাঁহার (গু[illegible]নে সন্দেহ জন্মিয়াছে; এজন্য তিনি উপযুক্ত শক্তি দিতেছেন না। তখন নন্দলালকে গুরুর নিকট পাঠাইয়া জানাইলেন, পিতার দোষে আমায় দোষী মনে করিবেন না। উপযুক্ত সাহায্য দান করুন, কি [illegible]কাশ করিয়া বলুন, যাহা চাহিবেন তাহা না দিই তখন আমায় বিপদে [illegible]বেন। বাহাদুর সা কাতরভাবে এইরূপ জানাইলে, গুরু বলিলেন, [illegible]তিনি আমার প্রতি যেরূপ দ্বৈধভাব পোষণ করিতে-

ছেন, সেরূপ না করেন ; উঁহার মাতুলকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিন। বাহাদুর সার মনে যে সন্দেহ হইয়াছিল, গুরু তাহা জানিতে পারিয়াছেন বুঝিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং গুরু যেরূপ লিখন চাহিয়াছিলেন, সেরূপ লিখন সহিত হাকম রায়কে গুরুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, তারা আজম তাঁহার সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন,—শত্রুপক্ষের এই জনকয়েক সৈন্যকে এখনও মারিয়া জয়লাভ করিতে পার নাই কেন? উহাদের এক এক জনের প্রতি তোমরা যে দশ দশজন পড়িতে পার! ও পক্ষে শিখ গুরুগোবিন্দ সিং আসিয়াছেন মনে করিয়া তোরাও মুগ্ধ হইয়াছিস্ না কি?" এদিকে শত্রুপক্ষের অসংখ্য সৈন্য দর্শনে বাহাদুর সা ব্যাকুল হইয়া ভাবিতেছেন, এখন গুরু সহায় ভিন্ন উপায় নাই ; পিতার দোষে আমি দোষী, সে জন্য গুরু বুঝি দয়া করিলেন না। ধরমসিং বাহাদুর সার পার্শ্বেই এক হস্তীতে রহিয়াছেন। বাহাদুরসা ধরমসিংকে বলিলেন,—"তুমিও আমার হইয়া গুরুকে ডাক। গুরু স্বয়ং আসিয়া রক্ষা করুন।" এমন সময় তারা আজমের সৈন্য দল সজোরে আসিয়া বাহাদুর সার সৈন্যের উপর পড়িল। তখন "গেল গেল" শব্দে বাহাদুর সা কাতর হইয়া উঠিলেন। ইহার পরই সকলের বোধ হইল যে, অদূরে সশস্ত্র গুরুগোবিন্দ সিং অশ্বপৃষ্ঠে আসতেছেন এবং তাঁহার সঙ্গে কত কত সুরবীর সহিদ * আসিতেছেন। তখন বাহাদুর সার প্রাণ কিরূপ হইল, তাহা বর্ণন করা যায় না। ধরম সিং বলিলেন, ঐ দেখুন গুরু আসিয়াছেন। বাহাদুর সা বলিলেন,—আর ভয় নাই। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই শুনা গেল, তারা আজম তীরের আঘাতে

* যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী হাজার সৈন্য নিহত করিতে পারেন, শিখেরা তাঁহাদিগকে সহিদ বলেন।

হস্তী হইতে পড়িয়া গিয়াছেন। সেই সময় আরও চৌদ্দজন হস্ত্যারোহী যোদ্ধার পতন হইল।

তখন যুদ্ধ বন্ধ হইল। অপরাপর রাজগণ, যাহারা তারা আজমকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল, তাহারা বাহাদুর সার নিকট নিজ নিজ দূত পাঠাইয়া তারা আজমের পতন বার্ত্তা জানাইল। বাহাদুর সা ধরম-সিংয়ের সহিত সত্বর তারা আজমের নিকট গিয়া তাহার কপাল হইতে দুইটা তীর উঠাইলেন। তখন, "এ তীর কাহার" বলিয়া তর্ক উঠিলে, পুরস্কারের লোভে অনেকেই "আমার তীর" বলিয়া দাবী করিল। যে দাবী করিল, তাহার তূণস্থ তীরের সহিত মিলাইলে কাহারও সহিত মিলিল না। বাহাদুর সা ভ্রাতার জন্য তখন দুঃখ প্রকাশ করিলেন—ভাই বীরধর্ম্মে কার্য্য করিয়াছে, তথাপি ভ্রাতৃশোক হৃদয়ে আসিয়াছিল।

তৎপরে, দিন দুই পরে, বাহাদুর সা পূর্ব্বোক্ত পাঁচ জন শিখকে এক একটী শিরোপা (পাগড়ী) দিয়া সংবর্দ্ধনা করিলেন এবং ধরমসিংকে বলিলেন,—আমি সৈন্যগণের ব্যবস্থা করিবার জন্য আগ্রা যাইতেছি; তুমি গুরুকে সঙ্গে করিয়া আমার ভবনে আইস। ইহার পর বাহাদুর সা আগ্রায় গেলেন এবং ধরম সিং শ্রীগুরুর নিকট গমন করিলেন।

ধরম সিং গুরুর নিকট উপস্থিত হইলে, গুরু যুদ্ধের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ধরমসিং বলিলেন,—শ্রীগুরুত সকলই জ্ঞাত আছেন, তবে আমার মুখে শুনিবার ইচ্ছা, তাই জিজ্ঞাসা করিলেন। এইকথা বলিয়া বাহাদুর সার ব্যাকুলতা প্রভৃতি সমস্ত বর্ণন করিলেন।

এই যুদ্ধ কোন্ স্থানে হইয়াছিল, 'সূর্য্য প্রকাশে' তাহার কোন উল্লেখ নাই। অন্যান্য ইতিহাসবেত্তারা বলেন,—ইহা আগ্রার নিকট হইয়াছিল। তবে 'সূর্য্যপ্রকাশে' বর্ণনার ভাবে বোধ হয়, ইহা দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে হইয়াছিল। এস্থলে 'সূর্য্যপ্রকাশের' আরও দুই একটী

ত্রুটির কথা বলিতে হইল। সম্রাট আরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুয়াজেম (বা সাআলম) যে বাহাদুর সা নাম গ্রহণ করিয়া সম্রাট হইয়া ছিলেন এবং তারা আজমের অপর নাম আজিজ (বা আজিম) ছিল, একথা, 'সূর্য্যপ্রকাশে' পাওয়া গেল না। শিখদিগের পুস্তকে অনেক স্থলে আরঙ্গজেবকে নারঙ্গা বলিয়াছে ; নামের একটু প্রভেদ ধর্ত্তব্য নয়।

এক্ষণে বাহাদুরসার প্রস্তাব অনুসারে শ্রীগুরু সদলে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিখগণ পরস্পর বলাবলি করিলেন যে, এই যুদ্ধে যে সকল মুসলমান নিহত হইল, তাহাদের অনেকের আত্মীয়বর্গ দিল্লীতে আছে ; সুতরাং সেই শত্রুপূর্ণ স্থানে গুরুকে সাবধানে লইয়া যাইতে হইবে। এইরূপ পরামর্শ অনুসারে শ্রীগুরুকে যমুনায় নৌকায় করিয়া দিল্লী সহরে প্রবেশ করান হইল এবং শিখেরা নৌকা হইতে তাঁহাকে দুরবীন দ্বারা দিল্লী সহর দেখাইলেন। শ্রীগুরুর নৌকা তীরে লাগিলে, গুরু সদলে মতিবাগে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিখদিগের এই ভীরুভাব দেখিয়া শ্রীগুরু বলিলেন,—"ভাল ! শিখ দিল্লীতে থাকিবে না—ইহারা গুরুকে ভাল করিয়া দিল্লী সহর দেখাইতে পারিল না।"

দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া শিখ-পরিবেষ্টিত গুরুগোবিন্দ প্রথমেই প্রস্তাব করিলেন,—যেখানে গুরু তেগবাহাদুরের সংকার হইয়াছিল, সেই শিসগঞ্জে সত্বরে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এখন আর সম্রাট আরঙ্গজেব নাই, এখন গুরুদ্বারা উপকৃত বাহাদুরসা সম্রাট হইয়াছেন ; সুতরাং এখন সচ্ছন্দে এ কার্য্য সমাধা হইতে পারিবে।

তৎপরে কথা হইল,—গুরু সত্বরেই দক্ষিণে যাইবেন এবং গুরুপত্নী দ্বয়কে দিল্লীতেই রাখা হইবে। এই কথা শুনিয়া মাতা সুন্দরীজী রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন ; গুরু যে সন্তান দিয়াছিলেন, তাহা হরণ করিয়া লইয়াছেন—চারিটীর একটীও নাই ; এক্ষণে অনেক কষ্টের

পর স্বামিদর্শন করিয়া যে জীবনধারণ করিব, তাহাতেও বঞ্চিত করিতে চাহিতেছেন; তবে পুনরায় পুত্রদান দিয়া যথা ইচ্ছা গমন করুন। ইহাতে গুরু সুন্দরীজীকে নানা উপদেশে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন,—"মূর্ত্তি কিছুই থাকিবে না, নশ্বরজগতে কিছুই থাকে না; একমাত্র ধর্ম্মই সঙ্গের সাথী জানিবে; তোমার পুত্র ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছে, তাহার জন্য শোক করিতে নাই; গত ষোল বৎসরে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, তাহাত স্বচক্ষে দেখিলে; কত যুগযুগ তপস্যা করিয়া জীব যে পদ পায় না, তোমার পুত্র সম্মুখ-সমরে পড়িয়া, সেই পরম গতিলাভ করিয়াছে, সে জন্য আর দুঃখিত হইও না; তুমি এখানে আমার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তপস্যা কর, পরে আমার লোক প্রাপ্ত হইবে; তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী—সামান্যা স্ত্রীলোকের ন্যায় বৃথা শোক করিও না—উহা তোমাতে ভাল দেখায় না; এখন শিখের কল্যাণ চাহ; চারিটী গিয়াছে, এখনও কত রহিয়াছে; তুমি শিখদিগের কল্যাণ কার্য্যে নিযুক্ত থাক; তুমি এখানে থাকিলে সব বজায় থাকিবে।" গুরু সুন্দরীজীকে এইরূপ নানা কথায় উপদেশ দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। মাতার চক্ষে কেবল বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কয়দিন এইভাবে গেলে একদিন গুরু শিখগণের সঙ্গে বেড়াইতেছেন, এমন সময় একটী অনাথ—পিতামাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত—শিশু গুরুর সম্মুখে আনীত হইলে, গুরু তাহার পালনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তৎপরে একদিন ঐ শিশুকে মাতা সুন্দরীজীর সমক্ষে আনয়ন করা হইল। মাতা উহাকে দেখিয়া গুরুকে বলিলেন,—ছেলেটী বেশ, ঠিক যেন আমার অজিতের মত; ইহাকে আমায় দাও। গুরু বলিলেন,—ইহাকে লইও না, আর মায়ার ফাঁস গলায় পরিও না; পরে এটীও তোমার দুঃখের কারণ হইবে। তুমি প্রত্যহ "গুরুগ্রন্থ" শুন; "ওয়া গুরু" মন্ত্র জপ কর; তাহা হইলে হৃদয়ে

শান্তি পাইবে। মাতা সুন্দরীজী মন্ত্রাদি জপ করিবেন, পূজাপাঠ করিবেন স্বীকার করিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রীগুরুকে অনুরোধ করিয়া ঐ অনাথ শিশুটীকেও লইলেন। এমন সময় সম্রাট বাহাদুরসার লোক আসিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া গুরু অন্তঃপুর হইতে বাহিরে গেলেন।

দক্ষিণযাত্রা পর্ব্ব।

—:•:—

পঞ্চম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর দিল্লী হইতে আগ্রা যাত্রা।

সম্রাটের লোক যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া জানাইল,—সম্রাট গুরুর সহিত সাক্ষাৎ চাহিতেছেন। গুরু বলিলেন, সত্বরে দক্ষিণ যাত্রা স্থির হইয়া গিয়াছে; সম্রাটকে অগ্রসর হইতে বল, আমি সত্বরে পশ্চাতে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইব। এই কথা বলিয়া গুরু সম্রাটের লোককে বিদায় দিলেন।

তৎপরে মাতা সাহেবদেয়ী শ্রীগুরুর সঙ্গে দক্ষিণ যাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীগুরু বলিলেন,—তুমি সুন্দরীর সহিত এখানেই থাক। উভয়ে একত্র থাকিলে, উভয়েরই কষ্টের লাঘব হইবে। কিন্তু মাতা সাহেবদেয়ী বলিলেন,—আমি শিখমাতা; গুরু যেখানে যাইবেন, সেখানে নূতন খালসা প্রস্তুত হইবে; নবপ্রসূত শিশুকে যেরূপ মায়ের পালন আবশ্যক, নূতন খালসার প্রতি আমার তেমনই কর্ত্তব্য। এই কথা শুনিয়া মাতা সাহেবদেয়ীর দক্ষিণ যাত্রায় গুরু সম্মত হইলেন।

ইতিমধ্যে গুরু তেগবাহাদুরের সৎকার স্থলে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইল। মাতা সুন্দরীজী মন্দিরের কর্ত্রীরূপে অনাথ শিশুটীকে লইয়া দিল্লীতে রহিলেন এবং খালসামাতা সাহেবদেয়ী স্বামিসঙ্গে দক্ষিণ চলিলেন।

গুরু সহচরগণের সহিত দিল্লী হইতে দক্ষিণ যাত্রা করিয়া প্রথমদিন মথুরা পৌছিতে পাঁচ ক্রোশ থাকিতে আড্ডা গাড়াইলেন এবং পরদিন

প্রাতঃকালে মথুরায় পৌঁছিয়া কৃষ্ণলীলা স্থল দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে কংসালয়, কংসকারাগার, বিশ্রামঘাট প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে গুরু অবশেষে বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। তথায় গিয়া নন্দালয় তৃণাবর্ত্তবধের স্থান, গোচারণের স্থান, গিরিগোবর্দ্ধন প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইলেন। "সূর্য্য-প্রকাশ" গ্রন্থকার ভাই সন্তোষ সিং বলিয়াছেন :—

কৃষ্ণরূপ ধর খেলে কানেরে।
গুরুরূপ ধরে সে ফেরে হেরে ॥

অর্থাৎ কানাই কৃষ্ণরূপ ধরিয়া খেলা করিয়াছিলেন, এক্ষণে গুরুরূপ ধরিয়া উহা দেখিয়া বেড়াইতেছেন।

মথুরা বৃন্দাবনে বানরের দৌরাত্ম্য চিরদিনই আছে; শিখদিগের পাগড়ী ধরিয়া বানরেরা টানাটানি করে; শ্রীগুরুর হুকুমে কেহ বানরের উপর অত্যাচার করিতে পায় নাই। গুরু বানরদিগকে মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য দিয়া শিখদিগের পাগড়ী উদ্ধার করিয়াছিলেন।

তৎপরে গুরু আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল চাহিলে শিখেরা এক ব্রাহ্মণ বিধবার নিকট হইতে জল আনিয়া দিল এবং সকলেই একবাক্যে এই ব্রাহ্মণ বিধবার পবিত্রতা প্রকাশ করিল; কিন্তু গুরু যখন শুনিলেন, গৃহস্থের বাড়ীতে শিশু সন্তান নাই, তখন সেই জল অপবিত্র বলিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং শিখদিগকে বলিয়াছিলেন, যে বাড়ীতে শিশু নাই, সে বাড়ী পবিত্র নয়; কারণ দেবতারা শিশুর সহিত বাস করেন। যে গৃহস্থলোক একাকী বাস করে, সে যতই পবিত্র থাকুক না কেন, তাহার গৃহ পবিত্র নহে। এই রূপে গুরু সন্ন্যাসী ভক্ত অপেক্ষা গৃহস্থ ভক্তের অধিক প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক গুরু সহচরগণের সহিত আগ্রা পৌঁছিতে চারিক্রোশ

থাকিতে এক আম্রবাগানে আড্ডা গাড়িয়াছিলেন এবং গুরুর তথায় পৌঁছান সংবাদ আগ্রায় প্রেরিত হইয়াছিল।

শ্রীগুরু আগ্রার নিকটে আসিয়াছেন শুনিয়া সম্রাট আকবরের স্বসম্পর্কীয় আগ্রানিবাসী খাঁনখানা অগ্রসর হইয়া শ্রীগুরুকে নিজ-ভবনে আনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। শ্রীগুরু তদনুসারে সহচর (মুসলমান) খাঁনখানার ভবনে গমন করিলেন। খাঁনখানা শ্রীগুরুকে বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে আদর যত্ন করিলেন। খাঁনখানার দেহে একটা বেদনা ছিল; উহা শ্রীগুরুর শুভাগমনে আরোগ্য হইয়া-ছিল; ইহাতে খাঁনখানার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়।

এদিকে শ্রীগুরুর আগ্রায় শুভাগমন হইয়াছে শুনিয়া, সম্রাট বাহাদুরসা নিজ অমাত্য ওমরাওকে শ্রীগুরুর নিকট পাঠাইয়া আহ্বান করিলেন। তদনুসারে শ্রীগুরু সাহেবসিং ও আর পাঁচ জন শিখকে সঙ্গে করিয়া সম্রাট দর্শনে গমন করিলেন। সম্রাট বাহাদুরসা শ্রীগুরুর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে আনিবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন; শ্রীগুরু সাহেব-সিংকে সঙ্গে করিয়া বাদশাহের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় আরও কয়েকটী বিশেষ অমাত্য রহিয়াছেন। সম্রাট নিজ আসন হইতে উঠিয়া গুরুকে প্রণাম করিলেন এবং চন্দনকাষ্ঠের আসনে বসিতে দিলেন। প্রথমেই বাদশাহ যুদ্ধের কথা উত্থাপন করিয়া কাহার তীরে তারা আজম নিহত হইয়াছেন সেই কথা পাড়িলেন। বাদশাহ ভ্রাতার হননকারী সেই তীর রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং শ্রীগুরুর তীরের সহিত মিলাইবার জন্য তাঁহার একটী তীর চাহিয়া লইলে উভয় তীরের মিল হইল।

শ্রীপ্রভু কহে পুরী অব্ বাঁচে।
গুরু ঘরসো সাওৎ রহো আছে॥

অর্থাৎ শ্রীপ্রভু (শ্রীগুরু) কহিলেন,—পুরী এখন বাঁচিল, অতঃপর

গুরু ঘরের (শিখ-সমাজের) প্রতি (বাদসাহের) বিশেষ অনুগ্রহ থাকে ইহাই প্রার্থনা করেন। গুরুগোবিন্দ সম্রাটের নিকট কেবল শিখ-সমাজের কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন ; নিজের জন্য তাঁহার কোন প্রার্থনা—হইতেই পারে না। শিখ-সমাজের কল্যাণেই গুরুগোবিন্দের কল্যাণ—ইহাই প্রকৃত স্বজাতি প্রেম।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, "এখন সুখে রাজ্য কর, তোমার সম কেহ হইবে না",—শ্রীগুরু এই শুভ আশীর্ব্বাদ করিয়া গাত্রোত্থান করিবেন, এমন সময় সম্রাট গুরুগোবিন্দের ললাটে রাজচিহ্ন দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। গুরুগোবিন্দের জন্য সম্রাট "কলিঙ্গী" (উষ্ণীষ) প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন ; তাহা (উষ্ণীষ) গুরুগোবিন্দের মস্তকে পরাইয়া দিলেন এবং বহুমূল্যের ভেট গুরুকে অর্পণ করিলেন। তৎপরে সম্রাট বাহাদুরসার মস্তকে শ্রীগুরু শিরোপা (পাগড়ী) দিয়াছিলেন। এইরূপে পরস্পরে বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল।

অতঃপর দক্ষিণযাত্রার দিন নির্ণয়-করণ বিষয়ে কথা হয়। এক্ষণে বর্ষা আসিয়া পড়িল ; শ্রীগুরু আগ্রায় থাকিয়া চাতুর্ম্মাস্য সমাপন করেন সম্রাট এই ইচ্ছা জানাইলেন এবং গুরু তাহাতে সম্মত হইলেন। তৎপরে সম্রাট পল্টন দেখিতে গেলেন ও শ্রীগুরু সাহেবসিংকে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তবে আগ্রায় অবস্থানকালে মধ্যে মধ্যে বাদশাহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

গুরুগোবিন্দ এক্ষণে নিজের আড্ডায় নিয়মিত সভা করিতে লাগিলেন—শিখ-সমাগম হইতে লাগিল। একদিন এক সুনিয়ার (স্বর্ণকার) আসিয়াছিল। শ্রীগুরুর সহিত কথায় সে শান্তি পায়। অপর একদিন নওনিধি নামে জনৈক ক্ষত্রিয় গুরু দর্শনে আসিয়া শ্রীগুরুকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শিখদিগের কেশধারণের উদ্দেশ্য

কি—ইহা ত অন্য কোন সম্প্রদায়ে দেখিতে পাওয়া যায় না।” শ্রীগুরু পৌরাণিকভাবে কেশচ্ছেদন বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানের দুইটী নূতন কথা বলিলেন :—

(১) মুসলমানের কথা।—ভগবান্ যখন কেশ দিয়াছেন, তখন প্রথমে উহা রক্ষা করা হইত। পরে ইব্রাহিম নামে এক বাদশাহ হয়েন। তিনি কোন রমণীতে আসক্ত হয়েন। সেই রমণী বলে, যদি তুমি তোমার বিবাহিতা পত্নীকে তালাক [বিবাহ-ভঙ্গ] দাও তাহা হইলে তোমায় নিকা [পৈশাচিক বিবাহ] করিতে পারি। রমণী আরও বলে,—কিন্তু তাহার পর যদি তুমি কোন রমণীর নিকট যাও, তবে তোমার যে যে অঙ্গ তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবে তাহা কাটিয়া দিব। কামবশ হইয়া ইব্রাহিম বাদসাহ তাহাতেই সম্মত হইলেন। কিছুদিন পরে তাহার পূর্ব্ববিবাহিতা পত্নী একদিন বেশভূষা করিয়া এরূপভাবে রহিলেন যে, বাদশাহ ইব্রাহিম ভুলক্রমে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে বাদশাহ তাঁহার নিকাকৃত পত্নীর নিকট ধরা পড়িলেন। তখন পূর্ব্ব সর্ত্ত অনুসারে ইব্রাহিম বাদশাহের প্রায় সর্ব্বাঙ্গ কাটার হুকুম হইল; কিন্তু তাহাতে বাদ-শাহের প্রাণের কোন ক্ষতি না হয়, এদিকে লক্ষ্য রাখিয়া হুকুম দেওয়া হইল। তাহাতেই সুন্নতের সৃষ্টি হইল এবং সর্ব্বাঙ্গের কেশচ্ছেদন ব্যবস্থা হইল। তখন বাদশাহ নিজের গৌরব রক্ষার্থে হুকুম দিলেন, রাজ্য মধ্যে সকল পুরুষকেই সুন্নৎ ও কেশ মুণ্ডন করিতে হইবে। তদবধি মুসলমানদিগের সুন্নৎ ও কেশচ্ছেদনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(২) হিন্দুর কথা।—ভগবান্ পরশুরাম যখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, তখন ক্ষত্রিয়-শিশু বা বালককে মারেন নাই। তাহাদের কেশচ্ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে পুনরায় ক্ষত্রিয় বল সংস্থাপিত হইলে, তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগেরও কেশ মুণ্ডনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা শ্লোক রচনা করাইয়া শাস্ত্র মধ্যে বসাইয়া দিয়াছিলেন অর্থাৎ কেশচ্ছেদনের পক্ষে যে সকল শ্লোক আছে, সে গুলি প্রক্ষিপ্ত বুঝিতে হইবে।

এইরূপে শিখ-সমাগমে কখন সম্রাটদর্শনে, কখন আগ্রা অঞ্চলে বর্ষা-কালে প্রকৃতির শোভা দর্শনে শ্রীগুরুর আনন্দে দিন যাপন হইয়াছিল।

দক্ষিণযাত্রা পর্ব্ব।

—•—

ষষ্ঠ পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর আগ্রায় অবস্থান। প্রথম অংশ।

শ্রীগুরুর আগ্রায় অবস্থানের স্থান খাঁনখানার বাটীর নিকটেই ছিল। সুতরাং খাঁনখানা শ্রীগুরুর সাধুসঙ্গলাভে বিশেষ আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার মনে যে কোন চিন্তার উদয় হইত, তাহা শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করিয়া, বিশেষ তৃপ্তি পাইতে লাগিলেন। একদিন শ্রীগুরু বলিলেন,—খাঁনখানা এই মান্যপদ প্রথমে সম্রাট আকবরের মাতুল-পুত্রকে দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু দেখিতেছি, তোমাকে এই পদ দিয়া উপযুক্ত পাত্রেই মান্য ন্যস্ত হইয়াছে। এই রূপে শ্রীগুরুও অকপট মুসলমান শিষ্যকে যথেষ্ট আদর যত্ন করিতেন।

খাঁনখানা শ্রীগুরুর পশ্চাতে থাকায় শ্রীগুরুর সভায় অনেক মুসলমান আসিতে লাগিল। একদিন সভায় কাজীমোল্লা প্রভৃতি আগ্রার স্থানীয় পদস্থ সৈয়দ পাঠান মুসলমানগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কেহ শ্রীগুরুর প্রতি প্রেমবশত, কেহ বা বিদ্বেষবশত, কেহবা নিজ নিজ সঙ্গিগণের উপরোধে আসিয়াছিলেন। শ্রীগুরুর দৃষ্টি যেমন সকলের প্রতি রহিয়াছে, সকলের দৃষ্টিও তদ্রূপ শ্রীগুরুর প্রতি রহিয়াছে; কিন্তু গুরুদ্বেষিগণ যেন তাহাদের দৃষ্টি শ্রীগুরুর প্রতি রাখিতে পারিতেছে না—যেন গুরুর তেজে তাহাদের চক্ষু ঠিকরিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় সরহিন্দ নিবাসী জনৈক সৈয়দ শ্রীগুরুকে

কতকটা বিদ্রূপভাবে বলিল,—আপনার অনেক কেরামৎ (যাদুবিদ্যা) শুনা যায়, তাহার কিছু আমাদের দেখান। শ্রীগুরু সৈয়দের কাপট্য বুঝিয়া প্রথমে বলিলেন,—আমি "কেরামৎ" কি জানি, সকলই সম্রাট বাহাদুরসা জ্ঞাত আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। তিনি একক পাঁচ হাজার লোকের মোয়াড়া ধরিতে পারেন। তখন সৈয়দ বলিল,— সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিন—তিনি সম্রাট। আপনার নিজের "কেরামৎ" দেখান। তখন শ্রীগুরু পকেট হইতে একটী মোহর বাহির করিয়া বলিলেন,—এই আমার "কেরামৎ"। সৈয়দ বলিল,—ওত দৌলত—ধন। গুরু প্রথমে বলিলেন,—মনে করুন, ইহারই বলে, আমার যাহা কিছু শুনিয়াছেন, সকলই হইয়াছে। কথাগুলি এরূপভাবে হইতেছিল, যে সকলেরই মনোযোগ সেই দিকে। বহুজনপূর্ণ সভা যেন এক-বারে নিস্তব্ধ; কেবল শ্রীগুরু এবং ঐ সৈয়দের বাক্যে নিস্তব্ধতাভঙ্গ করিতেছে মাত্র। সৈয়দ বলিল,—দৌলতের বলে আপনি এত অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, একথা আমরা স্বীকার করিনা বা বিশ্বাস করিনা। তখন গুরু হঠাৎ শান্ শব্দে নিজতরবারী নিষ্কোষিত করিয়া দেখাইয়া বলিলেন,—"ইহাই আমার সর্ব্বস্ব—ইহাই আমার কেরামৎ।" তখন সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং দুষ্ট লোকের ভয় হইতে লাগিল। বিশেষ গুরু আরক্ত-লোচনে তরবারি ঘুরাইয়া বলিতে লাগিলেন,—ইহাতে এত কেরামৎ আছে যে, এখনই লোকের শির হইতে দেহ বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে। তখন সৈয়দ লজ্জিত ভাবে নীরব হইলেন। এইরূপে সে দিনের সভা শেষ হইল।

পাঠান (মুসলমান) দিগের অপ্রতিহত প্রভাব গুরুগোবিন্দ কর্ত্তৃক নিবারিত হইতেছিল বলিয়া, তাহারা তাঁহার উপর বিরক্ত ছিল। তাঁহার আশ্রায় কয়েকদিন অবস্থানে তাহাদের যেন মহাকষ্ট হইতে

লাগিল। সামান্য পাঠান হইতে কাজীমোল্লা পর্য্যন্ত যাহারা তাঁহার উপর বিরক্ত, তাহারা পরস্পর গুরুগোবিন্দের নানাপ্রকার বৃথা দৌরাত্ম্যের কথা উত্থাপন ও আলোচনা করিতে লাগিল। ক্রমে কয়েকজন মুসলমান প্রজার আবেদন উপলক্ষ করিয়া স্থানীয় কাজী শ্রীগুরুর প্রতি পরওয়ানাজারী করিল যে, "আপনি অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করুন; কারণ, স্থানীয় লোক আপনার দৌরাত্ম্যে বড় পীড়িত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে শ্রীগুরু কর্ত্তৃক দৌরাত্ম্যের নামগন্ধও ছিলনা। কিন্তু ঐরূপ কথা উদ্ভাবন করিয়া ক্রমে সম্রাটের মন বিগড়াইবার উদ্দেশ্যে এই পরওয়ানা লিখিত হয়। গুরু উহাদের মনোগতভাব বুঝিয়া পরওয়ানা খানি স্বহস্তে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তখন কাজী ক্রোধান্ধ হইয়া এ বিষয় সম্রাট বাহাদুরসাকে জানাইলেন। সম্রাট বলিলেন,—গুরুগোবিন্দ কাহারও বাধ্য নহেন জানিবে। উনি স্ব-ইচ্ছায় ন্যায় সঙ্গত লোকহিতকর কার্য্য করেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। সম্রাটের এই উক্তিতে সকলে নীরব হইল।

দক্ষিণযাত্রা পর্ব্ব।

সপ্তম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর আগ্রায় অবস্থান। দ্বিতীয় অংশ।

"সূর্য্যপ্রকাশ" বলেন,—এ সময় ছোট বড় প্রায় বাহান্নজন নিকটস্থ রাজা ক্রমে ক্রমে শ্রীগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীগুরু সকলেরই মঙ্গলপ্রার্থী। রাজাদিগের আর্থিক ও সামরিক অবস্থার সংবাদ লইতেন। রাজগণ যাহাতে লোকপ্রিয় এবং প্রজা-হিতৈষী হয়েন, সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন এবং হিন্দু রাজার রাজ্যমধ্যে যাহাতে গোহত্যা নিবারিত হয়, সে জন্য বিশেষ করিয়া বলিতেন।

এইরূপ একদিন রাজা জয়সিং ও রাজা অজিৎসিং গুরুদর্শনে আসিয়া ছিলেন। গুরু তাঁহাদের কুশল মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া গোহত্যা নিবারণের কথা বলিলেন এবং হিন্দুর কন্যা পাঠানকে (মুসলমানকে) দেওয়া না হয়, সে জন্য পরামর্শ দিলেন। তাঁহারা শ্রীগুরুর সাক্ষাতে গোহত্যা নিবারণ প্রতিজ্ঞা ও হিন্দুর কন্যা মুসলমানকে দেওয়া নিবারণ চেষ্টা করিবেন বলিয়া সপথ করিয়াছিলেন। এই দুইজন রাজপুত রাজা তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্যহইতে কষাইগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন এবং পাঠানকে (মুসলমানকে) কন্যাদান সম্বন্ধে শ্রীগুরুর সাক্ষাতে বিশেষ লজ্জা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ঐ বিষয় প্রায় নিবারণ করিয়াছিলেন। শ্রীগুরু ইঁহাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া রাজা জয়সিংকে 'সিপর' নামক খড়্গ ও রাজা অজিৎসিংকে ধনুর্ব্বাণ দিয়া উৎসাহিত ও সংবর্দ্ধনা

করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়ারের রাজাও শ্রীগুরুর নিকটে আসিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন।

গুরু যে বাগানটীতে বাস করিতেছিলেন, ইহার পার্শ্ববর্ত্তী আরও কয়েকটী বাগানের ভিতর দিয়া সম্রাটের প্রাসাদে পৌঁছান যায়।

একদিন শ্রীগুরু আপন কাননাবাসে সভা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় জোহার সিং সুনিয়ারের (স্বর্ণকারের) কন্যা শ্রীগুরুর জন্য কতকগুলি দ্রব্য লইয়া আসিয়া শ্রীগুরুকে ভেট দিয়া প্রণাম করিল। কন্যাটী বেশ সুন্দরী; তাহার উপর শ্রীগুরুর নিকটে আসিতেছে বলিয়া সে পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হইয়া কতকটা বেশভূষা করিয়া আসিয়াছিল। কন্যাটী শ্রীগুরুকে প্রণাম করিয়া শিখদিগের পার্শ্বে ধীরভাবে উপবেশন করিল। শ্রীগুরু তাহার পরিচয়াদি লইতেছেন, এমন সময় সম্রাট বাহাদুরসা ইতস্ততঃ উদ্যানে পাদচারণ করিতে করিতে শ্রীগুরুর সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের আগমনে সকলেই ব্যস্ত হইলেন! শ্রীগুরুর আজ্ঞায় সম্রাটের জন্য যথাসাধ্য আসন দেওয়া হইল। সম্রাটের নয়ন ঐ জোহার সিং সুনিয়ারের কন্যার প্রতি নিপতিত হইল। সম্রাট কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন। কিন্তু শ্রীগুরুর সাক্ষাতে সামলাইয়া লইয়া শ্রীগুরুকে যেমন নমস্কার করেন, সেইরূপ করিলেন। সম্রাটের চিত্ত যে চঞ্চল হইয়াছে, ইহা অপর কেহ লক্ষ্য করুক বা না করুক, শ্রীগুরুর সর্ব্বদর্শিনী দৃষ্টিকে উহা অতিক্রম করে নাই। সম্রাট দুই একটী কথার পর যেন মুসলমানধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্যই বলিলেন, "কলমা" পাঠের এতই ক্ষমতা যে, যদি কোন রমণী "কলমা" পাঠ করিয়া বাদসাহের নিকট গমন করে, তথাপি সে স্বর্গলাভ করে। সম্রাট কথাগুলি এরূপ স্বরে বলিলেন, যেন প্রায় সকলে এবং বিশেষ করিয়া ঐ রমণী শুনিতে পায়। শ্রীগুরু বলিলেন,—কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী; পাপের

ফল ভোগ করিতেই হইবে; "কলমা" পড়িলেও ধর্ম্মনাশরূপ পাপ হইতে অব্যাহতি হইবে না; এ বিষয়ে একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছি। অনন্তর গুরু একটী মুদ্রা বাহির করিয়া বলিলেন, দেখুন এই মুদ্রাটী বাদসাহের চিহ্নে চিহ্নিত; কিন্তু এটীতে দোষ আছে, ইহাকে লইয়া "কলমা" পড়িয়া ভাঙ্গাইতে দিতেছি। এই কথা বলিয়া তদ্রূপ করিয়া মুদ্রাটী কোসপ নামে জনৈক ব্যক্তির হাতে দিয়া বলিলেন, ইহা বাজার হইতে ভাঙ্গাইয়া আন—স্বয়ং বাদশাহ অপেক্ষা করিতেছেন, সত্বরে আসিবে। লোকটা টাকা ভাঙ্গাইতে চলিয়া গেলে, সম্রাট তখনও "কলমা" পাঠের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীগুরুও কর্ম্মমাহাত্ম্য বুঝাইতে ক্রটী করিলেন না। কিছু পরে কোসপ, সেই মুদ্রা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সকল দোকানদারই ইহা মেকী বা দোষযুক্ত বলিয়া ফেরত দিল, অধিকন্তু আমায় গালি দিল। তখন শ্রীগুরু বাদশাহকে বলিলেন, আপনারই মুদ্রা, আপনারই রাজ্যে "কলমা" পাঠেও চলিল না; তখন স্বর্গরাজ্যে নীচকর্ম্মা কিরূপে স্থান পাইবে? এইরূপে সম্রাটকে ধীরভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াও যখন সম্রাটের মনের চাঞ্চল্য নিবারিত হইল না, তখন গুরু পুনরায় বলিলেন,—"ভাল, সম্রাট বলুন দেখি, ঐ রমণীদর্শনে আপনার মনের চাঞ্চল্য হইয়াছে কি না এবং সেই জন্য আপনি একথা উত্থাপন করিয়াছেন কিনা?" শ্রীগুরুর এই সরল প্রশ্নে সম্রাট বিস্মিত হইয়া কাতরভাবে নিজ মনোভাব স্বীকার করিলেন। তখন শ্রীগুরু কহিলেন,—"আপনার অনুমতি হয় ত ঐ রমণীকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিই।" তখন রমণী কাতরস্বরে বলিল,—"ইহাতে আমার ধর্ম্ম রক্ষা কিরূপে হইবে?" গুরু বলিলেন,—সে ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া আমার কথামত কার্য্য কর। এবং সম্রাটকে বলিলেন, আপনি অগ্রসর হউন, এবং

আপনার একটা লোককে বলিয়া দিন, উহাকে কোথায় লইয়া যাইবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সম্রাট নিজ ঈপ্সিত কক্ষে গমন করিলেন। শ্রীগুরুও সম্রাটের লোকের সহিত ঐ রমণী ও একজন সশস্ত্র শিখকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সম্রাট নিজ কক্ষ হইতে ঐ তিন জনকে আসিতে দেখিয়া কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উহারা যতই ঐ কক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই বাদশাহের ভয় বৃদ্ধি হইতে থাকিল! তখন তিনি দূর হইতেই উহাদিগকে এই বলিয়া অগ্রসর হইতে নিবারণ করিতে লাগিলেন,—"তোমরা আসিও না," "তোমারা আর অগ্রসর হইও না", "তোমরা ফিরিয়া যাও" ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। তখন উহারা শ্রীগুরুর নিকট ফিরিয়া আসিয়া সম্রাটের অনুজ্ঞা জানাইলে সকলে "ধন্য গুরু" শব্দে সভাস্থল ও কাননভূমি মুখরিত করিয়া তুলিল।

দক্ষিণযাত্রা পর্ব্ব।

—:*:—

অষ্টম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর আগ্রায় অবস্থান। তৃতীয় অংশ।

এইরূপে দিন যাইতেছে, ক্রমে পুষ্কর তীর্থের বার্ষিক স্নানে যাইবার দিন আসিল। কত কত হিন্দু ও শিখ এই পুষ্কর তীর্থস্নানে গমন করিল। সেই সময় খাঁনখানা সম্রাট দর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট সম্রাট শুনিলেন, গুরুগোবিন্দ পুষ্করস্নানে যান নাই। এই কথা শুনিয়া সম্রাট গুরুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি ত হিন্দুর পীর, আপনি এমন দিনে পুষ্করস্নানে গমন করেন নাই কেন? তাহাতে শ্রীগুরু বলিলেন—

শুন সাহেব শ্রীমুখ ফরমায়ে।
হিন্দু তুর্ক চলতে জস ভয়ে॥
খায়ে খাওয়ায় হাস দোনোকের।
দেয় উপদেশ যথাহিতহের॥

অর্থাৎ সম্রাট বাহাদুরের কথা শুনিয়া শ্রীগুরু শ্রীমুখে বলিলেন,—হিন্দু মুসলমান উভয়ে খায় খাওয়ায় যে যেরূপ হয় চলে, কিন্তু উভয়ের যাহাতে হিত হয়, আমি তাহাই উপদেশ দিয়া থাকি।

তাহাতে বাহাদুরসা বলিলেন,—মুসলমানে এক ঈশ্বর মানে, হিন্দু "ইমান" বলে, আপনি কি বলেন? তাহাতে গুরু বলিলেন,—"জাত পাত

সব বিগড় গিয়া” অর্থাৎ জাতি ধর্ম্ম সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে; হিন্দু ও মুসলমানে কেবল বিবাদ করিতেছে; উহাদের বিবাদ মিটাইবার জন্য আমার ধর্ম্ম খালসাপন্থ মধ্যস্থ স্বরূপ জানিবেন। সম্রাট্ বাহাদুরসা গুরুর মতবাদ কতক বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সে দিনের মিলনে এই পর্য্যন্ত হইল। সম্রাট্ মধ্যে মধ্যে শ্রীগুরুর জন্য বেদানা, কিস্‌মিস্, পেস্তা প্রভৃতি ভেট দিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতেন।

একদিন সম্রাটের এক ওমরাও শ্রীগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন,—সেদিন সম্রাটের সাক্ষাতে আপনার যেরূপ ধর্ম্মমতবাদ শুনিলাম, তাহাতে বড়ই তুষ্ট হইয়াছি; আবার অস্ত্র বিদ্যায়ও আপনাকে বিলক্ষণ দক্ষ বলিয়া জানি। আনন্দপুর, চমকোর প্রভৃতির যুদ্ধে আপনার নিরতিশয় রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে; এক্ষণে আমার ইচ্ছা, আপনার তীর-বর্ষণ কিরূপ, তাহা স্বচক্ষে দেখি। গুরু তখন তীরপূর্ণ তূণ ও ধনুক লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কাহার উপর তীর নিক্ষেপ করিব, বল।” ওমরাও কিছু দূরে একটা বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন,—“ঐ গাছে তীর মারুন।” তদনুসারে গুরু তীর মারিলেন। ওমরাওয়ের বোধ হইল, গুরু একটিমাত্র তীর ছুড়িলেন; কিন্তু দেখেন, সেই বৃক্ষে পাঁচটি তীর লাগিয়াছে। ইহাতে ওমরাও বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন,—“ধনুর্বিদ্যা” “ধন্যশিক্ষা”।

ওমরাও শ্রীগুরুর শস্ত্রবিদ্যা দেখিয়া গিয়া একদিন সম্রাট্‌কে বলেন,—“আপনারা উভয়ে একদিন শিকারে গমন করুন।” সম্রাট্ ওমরাওয়ের কথায় শ্রীগুরুর সহিত শিকারে যাইবার ব্যবস্থা করেন। সেই শিকারে শ্রীগুরু অথবা সম্রাট্ বিশেষ কোন কৌশল দেখান নাই সে দিন শ্রীগুরুর বাজপক্ষীরও ব্যাঘ্রসদৃশ “চিত্রার” (কুকুরের) শিকার-নৈপুণ্য দেখা গিয়াছিল বিলন্দখাঁ নামক জনৈক মুসলমান একটা বাঘ শিকার

করায়, শ্রীগুরু তাহাকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। ইহাতে বাজিদার্খাঁ হিংসা প্রকাশ করে এবং বলে যে, ও বাঘটাকে সকলেই তাড়া করিয়াছিল এবং বিলন্দর্খাঁ যেখানে অবস্থিত ছিল, সেখানে থাকিলে যে কেহ উহাকে মারিতে পার; তবে রোসন সিং যে বাঘ মারিয়াছে, উহা প্রশংসার যোগ্য। রোসনসিংকে পুরস্কার দিতে গেলে, সে গুরুকে বলিয়াছিল,—"আমি অর্থ পুরস্কার চাহিনা; শ্রীগুরুর কৃপাপ্রার্থী; উহাতেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।"

এইরূপে আগ্রায় শ্রীগুরুর আনন্দে দিন যাপন হইতেছিল। এমন সময় তিনি একদা নন্দলালকে ডাকাইয়া বলেন,—"বাহাদুরসা নিষ্কণ্টক সিংহাসন পাইয়াছেন; এক্ষণে হাকমরায় ও বাদশাহের মাতুলকে ডাকাইয়া বাহাদুরসার লিখন অনুসারে আমার যে দুইটী প্রার্থনা আছে, তাহা জানাইয়া, পূর্ণ করাইয়া লইতে হইবে।" তদনুসারে নন্দলাল সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, হাকম্‌রায় ও সম্রাটের মাতুলে সাক্ষাতে পর দিন শ্রীগুরুর প্রার্থনা শুনিবার দিন ধার্য্য হইল। উহাদের সাক্ষাতে শ্রীগুরুকে ডাকান হইলে, শ্রীগুরু পূর্ব্বোক্ত লিখন অনুসারে দাবী জানাইয়া বলিলেন:—সরহিন্দ বস্তীর সুবা ও তাহার সহায়তাকারী ও উৎসাহদাতা যে যে আনন্দপুরে উৎপাত করিয়াছিল এবং শিশু গুরুকুমারদ্বয়কে অন্যায়পূর্ব্বক বিষম অবিচারে নিহত করিয়াছিল, তাহাদিগকে বাঁধিয়া আমার (শ্রীগুরুর) হস্তে অর্পণ করা হউক; তাহাদের প্রতি আমি যথেচ্ছ ব্যবহার করিব; ইহাই আমার প্রথম প্রার্থনা; এই প্রার্থনা পূর্ণ হইলে অপর প্রার্থনা জানাইব।"

শ্রীগুরুর প্রার্থনা শুনিয়া সম্রাট একবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন, এ বিষয়ে মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিব। এই পর্য্যন্ত কথার পর শ্রীগুরু চলিয়া গেলেন।

তৎপরে সম্রাট মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। বিচক্ষণ মন্ত্রিগণ বলিলেন,—"আপনি যে শ্রীগুরুর সাহায্যে সাম্রাজ্যের একাধিপত্য পাইয়াছেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু আপনি এখন নূতন বাদশাহ; এখন একজন সুবা ও তৎসাহায্যকারীদিগের প্রতি ওরূপ ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই অন্যান্য সুবাগণ মিলিত হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিবে।" অবশেষে, বহু আলোচনার পর, স্থির হইল যে, এ বিষয়ে শ্রীগুরুর নিকটে বিনয়পূর্ব্বক এক বৎসরের সময় লওয়া হউক।

বাহশাহ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শের পর, শ্রীগুরুকে ডাকাইয়া তাঁহার প্রার্থনা-পূরণ বিষয়ে বৎসরেককাল সময় চাহিলেন এবং মন্ত্রিগণ যেরূপ যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, বিনয়পূর্ব্বক সে সকলও শ্রীগুরুকে জানাইলেন। বাদশাহ এক্ষণে আপনার প্রতিজ্ঞাপূরণে ইতস্ততঃ করিতেছেন দে[illegible] শ্রীগুরু বলিলেন,—"আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমি যে লোকের পুত্র, তাহাতে তুমি পরে কথা রক্ষা করিবে না; প্রথম প্রার্থনারই যখন এই দশা তখন আর দ্বিতীয় প্রার্থনা জানাইয়া কি করিব! কিন্তু সম্রাট্ জানিবেন, যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ না হয়, তবে আমার তেজ দিয়া এমন এক শিখ প্রস্তুত করিব যে, সেই তেজা শিখ আমার শত্রুকে একবারে বিমর্দ্দিত করিবে; সরহিন্দবস্তী একবারে ছারখার করিবে।" এইরূপ বলিতে বলিতে শ্রীগুরু ক্রোধভরে সম্রাটের সভা হইতে উঠিয়া গেলেন।

কেহ কেহ বলেন,—গুরুগোবিন্দ সম্রাট বাহাদুরসার অধীনতায় এই সময় সামরিক বিভাগে "চাকরী" স্বীকার করিয়াছিলেন। "সূর্য্যপ্রকাশে" তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। শিখেরাও ইহা স্বীকার করেন না।

দক্ষিণযাত্রা পর্ব্ব

—:•:—

নবম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর আগ্রা পরিত্যাগ ও তাপ্‌তী নদীতীরে অবস্থিতি।

তৎপরে এক দিন বাদশাহ গুরুকে বলিলেন,—"অতঃপর আপনার চাতুর্ম্মাস্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল; এইবার রাজপুত রাজগণের উপর পরওয়ানাজারি করি; তাহারা আসিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া যাউক; তৎপরে দক্ষিণে যাত্রা করা যাইবে।" শ্রীগুরু বলিলেন,—"এক্ষণে ৺দেবী পক্ষ পড়িল; আমি ৺দেবীপূজা করিয়া দক্ষিণ যাত্রা করিব।"

৺দুর্গোৎসবের কয়দিন নিয়মিত ৺আয়ুধপূজা ৺চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি এবং আবালবৃদ্ধবনিতা ও ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে বহুজনকে পূরী পঞ্চামৃত প্রভৃতি খাওয়ান হইয়াছিল। তৎপরে পূজাদি সমাপনান্তে ত্রয়োদশীর দিনে শ্রীগুরু দক্ষিণযাত্রা করিলেন। সম্রাট তৎপূর্ব্বেই যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীগুরু প্রথম দিন আগ্রার দক্ষিণে এক দীর্ঘিকা-তীর পর্য্যন্ত গিয়া রাত্রি কাটাইলেন। পরে তথা হইতে তিন মাইল দূরে গিয়া সম্রাট আরঙ্গজেবের এক পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নাম "সূর্য্যপ্রকাশে" প্রকাশ পায় নাই। শ্রীগুরু যোধপুরে গেলে রাজা অজিত সিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

তথা হইতে সহচরগণসহ শ্রীগুরু চিতোর নগরে উপস্থিত হয়েন। এই স্থানে ঘোড়ার ঘাসকাটা উপলক্ষে এক দল পাঠানের সহিত

শিখদিগের একটা ছোট রকম যুদ্ধ হয়। ইহাতে শ্রীগুরু শিখদিগকে বলেন,—বিনা হুকুমে তোমরা যাহার তাহার সঙ্গে লড়াই করিও না; উহা ভাল কার্য্য নহে। শ্রীগুরু শুনিলেন,—যে রাস্তা দিয়া তিনি যাইতেছেন সে রাস্তায় অগ্রসর হইলে, পথ খারাপ পাইবেন; সকলে অপর রাস্তা দিয়া যাইতে পরামর্শ দিতে লাগিল। কিন্তু গুরু খারাপ রাস্তারই অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ নর্ম্মদাতীরে পৌছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—সম্রাট বাহাদুর সা পূর্ব্বেই তথায় পৌছিয়াছেন। এখানেও ঘোড়ার ঘাস উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে শিখ ও পাঠানে গণ্ডগোল হয়। শিখ পাঠানে গণ্ডগোল থামাইবার জন্য শ্রীগুরু প্রিয়শিষ্য মানসিংকে পাঠাইয়া দিলেন। তখন উভয় দলে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং দেখা গেল যে, পাঠান দলটী অপর কেহ নয়, উহা বাদশাহের সৈন্য! তখন অনেকে বলিতে লাগিল যে, যখন শ্রীগুরুর সহিত বাদশাহের সখ্য হইয়াছে, তখন শিখ ও পাঠানে এ যুদ্ধ অকারণ; কিন্তু উভয় দলে এরূপ সকল লোক রহিয়াছে, যাহারা আনন্দপুরে যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিল এবং সেই শত্রুতা উপলক্ষ করিয়া বিবাদ করিতেছে। যাহা হউক, মানসিং মধ্যস্থতা করিতে গিয়া নিহত হইলেন; প্রথমে একটা গুলি আসিয়া তাঁহার উষ্ণীষ ফেলিয়া দিল; পরে অপর দুই গুলি তাঁহার বক্ষঃস্থলে লাগায় তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীগুরু মানসিংহের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মানসিং একজন প্রকৃত বীর এবং চমকোর যুদ্ধ হইতে তিনি ছায়ার ন্যায় শ্রীগুরুর সঙ্গে ছিলেন। সম্রাট বাহাদুর সা এই সংবাদ পাইয়া হুকুম দিলেন যে, যাহারা শিখদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছে, তাহাদের সকলকে বাঁধিয়া শ্রীগুরুর হস্তে অর্পণ করা হউক এবং শ্রীগুরু তাহাদের যেরূপ বিচার করেন, তাহারা সেই দশাই প্রাপ্ত হউক।

শ্রীগুরু বাদশাহের এই হুকুমে বলিলেন,—"যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে; উহাদের মারিয়া আমি আমার মানসিংকে আর ফিরিয়া পাইব না। বিশেষ আর একজন বাঁধিয়া দিবে, আর আমি মারিব, এরূপ প্রবৃত্তি আমার কখনই নাই। বাদশাহের হুকুমে উহারা সাবধান হইয়া চলুক।"

এদিকে অতঃপর গুরুগোবিন্দ যেখানে যাইতেছেন, সেইখানে শিখেরা নানা দ্রব্যের ভেট লইয়া শ্রীগুরুকে অর্পণ করিতেছে; নূতন খালসা বিস্তর হইতেছে; ভেট দ্রব্যের সঙ্গে মুদ্রাও বহুপরিমাণে আসিতেছে।

সম্রাট বাহাদুর সা অধিকদিন নর্ম্মদাতীরে থাকিলেন না। আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শ্রীগুরুও সহচরগণসহ তৎপশ্চাৎ চলিলেন এবং ক্রমে তাপ্তী নদীতীরে বুরহানপুর-নামক স্থানে আসিয়া শ্রীগুরু আড্ডা গাড়িলেন।

নাদের পর্ব্ব।

প্রথম পর্ব্বাধ্যায়।

সাধু-সম্মিলন। শ্রীগুরুর নাদের সহরে প্রবেশ ও তথায় অবস্থিতির ব্যবস্থা।

তাপ্‌তী নদীতটে বুরহানপুরের ছাউনির স্থান গুরুগোবিন্দের কতকটা প্রীতিপ্রদ বোধ হইলে, তিনি কয়েক দিন তথায় থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, সম্রাট বাহাদুর সা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইলেন। বুরহানপুরে এক সাধু বাস করিতেন; তিনি গুরুগোবিন্দের শুভাগমনবার্ত্তা শুনিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নদীতীরে শিখ-বেষ্টিত সভায় শ্রীগুরুকে দূর হইতে দেখিয়াই সাধু বড়ই আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। গুরুগোবিন্দও সাধুর অপূর্ব্বমূর্ত্তি দর্শনে সভা হইতে উঠিয়া সাধুর সহিত মিলিতে অগ্রসর হইলেন। উপস্থিত শিখগণ এই মিলন দর্শন করিয়া বড় প্রীতি পাইলেন। উভয়ের উভয়কে নমস্কার ও বক্ষে বক্ষ দিয়া আলিঙ্গন করিলেন। উভয়েরই নয়নে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে সামলাইয়া উপবেশন করিলেন। পরস্পর যেরূপ কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন, তাঁহাদের বহুকালের পরিচয় ছিল। সাধু বৃদ্ধ হইয়াছেন; তিনি তপঃসিদ্ধ; এজন্য বয়স অপরে অনুমান করিতে পারে না। সাধু বলিলেন,—তুমি জন্মিয়াছ এই সংবাদ ব্রহ্মার পুত্র নন্দের নিকটে পাইয়া পাটনা সহরে

তোমাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন তোমার পিতা তেগবাহাদুরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমার বয়স এখন প্রায় চারিশত বৎসর হইয়াছে। আমার যখন অল্প বয়স, তখন গুরু অঙ্গদের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল; কথিত আছে, কলিযুগে অত্যন্ত অত্যাচারে ধরা প্রপীড়িত হইলে, স্বয়ং বিষ্ণুর আবির্ভাব হইবে। তুমিই সেই অত্যাচার নিবারণ কল্পে আবির্ভূত হইয়াছ। তোমার পিতা তেগবাহাদুরের সঙ্গে আমার এ সকল কথা হইয়াছিল; তুমি ঘোর অত্যাচার হ্রাস করিয়া এদিকে আসিতেছ শুনিয়া, আমি তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছিলাম।

গুরুগোবিন্দ এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—"আপনার যেরূপ প্রেম, তাহাতে আপনার সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন হয়; সেই জন্য ওরূপ বলিতেছেন; আপনি প্রেমে পরমাত্মাকে বশ করিয়াছেন; আপনার আর জন্ম হইবে না; আপনাকে স্পর্শ করিয়া আজ আমি ধন্য হইলাম। সাধু বলিলেন,—এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে, অদ্য সদলে আমার আশ্রমে সেবা গ্রহণ করেন।

এইরূপে সে দিন সাধুর আশ্রমে সকলের নিমন্ত্রণ হইল। সাধু নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছিলেন; সকলেই ষড়-রসের আস্বাদ পাইয়াছিল। বহু পরিমাণে কড়া প্রসাদ (মোহনভোগ) হইয়াছিল। পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া গুরু সহচরগণের সহিত পুনরায় নিজের আড্ডায় ফিরিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সম্রাট্ বাহাদুরসার পত্র লইয়া দুই দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্রাট্ শ্রীগুরুকে লিখিয়াছেন,—আপনাকে ছাড়িয়া আমি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি; কিন্তু আপনার অদর্শনে আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। আপনি আমার পীর; আপনি সকল বিষয়েই সমর্থ,

আপনা হইতেই আমার সর্ব্বস্ব ; আপনার অদর্শনে আমি থাকিতে পারি না ; অতএব আপনি সত্বর আসিয়া দর্শন দিবেন। শ্রীগুরু সম্রাটের এই প্রেমপূর্ণ পত্র পাইয়া দূতদ্বয়কে বলিলেন,—তোমরা চল, আমি যাইতেছি। তখন শ্রীগুরু আরও দক্ষিণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অশ্বারোহণে চলিলেন।

কিছু দূর গিয়াই শ্রীগুরু দেখিলেন যে, সম্রাট্ অশ্বপৃষ্ঠে আসিতেছেন। পথিমধ্যে পরস্পরের দর্শন পাইয়া উভয়েরই আনন্দ হইল। ক্রমে উহাঁরা পুরগ্রামন নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। এখানে নাগপুর ও পুনা অঞ্চলের শিখগণ আসিয়া মিলিত হইল। পঞ্জাব অঞ্চল হইতে এ অঞ্চলের লোকের বেশভূষা, আচার ব্যবহার ও কথা বার্ত্তা অনেক স্বতন্ত্র দেখিয়া শ্রীগুরুর অনুচর শিখগণ বিস্মিত হইল। আগন্তুক শিখগণও তদ্রূপভাব দেখাইল। কিন্তু উভয় অঞ্চলের লোকের সম্মিলনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল।

এইরূপে সানন্দে বহুনগর, গ্রাম, নদী, পাহাড় প্রভৃতি পার হইয়া, শ্রীগুরু সম্রাটসহ পুণ্যতোয়া গোদাবরী তীরে বহু পুরাতন নাদের সহরে আসিয়া পৌছিলেন। শিখেরা নাদের সহরকে আফজলপুর বা "হুজুর সাহেব" বলে। সম্রাট সহরে অবস্থান করিলেন। শ্রীগুরু সহরের বাহিরে একটী স্থান পছন্দ করিয়া বলিলেন,—বহুকাল হইতে এটী আমার স্থান। শ্রীগুরু যে স্থানটী পছন্দ করিলেন, উহা তখন এক মোগলের অধিকারে ছিল। গুরুগোবিন্দ উহাকে নিজের পুরাতন স্থান বলিলে, ঐ মোগলের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। সম্রাটকেই বিবাদের মধ্যস্থ স্বীকার করা হইলে, সম্রাট দেখিলেন, যে মোগল ত বহুদিন এখানে বাস করিতেছে, এবং শ্রীগুরু ত আমার সঙ্গেই আসিলেন—অথচ উহার পুরাতন স্থান বলিয়া উনি দাবী

করিতেছেন ; শ্রীগুরুর মুখে কখন মিথ্যা কথা বাহির হইতে পারে না ; এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে। মোগল ভাবিলেন,—বাদসাহ যদি ন্যায্য বিচার করেন, তাহা হইলে আমার পুরুষানুক্রমের বাসস্থান অবশ্য আমিই পাইব ; কিন্তু বাদসাহ শ্রীগুরুর প্রতি যেরূপ বিশেষ ভক্তিমান দেখিতেছি, যদি ইনি পক্ষপাতী হয়েন, তাহা হইলে আমার পৈতৃক স্থান হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইবে। আবার বাদসাহ ভাবিতেছেন—আমি সম্রাট্ ; এ বিষয়ে ন্যায্য বিচার না করিয়া যদি আমি শ্রীগুরুকে এস্থান দেওয়াই, তাহা হইলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ আমাকে নিন্দনীয় হইতে হইবে এবং সে কলঙ্ক শ্রীগুরুকেও স্পর্শ করিবে।

বাদসাহ ও মোগল উভয়ের মন বুঝিয়া শ্রীগুরু বলিলেন—"ইহা যে আমার বহু পুরাতন স্থান, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি আছে ; এই স্থানে বসিয়া দুষ্টের দমনের জন্য বহু সহস্র বর্ষ ধরিয়া আমি তপস্যা করিয়াছিলাম ; এখনও স্থানটী খনন করিলে, বহু নিম্নে আমার আসন ও কতকগুলা ছাই দেখিতে পাওয়া যাইবে এবং আরও নিম্নে আমার জপের মালা ও কমণ্ডলু পাওয়া যাইবে। তখন বাদসাহের হুকুমে শ্রীগুরুর নির্দ্দিষ্ট স্থানটী খনন করিয়া সত্যসত্যই উক্ত দ্রব্যগুলি প্রাপ্ত হওয়া গেল। তখন সম্রাটের মধ্যস্থতায় এক যোজন স্থানটী শ্রীগুরুকে বাস করিতে দেওয়া হইল। অন্যান্য ঐতিহাসিকেরাও বলেন—সম্রাটের মধ্যস্থতায় দুই বর্গ ক্রোশ স্থান শ্রীগুরুকে দেওয়া হইয়াছিল।

স্থানটী পূর্ব্বে শ্রীগুরুরই ছিল এবং সম্রাটের মধ্যস্থতায় স্থানটী শ্রীগুরুকে দেওয়া হইল ; তথাপি মোগল বহুদিন উহা ভোগ করিয়াছে, এই জন্য উহার সন্তোষার্থে উহার উপযুক্ত মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা শ্রীগুরু

উহাকে দিলেন এবং যদি আর কাহারও ঐ জমির উপর দাবী থাকে, তাহা উপস্থিত করিতে পারে, একথা শ্রীগুরু সকলকে জানাইলেন। ইহাতে মোগল সন্তুষ্টচিত্তে সে স্থান ত্যাগ করিল। অন্য কেহও দাবী করিল না।

নাদের পর্ব্ব।

দ্বিতীয় পর্ব্বাধ্যায়।

মাধবদাস বা বৈরাগী বান্দা সম্মিলন।

গুরুগোবিন্দ উক্তরূপে নাদের সহরের পার্শ্বে স্থানটী পাকা করিয়া লইয়া, তথায় অবস্থান পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে মৃগয়ায় গমন করিতে লাগিলেন। মৃগয়াই এক্ষণে তাঁহার প্রধান কার্য্য। একদা শিকারে গিয়া তিনি কানন মধ্যে এক সাধুর আশ্রম দেখিতে পাইলেন তখন সাধু আশ্রমে ছিলেন না। গুরু ঐ আশ্রমের পার্শ্বে এক দীঘিকার তীরে ছাগ বলি দিয়া, উহা রন্ধন করাইয়া, ভোজন করিলেন এবং পরে সাধুর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পালঙ্কে বসিলেন। সাধুর এক চেলা এই ব্যাপার দেখিয়া শ্রীগুরুকে নিবারণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাহা করিতে না পারিয়া সত্বরে গিয়া নিজগুরু মাধবদাসকে সংবাদ দিলেন যে, অস্ত্রধারী এক বীরপুরুষ আসিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন; পাঁঠা কাটিয়া ভোজন করিয়া আশ্রম অপবিত্র করিয়াছেন এবং আপনার পালঙ্কে উপবেশন করিয়াছেন; আমি এ সকল নিবারণ করিতে পারি নাই। এই সাধু পিশাচসিদ্ধ। তিনি তাহার এক বীরকে (পিশাচকে) আজ্ঞা করিলেন যে, ঐ অস্ত্রধারীকে আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। প্রথম বীর অক্ষম হইল; এইরূপে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ বীরও অক্ষম হইলে, সাধু স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধু শ্রীগুরুর মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে পালঙ্ক হইতে উঠাইতে পারা যায় কিনা দেখিবার জন্য ঐ বীর চতুষ্টয়ের সমবেত চেষ্টায় একবার

শ্রীগুরুকে পালঙ্ক হইতে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন,—পারিলেন না। তখন শ্রীগুরু পালঙ্কে এরূপ ভার দিলেন যে, উহা উৎক্ষিপ্ত হওয়া দূরে থাকুক মৃত্তিকায় বসিয়া যাইতে লাগিল! তখন সাধু যোড়হস্তে নমস্কার করিয়া বলিলেন,—আপনি কে আমায় পরিচয় দিন,—আমি আপনার "বান্দা"। শ্রীগুরু বলিলেন,—তোমার গুরু কে? তাঁহাকে আমায় দেখাও। সাধু বলিলেন,—আমার গুরু দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে এখন আর কিরূপে দেখাইব? গুরু বলিলেন,—তোমার গুরু এক্ষণে কীটযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই আশ্রমেই ঐ বৃক্ষের ফলের ভিতর আছেন। এই কথা বলিয়া গুরু অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইলে, সাধু সেই ফলটী আনিয়া দেখিলেন, প্রকৃতই উহাতে একটী কীট রহিয়াছে; অনন্তর সাধু উহাকে সম্বোধন করিলে, কীট বিকৃত শব্দ করিল। সাধু তখন বলিলেন,—আমার গুরুর এ অবস্থা কেন? আমি জানি, উনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শ্রীগুরু বলিলেন,—উনি একটী গুহ্য কারণে এভাবে রহিয়াছেন; এইবার উনি মুক্তি লাভ করিবেন, উহাঁকে ছাড়িয়া দাও। সাধু এই ব্যাপার দেখিয়া একবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন আমি "শ্রীগুরুর বান্দা"।

বান্দা সম্মিলন সম্বন্ধে সকল ঐতিহাসিকই প্রায় কিছু কিছু অদ্ভূত কথা লিখিয়াছেন। তবে "সূর্য্য-প্রকাশে" যেরূপ বর্ণিত আছে, এখানে তাহাই সংক্ষেপে দেওয়া গেল। 'বান্দার' আসল নাম মাধব দাস। কেহ কেহ বলেন—ইনি রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈরাগী ছিলেন; কিন্তু সে কথা "সূর্য্যপ্রকাশে" নাই। ইনি বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং শ্রীগুরুর বান্দা বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিয়াছিলেন; এইজন্য শিখ-সমাজে এবং ইতিহাসে ইঁহার সুপ্রসিদ্ধ নাম "বৈরাগী-বান্দা"।

শ্রীগুরুও বান্দার বিনীত ভাব এবং অদ্ভুত তপঃ প্রভাব দেখিয়া যেন মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবংপ্রথম দর্শনেই উঁহার প্রতি পুরাতন সেবকদিগের অপেক্ষও অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বান্দা বলিলেন,—এক্ষণে আপনি আমার গুরু; আমি আপনার দাস; আমাকে আপনার সেবায় নিয়োগ করুন। গুরু বলিলেন,—আমি আমার ধর্ম্ম-বিস্তারের জন্য, "দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন" মহামন্ত্র সাধনের জন্য, অত্যাচারী মুসলমানের ধ্বংস ইচ্ছা করি। তুমি আমাকে এবিষয়ে কোনরূপ সাহায্য করিতে পার কি না? বান্দা বলিলেন,—আমি আপনার দাস; আমায় যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত। গুরু বলিলেন,—তুমি আমার কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া তোমাকে পঞ্জাবে পাঠাইতে চাই; তথায় আমার শত্রুগণকে প্রথমে ধ্বংস করা আবশ্যক। বান্দা পুনরায় বলিল,—আমি আপনার দাস; আপনার নিকটে থাকিয়া সকল কর্ম্ম করিতে পারি; অতদূর একাকী গিয়া কিরূপে কার্য্য করিব? গুরু তখন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, পঞ্জাবই এখন প্রকৃত কর্ম্ম ক্ষেত্র; তথায় শিখগণ সাধু দর্শনে বল পাইবে।

এইরূপ কথা বলিয়া, গুরুগোবিন্দ বান্দাকে নিজ অসি প্রদানে উদ্যত হইলে উপস্থিত খালসাগণের মুখস্বরূপ হইয়া ধরম সিং বলিলেন,—প্রভু একি! এই খালসা মণ্ডলী এতদিন শ্রীগুরুর সেবা করিয়া একজনও যে কার্য্যের উপযুক্ত হইল না, একজন এক দণ্ডের জন্য শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ পাইয়া মিনতি ও বিনয় প্রকাশ করিয়া সেই অসি প্রাপ্তির যোগ্য হইল! যদি ইচ্ছা হয়, আপনার তীর-ধনুক উহাকে দিন। এই কথায় শ্রীগুরু খাণ্ডা (তরবারী) দান হইতে নিরস্ত হইয়া, নিজের পাঁচটী তীর ও ধনুক বান্দাকে দিয়া বলিলেন,—রিপু দমনে বান্দা তোমাদের প্রধান সহায় হইবে, উপস্থিত বিগ্রহে খালসার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকিবে

না; বান্দারই শ্রেষ্ঠত্ব জানিবে। ধরম সিং-প্রমুখ শিখগণ যখন গুরুকে অসিদানে নিবারণ করেন, তখন তাঁহাদের মনের দুঃখে চক্ষে জল পড়িতেছিল। ইহা দেখিয়া গুরু তাহাদের সাক্ষাতেই বান্দাকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন যে, খালসাকে চিরদিন যত্ন খাতির করিবে; 'রাজ্য' খালসারই হইবে, বান্দার হইবে না। অনন্তর বান্দাকে বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য হইতেই তোমার তেজ; ব্রহ্মচর্য্য চিরদিন পালন করিবে; বিবাহ করিবে না; তোমার প্রধান কার্য্য শত্রুকে ধ্বংস করা এবং স্থানবিশেষে লুণ্ঠন করা। প্রথমে দিল্লীর নিকটে যমুনা তীরবর্ত্তী সিধৌরায় যুদ্ধ করিবে; তৎপরে সিধৌরা লুণ্ঠন করিবে; কিন্তু সেখানে বৃদ্ধ বুদ্ধসা আছে (এই কথা বলিয়া ধরম সিং প্রভৃতির দিকে চাহিয়া বলিলেন) যাহাকে আমি পাঁওটায় দেখিয়াছিলাম, তাহার স্থান লুণ্ঠন করিবে না। তৎপরে সরহিন্দে যাইবে; সেখানে গুরুকুমার হত্যাকারী উজিদা খাঁকে একবারে ধ্বংস করিবে; সরহিন্দ সহর একেবারে উৎসন্ন দিবে। কেবল, তথায় যে মুল্লা সাধু (বা দয়ালপুরী) আছে, তাহার স্থানটী বাদ দিবে। এইরূপে যেখানে যেখানে গুরুদ্রোহী দেখিবে, সেই খানেই মারিবে।

শ্রীগুরু বান্দাকে এইরূপে তাহার কার্য্য নির্দ্দেশ করিতেছেন, এমন সময়ে বান্দা বলিলেন,—প্রভু ইহাতে লক্ষাধিক সৈন্যের প্রয়োজন; তাহা কোথায় পাইব? গুরু বলিলেন,—আমার পন্থী অনেক, আমি সকলের সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিতেছি। ইহাতে শুধু বান্দা কেন শিখেরা পর্য্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তখন গুরু বলিলেন,—তোমরা মনে করিতেছ, শিখ অতি অল্পসংখ্যক তাহা নহে; বান্দা, তুমি চক্ষু মুদিত করিয়া ধীরভাবে ধ্যান ধারণা করিয়া দেখ। তখন বান্দা অগণ্য শিখ যোদ্ধা, পদাতিক অশ্বারোহী প্রভৃতি দেখিতে পাইল। গুরু বলিলেন;—

"লরে আর লাখো কি মরে।
বাঁচে সে জীব ভাজে যো পরে॥"

অর্থাৎ (বান্দা) দেখিবে, তুমি লক্ষ লক্ষ মারিবে; যে জীব পলাইবে সেই বাঁচিবে; তোমার সম্মুখ সমরে কেহ পারিবে না; কিন্তু জানিবে, এ সকল কিছুই তোমার নামে হইবে না, তুমি অহঙ্কারবশতঃ নিজের নামে যাহা করিবে, তাহাই নষ্ট হইবে। এইরূপ কথা বলিয়া, গুরুবংশীয় একজন তেহেন ক্ষত্রীয় ও একজন বাল্লা ক্ষত্রিয় এবং বাবা বিনোদ সিং ও তৎপুত্র কাহান সিং আর অপর একজন বাবা বাজ সিং এই পাঁচ জনকে বান্দার সাক্ষাৎ সাহায্যার্থে গুরু নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ধরম সিং প্রভৃতির তৃপ্ত্যর্থে গুরু পুনঃ পুনঃ বলিলেন,—যুদ্ধ কার্য্যে বান্দার প্রাধান্য জানিবে। বান্দার অবর্ত্তমানে খালসা বান্দার স্থানীয় হইবে। বান্দা যতদিন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে, কামিনী কাঞ্চনে মন দিবে না, ততদিন উহার তেজ অপ্রতিহত জানিবে। যে দণ্ডে উহাতে অহঙ্কার আসিবে, নিজের ভোগ বিলাস, মান, যশ প্রভৃতিতে মন দিবে—তখনই উহার তেজের হ্রাস হইতে থাকিবে।

এইরূপে বান্দায় তেজঃ সঞ্চার করিয়া গুরু সহচরগণ সমভিব্যাহারে নিজ আড্ডায় ফিরিয়া আসিলেন। বান্দাও যমুনা অঞ্চলে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

কেহ কেহ বলেন গুরুগোবিন্দ নিজ অসি বান্দাকে দিয়াছিলেন; কিন্তু "সূর্য্য প্রকাশ" তাহা বলেন না।

নাদের পর্ব্ব।

তৃতীয় পর্ব্বাধ্যায়।

বৈরাগী বান্দাপ্রসঙ্গ। সিধৌরা প্রভৃতি ধ্বংস।

রাজশক্তির সহায়তায় মুসলমানগণ তখন পঞ্জাব অঞ্চলে যে কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, লেখনী তাহার বর্ণনায় কাতর হয়। শ্রীগুরু "পাপী নগর" বলিয়া যে দুইটী স্থানের উল্লেখ করিয়া বান্দাকে ধ্বংস করিবার অনুমতি করিলেন, তথায় যে সকল বীভৎস কাণ্ড হইয়াছিল, তাহাতে ধ্বংস ভিন্ন উপায় ছিল না।

বান্দা গুরুদত্ত পাঁচজন ও অপর কয়েকজন অনুচর লইয়া যমুনার দিকে অগ্রসর হইলেন। পাঁচক্রোশ পথ আসিয়া বান্দার হঠাৎ মনে হইল, দেখি আমি লুকাইলে উহারা কি করে? তিনি মুচনকুপাল গ্রামে আসিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্রীগুরুর আজ্ঞাবহ শিখগণ তাঁহাকে অধিকক্ষণ লুকাইয়া থাকিতে দিল না। তেহেগ্রামে এক উচ্চ-ভূমিতে উঠিয়া তাহারা বান্দাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। তখন বান্দা সন্তুষ্ট হইয়া উহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় আরও কিছুদূর গমন করিলে, শিখেরা জিজ্ঞাসা করিল,—আমাদের আহারের কি হইবে? বান্দা বলিল,—শ্রীগুরু আদেশ করিয়াছেন, লোকের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক খাদ্য লইবে। ইহার পর কিছুদূর যাইতে যাইতে তাহারা দেখিল, এক রমণী তাহার স্বামী ও তাহার সহকারীদিগের জন্য রুটী লইয়া যাইতেছে। উহারা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া রুটী খাইল। রমণী চীৎকার

করিয়া তাহার স্বামীকে জানাইল। সে গ্রামে দশ পনের ঘর বসতি। তাহারা লাঠি সোঁটা লইয়া আসিল। কিন্তু যুদ্ধকৌশলে সুনিপুণ শিখের সহিত তাহারা পারিল না। তখন মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে থামাইয়া শিখ দল চলিতে লাগিল। এইরূপে গ্রাম নগর প্রান্তর পার হইয়া শিখেরা ক্রমে যমুনার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে আসিয়া পড়িল। শ্রীগুরুর ব্যবস্থায় ক্রমশঃ শিখদল পুষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহারা মুস্তাবাদ নগরের নিকট পৌছিলেন। তথাকার মালিক একজন তুর্ক। একদল শিখ লুট করিতে করিতে আসিতেছে এই সংবাদ পাইয়া, তিনি দুইটা তোপ ও দুইহাজার লোক লইয়া শিখদিগের গতিরোধ করিতে বাহির হইলেন। বান্দাও শিখসৈন্যের অগ্রবর্ত্তী হইলেন; অদূরে শত্রুপক্ষকে দেখিয়া তিনি গুরুদত্ত একটী তীর দিয়া নিজ সৈন্যের সম্মুখে একটী রেখা কাটিলেন এবং নিজপক্ষে যে যৎসামান্য তীর ও বন্দুক ছিল, লক্ষ্য স্থির করিয়া তাহা ছুঁড়িতে হুকুম দিয়া বলিলেন—"এই রেখার এদিকে শত্রুপক্ষের গোলা গুলি আসিবে না।"—তুর্কপক্ষ গোলা গুলি ছুঁড়িতে লাগিল; কিন্তু একটীও শিখ হত বা আহত হইল না। বান্দার এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া এবং সঙ্কটস্থলে বান্দাকে অগ্রণী দেখিয়া উপস্থিত শিখদল একেবারে বান্দার নেতৃত্বে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। তখন বান্দার হুকুমে শিখপক্ষ উক্ত রেখা পার হইয়া গিয়া, তরবারীর আঘাতে অনেক তুর্ক সংহার করিয়া তাহাদের তোপ বন্দুক কাড়িয়া লইল। এইরূপে শিখসমাগমে বান্দার সৈন্য সংখ্যাও যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমনি যুদ্ধ জয়েও অস্ত্র শস্ত্রও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ক্রমে দূর হইতে শ্রীগুরুর নির্দ্দিষ্ট সিধোরা নগর দেখা গেল। নগরটী পাকা প্রাচীর বেষ্টিত। সিধোরায় সাহেকুয়াতা পীরের কবর; দূর হইতে মসজিদের উচ্চ কাঞ্চন-মণ্ডিত শিখরদেশ দেখা যাইতে লাগিল।

"সূর্য্যপ্রকাশ" বলেন,—বান্দার দৃষ্টি নিক্ষেপে উহা যেন কাঁপিতে লাগিল। একান্ত উত্তেজনায় কম্পিত শিখেরা বলিতে লাগিল,—"এখন কাঁপিতেছ কেন? এতকাল হিন্দুর উপর যে অত্যাচার দেখিয়াছ, আজ তাহার প্রতিফল দেখিবে—সেই ভয়ে কি কঁপিতেছ?" ক্রমে উভয় পক্ষে অস্ত্র চলিতে লাগিল। প্রাচীর-বেষ্টিত নাগরিকেরা মুর্চ্চা (লুক্কাইত স্থান) হইতে গুলি চালাইতে লাগিল। শিখেরা বাহির হইতে গোলা গুলি চালাইয়া কিছুই করিতে না পারায়, বান্দা দমদমা (উচ্চভূমি) প্রস্তুত করিতে হুকুম দিলেন। কি ভয়ঙ্কর উত্তম! অবিলম্বে মাটি কাটিয়া উচ্চ ভূমি প্রস্তুত হইল। বান্দা স্বয়ং জনকয়েক অনুচরসহ সেই উচ্চ-ভূমিতে উঠিয়া কয়েকটা গোলা চালাইবামাত্র সহরে প্রবেশের উপায় হইল; ক্রোধান্ধ শিখগণ বহুবর্ষের নির্য্যাতনের প্রতিফল দিবার জন্য নগরের একান্ত গর্ব্বিত এবং নিতান্ত হৃদয়হীন মুসলমানদিগের উপর গিয়া পড়িল। মৃতের উপর আক্রমণ হিন্দু এবং শিখধর্ম্মের বিশেষতঃ বীর ধর্ম্মের বিরোধী কার্য্য। তাহারা সেই উন্মত্তাবস্থায় তাহাও করিয়া ফেলিল! কবর খোদিত করিয়া পীরের দেহ বাহির করিল এবং তাহা দগ্ধ করিল! এই সময়ে ধার্ম্মিক বুদ্ধুসার আসল স্থানের সন্ধান লইয়া উহা রক্ষা করা হয়। কেবল শব্দ হইতেছে—"মোগল, পাঠান, সৈয়দ মৎ ছোড়ো।" "এস্থানের যে সকল কুকর্ম্মী মুসলমান হিন্দু রমণীগণের প্রতি অত্যাচার করিত, এত কালে তাহারা তাহার প্রতিফল পাইল।" এইরূপে সিধৌরা ধ্বংস করিয়া শিখদল সরহিন্দ অভিমুখে যাত্রা করিল।

সুবা উজিদা খাঁ লাহোরের সুবাকে সংবাদ দিয়া সত্বরে তথা হইতে পল্টন আনাইলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে বান্দা অম্বালা লুণ্ঠন করিয়াছে। তখন সুবা উজিদা খাঁ সসৈন্যে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ছৎবাণুর নগরে গিয়া পৌঁছিতেই শিখদলের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

নাদের পর্ব্ব।

—•—

চতুর্থ পর্ব্বাধ্যায়।

বৈরাগী বান্দা-প্রসঙ্গ। সরহিন্দ প্রভৃতি ধ্বংস। বান্দার কলঙ্ক।

সুবা উজিদা খাঁর সৈন্য ও শিখদিগের সাক্ষাৎ হইবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষে অনেক সৈন্য নিহত হইল, তন্মধ্যে সুবার পক্ষে সংখ্যা অধিক। বান্দা যোদ্ধাদিগকে বলিয়া দিলেন,—উজিদা খাঁকে ধরিতে পারিলে, কাটিও না—আমার কাছে আনিবে। যুদ্ধ করিতে করিতে উজিদা খাঁ ও বান্দা সম্মুখীন হইয়া পড়িলেন। বান্দা ভাবিলেন,—যদি গুরুদত্ত তীর দিয়া উজিদাকে বধ করি, তাহা হইলে উহার পরলোকে সদ্গতি হইবে। এইরূপ মনে করিয়া, তিনি একটা বর্ষা দ্বারা তাহাকে হস্তী হইতে ফেলিয়া দিলেন; সুবা আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। তৎপরে বান্দা তাঁহাকে ঘোড়ার পদতলে দলন করিয়া নিহত করিলেন। "পন্থ প্রকাশ" বলেন,—উহার পায়ে একটা দড়ি বাঁধিয়া দড়ির অপর প্রান্ত একটা গরুর সিংঙে বাঁধিয়া গরুটাকে দৌড়াইয়া চালান হয়; সেই হেঁচ্‌ড়ানিতে উহার প্রাণ বাহির হয়। সেই সময় বলা হয়—"শিশু গুরুকুমার বধের ফল যথেষ্ট হইল কি?"

এইরূপে সুবা উজিদাখাঁকে মারিয়া বৈরনির্য্যাতনে উন্মত্ত শিখেরা সহরের যত উচ্চপদস্থ লোক উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকেও মারিতে লাগিল। তন্মধ্যে গুরুকুমার-বধের উৎসাহদাতা সুচানন্দকে পাইয়া তাহার নাক

ফুড়িয়া তাহাকে চণ্ডালের দ্বারা জুতা মারিতে মারিতে নিহত করা হয়। তৎপরে তাহার অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা বান্দার সাক্ষাতে আনীত হইল। স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ভারতের অস্থিমজ্জাগত। সেই উন্মত্তাবস্থাতেও শিখেরা সকলে বলিল,—"এ বালিকা নিরপরাধা।" বান্দা বলিল,—"আমার গুরুকুমার-বধের সময় কি বিচার হইয়াছিল? তবে এ বালিকা মনে করে,—আমি উচ্চবংশে জন্মিয়াছি, আমার উচ্চ [illegible] বিবাহ হইবে, তাহা হইবে না। এ বড়ই নীচমনার কন্যা,—চণ্ডালে যাহাতে ইহাকে বিবাহ করে, তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।" পরে তদ্রূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সৈন্যগণকে হুকুম দেওয়া ছিল, তাহারা লুণ্ঠন করিবে; এক্ষণে তাহারা সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ভয়ঙ্কর উৎপাত করিতে লাগিল। সরহিন্দ সহরের ধন, যতদূর পারিলেন, একত্র করাইয়া বান্দা তাহা নিজ অধিকারে রাখিলেন এবং লোকের ঘরদ্বার ভাঙ্গাইয়া শতদ্রুতে ফেলাইতে লাগিলেন। যাহারা আসিয়া শরণ লইল, তাহারা খালসার প্রজা হইতে স্বীকার করিলে, তাহাদিগকে রক্ষা করা হইল। লোকের ঘর ভাঙ্গিবার সময় বান্দা শ্রীগুরুকে স্মরণ করিয়া বর দিলেন,—যে ব্যক্তি এই সহরের ঘর ভাঙ্গিয়া শতদ্রুতে ফেলিবে, তাহার আহার মিলিবে। শিখেরা বলেন,—অদ্যাপি এই বর প্রভাবে দেখা যায়, এ সহরের ঘরের অন্ততঃ দুই চারিখানি ইষ্টক ভাঙ্গিয়া যে শতদ্রুতে নিক্ষেপ করে, সে ব্যক্তি সে দিনের খোরাকী চারি আনা ছয় আনা কোন না কোন উপায়ে আজও পাইয়া থাকে।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন,—শ্রীগুরু মালব প্রদেশের দমদমা হইতে সরহিন্দ সহরে গিয়াছিলেন এবং এই স্থানে গুরুকুমারদ্বয় নিহত হইয়াছিল বলিয়া, শিখদিগের তৃপ্তিসাধনের জন্য গুরু এস্থানের নাম "গুরুমার" রাখেন। এবং শিখদিগকে এই অনুমতি করিয়াছিলেন,

যে তাহাদের মধ্যে যে কেহ যখন এই স্থান দিয়া গঙ্গাস্নানাদি তীর্থ গমন করিবে, তখন সে এই সহরের দুই খানি ইষ্টক শতদ্রুনদীতে ফেলিয়া দিয়া যাইবে। কিন্তু এ সকল কথা "সূর্য্যপ্রকাশে" পাওয়া যায় না। শ্রীগুরুর সাক্ষাতে কবর খুঁড়িয়া মৃতকে জ্বালান একেবারেই অসম্ভব। বান্দার এই কার্য্যটী লর্ড কিচেনারের খার্টুমে মাহদীর গোর বারুদে উড়াইয়া দেওয়ার ন্যায়ই একান্ত লজ্জার বিষয়। বান্দার উক্তিই এইভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে।

এইরূপে সরহিন্দ সহর ধ্বংস করিয়া, বান্দা আনন্দপুর গিয়া গুরুস্থানে যথাবিহিত প্রণামাদি করিয়াছিলেন। বান্দা যে সকল স্থান জয় করিতেছিলেন, তাহা খালসা রাজ্যভুক্ত হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহার রাজকার্য্য চালাইবার কোন ব্যবস্থা তিনি করেন নাই।

আনন্দপুর হইতে পাহাড়ী রাজগণকে প্রতিশোধ দিবার জন্য বান্দা সসৈন্যে প্রথমেই ভীমচাঁদের রাজ্যে গমন করিলেন। তিনি ভীমচাঁদ ও ছোট বড় প্রায় বাইশ জন পাহাড়ী রাজাকে নিহত করিয়াছিলেন। বান্দা গুরুনিন্দক পাইলেই তাহার হাত কান নাক কাটিয়া দিতেন।

এই পাহাড়ী রাজগণকে নিহত করিবার পর, ধীরে ধীরে বান্দার মনে অহঙ্কার প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে বান্দার গুরুবাক্য ভুল হইতে লাগিল। পাহাড় অঞ্চলে বেড়াইতে বেড়াইতে বান্দা একদিন দেখিল, একটী পরম সুন্দরী চম্বাল-কন্যা তাঁহার সম্মুখ দিয়া সখীগণের সহিত স্নান করিয়া গেল। তাহাতেই তাহার চিত্ত বিচলিত এবং সেই উপলক্ষে হৃদয়ের এতকালের অটল ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হইল। বীজ বপন করিবামাত্র ফল পাওয়া যায় না; সেজন্য বান্দা প্রথমেই বুঝিল না যে, তাহাতে পাপ প্রবেশ করিল; সে সহজেই সে ক্ষেত্রে যেন সামলাইয়া লইল। যাহা হউক গুরুদ্রোহী পাহাড়ীগণকে জয় করিয়া বান্দা সসৈন্যে জলন্দর

দোয়াবে আসিলেন। তথায় কতকগুলি মুসলমান-প্রধান গ্রাম জয় করিয়া অমৃত সহরের নিকট মাঝা গ্রামে আসিয়াছিলেন। শিখপ্রধান গ্রাম অথবা যে সকল মুসলমান-প্রধান গ্রাম তদীয় বশ্যতা স্বীকার করিল, সে সকল নির্ব্বিঘ্নে রহিল।

তৎপরে বান্দা সসৈন্যে লাহোরে আসিয়া, তথা হইতে চম্পাচিড়ি নগরে গিয়া সুবাকে নিহত করেন। এইরূপে তিনি দক্ষিণি নগর, গুরুদাসপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। এই সময় রামকোর নামক জনৈক ব্যক্তি বান্দাকে বলেন যে, শুনিয়া আসিলাম, আপনি যেরূপে নানা স্থান জয় করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, সে কথা দিল্লীতে আলোচিত হইতেছে। এদিকে বৈরাগী বান্দার সাংসারিক মায়া অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং বান্দা শিখদিগের নিকট হইতে ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া সরিয়া থাকিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববৎ প্রকাশ্য জীবনে আনন্দ রহিল না। শ্রীগুরু বান্দার দেহরক্ষী-স্বরূপ যে পাঁচজন শিখ দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বাবা বিনোদ সিং এই সময় জানিতে পারেন, যে বান্দা ভিতরে ভিতরে একটা নীচবংশীয়া সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়াছেন। এই উপলক্ষে বান্দার উপর বাবা বিনোদ সিং বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাটিতে উদ্যত হইলে তদীয় পুত্র বাবা কাহান সিং পিতাকে বলেন,—বান্দা অতঃপর যাহা করিতেছেন, উহাতে উহার নিজেরই ক্ষতি হইবে; পরন্তু শ্রীগুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া গুরুদ্রোহিগণকে বধ করিয়া বান্দা যে মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে উহার অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপণ করা 'আমাদের' উচিত নয়; বিশেষতঃ যখন বান্দা অমৃত পান করিয়া রীতিমত খালসা হয় নাই, তখন উহাকে খালসাভাবে ত আমরা গ্রহণ করিতেছি না; এই ব্যক্তি যুদ্ধ-কার্য্যেই গুরুর নির্দ্দিষ্ট নেতা মাত্র; আমাদের সমাজভুক্ত নহে।

উপযুক্ত পুত্রের এইরূপ প্রবোধ-বাক্য শ্রবণে বাবা বিনোদ সিং সে কার্য্যে নিরস্ত হয়েন।

এদিকে বান্দার লুণ্ঠনাদির উৎপাতে প্রদেশটি উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলে, দলে দলে লোক সম্রাট বাহাদুর সার নিকটে গিয়া বান্দার বিরুদ্ধে আবেদন করিতে লাগিল। সম্রাট বলিলেন, বান্দা শ্রীগুরুর লোক; অতএব তাঁহাকে এ বিষয়ে জানাও। তখন সম্রাট্ বাহাদুর সা শ্রীগুরুকে নাদের সহরে রাখিয়া দিল্লীর দিকে চলিয়া আসিয়াছেন। সম্রাট্ কয়েকজন উকীল, মোসাহেব, ওমরাও প্রভৃতিতে মিলিত একটী দল শ্রীগুরুর নিকট পাঠাইয়া বান্দার অত্যাচার জানাইলেন। শ্রীগুরু তাহাদের সহিত দেখা না করিয়া বলিয়া দিলেন,—আমি ত সম্রাট্কে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, সরহিন্দের সুবা ও কয়েকজন বড় বড় লোককে বাঁধিয়া আমার হস্তে দাও; নতুবা নবতেজ সম্পন্ন একজন বীর গুরুকুমার-হত্যা প্রভৃতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে প্রেরিত হইবে। এখন ও বিষয় সম্রাটকেই বল; তিনি যেরূপ ভাল বিবেচনা করেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করুন; আমার কোন আপত্তি নাই।

শ্রীগুরু এক্ষণে নাদেরে থাকিয়া নির্জ্জনে বসিয়া আপন ধ্যানাদি কার্য্য, মধ্যে মধ্যে, মৃগয়াদি কার্য্য এবং কোন শিখ বা অপর কেহ আসিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলে, উপদেশ দান—ইত্যাদি কার্য্যে দিন যাপন করিতেছিলেন। এমন সময় শিখদিগের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে লাগিলেন, বান্দার ক্রমে অহঙ্কার বৃদ্ধি ও কামিনী-কাঞ্চনে লোভ দেখা দিয়াছে। সুতরাং বান্দার বিষয়ে শ্রীগুরু সকল সংবাদই পাইয়াছিলেন; কিন্তু সম্রাট্ যে তাঁহার কথা রক্ষা করেন নাই, সেই জন্য সম্রাটের প্রেরিত দলকে (ডেপুটেশনে) শ্রীগুরু ঐরূপভাবে উপেক্ষা দেখাইয়াছিলেন।

নাদের পর্ব্ব।

—*—

পঞ্চম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর নিকটে বান্দা-প্রসঙ্গ। শ্রীগুরুর বৈকুণ্ঠ গমনোদ্‌যোগ।
মাতা সাহেবদেয়ীকে দিল্লীতে প্রেরণ।

সম্রাটের লোকেরা বান্দার অত্যাচারের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াও শ্রীগুরুর নিকট হইতে উপেক্ষিত হইয়া চলিয়া গেলে, কয়েকদিন পরে সম্রাট স্বয়ং শ্রীগুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎকালে শ্রীগুরু গোদাবরীতে স্নান করিতেছিলেন। এই সময়ে সম্রাট দয়াসিংকে বলেন,—দেখিতেছি আমি কথা রক্ষা করিতে পারি নাই বলিয়া, শ্রীগুরু বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন; এক্ষণে তিনি যাহাতে পুনরায় কৃপা করেন, সে বিষয়ে তোমরাও পোষকতা করিবে। শ্রীগুরু স্নান করিয়া তীরে উঠিলে, সম্রাটকে তথায় উপস্থিত করা হইল। সম্রাট আরঙ্গজেব কোথাও বহুলক্ষ মুদ্রা মূল্যের একটি হীরক পাইয়াছিলেন; এক্ষণে শ্রীগুরুর তৃপ্ত্যর্থে সম্রাট্ বাহাদুর সা সেই হীরক শ্রীগুরুকে উপঢৌকন স্বরূপ দিবামাত্র শ্রীগুরু উহা গোদাবরী জলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সম্রাট কোন প্রকারে বিচলিত না হইয়া, শ্রীগুরুর কৃপা প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীগুরু বলিলেন,—আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, আপনি আমার কথা রক্ষা করিবেন না। সম্রাট্ বলিলেন,—যে জন্য আমি সুবা উজিদাকে আপনার নিকট বন্ধন করিয়া

দিই নাই, তাহা আপনাকে জানাইয়াছিলাম। আপনি যে আমায় রক্ষা করিবার জন্যই স্বয়ং তেজীয়ান্ বান্দাকে পাঠাইয়া সে সকল কার্য্য করিয়া লইয়াছেন,—আমার ক্রটি বাকী থাকিতে দেন নাই—তাহা ভালই হইয়াছে। যথেষ্টই সাজা দেওয়া হইয়াছে; এক্ষণে লোকের কষ্ট নিবারণের জন্য আপনার ঐ বান্দাকে ফিরাইয়া লউন। শ্রীগুরু বলিলেন -- সে কথাত আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তবে আপনিও যে আপনার পিতার ন্যায় কথা রক্ষা করিলেন না, ইহাই আমার আপনাকে জ্ঞাপন করা উদ্দেশ্য ছিল।

বাদশাহ উপস্থিত থাকার সময়েই পঞ্জাব হইতে সাহেব সিং প্রমুখ পাঁচ জন শিখ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, বান্দা আর সে বান্দা নাই; বান্দা এখন খালসার গুরু হইতে চায়; স্বয়ং কর্ত্তা হইতে চায়; বিবাহ করিবার চেষ্টায় আছে। তাঁহারা আরও জানাইলেন যে, বান্দা খালসার গুরু হইতে চাহিলে, বাবা বিনোদ প্রভৃতি তাহার বল পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে বলেন, যে এক্ষণে তুমি যদি গুরুশক্তি ধরিয়াছ, তবে তুমি কালবর্ণের বস্ত্র পরিধান কর; সরাপ (মদ্য) পান কর এবং "ঝটকা" (এককোপেকাটা) বা বলিদানের মাংস খাও। কিন্তু সে বিষয়ে সে আপনার পূর্ব্ব বৈষ্ণবভাব ত্যাগ করিতে চাহে না;—তাহাতে ভয় পায়।

তখন শ্রীগুরু শিখদিগকে বলিলেন,—এক্ষণে বান্দা আপনা আপনিই নষ্ট হইবে; উহার জন্য আর কোন চেষ্টা করিতে হইবে না।

শিখদিগকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীগুরু যখন জানাইলেন যে, বান্দার তেজ অতঃপর হ্রাস হইতে চলিল, তখন সম্রাট কতকটা তৃপ্তিলাভ করিয়া শ্রীগুরুর নিকট হইতে বিদায় হইলেন এবং সৈন্য এবং কর্ম্মচারীদের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য রাজ্য মধ্যে পরওয়ানা জারি করিলেন যে, শ্রীগুরু বান্দার তেজ হরণ করিয়াছেন।

পঞ্জাব হইতে সাহেব সিং-প্রমুখ যে পাঁচ জন শিখ আসিয়াছিল, তাহারাও শ্রীগুরুর নিকট বিদায় হইয়া পঞ্জাব চলিয়া গেল এবং তথায় গিয়া বাবা বিনোদ সিং প্রভৃতিকে শ্রীগুরুর আজ্ঞা জানাইল। তখন বান্দাকে উপলক্ষ করিয়া শিখদিগের মধ্যে দুই দল হইয়া পড়িল; এক দলের নাম 'বান্দাই শিখ' অপর 'খালসা শিখ'। 'বান্দাই শিখ' সংখ্যায় নিতান্ত অল্প। খালসা শিখের নিকট তাড়া খাইয়া বান্দা সদলে লৌগড় দুর্গে ও পাহাড় অঞ্চলে আপাততঃ অবস্থান করিতে লাগিল।

গোদাবরীতীরের যে ঘাটে বসিয়া বাদশাহ ও সাহেবসিং-প্রমুখ শিখগণের সহিত শ্রীগুরুর উক্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সেই ঘাটে বাদশাহ-দত্ত বহুমূল্যের হীরক নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া ঐস্থানের নাম "হীরা ঘাট" হইয়াছে।

শ্রীগুরু গোদাবরী-তীরে যে জঙ্গলে শিকার খেলিতে যাইতেন, সেখানে অনেক মোগল পাঠান প্রভৃতি আসিয়া তাঁহার গুলি ও তীর চালান দেখিয়া ধন্য ধন্য করিত। এই স্থানের নাম "শিকার ঘাট" হইয়াছে।

একদিন গুরু গোদাবরী তীরে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক শিখ বহুমূল্যের একটী "নাগিনা"-নামক (মূল্যবান্) পাথর আনিয়া শ্রীগুরুকে উপঢৌকন দিলে, গুরু উহাও গোদাবরী সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। উপস্থিত কেহ বলিল,—বোধ হয়, শ্রীগুরু উহার মূল্য সম্বন্ধে বিবেচনা না করিয়াই জলে ফেলিয়াছেন। তাহাতে শ্রীগুরু কহিলেন,—হইতে পারে আমি উহার মূল্য জানিনা; তবে একথা ঠিক যে আমার উহাতে আর আবশ্যক নাই। তোমার আবশ্যক বোধ হয়, উহা জল হইতে উঠাইয়া লও। এইকথা বলায় শিখ জলে ডুবিয়া একটী "নাগিনা" অনুসন্ধান করিতে গিয়া, অনেক "নাগিনা" মাণিক মুক্তা ইত্যাদি হাতে তুলিয়া আশ্চর্য্য হইল। তখন সে জল হইতে উঠিয়া শ্রীগুরুর নিকটে

আসিয়া ইহা জানাইলে, তিনি উপদেশ দিলেন, উহাতে কি হইবে? নিরন্তর "হরি হরি" জপ কর, উহা অপেক্ষা আনন্দ পাইবে। যে স্থলে এই ঘটনা হইয়াছিল, উহা গোদাবরী নদীর "নাগিনা" ঘাট নামে খ্যাত।

এই সময় কিছুদিন পরে এক ধনী পাঠান আসিয়া, গুরুগোবিন্দকে বলিল, —আনন্দপুরে অবস্থানকালে আপনি আমার নিকট এগার হাজার টাকার ঘোড়া লইয়াছিলেন। শ্রীগুরু বলিলেন,—আমার তাহা স্মরণ আছে; কিন্তু মূল্যের জন্য তুমি এতদিন আইস নাই। যাহা হউক যখন এত দিন গিয়াছে, তখন আরও একটু অপেক্ষা কর; অল্পদিন পরেই খালসা রাজ্যের নিকট হইতে সুদ সমেত পাইবে। পাঠান বলিল, —আমি সুদ লইনা, আমার সুদ চাই না। তখন গুরু বলিলেন,—ভাল, তুমি সুদ লওনা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম; আমি পুনরায় কাগজ লিখিয়া দিতেছি, উহার তিন চারি গুণ অধিক মূল্য পাইবে। তৎপরে পাঠান চলিয়া যায়। "সূর্য্যপ্রকাশ" বলেন যে, খালসা সরদারগণের নিকট ঐ পাঠান পরে বহু মূল্য পাইয়াছিল। মুসলমান ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে, শ্রীগুরু এই পাঠানকে টাকা না দিয়া নিহত করিয়াছিলেন, এবং ইহার পুত্রই গুরুকে মারাত্মক আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু শিখদিগের প্রামাণিক গ্রন্থ সে কথা বলে না। টাকা কড়ি সম্বন্ধে শ্রীগুরুর পবিত্র জীবনও তাহা ভাবিতে দেয় না। অথচ উহার উপর নির্ভর করিয়া রবি বাবুর এক কবিতাও লিখিত হইয়াছে!

শ্রীগুরু যখন ভাং (সিদ্ধি) সেবন করিতেন, তখন অন্যান্য শিখ ও ভক্তগণ আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিত। সেই সময় উপস্থিত সকলে মিষ্টান্ন ভোজন করিত এবং সেই উপলক্ষে বড় গোলমাল শব্দ হইত। সম্রাট বাহাদুরসা এ সময়ে শ্রীগুরুর আবাসের নিকটেই থাকিতেন। একদা তিনি গোলমাল শুনিয়া সন্দেহ করিলেন, বোধ হয় শ্রীগুরুর খরচের

অপ্রতুলের নিমিত্ত মিষ্টান্ন বিতরণে গোলমাল হয়। তখন ঐ মিষ্টান্ন যাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয়, সম্রাট তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেখেন যে, তাহাতে গোলমাল কমিল না—বরং বৃদ্ধি পাইল ; কারণ অতিথি বাড়িয়া গেল। যাহা হউক, তদবধি সম্রাট ঐ "লঙ্গরে" (শিখভোজে) অর্থ দিতে লাগিলেন।

এই সময় সেবক দয়া সিংয়ের জ্বর হয় এবং তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়; তাহাকে চিতায় উঠান হইয়াছে এমন সময় শ্রীগুরুর ডাকে দয়া সিং শ্রীগুরুর নিকটে আসিল! শ্রীগুরু দয়াসিংকে বলিলেন,—"এক্ষণে তুমি পরমাত্মার নিকট যাইতেছ।" তৎপরে তিনি নিজের বিষয় নিম্নলিখিত কয়েকটী কথায় বলিয়াছিলেন—

"মিত্রপ্যারে নু হাল মুরি দাদা কহনা।
তুদবিন্ রোগ রাজাইয়াদা ওড়না।
নাগ নেওয়া সাঁদে রহনা।
শূল শোরাহি খঞ্জর প্যালা।
বিম্বকসাবাদ সম না।
ইঁয়াড়েদা সানু সথর চঙ্গা।
ভাট খেড়াদা রহনা।

অর্থাৎ পরমাত্মাকে বলিবে, এ দাস তাঁহা বিনা রোগের রেজাই জড়াইয়া রহিয়াছে; এখানে ভুজঙ্গ শিশু বেষ্টিত হইয়া থাকা; বাটী রেকাবী প্রভৃতি পান পাত্রাদি শূল সম বোধ হইতেছে। আপনার শরণ পাইলে সুখ দুঃখ সব সমান বোধ হয়; নগরে থাকা আর ভাজনা খোলায় থাকা, উভয়ই সমান।

দয়াসিং এই সন্দেশ লইয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলেন। তৎপরে শ্রীগুরু বড় উদাস হইলেন। এইবার শ্রীগুরুও বৈকুণ্ঠে যাইবার উদ্‌যোগ করিতে

লাগিলেন। প্রথমে সহধর্ম্মিণী সাহেব দেয়ীকে নিকট হইতে সরাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল; তিনি নিকটে থাকিলে, সহমরণে গমন করিবেন। এই সময় রামকোরের ভাই শ্রীগুরুর নিকট ছিল। তাহার মাতার ইচ্ছা যে, তাহাকে ঘরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহাকে ঘরে পাঠাইবার উপলক্ষেই মাতা সাহেবদেয়ীকে দিল্লীতে মাতা সুন্দরীজীর নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মাতা সাহেবদেয়ী শ্রীগুরুর নিকটে থাকিবার জন্য সরোদনে অনেক অনুরোধ করিলে শ্রীগুরু তাঁহাকে ষষ্ঠ-গুরুর (গুরু হরগোবিন্দের) প্রতিমূর্ত্তি দিয়া বলিলেন, এই মূর্ত্তি পূজা করিবে ও জপ করিবে। "গুরু আজ্ঞা বলবান্"। সুতরাং মাতা সাহেবদেয়ী গুরু-আজ্ঞা অনুসারে দিল্লী গেলেন। তথায় মাতা সুন্দরীজীর সহিত দেখা হইলে, উভয়েই বহু রোদন করিলেন। তৎপরে মাতা সুন্দরীজী যে বালকটিকে লইয়া ছিলেন, তাহাকে অজিৎ সিং বলিয়া ডাকেন এবং শ্রীগুরুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন ঐ শিশুটি উভয়েরই মায়ার স্থল হইয়া দাঁড়াইল। উভয়ে গুরু আজ্ঞানুসারে পূজা জপ ও শিখসেবায় দিন কাটাইতে লাগিলেন।

নাদের পর্ব্ব।

—o—

ষষ্ঠ পর্ব্বাধ্যায়।

বাদশাহ ও শ্রীগুরু সংবাদ। পৈয়ন্দাখাঁর পৌত্র গুলখাঁ।
স্বর্গীয় দূতের আগমন।

এই সময়ে শ্রীগুরু যেরূপে দিন যাপন করিতেন, তাহার এক দিনের বিবরণ বলিলে অনেকটা বুঝা যাইবে। তিনি রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর থাকিতে (অর্থাৎ প্রায় রাত্রি দুইটার পর) শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচাদি কার্য্য ও স্নান করিতেন; তৎপরে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত গুরুদিগের—বিশেষ করিয়া গুরু নানকের বাণীপাঠ ও জপাদি করিতেন। সূর্য্যোদয়ের পর আফিং সেবন করিয়া সভায় বসিতেন। সভায় শিখ মোগল পাঠান এবং সাধারণ হিন্দু প্রভৃতি সকলেই আসিত; তন্মধ্যে শিখের ভাগই অধিক। কোন শিখ আসিতেছে, কোন শিখ যাইতেছে, এই ভাবে শ্রীগুরুর আবাসে শিখ সমাগম চলিত এবং তদুপলক্ষে নিয়মিত অতিথি সেবার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত শ্রীগুরু দরবারে থাকিতেন। তৎপরে আহারাদি করিয়া প্রায় ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করিতেন। বিশ্রামান্তে পুনরায় স্নান শৌচাদি করিয়া আফিং সেবন ও ঠাণ্ডাই পানান্তে শিকার খেলিতে যাইতেন। শীতপ্রধান দেশের যেমন চা, আমাদের বোধ হয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে ঠাণ্ডাই বা সরবৎ তদ্রূপ। এই জন্যই পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উহার বিশেষ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

শিকার খেলিয়া ফিরিয়া আসিতে প্রায় রাত্রি নয়টা হইত ; এজন্য অনেক স্থলে শিখদিগের সন্ধ্যাকালীন আরতি রহরাসপাঠ প্রভৃতি প্রায় রাত্রি এক প্রহরের পর হয়। তৎপর কিছুক্ষণ একক জপাদি করিয়া রাত্রিতে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শয়ন করিতেন। কোন কোন দিন শিকারে না গেলে, দরবারে বসিতেন।

একদিন শ্রীগুরু দরবারে বসিয়া আছেন, এমন সময় সম্রাট বাহাদুর সা কয়েকজন কাজী, মোল্লা, সৈয়দ, রহিস প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাট শ্রীগুরুকে যথারীতি প্রণামাদি করিয়া উপবেশন করিলেন, শ্রীগুরু সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আর কি চাই বল ? সম্রাট্ বলিলেন,—অতঃপর আমি হায়দ্রাবাদ হইয়া দিল্লী যাইব। শ্রীগুরুর একখানি প্রতিমূর্ত্তি লইতে ইচ্ছা করি। ইহাতে শ্রীগুরু রাজ্য সুপালন জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় প্রজার প্রতি সম্রাটকে সমদর্শী হইতে পরামর্শ দিলেন। এতদুপলক্ষে সম্রাট বলিলেন, হিন্দুধর্ম্ম কাঁচা। তখন শ্রীগুরু বলিলেন—তাহা নহে। হিন্দু "রক্ষার্থে" এবং মুসলমান "নাশার্থে" চলিয়াছে। হিন্দুরা গোসেবা করে, নিজেদের অর্জ্জনে নিজেদের ভরণপোষণ করে, কাহারও উপর উৎপীড়ন করেনা। কিন্তু মুসলমান তেমন নয়। তুমি আরঙ্গজেবের মতন হইও না, ঈশ্বরের নাম জপ করিও। যদি আবার অত্যাচার হয়, তবে খালসা গোর খুঁড়িয়া মুসলমানদের পোড়াইবে।

সম্রাট বাহাদুরসা শ্রীগুরুর ভাব অনেকটা বুঝিয়া ছিলেন ; তিনি উক্ত কথায় প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, দ্বিরুক্তি করিলেন না। ইহাতে শ্রীগুরু আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সম্রাটকে বলিলেন—তোমার রাজ্য কুশলে থাকিবে ; কিন্তু ইহারপর যে গোলযোগ হইবে, তাহা আর তুমি মিটাইতে পারিবে না। এইরূপ কথা হইতে হইতে বান্দার উৎপাতের কথা

উঠিল। তাহাতে শ্রীগুরু বলিলেন,—"বান্দার তেজ ত আর নাই, সে সত্বরেই দুর্গে আবদ্ধ হইবে" সম্রাট বলিলেন,—"আল্লা যাহা করিবেন তাহা হইবে; এক্ষণে শ্রীগুরু ত আমার রাজ্য কুশলে থাকিবে বলিয়াছেন, ইহাই আমার সৌভাগ্য; এক্ষণে দিল্লী যাইতেছি, পুনরায় আসিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব।" তাহাতে শ্রীগুরু বলেন,—"বোধ হয় আর দেখা হইবে না; শ্রীগুরু এক্ষণে বৈকুণ্ঠযাত্রার উদ্‌যোগ করিতেছেন।" তৎপরে অনুচরগণের সহিত সম্রাট বিদায় লইলেন।

এই সময়ে শ্রীগুরু প্রায় একাকী থাকিতেন এবং সভায় বসিলে বামন নামে একজন "কবীশ্বর" শ্রীগুরুকে মহাভারত পুরাণাদি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। আনন্দেই সময় কাটিত। একদিন একটী সশস্ত্র পাঠান বালক সভায় আসিয়া ধীরভাবে বসিলে, শ্রীগুরু তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া সানন্দে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সে উত্তর দিল,—"পৈন্দাখাঁ আমার পিতামহ, আমার নাম গুল্‌খাঁ, আমার নিবাস পঞ্জাবে ছোটামীর গ্রামে; আমরা পুরুষানুক্রমে বাদশাহের চাকরী করি। * আমার মাতার নিকটে শ্রীগুরুর অনেক মহত্বের কথা শুনিয়াছি, তিনিই আমাকে শ্রীগুরুর নিকটে পাঠাইয়াছেন।" শ্রীগুরু এই পাঠান বালককে দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, উহার পিতামহ ষষ্ঠ গুরু-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—গুরুগোবিন্দই ইহার পিতামহকে নিহত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। যাহা হউক, শ্রীগুরু বালকের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং তাহাকে পাঁচটী আসরফি (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়া বলিলেন,—"তুমি প্রত্যহ

* গ্রন্থান্তর হইতে জানা যায়, ইহার পিতার নাম সৈয়দখাঁ এবং ইহার মাতা শ্রীগুরুকে "পয়গম্বর" বলিয়া মনে করিত। আবার কেহ কেহ বলেন,—এই বালক পূর্ব্বোল্লিখিত ঘোড়ার মহাজনের পুত্র।

আসিবে।” সে শ্রীগুরুর কথায় এবং যত্নে আনন্দিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত তাহার মাতাকে জানাইলে, তিনি তাহাকে শ্রীগুরুর নিকটে প্রত্যহ যাইতে বলিয়াছিলেন।

গুল্‌খাঁ পরদিন সভায় আসিলে, শ্রীগুরু তাহাকে লইয়া চৌপাট (পাশা) খেলিতে বসেন এবং পাঁচটী রজত মুদ্রা দিয়া বলেন,—“প্রত্যহ আসিও; প্রত্যহ এইরূপ পাইবে।” পাশা খেলিবার সময় শ্রীগুরু তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সে বাদসার সরকারে কতদিন চাকরী করিতেছে, তাহার পিতা কত দিন চাকরী করিয়াছে, পিতামহই বা কিরূপ চাকরী করিয়া কিরূপে নিহত হইয়াছিল ইত্যাদি। পরে সে চলিয়া গেলে, শিখেরা বলিতে লাগিল,—“এবালক শত্রুর পুত্র—শত্রু; ইহাকে এত আদর, এত যত্ন কেন! ও কি সুযোগ পাইলে শত্রুতা করিতে ত্রুটী করিবে?” তাহাতে শ্রীগুরু বলেন,—“ইহার গুহ্য কারণ আছে; কোন কাজ আছে বলিয়াই আমি ওরূপ করিতেছি।” তখন শিখেরা আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। পাঠান বালক ঐরূপ আসা যাওয়া করিতে লাগিল।

তৎপরে একদিন পুরখালি নিবাসী দুইজন শিখ দুইটী রজত-মণ্ডিত “যমধর” নামে মুদ্গর লইয়া আসিল। কেহ কেহ বলেন,—উহারা দুইখানি তরবারী লইয়া আসিয়াছিল। যাহাহউক, শ্রীগুরু উহা পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং গুলখাঁ আসিলে তাহাকে ঐ “যমধর” মুদ্গর দিয়া বলিলেন,—“যে এমন মুদ্গর পাইয়া শত্রুকে না মারে, সে মনুষ্য মধ্যে গণ্য নহে—সে কুলাঙ্গার—তাহার জন্ম বৃথা” ইত্যাদি। যাহাহউক, এইরূপ কথাকর্ত্তা ও পাশা খেলা চলিতে লাগিল। শ্রীগুরুর ঐরূপ কথায় গুল্‌খাঁ প্রথম প্রথম বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই। কিন্তু এই মুদ্গর উপলক্ষে যখন শ্রীগুরু বৈরনির্য্যাতন-সম্বন্ধে ঐ সকল কথা বার বার বলিতে

লাগিলেন, তখন গুল্‌খাঁর মনটা বিচলিত হইল। গুলখাঁ প্রত্যহ বাড়ী গিয়া তাহার মাতাকে গুরুপ্রদত্ত টাকা দিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিত; সে দিনও টাকা দিয়াছিল বটে, কিন্তু আনন্দ প্রকাশ করে নাই। পুত্রকে বিমর্ষ দেখিয়া গুলখাঁর মাতা উহার কারণ জানিতে চাহিলেন। তখন গুল্‌খাঁ শ্রীগুরুর উক্তি—"পিতার শত্রুকে যে নিধন না করে, তাহার জীবনে ধিক্" ইত্যাদি জানাইয়া বলে:—

"হাম পাঠানকে পুত গোস্‌সেলে।
শ্রীগুরু পুরব বাত চিতেলে॥

অর্থাৎ আমি পাঠানের পুত্র সহজেই ক্রোধী; আর শ্রীগুরু আমাদের পূর্ব্ব শত্রুতার চৈতন্য সাধন করিয়া দিতেছেন! তাহাতে তাহার মাতা বলেন,—"সাবধান, শ্রীগুরুকে যেন মারিও না,—তাহা হইলে শিখেরা তোমায় মারিয়া ফেলিবে।"

এইরূপে গুল্‌খাঁর মন বিচলিত হওয়ায় তাহার মনে সঙ্কোচ অভিমান প্রভৃতি দেখা দিল। তাহাতে শ্রীগুরু জিঘাংসাবৃত্তিকে আরও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; অথচ যত্ন আরও বাড়াইতে লাগিলেন। অপর রাত্রিতে আরতি রহরাস প্রভৃতি সায়ং কার্য্য সমাধা করার পর, শ্রীগুরু একদিন, গুল্‌খাঁকে একাকী আপন কক্ষে বলিলেন:—

"বৈরী মিল একান্ত সুখানী।
আপ হোয় তব আজত:পানী॥
মারা নাহি থুক মুক বাঁকে।
জীবন পর লানত বহু তাকে॥
* • * •
শমা শত্রু হতবে কোপাবে।
চুক যায় ফের হাত না আবে॥

অর্থাৎ শত্রুকে একান্ত একাকী পাইয়া এবং শস্ত্রধারী হইয়া যে শত্রুকে না মারে, তাহার জীবনে ধিক্,—তাহার নিজ জীবনের মায়া অধিক। * * * এমন সময় পাইয়া যদি শত্রুকে মারিতে ভুলিয়া যায়, তবে পুনরায় এমন সুযোগ না আসিতে পারে। তৎপরে শ্রীগুরু আরও বলিলেন,—"সে মানুষের পুত্র নহে—সে গৃধিনী গর্ভজাত।" এইরূপ বাক্যবাণে গুল্খাঁর ক্রোধ আসিয়া পড়িল; সে শ্রীগুরুকে "যমধর" দ্বারা আঘাত করিল, হাত কাঁপিয়া যাওয়ায় শ্রীগুরুকে প্রথম ও দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় লাগে নাই। তৃতীয় উদ্যমে গুরু পেটে (পাঞ্জরের নিম্নে) আঘাত পাইলেন। তখন শ্রীগুরু পাঠান-বালককে কাটিয়া ফেলিলেন এবং শিখদিগকে ডাকিয়া গুল্খাঁর মৃতদেহ ফেলিয়া দিতে বলিলেন। শিখেরা তদনুসারে কার্য্য করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে, শ্রীগুরুর অঙ্গে রক্ত পড়িতেছে! তখন তাহারা ব্যস্ত হইয়া ক্ষত স্থানটীতে ঔষধ লাগাইয়া শিলাই করিয়া দিল; এবং বলিতে লাগিল,—আমরা পূর্ব্বেইত বলিয়াছিলাম যে, শত্রুকে শ্রীগুরু কেন নিকটে লইতেছেন; ষষ্ঠ গুরু উহার পিতামহকে মারিয়াছিলেন; এ নিশ্চয় তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে। শ্রীগুরুর এ যে কি লীলা—যেন শিকার খেলা—আমরা কিছুই বুঝিলাম না। কেহ কেহ বলেন,—পাঠানপুত্র শ্রীগুরুকে আঘাত করার পরই গুরু শিখদিগকে ডাকিয়াছিলেন এবং শিখেরাই উহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছিল; আবার কেহ কেহ বলেন,—শিখেরা উহাকে মারিতে উদ্যত হইলে, শ্রীগুরু নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, পিতৃ-বৈরীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাই এই ব্যক্তি শিক্ষা দিয়াছে, উহাকে মারিও না; কিন্তু শিখেরা তাহা না শুনিয়া গুরু-দ্রোহীকে তৎক্ষণাৎ সংহার করিয়াছিল। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু "সূর্য্যপ্রকাশ" যাহা বলেন তাহাই উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

শিখেরা বলেন,—অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা ভাই সন্তোষ সিং লিখিত "শ্রীগুরু

প্রতাপ সূর্য্য প্রকাশ"অধিক প্রামাণ্য; "পন্থ প্রকাশ" প্রভৃতি ইহা অপেক্ষা আধুনিক। যে সকল কথায় তর্ক উপস্থিত হয়, তথায় শিখেরা "সূর্য্য প্রকাশের" কথাই গ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, - ভাই সন্তোষ সিং অনেক সময় শ্রীগুরুর নিকটে থাকিয়া এ সকল বিবরণ লিখিয়া লইয়াছিলেন। কেহ বা বলেন,—কবীশ্বর বামন শ্রীগুরুর সভায় থাকিয়া যে সকল মন্তব্য লিখিয়া লইয়াছিলেন, তাহা হইতে ভাই সন্তোষ সিং ঐ গ্রন্থ খানি লিখিয়াছিলেন। ঐ জন্য আমরাও "সূর্য্য প্রকাশের" প্রাধান্য দিয়া আসিতেছি।

তৎপরে খালসাগণ মিলিত হইয়া সম্রাট্ বাহাদুরসাকে পত্রদ্বারা জানাইল যে, শ্রীগুরু পাঠান-পুত্র গুল্খাঁ কর্ত্তৃক আঘাত পাইয়াছেন। বাহাদুরসা এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে উত্তম চিকিৎসক আনাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং শ্রীগুরুকে দেখিতে আসিলেন। সম্রাট্ উক্ত পাঠান-পুত্রের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিলে শ্রীগুরু বলিলেন,—"ইহাতে তাহার বিশেষ কোন দোষ নাই; আমিই তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম।" ইহার কিছুদিন পরে ক্ষত স্থান আরোগ্য হইয়া যায়। পরে পুনরায় শ্রীগুরু স্বচ্ছন্দে দরবারে বসিতেছেন দেখিয়া সম্রাট বাহাদুরসা বিদায় লইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় নিয়মিত দীপ দান কার্য্য সম্পন্ন হইলে, শ্রীগুরু তাঁবুতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দুই দেব-দূত আসিয়া শ্রীগুরুর সহিত তাঁহার তাঁবুতে সাক্ষাৎ করেন। বিদ্যুৎ-প্রভায় তাঁহাদের আগমন জানা গিয়াছিল। তাঁহারা শ্রীগুরুকে এক পত্র প্রভার ন্যায় দিয়াছিলেন। উহা পাঠ করার পর কথা হইল;—

"প্রভুজী অব বৈকুণ্ঠ সুধারো।
কার্য্য ইহালীন কৈর সারো॥

অর্থাৎ, প্রভু এখন বৈকুণ্ঠে চলুন, এখানকার কার্য্য শেষ করিয়া লউন। শ্রীগুরু বলিলেন,—অকাল পুরুষের যেরূপ আজ্ঞা আমি তাহা মানিয়া লইয়াছি; পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। এইরূপ কথাবার্ত্তায় পর দূতদ্বয় চলিয়া গেলেন। পরদিন হইতে শ্রীগুরুকে অধিকতর আনন্দিত দেখা গেল।

নাদের পর্ব্ব।

সপ্তম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর বৈকুণ্ঠ-গমনোদ্‌যোগ।

কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, শ্রীগুরুর আহত স্থানটী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল কিনা, জানিবার জন্য সম্রাটের ইচ্ছা হইল। তিনি শ্রীগুরুর নিকট দুইজন ওমরাওকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা হস্তী আরোহণে দিল্লী হইতে আফজল পুর বা নাদেরে আসিয়া শ্রীগুরুর নিকটে সংবাদ দিলেন। শ্রীগুরু তাঁহাদের আহারাদি হইতে হাতীর খোরাক পর্য্যন্ত পূর্ণ আতিথ্যের ব্যবস্থা করেন। তৎপরে শ্রীগুরু দরবারে বসিয়া ওমরাও দ্বয়কে দর্শন দিলে, তাঁহারা যথাবিহিত প্রণামাদি করিয়া কহিলেন,—সম্রাট্ বাহাদুরসা শ্রীগুরুর ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে কি না জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন এবং আঘাতকারী পাঠানপুত্রের উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন যে, উহার গৃহাদি তোপে উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ওমরাওদ্বয় এই সকল কথা শ্রীগুরুকে জানাইলে, শ্রীগুরু বলিলেন,—সম্রাটকে বলিবে, পাঠান পুত্রের কোন দোষ নাই; উহা অকাল পুরুষের ইচ্ছায় এবং আমার উৎসাহেই ঘটিয়াছে। যে সময় এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন দরবার গৃহে শ্রীগুরুর তীর-ধনুকের প্রতি ওমরাওদ্বয়ের নয়ন আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা সে সময়ে চুপি চুপি পরস্পর বলাবলি করিতেছিলেন,—এত বড় ধনুক কি লোকে সহজে তুলিতে পারে? তাহাও যদি অনেক চেষ্টায় সম্ভব হয়, তবে এত বড় তীর উহাতে যোজনা করিয়া ছুঁড়িতে পারা যায় না। বোধ হয়, উহা লোককে দেখাইবার জন্য বিশেষ করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে; ব্যবহারের

জন্য অন্য তীর ধনুক আছে। শ্রীগুরু ওমরাওদ্বয়ের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, সব্যসাচীর ন্যায় দুইহস্তে দুইটী ধনুক অবলীলাক্রমে লইলেন। তৎপরে উহার জ্যা আরোপণের সময় হঠাৎ ক্ষত স্থানে ব্যথা পাইলেন ;— রক্ত দেখা দিল ; এমন কি পূর্ব্বে যে সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও ফাটিয়া গেল।

তখন ওমরাওদ্বয় বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীগুরু এ কি করিলেন? এ ত ভাল কার্য্য হইল না! আপনি অসুস্থাবস্থায় কেন এ কার্য্য করিতে গেলেন?" শ্রীগুরু বলিলেন,—"অকাল পুরুষের এইরূপই ইচ্ছা ; এজন্য ব্যাকুল হইতে হইবে না—আর কোন চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা নাই। আপনারা যেরূপ দেখিলেন, সম্রাটকে সেইরূপ বলিবেন।" এই কথা বলিতে বলিতে দুইটী সিরোপা ওমরাওদ্বয়কে দিয়া তাঁহাদের বিদায় দিলেন।

ওমরাওদ্বয় বিদায় হওয়ার তিন দিন পরে, শ্রীগুরু হুকুম দিলেন, —অদ্যই পাঁচ শত টাকার কড়া প্রসাদ (মোহনভোগ) প্রস্তুত এবং এক শত টাকার মেওয়া ফল ক্রয় করিয়া আনয়ন করা হউক। ইহার উপযুক্ত পুরি, কচুরী, পুপপুরী, পকৌরে, বড়ে, দহি-বড়া প্রভৃতিও প্রস্তুত করাও। আগামী কল্য চতুর্থী, বুধবার। আগামী কল্য ভোজ দিতে হইবে। শ্রীগুরু এইরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হুকুম দিয়া আফজলপুর ও উহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলে সাধু, ফকির ও চারিবর্ণের লোক সকলকে নিমন্ত্রণ করাইলেন। তদনুসারে পরদিন "লঙ্গর" (ভোজ) লাগিল। "অমৃত"-পায়ী খালসা সকলে এক পংক্তিতে ও অপরাপর বর্ণাশ্রমীরা পৃথক পৃথক পংক্তিতে বসিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। কড়া প্রসাদকে (মোহন ভোগকে) পঞ্জাব অঞ্চলে 'কুন্‌কা' বলে। শ্রীগুরু বলিলেন,—কুন্‌কা কণিকামাত্র

গ্রহণ করিলেও দেহ পবিত্র হয়। শ্রীগুরুর এই সকল কার্য্য দেখিয়া, সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, শ্রীগুরু এইবার বৈকুণ্ঠ গমনের উদ্‌যোগ করিতেছেন।

সকলে আহার করিয়া চলিয়া গেলে শ্রীগুরু অনুচর শিখগণকে বলিলেন, আগামী কল্য বীরবার (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার) পঞ্চমী, আমি, শুভযাত্রা করিব; অদ্যই শতমণ চন্দন কাষ্ঠ সংগ্রহ কর। নূতন পোষাক ও দীপমালার যোগাড় কর। এ সময়ে "প্রেম পরমেশ্বর পর" রাখিয়া "যাঁহা তাঁহা গুরুবাণী জপে"। সকলের চক্ষেই জল পড়িতেছে; কিন্তু সকলেই গুরুবাণী জপ: করিতেছে ও শ্রীগুরুর আজ্ঞা অনুসারে হাতে কার্য্য করিতেছে। ক্রমে রাত্রি হইয়া গেল। সকলে পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল,—শ্রীগুরুর রূপ আর দেখিতে পাইবে না—আজ যত পার, নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লও। শিখেরা তখন শ্রীগুরুকে বলিল,—গুরু আপনি অন্তর্যামী; আপনি পরমাত্মায় মিলিত হইয়া গেলে, আমাদের উপায় কি হইবে? আমরা কি দেখিব? আমাদের এরূপ উপদেশ আর কে দিবে?—এইরূপ নানা আক্ষেপপূর্ণ বাক্য শুনিয়া

শ্রীগুরু গোবিন্দ সিং উপরে।
শুন খালসা তুম মম প্যারে
নেত রচি পরমেশর ধৈ সে
ভূত ভবিখ্য মিটে সো কৈ সে॥

অর্থাৎ শ্রীগুরু গোবিন্দসিং বলিলেন,—শুন খালসা, তোমরা আমার অতি প্রিয়; পরমেশ্বর যেরূপ নীতি রচিয়া ভূত ভবিষ্যৎ চালাইতেছেন, সেইরূপ চলিবে। এজন্য দুঃখ কি? অকাল পুরুষের নাম লও। তাঁহার ধ্যানে থাক। শ্রীগুরুর এইরূপ উপদেশ শুনিতে শুনিতে ও নানা কথায় সে রাত্রি যেন সকলের অজ্ঞাতসারে প্রভাত হইয়া গেল।

শ্রীগুরু ধীরে ধীরে স্নানাদি কার্য্য করিয়া সকলের দর্শনার্থে প্রায় চারিঘণ্টা কাল দরবারে (সভায়) ছিলেন; তৎপরে পুনরায় স্নান করিয়া ভাং (সিদ্ধি) ও ঠাণ্ডাই (মসলা দেওয়া সরবৎ) পান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিলেন। দর্পণে মুখ দেখিতে দেখিতে দস্তর (পাগড়ী) বাঁধিলেন; পঞ্চম গুরুর বাণী "সথমনি সাব" পাঠ করিলেন। তৎপরে অস্ত্রাদি নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া দরবার গৃহ হইতে বাহিরে ময়দানে গিয়া বসিলেন। শিষ্যগণকে বলিলেন,—আমার এসকল :পোষাক অস্ত্র শস্ত্র কিছু খুলিও না। লোকের ভিড় নিতান্ত আমার নিকটে না হয় সে জন্য কাপড়ের কানাৎ (কাণ্ডার) দিয়া ঘেরিয়া দাও। চন্দন কাষ্ঠাদি আমার নিকটে আনিয়া রাখ। শ্রীগুরু যতই এই সকল কার্য্য করাইতে লাগিলেন, ততই সকলের চক্ষের জল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

নাদের পর্ব্ব।

—•—

অষ্টম পর্ব্বাধ্যায়।

শ্রীগুরুর বৈকুণ্ঠ গমন।

আজ সম্বৎ ১৭৬৫ (খৃঃ অব্দঃ ১৭০৮) কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি ; শিখদিগের আজ আর চক্ষের জল নিবারণ হইতেছে না। তাহাদিগকে যতই বুঝাইতেছেন, যতই উপদেশ দিতেছেন, কিছুতেই তাহাদের শোকাবেগ নিবারিত হইতেছে না। শ্রীগুরু বলিলেন—স্থূল দেহ ত থাকে না, ইহার জন্য শোক করিও না। শিখেরা বলিল—আর কাহার পদে মস্তক দিয়া আমরা সংসারের জ্বালা মিটাইব ? শ্রীগুরু বলিলেন,—তোমাদের অকাল পুরুষে সঁপিয়া দিয়াছি ; তোমাদের কোন চিন্তা নাই। তোমরা পরস্পর প্রীতি রাখিবে। এইরূপে কতই উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং শিখেরা কতপ্রকারেই আপনাদের মনোবেগ থামাইতে লাগিল—সে সমস্ত পূর্ণভাবে বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। শ্রীগুরু বলিলেন,—

সিং সে রহেত পাঁচ যাঁহা মিলে।
মম স্বরূপ সো দেখো ভলে॥

অর্থাৎ যেথানে পাঁচ জন শিখ মিলিত হইবে দেখিবে, তথায় আমার স্বরূপ জানিবে।

আরও বলিলেন,—সর্ব্বদা শস্ত্র সঙ্গে রাখিবে, সর্ব্বদা উদ্‌যোগী থাকিবে এবং সর্ব্বদা মনে করিবে, যেন আমার কাছেই আছ।

"গুরু খালাসা খালসা গুরু" জানিবে।

এইরূপে অর্দ্ধ রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

তৎপরে বোধ হইল, যেন দেবলোক হইতে দেবতাগণ আসিতেছেন। একাদশ জন শিবদূত, ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি "জয় জয় গুরু উচারে" আসিতে লাগিলেন এবং শ্রীগুরুকে দর্শন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

এই সময় শ্রীগুরু জপজী পাঠ করেন। তৎপরে পাঁচটী দোহরে (শ্লোক বিশেষ) পাঠ করেন। উহার একটী উদ্ধৃত করা গেল :—

"হরি হর জন দুই এক উচারা।
ঐ সো আশা জিনহে মাঝারা॥" ইত্যাদি

তৎপরে

প্রথম ভগবতী সিমরণ· করিয়ে।
শ্রীনানক কো ধ্যায় সম্বরিয়ে॥

এইরূপ পাঠ করিতে করিতে শ্রীগুরু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোমর কসিয়া লইলেন। এবং বলিলেন :—

"ওয়া গুরু জীকা খালসা।
ওয়া গুরু জীকা ফতে॥"

এই জয় ধ্বনি চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দেড় প্রহর রাত্রি থাকিতে শ্রীগুরু বলিলেন,—আমার অশ্ব প্রস্তুত কর। এই সময় সকলে শ্রীগুরুকে নিজের নিজের নিকটে দেখিল, কিন্তু কেহ স্পর্শ করিতে পাইল না। তখন কানাৎ (বা কাপড়ের কাণ্ডার)-বেষ্টিত ভূমিতে যেন দিবালোক দেখা যাইতে ছিল।

শ্রীগুরু এই সময় চিতার নিকটে গিয়া দক্ষিণ হস্তে বর্ষা ধরিয়া এবং অপর হস্ত কোমরে রাখিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—এখানে যে অর্থাদি

সমাগম হইবে তাহা কেবল লোককে খাওয়াইবে, সঞ্চয় করিবে না। সে টাকা লইয়া মন্দির প্রস্তুত করিবে না। এখানে যে মন্দির প্রস্তুত করাইবে, তাহার কুল নাশ হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। শ্রীগুরু লোককে খাওয়াইতে ("লঙ্গর") বড় ভাল বাসিতেন। সেইটী যাহাতে বজায় থাকে, তাহাই বারবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই সময় ভাই সন্তোষ সিং উপস্থিত ছিলেন; তিনি যোড় করে শ্রীগুরুকে নিবেদন করিলেন :—

তব সন্তোষ সিং কর যোড়ে।
শিখ সঙ্গৎ নাহেনই ওড়ে॥
কিস্‌তে লেধন ডেগ চালাওয়ে।
রহ সিং সো কিস্তে খাওয়ে॥

অর্থাৎ তখন সন্তোষ সিং যোড় করে নিবেদন করিলেন,—এখানে শিখ সঙ্গৎ নাই, ভোজ চালাইবার জন্য কাহার নিকটেই বা ধন লইবে, শিখেরা কাহার নিকটেই বা খাইবে?

শ্রীমুখতে পুন ধীরজ দিন।
দেশ না রহে সিং তে হীন॥

অর্থাৎ (শ্রীগুরু) শ্রীমুখে পুনরায় ধৈর্য্য দিয়া বলিলেন—ক্রমে কোন দেশ শিখহীন থাকিবে না।

ইহার পর শ্রীগুরু সমাধি লইয়া চিতার উপর উপবেশন করিলেন। শ্রীগুরুর আজ্ঞায় চিতা প্রজ্বলিত হইল। চৌদিকে "ওয়া গুরুজীকা ফতে' ধ্বনিত হইতে লাগিল। আকাশে নহবতের ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। তখন সকলে উৰ্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখিল। এক জ্যোতির্ম্ময় মূৰ্ত্তি ক্রমে আকাশে মিশাইয়া গেল।

তখন যে সকল শিখ কানাতের বাহিরে ছিল, তাহারা ও অপর সকলে

কানাতের ভিতর আসিল। এমন সময় হঠাৎ একবার শ্রীগুরুর দর্শন পাওয়া গেল। তিনি তাঁহার সজ্জিত ঘোড়াটী লইয়া অন্তর্ধান হইলেন এবং শুনা গেল, "শোক করিওনা, শ্রীগুরুর জপ কর।"

ইতি মধ্যে চিতা নির্ব্বাপিত হইয়া শীতল হইয়া গিয়াছে; কেবল মাত্র চিতাভস্ম রহিয়াছে। শ্রীগুরু যে অস্ত্র শস্ত্র অঙ্গে লইয়া ছিলেন, তাহার কোন চিহ্নই নাই। পরে এই স্থানটী শ্রীগুরুর সমাধি স্থান বলিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র; বহুদিন তথায় মন্দির উত্তোলন করা হয় নাই।

ক্রমে প্রাতঃকাল হইয়া গেল। সব শিখ একবারে উদাস হইয়া ধীর ভাবে বসিয়া আছে, এমন সময় তথায় এক সাধু আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। সাধু শিখদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা এমন উদাসভাবে বসিয়া রহিয়াছ কেন? তাহারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—আমাদের শ্রীগুরু বৈকুণ্ঠ গমন করিয়াছেন। এই কথা বলিতে বলিতে তাহাদের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। তখন সাধু আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন,— সে কি কথা, আমি এই মাত্র তাঁহাকে দেখিয়া আসি-লাম, তিনি অশ্ব পৃষ্ঠে ঐ দিকে গমন করিতেছেন। শ্রীগুরুকে একাকী যাইতে দেখিয়া আমি আরও জিজ্ঞাসা করিলাম কোথায় যাইতেছেন? তিনি বলিলেন, শিকার খেলিতে যাইতেছি। তখন শিখেরা শ্রীগুরুর বৈকুণ্ঠ গমন বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলেন। এমন সময় জনৈক শিখ বলিলেন,—সাধু যোগীর হৃদয়ে শ্রীগুরু সদাই বাস করেন; সেজন্য উনি যে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, ইহা বিচিত্র নয়।

তৎপরে উপস্থিত শিখেরা শ্রীগুরুর বৈকুণ্ঠ গমন উপলক্ষে পরদিন জন সাধারণকে বিশেষ ভোজ দিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল ভোজ দিয়া শিখদের যেন তৃপ্তি হয় নাই। শ্রীগুরুর সমাধি মন্দির হওয়ার "বাসনা" প্রচ্ছন্নভাবে অনেকেরই মনে উঠিয়াছিল। কিন্তু শ্রীগুরুর আজ্ঞায় সে

"বাসনা" সকলে তখন "বলি" দিয়াছিল। পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা শিখেরা বলেন,— "আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ শ্রীগুরুর এ আজ্ঞা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। পাঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রঞ্জিৎ সিংহের অভ্যুদয় কালে তাঁহার ইউরোপীয় বন্ধুগণ মহারাজকে কীর্ত্তিশালী করিবার জন্য নাদের সহরে শ্রীগুরুর সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার পরামর্শ দেন; তাহাতে মহারাজ আনন্দিত হইয়া সে কার্য্যে রত হয়েন। নাদের সহর হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজ্যভুক্ত। মহারাজের বিশেষ পরিচিত, ক্ষত্রিয়-কুলতিলক চণ্ডুলাল তখন নিজামের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। মহারাজ নাদের সহরে শ্রীগুরুর সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্য পাইবার জন্য চণ্ডুলালকে পত্র লিখেন। চণ্ডুলাল শ্রীগুরুর ওবিষয়ে নিবারণের অনুজ্ঞা জানিতেন এবং মহারাজের পত্রের উত্তরে তহা জানাই-লেন। মহারাজ তথাপি উহাতে নিবৃত্ত না হইয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই মহারাজ রঞ্জিৎ সিং দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে লাহোরে মহারাজের প্রাসাদের সিংহদ্বার হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং মহারাজের উপযুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রের লোকান্তর হয়। তৎপরে মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার দলিপ সিং কি ভাবে রহিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এইরূপে "গুরু অপেক্ষা গুরু-আজ্ঞা বলবান" এই মহাবাক্য সিদ্ধ হইল। শিখেরা বলেন,—গুরুবাক্য লঙ্ঘনের ফলেই আমরা এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম!

নাদের পর্ব্ব।

—:•:—

নবম পর্ব্বাধ্যায়।

নাদের বা আফজলপুরে শ্রীগুরুর আবাসে নূতন সেবায়ত। মাতাদ্বয়ের কথা। পুনঃ বান্দা-প্রসঙ্গ। মাতা সুন্দরীজীর পালিত পুত্রের কথা। উপসংহার।

জনওয়ারানায় গ্রামের রুস্তমরায় ও রবালে রায় নামে দুই ব্যক্তি মারহাট্টাদিগের দেশে গিয়া প্রায়ই লুণ্ঠন করিত বলিয়া মহারাষ্ট্র অধিপতি তাহাদিগকে ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং দুর্গা সিং নামে জনৈক শিখ তাহাদের পাহারায় নিযুক্ত হয়। সে পাহারা দিবার সময়েও গুরুবাণী অভ্যাস করিত। রবালে রায় দুর্গা সিংকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি পাঠ করিতেছ? তাহাতে সে গুরু-মাহাত্ম্য—বিশেষ করিয়া শ্রীগুরু গোবিন্দ সিংহের-মাহাত্ম্য বর্ণন এবং চমকোর ও আনন্দপুরের যুদ্ধ বর্ণন-পূর্ব্বক শেষে বলে, শ্রীগুরুর কৃপা হইলে সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। তুমি আর্দাশ (আত্ম-নিবেদন) জানাইয়া, শ্রীগুরুর স্মরণ লও; তাহা হইলে কারামুক্তও হইতে পার। রবালে রায় এই কথা শুনিয়া একান্তমনে শ্রীগুরুকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন শ্রীগুরু অশ্বপৃষ্ঠে কারাগারেই দর্শন দেওয়ায় রবালে রায় ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আপনি কে? শ্রীগুরু বলিলেন,—তুমি যাহাকে ডাকিতেছ, সেই আমি। তখন রবালে রায় কাতরতা জানাইতে লাগিল

শ্রীগুরু বলিলেন,—এ কাতরতার সময় নয়,"ওয়াগুরু"মন্ত্র জপিতে জপিতে ভাইকে জাগাইয়া দুইজনে আমায় রেকাব ধর। এবং চৌকিদারকে বলিয়া আইস যে, তোমরা যাইতেছ; তাহারা বাধা দিবে না। এইরূপে রবালে রায় যথাযথ কার্য্য করায় শ্রীগুরু তাহাদের দুই ভাইকে লইয়া আফজলপুরে আনিয়া তথাকার সেবায়ত নিযুক্ত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ক্রমে কতক শিখ আফ্‌জলপুর (নাদের) হইতে এদিকে ওদিকে চলিয়া গেলেন। কয়েক জন শিখ দিল্লী গিয়া মাতা সুন্দরী জী ও মাতা সাহেব দেয়ীকে সংবাদ দিলেন যে শ্রীগুরু বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন এবং তাঁহারা মাতাদ্বয়ের সেবার্থে দিল্লী আসিয়াছেন। এই সংবাদে মাতাদ্বয় রোদন করিতে লাগিলেন। শিখেরা শ্রীগুরুর উপদেশ বাক্য উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। মাতা সুন্দরী জী কতকটা ধৈর্য্য ধরিলেন; মাতা সাহেবদেয়ী রোদন সংবরণ করিয়া সাধনায় নিযুক্ত হইলেন এবং আহার নিদ্রাদির হ্রাস করিয়া ফেলিলেন। মাতা সুন্দরী জী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মাতা সাহেব দেয়ীকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন। অতি অল্প দিন পরেই, একাদশী তিথিতে, মাতা সাহেব দেয়ী দেহত্যাগ করেন। অতঃপর মাতা সুন্দরী জী অজিত নামক বালকটীকে লইয়া কিছুদিন দিল্লীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ওদিকে বান্দা লোহাগড়ে অবস্থান করিতেছিলেন। ক্রমে সম্রাট বাহাদুরসার আদেশে লাহোরের সুবা ও অন্যান্য তুর্কগণ তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। বান্দা অহঙ্কার বশতঃ সে সকল সংবাদ পাইলেও গ্রাহ্য করিল না। বাবা বিনোদ সিং প্রমুখ শিখগণ শ্রীগুরুর আদেশে বান্দার আদেশ পালনে নিযুক্ত; সুতরাং অন্য আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা বান্দাকে ত্যাগ করেন নাই। বান্দার গর্ব্ব দেখিয়া মধ্যে মধ্যে বাবা বিনোদ

সিং তাহার উপর খড়্গহস্ত হইলে বাবা কাহান সিং পিতাকে প্রবোধ দিয়া দিন কাটাইতেন। তুর্কসৈন্য বান্দাকে দুর্গমধ্যে বেষ্টন করিলে, বাবা বিনোদ সিং বিশজন শিখের সহিত রসদ সংগ্রহ করিয়া বান্দাকে সাহায্য করিলেন। একদিন বান্দা বলিল,—"আমি" গুরু আজ্ঞা পালন করিয়াছি, এখন তোমরা ইচ্ছা কর, চলিয়া যাইতে পার। বাবা কাহান সিংয়ের পরামর্শে বাবা বিনোদ সিং গোবিন্দোয়ালে প্রস্থান করেন।

তৎপরে তুর্কেরা বান্দাকে আক্রমণ করিয়া, কয়েকজন শিখসহ তাহাকে বন্দী করিল। সম্রাট্ বাহাদুর সার হুকুমে তাহারা দিল্লীতে আনীত হয়. তথায় অত্যন্ত নির্য্যাতনের সহিত বান্দাকে হত্যা করা হয়। মাতা সুন্দরীজীর অনুরোধে জনৈক শিখের সাহায্যে বন্দী শিখদিগের মধ্যে বাবা কাহান সিং কারামুক্ত হয়েন। বাদশাহ বাবা বাজসিংহের বিক্রমে তুষ্ট হইয়া একজন শিখের সহিত তাঁহাকে মুক্তি দান করেন।

ক্রমে মাতা সুন্দরী জীর পালিত পুত্র অজিত সিং বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। মাতা সাহেবদেয়ী নাদের হইতে আসিবার সময় পূজা করিবার জন্য দুইখানি তরবারী, দুইটি যমদর (মুদ্গর বিশেষ) এবং ছয়টি পেঁচকস আনিয়াছিলেন। ঐ অস্ত্রগুলি উচ্চ আসনে রাখিয়া উভয়েই পূজা করিতেন এবং বালক অজিতকে উহা পূজা করিতে শিক্ষা দিতেন। মাতা সাহেব-দেয়ী দেহত্যাগ করিলে, মাতা সুন্দরী জী এবং অজিত সিং উহা পূজা করিতেন। এই সময়ে শ্রীগুরুর নিমিত্ত যে সকল ভেট আসিত, শিখ সঙ্গত (সঙ্ঘ) তাহা প্রায় অজিতকে দিতেন। অমৃতসহর প্রভৃতি দূর দূর স্থান হইতেও ভেট আসিতে লাগিল। মাতা সুন্দরীজীর তৃপ্ত্যর্থে শিখেরা অজিত সিংহের উপর শ্রদ্ধা দেখাইত। ক্রমে অজিত সিং স্বয়ং শিখগুরু হইবেন এইরূপ ভাব দেখাইতে লাগিলেন। ষাটজন অশ্বারোহী সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত; ক্রমে গর্ব্ব ও অহঙ্কার আসিয়া দেখা দিল। তিনি পূজিত

অস্ত্রগুলি নিজ অঙ্গে ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মাতা সুন্দরী জী আপত্তি করিলেন; অপর শিখেরাও এ বিষয়ে নিবারণ করেন।

ক্রমশঃ অজিত সিং "আবদেরে খোকা" হইয়া দাঁড়াইল! একদিন তাহার এত জেদ হইয়া উঠিল যে, সে মাতাকেই মারিতে উদ্যত হইল; তাহাতে মাতা ক্রোধে গালি দিয়াছিলেন। তখন শ্রীগুরু যে পালিত পুত্র লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই কথা স্মরণ করিয়া মাতা নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কোন কোন দিন ক্রোধ উপলক্ষে মাতা পুত্রের অন্নজল ত্যাগ হইত। শিখেরা আবার উভয়কে বুঝাইয়া পান আহার করাইতেন। ক্রমে মাতা মনে করিলেন, হয়ত বিবাহ দিলে পুত্র বশীভূত হইবে; তদনুসারে অজিত সিংহের বিবাহ দেওয়া হইল।

তৎপরে একদিন অজিত সিং বেড়াইতে বেড়াইতে জুম্মা মসজিদের নিকটে গিয়া বলেন,—আমি শিখগুরু, আমার সম্মুখে মস্তক নত কর। তথাকার মোল্লারা এই কথা শুনিয়া ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত করে, এবং সম্রাট্‌কে এই ব্যাপার জ্ঞাত করে। তাহাতে অজিত সিংহ ভীত হইয়া নিজ কেশ ছেদন করে। অনন্তর সম্রাটকর্ত্তৃক আহূত হইলে, সে তাঁহার নিকটে না গিয়া বলিয়া পাঠায় যে, আমি সম্রাটের অবাধ্য নহি। মাতা সুন্দরীজী এই সকল কথা শুনিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া, বালক জুঝার সিং ও ফতে সিং ধর্ম্মের জন্য কেমন প্রাণ দিয়াছিল, সেই সকল কথা উল্লেখ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং স্বামিবাক্য অবহেলার জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি উপস্থিত শিখগণের পরামর্শে অজিত সিংহ সম্বন্ধে "বেদাওয়া" লিখিয়া তাহাকে ত্যাগ করিলেন। এইরূপে কষ্টভোগ করিতে করিতে মাতা সুন্দরীজীরও লোকান্তর হইল। অতঃপর অজিত সিং সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না; শিখেরা এ বিষয় উপেক্ষা করেন।

এইরূপে শিখদিগের মতানুযায়ী শ্রীগুরু গোবিন্দসিংহের জীবন-চরিত লিখিত হইল। শিখেরা যাহা বিশ্বাস করেন, তাহা না জানিলে শিখকে জানা হয় না; বস্তুতঃ তাহারই প্রয়োজন। এইজন্য ইউরোপীয় ধরণে অলৌকিক বাদ দিতে প্রবৃত্তি হয় না। গুরুগোবিন্দ আর কাহাকেও গুরুপদে বরণ করিয়া গেলেন না; কিন্তু যেখানে পাঁচজন খালসা সেই খানেই তিনি বর্ত্তমান এই মহাবাক্য-বিশ্বাসে "অমৃতপায়ী" শিখ "অমরত্ব" লাভ করিয়াছে। এসময়ে মোগল সম্রাটগণের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু পশ্চিম হইতে আমেদসার পুনঃ পুনঃ আক্রমণে শিখদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। গুরুগোবিন্দ নব তেজ দিয়া যে 'বান্দা' গঠন করিলেন, তিনি স্বীয় সংযত দীনভাবের অবস্থায় একবার শিখশক্তির বিপুলতা দেখাইয়া এবং পরে নিজ অহঙ্কারেই তেজোহীন হইয়া এই মহাশিক্ষা প্রত্যক্ষ করাইলেন যে, সাক্ষাৎ কোন গুরুদ্বারা পরিচালিত না হইয়াও তাঁহারা খালসা ধর্ম্মপথে সম্মিলিত উদ্যমে—অজেয় কিন্তু ধর্ম্মপথ এবং দীনভাব ছাড়িয়া অহঙ্কৃত হইলে, তাহাদেরও পতন অবশ্যম্ভাবী। মহারাজ রণজিৎ সিংহের অজেয় খালসা সৈন্য পরে ইহাই পুনর্ব্বার ভারতকে দেখাইয়া গিয়াছে। দর্পভরে পঞ্জাবের মধ্যে এবং ব্রিটিশ সীমানায় অত্যাচার না করিলে, আজিও সেই খালসা সৈন্যদল স্বাধীন নেপালের ন্যায় ব্রিটিশ মিত্রের সহচররূপেই প্রতীয়মান হইতেন! তবে শ্রীভগবানের এবং শ্রীগুরুর উদ্দেশ্য আমরা কি বুঝিব? ভারতের বর্ত্তমান একচ্ছত্র শাসন ব্যতীত হয় ত শিখগণ ভারতের জাতীয় ভাবের মধ্যে আসিতেন না। তাই "বিধি-প্রেরিত" ইংরাজের ভারতে আগমন।

সম্পূর্ণ।

ভূদেব গ্রন্থাবলী।

পূজ্যপাদ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত পুস্তকগুলি আমার নিকট, কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২০১ নং (বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে), ২২।১ নং (ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে), ৩০ নং (সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে), এবং ২০৩ নং (মনোমোহন লাইব্রেরীতে) পাওয়া যায়।

শুভবিবাহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার—

মুর্শিদাবাদী গরদে স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধাই ডবল ক্রাউন

	মূল্য	ডাঃ
* পারিবারিক-প্রবন্ধ (৮ম সংস্করণ)	১॥০	✓১০
ঐ (৭ম ঐ)	১৲	✓১০
ঐ হিন্দীতে	১৲	✓১০

ভারতে নবযুগ-প্রবর্ত্তক—

* সামাজিক প্রবন্ধ (চতুর্থ সং)	১॥০	✓১০
* আচার প্রবন্ধ (২য় সং)	১৲	✓১০
* ঐ হিন্দী	১৲	✓১০
* বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ (২য় সং)	॥০	⁄১০

* বিবিধ প্রবন্ধ—	মূল্য	ডাঃ
* ঐ ২য় ভাগ [তন্ত্রের কথা প্রভৃতি]	॥০	⁄১০
* পুষ্পাঞ্জলি (২য় সং)	॥০	⁄১০
* স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস	॥০	⁄১০
* বাঙ্গালার ইতিহাস ৩য় ভাগ	॥০	⁄১০
ঐতিহাসিক উপন্যাস (৬ষ্ঠ সং)	॥০	⁄১০
পুরাবৃত্তসার (১৫শ সং)	৸০	⁄১০
ইংলণ্ডের ইতিহাস (৭ম সং)	৸০	⁄১০
শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব (৫ম সং)	১৲	⁄১০
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (৭ম সং)	১৲	⁄১০

উপরিউক্ত পুস্তকগুলির ডিমাই আটপেজি সংস্করণ এবং সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী (।৵০) বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের মূল দলিলের নকল সহিত দুই খণ্ডে বাঁধান আমার নিকট লইলে ডাকমাশুল ও ভি পি খরচা সহিত মোট ১০৸০ পড়িবে।

বিশ্বনাথ (দাতব্য) ট্রষ্ট ফণ্ডের অপর পুস্তকাদি—

	মূল্য	ডাঃ
ভূদেব চরিতম্ (মহাকাব্যম্)	১॥০	✓০
[সংক্ষিপ্ত] ভূদেব জীবনী	।৵০	⁄১০
অনাথবন্ধু [উপন্যাস]	১।০	⁄১০
* সদালাপ (সচিত্র) নং ১, ২, ৩ প্রত্যেক	৸০	✓০
* নেপালী ছবি (সচিত্র)	৸০	✓০
* শ্রীরামচরিত্রের আলোচনা	।০	⁄১০

	মূল্য	ডাঃ
একাদশীতত্ত্ব [দেবনাগর অক্ষরে]	১৲	৵১০

* চিহ্নিতগুলি এডুকেশনগেজেট হইতে পুনর্মুদ্রিত।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত :—

পোষ্যপুত্র (উপন্যাস) (২য় সং)	১।০	৵০
বাগ্‌দত্তা (ঐ)	১॥০	৵০
মন্ত্রশক্তি (ঐ)	১॥০	৵০
জ্যোতিঃহারা (ঐ)	১॥০	৵০
মহানিশা (ঐ)	২৲	৵০

us. The value of the publication lies chiefly in the clearness of manner in which the salient moral lessons of the great epic are sought to be impressed on the juvenile mind. This book is well adapted for the use of the young folk of both the sexes.

—*Indian Mirror*.

Sisu Mahabharata.—(By Tinkari Banerji.)

In this book, the story of the Mahabharata, with such incidents as bear directly on the main plot, has been given, canto by canto. The publication is intended for the use of children of a larger growth may find it useful to them for the purposes but children of reference.—*Indian Mirror*.

We have much pleasure to acknowledge receipt of a copy each of Sisu Ramayana and Sisu Mahabharata in Bengali by Babu Tincoury Banerji. They are brief stories culled from our ancient epic poems and are intended for our little boys and girls. We shall be very glad if the members of the Text Book Committee and managers of unaided higher and lower class schools in Bengal and Behar be good enough to introduce these useful brochures in the lower classes of their schools. We thank the compiler heartily for having hit upon the idea of bringing out such useful books. It is now time that such social and religious books should be placed in the hands of our little children for their welfare. The prices of the publications are As. 2 and 4 respectively and they may be had of all the principal book sellers.—*Hope.*

শিশু মহাভারত। শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমরা পরম পারিতোষ লাভ করিয়াছি। নীতিশিক্ষোপযোগী এবং হৃদয়গ্রাহী দেশীয় বিষয়ের দ্বারা দেশীয় শিক্ষার্থিগণকে নীতিশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাই আমরা সর্ব্বথা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। গ্রন্থকার সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে পুস্তকখানিতে উল্লিখিতরূপ ব্যবস্থারই অনুসরণ করিয়াছেন। পুস্তকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় পুস্তকখানি সর্ব্বাংশে বালক বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইবার উপযোগী। এডুকেশন গেজেট।

শিশু মহাভারত। শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। মূল্য।• চারি আনা মাত্র। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে প্রকাশিত। মহাভারতের কথা বালকগণ শিশুকালে শিখিলে, ভবিষ্যতে তাহাতে অনেক উপকার হয়। তবে, মহাভারতের গল্পগুলি বালকগণের শিখিবার উপায় অতি অল্পই ছিল। এই পুস্তকখানির দ্বারা সে অভাব কতক পরিমাণে দূর হইবে। পুস্তকের ভাষা বালকগণের উপযোগী হইয়াছে।—হিতবাদী।

শিশু রামায়ণ। উক্ত গ্রন্থকার কর্তৃক প্রণীত। মূল্য ৵• আনা। উদ্দেশ্য সহজ বাঙ্গালায় বালকদিগকে রামায়ণ শিক্ষা দেওয়া। উদ্দেশ্য ভাল, লেখা ভাল। এই পুস্তকের দ্বারা বালকদিগের উপকার হইবে।—হিতবাদী।

পদ্য ব্যাকরণ। ইহাও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারের। পদ্যগুলি সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায় বালকগণ অনায়াসে কণ্ঠস্থ করিতে পারিবে।—হিতবাদী। ইত্যাদি।

সচিত্র সাধন-বিজ্ঞান।

আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে একখানি সর্ব্বাঙ্গীন অধ্যাত্ম-তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক সাধন-রহস্য ও আধ্যাত্মিক চিত্রাবলী সম্বলিত সুবৃহৎ গ্রন্থ খণ্ডাকারে মাসে মাসে প্রকাশ করিতেছি। আশা করি আপনারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

মূল্য—এককালীন ডাঃ মাঃ সমেত ৫॥• টাকা কিম্বা প্রবেশিকা এক টাকা পাঠাইলে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড গ্রন্থ প্রতি খণ্ড ॥• হিসাবে ধার্য্য করিয়া ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয়।

প্রকাশক,—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর, এফ, আর, জি, এস,
প্রোপ্রাইটর—বেঙ্গল আর্ট ষ্টুডিও, ১নং সরকার লেন, কলিকাতা।

মহামানব

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়